রূহের রহস্য

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম

রূহের রহস্য

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম

ISBN : 984-32-3626-2

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
বুক এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৫১০৬৫৫০

পরিবেশক
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৮
চতুর্থ প্রকাশ : জুন, ২০১৫
রমযান, ১৪৩৬
আষাঢ়, ১৪২২

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য ঃ তিনশত টাকা মাত্র

Ruher Rahaiyssha Written by Allama Hafez Ibnul Qaiyeem Translated into Bengali by Lokman Ahmad Amimi, Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar, Dhaka, 4th Edition June, 2015
Price Tk. 300 ($6.00) Only.

AP-56

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

হাফিয আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) এখন থেকে প্রায় সাত শ' বছর পূর্বে 'আররূহ' গ্রন্থখানা আরবি ভাষায় রচনা করেন। তিনি ছিলেন সমকালীন মুসলিম বিশ্বের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর অনন্য প্রজ্ঞা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলো তাঁর দীপ্ত পদচারণা। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ছিলো অনেক। তন্মধ্যে 'আররূহ' গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এ গ্রন্থখানা মিসরের জমহুরিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

রূহ্ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে, কোন কোন গ্রন্থের সাহায্য নেয়া যায়, আমি এক সময় আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ, বহু গ্রন্থের প্রণেতা মুফতী মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলাম। তিনি তখন ছ'খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। সেগুলো হচ্ছে– ১. কিতাবুর্ রূহ– হাফিয ইবনুল কায়্যিম, ২. কিতাবুত তাকদীর– হাফিয ইবনুল কায়্যিম, ৩. শরহুস্ সুদূর ফী যিকরিল মাউতা ওয়াল কুবূর– আল্লামা জালাল উদ্দীন সূউতী, ৪. আবইয়াতু তাসাব্বুত– আল্লামা জালাল উদ্দীন সূউতী, ৫. আল বদূরুস্ সাফিরাহ ফী আহওয়ালিল আখিরাহ– আল্লামা জালাল উদ্দীন সূউতী, ৬. মুসীবুল গারাম ইলা দারিস্ সালাম– নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান। তন্মধ্যে হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ)-এর 'আররূহ' গ্রন্থখানাকে তিনি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থখানা যাতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়, এটাও ছিলো তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। তাঁর সেই মহতী ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি 'আররূহ' গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এর নামকরণ করেছি "রূহের রহস্য"।

রূহ কি, রূহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কি, রূহ নশ্বর না অবিনশ্বর, রূহের সঙ্গে নাফসের সম্পর্ক কি, রূহ আগে সৃষ্টি হয়েছে, না দেহ আগে সৃষ্টি হয়েছে, মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে রূহের অবস্থান কোথায়, এসব বিষয়ে জানার কৌতুহল, আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা মানুষের চিরন্তন। তাই যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধিৎসু মানুষ রূহের হাকীকত ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা করে আসছেন। গ্রন্থকার

হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ) তাঁর এই গ্রন্থে রূহ সম্পর্কে সেসব বিষয় কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে কোন কোন মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এই তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

'আররূহ' গ্রন্থখানা সাত শ' বছর পূর্বে আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় আধুনিক আরবী ভাষার সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ভাষাগত বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে শব্দের উপর নির্ভর না করে, ভাবার্থের উপর নির্ভর করে অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। গ্রন্থখানায় কোন কোন বিষয়বস্তু এতোই কঠিন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা বুঝে উঠা কষ্টকর। তবুও আমি অনুবাদের ভাষা ও ভাবকে সহজবোধ্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এছাড়া এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করার লক্ষ্যে হাদীস ও অন্যান্য ঘটনা বর্ণনাকারীদের নামের সনদ বা সূত্রের মধ্যে দু'একজনের ছাড়া অন্য কারো নাম উল্লেখ করিনি।

মূল আরবি গ্রন্থে কোন কোন বিষয়বস্তু একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। স্বভাবতই এটা পাঠকের জন্য একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। তবে এ ব্যাপারে আমার কোন কিছু করার সুযোগ বা অবকাশ ছিলো না, যেহেতু এটা অনূদিত গ্রন্থ। এ অনূদিত গ্রন্থে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে, সম্মানিত পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সেটা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞ চিত্তে তা সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, আমার দীর্ঘ দিনের সুহৃদ সুনামগঞ্জ নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মজিদ সাহিত্য ভূষণ, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার এই অনূদিত গ্রন্থখানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তাঁর এই সহৃদয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই অনূদিত গ্রন্থখানা প্রকাশ করার ব্যাপারে অন্য যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আমি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সকলকে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শান্তি দান করুন। আমীন ॥

অক্টোবর, ১৯৯৮ইং

লোকমান আহমদ আমীমী

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

আররূহ্ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি পরিপূর্ণ গুণাবলী ও মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্যে বিভূষিত। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত। তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, অনুগত ও অবাধ্য, আকাশের হোক বা পৃথিবীর অধিবাসী হোক, সকলের জন্য আখিরাতে সুবিচার নিশ্চিত করেছেন। একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি যিনি প্রচুর পার্থিব সম্পদের অধিকারী এবং আকাশচুম্বি ও মনোরম প্রাসাদরাজি তৈরি করে দুনিয়ার মানুষকে হতবাক করেন এবং দুনিয়াকে নিজের চিরস্থায়ী নিবাস বলে মনে করেন, তিনি কতোই না বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তিনি ভুলে যান, একদিন তাঁকে অবশ্যই সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে।

অপরদিকে, একজন আল্লাহর প্রেমিক বান্দা আখিরাতের চিন্তায় জীবনভর চিন্তিত ও শঙ্কিত থাকেন এবং আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় তৎপর ও যত্নবান থাকেন। এই মহৎ নেককার বান্দা আনন্দচিত্তে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। কিন্তু উভয় ব্যক্তির বিদায় নেয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একজন চিরশান্তি ও অনন্য সৌভাগ্য লাভ করেন আর অপরজন দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার শিকার হন। একজন জান্নাতের সুদৃশ্য বাগবাগিচায় আনন্দে অবস্থান করেন এবং বরযখী জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও নি'আমত উপভোগ করেন। আর অপরজন জাহান্নামে চরম শাস্তি ভোগ করেন।

আসুন, আমরা দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও অনন্ত, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর দয়া ও করুণা অপরিসীম। সকল সৃষ্টি তাঁর করুণায় লালিত-পালিত হয়। আল্লাহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সূচনা অপার অনুগ্রহে সম্পন্ন করেছেন আর আমাদের উপর তাঁর নি'আমত ও করুণা অহরহ বর্ষণ করছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি ও নাফসের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের হিদায়াতের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র রূহের অধিকারী। তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের সর্দার ও সাইয়্যিদুল আবরার।

তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিলো পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। এই পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন : "ইয়াসয়ালূনাকা আনির্‌রূহি"..... অর্থাৎ– "তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন– রূহ আপনার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের উপর ও মহান সাহাবায়ে কিরামের উপর লাখো দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক যাঁরা হিদায়াত প্রাপ্তির পর বিন্দুমাত্র পদস্খলিত হননি। এসব মহামানবের উপর আল্লাহর তা'আলার অসীম রহমত ও বরকত বৃষ্টি ধারার মতো কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হোক এবং তাঁরা চিরশান্তি লাভ করুন। আমীন।

কিতাবুর রূহ একটি উন্নত ও উঁচু মানের গ্রন্থ। এতে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে অনেক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। রূহ সম্পর্কে যাবতীয় মাসয়ালা ও তথ্য এই গ্রন্থে অতি স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া কুরআন, হাদীস, মহান সাহাবী এবং নির্ভরযোগ্য আলিমদের অভিমত সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত যেসব মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে লোকজন গ্রন্থকারের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের মধ্যে হামদ ও সালাতের কোন উল্লেখ নেই।

যখন আমি গ্রন্থখানা প্রকাশ করার মনস্থ করলাম তখন ইস্তেখারার মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে এই ভূমিকা সংযোজন করি। এই গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়সমূহ এক একটি মণি-মুক্তাস্বরূপ। এই গ্রন্থখানা পাঠ করলে রূহ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিকৃত ও অপরিপক্ক ধ্যান-ধারণা থেকে রক্ষা করুন এবং খাঁটি নিয়ত, নেক আমল ও সৎ উপদেশ গ্রহণের তাওফীক দান করুন। গ্রন্থকার ও সম্মনিত পাঠকবর্গকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের সুখ ও শান্তি দান করুন।*

---

* গ্রন্থকার হাফিয ইবনুল কায়্যিম (র) তাঁর এই গ্রন্থের কোন নামকরণ করে যাননি। কিন্তু এই গ্রন্থখানা 'আর্‌রূহ' বা আত্মা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে এবং এই নামেই অধিক পরিচিত। এই গ্রন্থখানার ভূমিকাটি বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে উমর বাকায়ী (র) কতৃর্ক লিখিত। এই গ্রন্থখানার কলেবর হ্রাস করার পর এর নাম 'সির্‌রুর রূহ' বা 'রূহের রহস্য' রেখেছিলেন। ৮৮৫ হিজরী সনে বাকায়ী ইনতেকাল করেন। –অনুবাদক

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কিতাবুর রূহ গ্রন্থ প্রণেতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর আইয়ূব ইবনে সা'দ ইবনে হরীয আয্যারয়ী আদ্দিমাশ্কী আবূ আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন। তিনি ৬৯১ হিজরীর ৭ই সফর দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীর ১৩ই রজব ইনতেকাল করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কায়্যিম আলজাওযী (র)। তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবূ বকর ইবনে আবদুদ্দায়িম, ঈসা আল মুতয়িম, ইবনুশ শীরাযী, ইসমাইল ইবনে মাকতুম, শিহাব নাবলুসী, কাযী তকীউদ্দীন সুলাইমান, বিনতে জাওহার ও ইবনে তাইমিয়াহ (র) দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ ও বিপথগামী লোকদের প্রতিরোধকল্পে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তবে সত্য ও যুক্তির আলোকে তিনি অনেক বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র)-এর বিরুদ্ধাচরণও করেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিলো অনেক। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, ইমাম ইবনে কাসীর, ইবনে রজব আলবাগদাদী আল হাম্বালী, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আননাবলসী প্রমুখ।

মানুষ সাধারণত সমকালীন শিক্ষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইবনুল কায়্যিম (র) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সেই পরিবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। এই প্রেক্ষাপটে এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্ম মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো না। তিনি যে বিরাট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেটাকে তিনি জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত গবেষকও ছিলেন। সমকালীন মিসর ও সিরিয়ায় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টিকে তিনি গ্রহণ ও আত্মস্থ করেন। তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন একটি চলমান বিশ্বকোষ। ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, সীরাত ও ঐতিহাসিক বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই অধিক ছিলো না, জ্ঞানের গভীরতার দিক দিয়েও ছিলো সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন অত্যধিক জ্ঞান পিপাসু ও পাঠানুরাগী। গ্রন্থ সংগ্রহ করাও ছিলো তাঁর নেশা। ফলে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের কোন পরিধি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তাঁর কোন কোন মতবাদের দরুন নানা রকমের নির্যাতনের

শিকার হয়েছিলেন, এর মধ্যে কোন কোনটি ছিলো খুবই অবমাননাকর। একবার তাঁকে তাঁর উস্তাদ শাইখ তকীউদ্দিনসহ একটি উটের পিঠে চড়িয়ে বেত্রাঘাত করতে করতে রাস্তা ঘোরানো হয়েছিলো। অবশেষে তাঁদেরকে একটি দুর্গের নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁর উস্তাদ শাইখ তকীউদ্দীন এই অবস্থায় ইনতেকাল করেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিমকে পরে সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এই নির্যাতনের কারণ ছিলো এই যে, হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করতে তিনি সম্মত হননি। এজন্য তিনি তৎকালীন বিচারকদের নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। তদুপরি তিনি কারণ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার বৈধতার পক্ষেও ফতওয়া দিয়েছিলেন। এতে সেই সময়কার বিচারক সুবকী তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে ডেকে পাঠান। পরিশেষে, ইমাম ইবনুল কায়্যিম তাঁর সেই সব অভিমত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হাজার (র), ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র)-এর গবেষণা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "তিনি তাঁর গ্রন্থাবলী প্রণয়নে কঠোর পরিশ্রম করতেন।" এই উক্তি থেকে এটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পাঠকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে একটি সুষমামণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপহার দেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এ জন্যই জনগণ তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী খুবই পছন্দ করেন।

এখানে ইবনুল কায়্যিম (র)-এর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ ১. ই'লামুল মুকিয়ীন, ২. আখবারুন নিসা, ৩. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া আ'লা গাযবিল ফিরাকাতিল জুহামিয়া, ৪. ইগাসাতুল লাহ্ফান, ৫. ঈমানুল কুরআন, ৬. বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, ৭. বুতলানুল কিমিয়া মিন আরবাঈনা ওয়াজহান, ৮. বায়ানুল বুতলান, ৯. তাফযীলু মক্কা আ'লা মাদীনা, ১০. তাফসীরুল ফাতিহা, ১১. তাফসীরু আসমাইল কুরআন, ১২. তুহ্ফাতুল মাউদূদ ফী আহ্কামিল মাউলুদ, ১৩. তাহ্যীবু সুনানী আবী দাউদ, ১৪. জালাউল ইফহাম ফী যিকরিস সালাতি ওয়াস্ সালাম আ'লা খায়রিল আনাম, ১৫. জারাবাতুল আবিদিল সুলবান, ১৬. আল জাওয়াবুল কাফী আন সামরাতিদ্ দুয়া, ১৭. হুকমু তারিকিস্ সালাত, ১৮. হুকমু ইগমামি হিলালি রামযান, ১৯. হাদীল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, ২০. রাওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকিন, ২১. যাদুল মা'য়াদ, ২২. শিফাউল আলীল ফিল কাযা ওয়াল ক্কাদর, ২৩. শারহু আসমায়িল কিতাবুল আযীয, ২৪. শারহুল আসমায়িল হুসনা, ২৫. তারীকুল হিজরাতাইন ওয়া বাবুস্ সা'য়াদাতাইন, ২৬. আত্তুরুকুল হুকমিয়া,

২৭. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ২৮. ইলমুল বায়ান, ২৯. ফাযলুল ইল্‌ম, ৩০. আল ফাতহুল কুদসী, ৩১. আল ফুরুসিয়াতুশ্ শারইয়াহ, ৩২. মাদারিকুস সালিকীন, ৩৩. দারুমিফতাহিস্ সায়াদাহ, ৩৪. মায়ানিল আদাওয়াতি ওয়াল হুরুফ, ৩৫. নুযহাতুল মুশতাকীন, ৩৬. নূরুল মুমিন ওয়া হায়াতুহু, ৩৭. নিকাহুল মুহরিম, ৩৮. নাফদুল মানকূল ওয়াল মিহাক্কুল মুমাইয়িয বাইনাল মারদূদ ওয়াল মাকবুল, ৩৯. আর্‌রূহ।

এর মধ্যে 'আররূহ' গ্রন্থখানা ইবনুল কায়্যিম (র)-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এ গ্রন্থখানা পাঠ করলে পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হবেন।

এই গ্রন্থখানা পড়ে সুধীবৃন্দ, পাঠকগণ যাতে এর সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ও কল্যাণ সাধন করতে পারেন, তার জন্য আমি পরম করুণাময়ের দরবারে আকুল প্রার্থনা করছি।

– মুহাম্মদ ফাহমী আস্‌সিরজানী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তি কবর যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারে কিনা
এবং তাদের সালামের উত্তর দিতে পারে কিনা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর রূহের পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয় কিনা ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের রূহ পরস্পর সাক্ষাৎ করে কিনা ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

রূহের মৃত্যু হয়, না কেবল দেহের মৃত্যু হয় ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহকে কিভাবে চেনা যায় ৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবরে মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াবের সময় মৃত ব্যক্তির
রূহকে কিভাবে দেহে ফিরিয়ে আনা হয় ৭৮

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যুর পর কবরের আযাব হয় কিনা কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয় কিনা ১১৪

অষ্টম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনে কবরের আযাব সম্পর্কে কোন উল্লেখ আছে কিনা ১৪২

নবম অধ্যায়

কি কি কারণে কবরের আযাব হয় ১৪৬

দশম অধ্যায়

কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ১৫০

একাদশ অধ্যায়
কবরে কি মুমিন, মুনাফিক ও কাফির সবাইকে প্রশ্ন করা হয় ১৫৭
দ্বাদশ অধ্যায়
মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব কি কেবল শেষ নবীর
উম্মতের জন্য, নাকি অন্য সকল নবীর উম্মতের জন্যও ছিলো ১৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়
কবরে কি শিশুদেরকেও সওয়াল-জওয়াব করা হয় ১৬৫
চতুর্দশ অধ্যায়
কবরের আযাব স্থায়ী না সাময়িক ১৬৭
পঞ্চদশ অধ্যায়
মৃত্যুর পর রূহ কিয়ামত পর্যন্ত কোথায় অবস্থান করে ১৭১
ষোড়শ অধ্যায়
মৃতদের রূহ জীবিতদের নেক আমল দ্বারা উপকৃত হয় কিনা
বা মৃত ব্যক্তি নিজের নেক আমল দ্বারা উপকৃত হয় কিনা ২০৪
সপ্তদশ অধ্যায়
রূহ নশ্বর, না অবিনশ্বর ২৪৩
অষ্টাদশ অধ্যায়
প্রথমে রূহ, না দেহের সৃষ্টি হয়েছে ২৬৪
ঊনিশতম অধ্যায়
নাফস কি? নাফসের মূল রহস্য কি ২৯১
বিশতম অধ্যায়
নাফস ও রূহ কি এক, না ভিন্ন ৩৪৩
একুশতম অধ্যায়
নাফস কি একটি না তিনটি ৩৪৮
কতিপয় পরিভাষার ব্যাখ্যা ৩৬২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তি কবর যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারে কিনা এবং তাদের সালামের উত্তর দিতে পারে কিনা

হযরত ইবনু আবদিল বার (রহ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন তাঁর কোন পূর্ব পরিচিত ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়ে যান এবং তাকে সালাম জানান, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ সালামের জবাব দেয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির রূহকে কবরে ফিরিয়ে দেন এবং সে সালামের জবাব দেয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাবও দিয়ে থাকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের লাশ একটি কূপে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। এরপর তিনি সেই কূপের নিকট এসে দাঁড়ান এবং এক এক করে তাদের নাম ধরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমরা কি তোমাদের রবের প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পেয়েছো? আমি তো আমার রবের ওয়াদা ঠিকই পেয়েছি।" তা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করছেন যারা লাশে পরিণত হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আমার কথাগুলো তারা তোমাদের চেয়েও অধিকতর স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছে; কিন্তু তারা এর উত্তর দিতে অক্ষম।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর লোকেরা যখন ফিরে আসতে থাকে, তখন সেই মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়। (আল ফাতহুল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯)

এছাড়া রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, যখন তারা কবরবাসীদেরকে সালাম দেয়, তখন তারা যেন সামনে উপস্থিত লোকদেরকে যেভাবে সালাম দেয়, ঠিক সেভাবে সালাম দেয়। তারা যেন বলে, "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন।" অর্থাৎ 'হে

কবরবাসী মুমিনগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ ধরনের সম্বোধন তাদেরকেই করা হয় যারা শুনতে পায় ও বুঝতে পারে। অন্যথায় কবরবাসীদেরকে এভাবে সম্বোধন করা হবে জড় পদার্থকে সম্বোধন করারই শামিল।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আগেকার দিনের বিজ্ঞজনেরা অভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে, মৃত ব্যক্তিরা যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারে এবং তাদেরকে দেখে উল্লসিত হয়।

হযরত আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়েদ ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর "কিতাবুল কুবূর" গ্রন্থে "মৃত ব্যক্তিরা যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারে" শীর্ষক অধ্যায়ে নিম্নোক্ত ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সেখানে বসে, তখন সেই মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের উত্তর দেয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তি সেখান থেকে চলে না যায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি স্বস্তি বোধ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন কোন ব্যক্তি তার পরিচিত কোন ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়ে যায় এবং তাকে সালাম দেয়, তখন সে সালামের জবাব দেয় এবং তাকে চিনতে পারে। আর যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে কেউ যায় এবং তাকে সালাম দেয়, তখন সেও তার সালামের জবাব দিয়ে থাকে।

হযরত আসিম আল জাহদারীর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আসিম (রা)-এর ওফাতের দু'বছর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি না মরে গেছেন? তিনি বললেন, "অবশ্যই"। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখন কোথায় আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন বেহেশতের একটি বাগিচায় আছি। আমি এবং আমার কয়েকজন সাথী প্রত্যেক জুমুআর রাতে ও জুমুআর দিনের সকালে হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী (রা)-এর নিকট মিলিত হই, আর তোমাদের সকল অবস্থা তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সশরীরে উপস্থিত হন, নাকি শুধু আপনাদের রূহ উপস্থিত হয়? তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের শরীরতো নষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমাদের রূহ পরস্পর মিলিত হয়। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কবর যিয়ারতের কথা কি আপনারা জানতে পারেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, জুমুআর সমস্ত দিন এবং শনিবার দিন সূর্য উঠার আগ

পর্যন্ত জানতে পারি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য সব দিন বাদ দিয়ে শুধু জুমুআ ও শনিবারের এই বৈশিষ্ট্য কেন? তিনি বললেন, যেহেতু জুমুআর দিনটি ফযীলত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন।

হযরত হাসান কাসসাব (র) বর্ণনা করেন ঃ প্রতি শনিবার সকালে আমি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র)-এর সাথে জুবানে (কবরস্থানে) যেতাম। সেখানে গিয়ে মৃতদেরকে সালাম করে তাঁদের জন্য দু'আ করতাম এবং ফিরে আসতাম। একদিন আমি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র)-কে বললাম, শনিবারের পরিবর্তে আপনি সোমবার দিন যিয়ারতের জন্য ধার্য করলে ভালো হয়। তিনি বললেন, 'না', যেহেতু আমি জানতে পেরেছি, শুক্রবার দিন, তার পূর্ববর্তী দিন এবং তার পরবর্তী দিনও মৃত ব্যক্তিরা যিয়ারতকারীদের সম্পর্কে অবহিত থাকে।

এই প্রসঙ্গে হযরত আদ্‌দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত আছে। কেউ যদি শনিবার দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে কোন কবর যিয়ারত করে, তাহলে মৃত ব্যক্তি তার সর্বশেষ যিয়ারত সম্পর্কে জানতে পারে। কেনো এমন হয়, জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দিলেন, "জুমুআর দিনের বিশেষ মর্যাদার কারণে, জুমুআর ফযীলতের কারণেই শনিবারের প্রথম অংশের এই মর্যাদা।

হযরত জাফর ইবনে সুলাইমান (র) হযরত আবূ তাইয়াহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আবূ তাইয়াহ (র) বলেন যে, হযরত মুতরাফ (র) প্রত্যহ সকালে কবরস্থানে যেতেন, আর জুমুআর দিন যেতেন গভীর রাতে। হযরত জাফর ইবনে সুলাইমান (র) এই প্রসঙ্গে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ তাইয়াহ (র)-কে বলতে শুনেছেন, অন্ধকার রাতে মুতরাফ (র)-এর চাবুকটি আলোকিত হয়ে যেতো। একদিন রাতে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঐ কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, প্রত্যেক কবরবাসী নিজ নিজ কবরের উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে সবাই বলতে লাগলেন, আরে ইনিতো সেই মুতরাফ যিনি প্রত্যেক জুমুআ বারে আমাদের কাছে আসেন। তখন মুতরাফ (র) তাঁদেরকে বললেন, আপনারা কি জুমুআর দিনের খবর রাখেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, এমনকি ঐ দিন পাখিরা যা বলে, তাও আমরা শুনতে পাই। আমি আবার তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, পাখিরা কী বলে? তাঁরা বললেন, পাখিরা 'সালাম' 'সালাম' বলতে থাকে।

হযরত ফযল (র) ছিলেন হযরত ইবনে উয়াইনা (র)-এর মামাত ভাই। তিনি বর্ণনা করেন, যখন আমার পিতার ইনতেকাল হলো, তখন আমি তাঁর সম্বন্ধে খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। আমি প্রত্যহ তাঁর কবর যিয়ারত করতাম। ঘটনাক্রমে আমি কিছুদিন তাঁর কবর যিয়ারত করতে যেতে পারিনি। পরে একদিন

আমি তাঁর কবরের কাছে এসে বসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে আমি দেখলাম, আমার পিতার কবরটি যেন হঠাৎ ফেটে গেলো। তিনি কবরের মধ্যে কাফনে আবৃত অবস্থায় বসে আছেন। তাঁকে দেখতে মৃতদের মতোই মনে হচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় বৎস! তুমি এতোদিন পরে আসলে কেনো? আমি বললাম, আব্বা, আমার আসার খবর কি আপনি জানতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি যখনই এখানে আস তোমার খবর আমি পেয়ে যাই। তোমার যিয়ারত ও দু'আর বরকতে আমি শুধু উপকৃত হই না, আমার আশে পাশে যাঁরা সমাহিত তাঁরাও উল্লসিত, আনন্দিত এবং উপকৃত হন। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি সব সময় আমার পিতার কবর যিয়ারত করতে থাকি।

হযরত উসমান ইবনে সাওদা (র)-এর আম্মা একজন উঁচু স্তরের আবিদা বা ইবাদতকারিণী ছিলেন। এজন্য লোকেরা তাঁকে রাহিবা বলে সম্বোধন করতো। হযরত উসমান (রা) বলেন, তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রয়োজনীয় মুহূর্তের সম্পদ ও সঞ্চয়, তোমার উপর আমার ভরসা, তুমি আমার মৃত্যুর সময় তোমার সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। আর কবরে আমাকে একা ফেলে রেখো না। অতঃপর আমার আম্মা ইনতিকাল করলেন। আমি প্রত্যেক জুমুআর দিন তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর ও অন্যান্য কবরবাসীর জন্য মাগফিরাত কামনা করতাম।

একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান! আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র, মৃত্যু খুবই যন্ত্রণাদায়ক। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সসম্মানেই কবরে আছি। আমি ফুল শয্যায় ও মিহি রেশমের গালিচায় শুয়ে বসে শান্তিতে সময় কাটাচ্ছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। আমি বললাম, আমি আপনার কি খিদমত করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার কবর যিয়ারত করবে ও আমার জন্য মাগফিরাত চাইবে। জুমু'আর দিন যখন তুমি নিজের ঘর থেকে এখানে আসো, তখন আমাকে এ বলে সুসংবাদ দেয়া হয়, হে রাহিবাহ, তোমার স্নেহের পুত্র এসেছে। এর দ্বারা শুধু আমারই নয়, বরং আমার প্রতিবেশী কবরবাসীদেরও উপকার হয়ে থাকে।

হযরত বাশার ইবনে মনসূর (র) বর্ণনা করেন ঃ একবার মহামারীর আকারে প্লেগ দেখা দিলো। সেই সময় এক ব্যক্তি কবর স্থানে আসা যাওয়া করতেন, জানাযায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং সন্ধ্যাবেলা কবরস্থানের ফটকে দাঁড়িয়ে বলতেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করুন, তোমাদের অসহায় অবস্থায় দয়া করুন,

তোমাদের সৎ কাজগুলো গ্রহণ করুন।" তিনি এর অধিক আর কোন কিছু বলতেন না। তিনি এক রাতে কবরস্থানে না গিয়ে বাড়িতেই রয়ে গেলেন। অন্যান্য দিন যে দু'আ করতেন তাও করলেন না। রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, অসংখ্য লোক তাঁর নিকট এসেছেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা এবং আমার নিকট আপনাদের প্রয়োজনই বা কি? তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা কবরবাসী। আপনি সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরার সময় আমাদের জন্য আপনার পাঠানো হাদিয়ায় আমাদেরকে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য সেই দু'আ না করে গতকাল আপনি নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছে চলে এসেছেন। তিনি বললেন, কি হাদিয়া! তাঁরা বললেন, "আমাদের জন্য আপনার দু'আ।" তিনি বললেন, ঠিক আছে, এখন থেকে আমি আপনাদের জন্য সব সময় দু'আ করতে থাকবো। এরপর থেকে আমি আর কোন দিন তাদের জন্য দু'আ করা বাদ দেইনি।

একদা হযরত সুলায়েম ইবনে উমর (র) কোন এক কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর পেশাবের খুব বেগ পেয়েছিলো, তিনি কোন রকমে পেশাবের বেগ থামিয়ে রাখলেন। তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন, "আপনি কোন কবরের গর্তে পেশাব করে নিন।" তিনি তখন কেঁদে ফেললেন এবং বললেন 'সুবহানাল্লাহ'। আল্লাহর কসম, আমি জীবিতদের ন্যায় মৃতদের সামনেও লজ্জা ও সংকোচ বোধ করি। মৃতদের যদি কোন অনুভূতি না থাকতো তাহলে আমি তাদের থেকে কোন লজ্জা অনুভব করতাম না।" (এসব ঘটনা কিতাবুল কুবূর থেকে সংগৃহীত)

হযরত আবূ আইয়ূব (রা) বর্ণনা করেন ঃ জীবিতদের আমল মৃতদের নিকট পেশ করা হয়। নেক আমল দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হন এবং উৎফুল্ল বোধ করেন। তাঁরা জীবিতদেরকে বদ আমল থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময় আল্লাহ তা'আলা কাছে দু'আ করে থাকেন। মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, একদিন আব্বাদ ইবনে আব্বাদ (র) ইবরাহীম ইবনে সালিহ (র)-এর নিকট গেলেন। ইবরাহীম ফিলিস্তিনের একজন শাসক ছিলেন। আব্বাদ কিছু উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে কি উপদেশ দেবো! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নেককার বানিয়ে দিন। আমি জানতে পেরেছি জীবিতদের আমল তাদের মৃত আত্মীয়দের নিকট পেশ করা হয়। আমি আরও জানতে পেরেছি, জীবিতদের আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও পেশ করা হয়। এখন আপনি আপনার আমলের প্রতি লক্ষ্য করুন। অতঃপর ইবরাহীম এতো বেশি কাঁদতে লাগলেন যে, তাতে তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

হযরত সাদাকাহ ইবনে সুলাইমান (র) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি একটি কুৎসিত চারিত্রিক দোষে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতা মারা যান। পিতার ওফাতের পর তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হন। অতপর তিনি তাঁর পিতাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলাম, তোমার আমল আমার নিকট পেশ করা হতো, সেগুলো ছিলো নেক আমল। তবে একবার আমাকে আমার মৃত সঙ্গীদের নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হতে হয়। আমাকে তুমি আমার মৃত সঙ্গী-সাথীদের কাছে আর লজ্জিত করো না।

হযরত খালিদ (র) এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ সাদাকাহ ইবনে সুলাইমান (র) কুফায় তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। শেষ রাতে তিনি তাঁকে এই দু'আ করতে শুনতেন, "হে অসৎলোকদের সংশোধনকারী! হে পথভ্রষ্টদের সরল পথ প্রদর্শনকারী! হে অতি দয়ালু আল্লাহ! ব্যর্থ না হয় এমন তাওবার তাওফীক আমাকে দান করুন।" এ সম্পর্কে মহান সাহাবাদের অনেক বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা)-এর কোন কোন সঙ্গী-সাথী এই দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! আমি এমন আমল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যার কারণে আমাকে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট লজ্জিত হতে হয়।" এ কথাটি তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর শাহাদাতের পর আলোচনা করতেন।

উল্লেখ্য যে, 'যিয়ারত' শব্দটি প্রমাণ হিসেবে এখানে যথেষ্ট যে, মৃতদের প্রতি সালামকারীকে যায়ির বা যিয়ারতকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তি যদি সালামকারীকে চিনতে না পারতো, তাহলে সালামকারীকে যায়ির বলা ঠিক হতো না। কারণ, যার যিয়ারত করা হয় সে যদি নাই জানে, কে তার কবর যিয়ারত করছে, তাহলে একথা বলা ঠিক হবে না, অমুক লোক তার কবর যিয়ারত করেছে। এছাড়া কবরস্থানে সালাম দেয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি করতে পারে। মৃত ব্যক্তিরা যদি যিয়ারতকারীকে অনুভব বা উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে এরূপ কোন কাজ করাই অর্থহীন। অথচ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কবরস্থানে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন– "সালামুন আলাইকুম আহ্লাদ্দিয়ারে মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়া মিনকুম ওয়াল মুসতাখিরীনা নাসায়ালুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ।" অর্থাৎ "হে কবরবাসী মুমিন-মুসলমান! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীদের উপর রহম করুন। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করি।"

যিয়ারতকারীর এই সালাম, এই সম্বোধন ও এই আহ্বান কবরবাসীরা শুনে ও বুঝে এবং এর জবাব দিয়ে থাকে যদিও সালামকারী তা শুনতে পায় না। এমনকি কেউ যদি মৃত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়ে, তাহলে তারা নামাযীকেও দেখতে পায় এবং নামায সম্পর্কেও অবগত হয়। নামায পড়ার দরুন তাকে মৃতরা ঈর্ষা পর্যন্ত করে।

হযরত আবূ উসমান আবদুর রহমান নাহদী (র) কর্তৃক বর্ণিত। একদিন হযরত ইবনে সাস (র) একটি জানাযায় শরীক হন। তিনি সাধারণ পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি একটি কবরের নিকট দু'রাক'আত নামায পড়ে কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি– আমি মানসিকভাবে সজাগ ও সচেতন ছিলাম। সেই অবস্থায় ঐ কবর থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমাকে বলা হলো, এখান থেকে তুমি সরে যাও, আমাকে কষ্ট দিও না। আজ তোমাদের আমল করার সুযোগ আছে কিন্তু এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও। আমরা তোমাদের আমল সম্পর্কে জানতে পারি কিন্তু আমাদের পক্ষে কোন আমল করার উপায় নেই। তোমার দু'রাক'আত নামায আমাদের কাছে বহু মূল্যবান।"

এখানে লক্ষণীয় কে কবরে হেলান দিলো, কে নামায পড়লো, তা কবরবাসী জানতে পেরেছে।

কবরবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে হযরত আবূ কিলাবা (র) বলেন ঃ আমি একবার সিরিয়া থেকে বসরায় এসে কোন একস্থানে অবস্থান করছিলাম। অতপর পাক-সাফ হয়ে ওযূ করে রাতে আমি দু'রাক'আত নামায আদায় করলাম, এরপর কোন এক কবরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে ঐ কবরবাসীকে অভিযোগ করতে শুনলাম, তিনি বলছেন, "আজ রাতে তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো।" তিনি আরো বললেন, তোমরা আমল করতে পারো কিন্তু এখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানো না, আমরা সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু আমল করা থেকে বঞ্চিত।" তিনি আরো বললেন, "তুমি যে দু'রাক'আত নামায পড়েছো তা আমার কাছে দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম।" তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সালাম দিও। কারণ, তাঁদের দু'আয় আমরা পাহাড় পরিমাণ নূর লাভ করে থাকি।"

হযরত যায়েদ ইবনে ওহাব (র) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "একবার আমি একটি কবরস্থানে গিয়ে বসলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি কবরের কাছে এসে কবরটির মাটি সমান করলেন। তারপর তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। আমি

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– এটি কার কবর? তিনি বললেন, আমার এক ভাইয়ের কবর। আমি বললাম, তিনি কি আপনার আপন ভাই? তিনি বললেন, না, তিনি আমার দ্বীনি ভাই। ঐ আগন্তুক ব্যক্তি তাঁর দ্বীনি ভাইকে স্বপ্নে দেখে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ, আপনি তো ভালো আছেন। তখন কবরবাসী বললেন, "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" –এই যে আয়াতটি আপনি তিলাওয়াত করলেন, আমি যদি সওয়াব লাভের আশায় তা তিলাওয়াত করতে পারতাম, তাহলে তা আমার জন্য দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম হতো। উক্ত কবরবাসী আরো বললেন ঃ আপনারা হয়তো জানেন না, আমাকে যে জায়গায় দাফন করা হয়েছিলো, অমুক ব্যক্তি সেখানে এসে দু'রাক'আত নামায পড়েছিলেন। আফসোস, আমি যদি ঐ দু'রাক'আত নামায পড়তে পারতাম, তাহলে তো আমার নিকট দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অধিক মূল্যবান হতো।"

কবরবাসীর অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুতরাফ (র)-এর আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, আমরা একবার বসন্তকালে ভ্রমণে বের হলাম। আমাদের পথের পাশে একটি কবরস্থান ছিলো। আমরা জুমু'আর দিন সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে করলাম। অবশেষে এক জুমু'আর দিন আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে পৌঁছার পর একটি জানাযা দেখতে পেলাম। উক্ত জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার ইচ্ছে করলাম। শেষ পর্যন্ত জানাযার নামাযে শরীক হলাম। অতঃপর সেই মরহুমের কবরের পাশে বসে পড়লাম। আমি সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত নামায পড়লাম। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি সঠিকভাবে সেই নামায আদায় করতে পারিনি। এরপর আমার তন্দ্রা আসলো, আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন স্বপ্নে ঐ কবরবাসীকে বলতে শুনলাম, "আপনি যে দু'রাক'আত নামায আদায় করেছেন, আপনার ধারণা এটা সঠিকভাবে আদায় করা হয়নি। আমি বললাম, আপনার কথা ঠিক। তিনি বললেন, আপনারা আমল করতে পারেন, আমরা তা পারি না। পক্ষান্তরে, আমরা এখানকার অবস্থা জানি, কিন্তু আমাদের আমল করার কোন সুযোগ নেই। আমি যদি আপনার মতো দু'রাক'আত নামায পড়তে পারতাম, তাহলে সেটা দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে আমার জন্য উত্তম হতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কারা সমাহিত? তিনি বললেন, সবাই মুসলমান, সবাই নেককার ও সৌভাগ্যবান। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখানে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশালী কে? তখন তিনি একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! ঐ কবরবাসীকে আমার

কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বলতে পারি। এমন সময় ঐ কবর থেকে একজন যুবক বের হয়ে আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানকার সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি? উত্তরে তিনি বললেন, লোকেরা তো তাই মনে করে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এমন কী আমল করতেন? আপনার বয়সতো এতো বেশি নয় যে আপনি অনেক হজ্জ ও উমরা পালন করে থাকবেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে থাকবেন এবং আরো অনেক বড় বড় নেক আমল করে থাকবেন। উত্তরে তিনি বললেন, "দুনিয়াতে আমি বড়ই বিপদাপদের মধ্যে ছিলাম বটে, কিন্তু আমি সেই অবস্থায়ও সবর করতাম। তাই আমার মর্যাদা এখানকার সকলের চেয়ে বেশি।"

উপরে বর্ণিত স্বপ্নের ঘটনাবলী যদিও এককভাবে প্রমাণের জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়, তবুও এই সম্পর্কে বহু স্বপ্নের বৃত্তান্ত বিবৃত রয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে আল্লাহ তা'আলাই সবকিছু ভালো জানেন।

মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে অধিক সংখ্যক বিজ্ঞ মুসলমান একই রকম স্বপ্ন দেখলে তাঁদের সেই স্বপ্ন একটি হাদীসের সমতুল্য। এছাড়া কোন একটি বিষয়কে ভালো মন্দ ধারণা করার ক্ষেত্রে তাঁদের ঐকমত্য সমতুল্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাঁটি মুসলমানেরা যখন কোন বিষয়কে ভালো মনে করেন, তখন তা আল্লাহর কাছেও ভালো। আর যে বিষয়কে খাঁটি মুসলমানেরা মন্দ মনে করেন তা আল্লাহর কাছেও মন্দ হিসেবে গণ্য হয়। তবুও এই মাসয়ালাটি শুধু স্বপ্নের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, বরং এই সম্পর্কিত যেসব দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে– তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত স্বপ্নগুলো নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

সহীহ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, একজন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনি চিনতে পারেন। এই প্রসঙ্গে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি তাঁর অন্তিম সময়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তখন তাঁর ছেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আব্বাজান, আপনি কাঁদছেন কেনো? আল্লাহর রাসূল কি আপনাকে অমুক অমুক সুসংবাদ দেননি?" তিনি বললেন, আমি তাওহীদ ও রিসালাতকে বিশ্বাস ও স্বীকার করা সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করি। আমার জীবনকাল তিনটি পরস্পর বিরোধী খাতে অতিবাহিত হয়েছে। এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার অতিশয় দুশমনি ছিলো এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁকে হত্যা করার চেয়ে উত্তম আর কোন কাজ ছিলো না। আমি

যদি সে অবস্থায় মারা যেতাম, তাহলে অবশ্যই জাহান্নামী হতাম। অবশেষে যখন আল্লাহ আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে আরয করেছিলাম, আপনি আপনার পবিত্র হাতখানা প্রসারিত করুন, আমি বাই'আত হবো। তিনি তাঁর ডান হাতখানা প্রসারিত করলে আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি তখন বললেন, হে আমর! ব্যাপার কী? আমি বললাম, আমার কিছু শর্ত আছে। তিনি বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমার অতীতের সমস্ত গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না, ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ পেছনের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়। সে সময় থেকে তিনি হয়েছিলেন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি। তাঁর সুউচ্চ শান ও মর্যাদার দরুন আমি কখনো তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। কেউ তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারক ও পবিত্র আকৃতি কি রকম ছিলো জিজ্ঞেস করলে, তা আমি বলতে পারতাম না। কেননা তাঁর মহান শান ও সুউচ্চ মর্যাদার দরুন তাঁকে ভালো করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই অবস্থায় আমি যদি ইনতিকাল করতাম, তাহলে আমার মনে হয় আমি বেহেশতী হতাম।

অবশেষে আমাকে এমন-সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, আমি জানি না, এর পরিণতি কি হবে। সাবধান, আমার ওফাতের পর আমার জানাযার সাথে যেন কোন মশাল বা শোক প্রকাশকারিণীর দল না থাকে। আমার দাফন কার্য শেষে আমার কবরের উপর প্রচুর মাটি দেবে এবং কবরের পাশে একটি উট যবাই করে এর গোশত বিলি বণ্টন করতে যেটুকু সময় লাগে ততোক্ষণ তোমরা সেখানে অবস্থান করবে। এতে আমি তোমাদের উপস্থিতি অনুভব করবো এবং আমার রবের ফেরেশতাকে কী জবাব দেব তা ঠিক করে নিতে পারবো। এই ঘটনার দ্বারা জানা গেলো যে, মৃত ব্যক্তি কবরের নিকট উপস্থিত লোকজন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাতে উল্লসিত হন ও আশ্বস্ত বোধ করেন।

সুদূর অতীতের এক শ্রেণীর বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে ঃ তাঁরা মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফনের পর তাঁদের কবরের নিকট কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে অসিয়ত করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল হক (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর কবরে যেন সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। হযরত মুআল্লা ইবনে আবদুর রহমান (র)ও তদ্রূপ অভিমত পোষণ করতেন। ইমাম আহমদ (র) প্রথমাবস্থায় উপরোক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি উক্ত হাদীস

সম্পর্কে তখন পর্যন্ত অবহিত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনিও কবরে কুরআন শরীফ পাঠ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

হযরত আলা ইবনে লাজলাজ (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা অসিয়ত করেছিলেন যে, তিনি ইনতিকাল করলে তাঁকে যেন লাহাদ ধরনের কবরে দাফন করা হয় এবং কবরে লাশ নামানোর সময়ে "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" পাঠ করা হয়। আর মাটি দেয়ার পর তাঁর শিয়রের দিক থেকে যেন সূরা বাকারার প্রথম অংশের আয়াতগুলো পাঠ করা হয়। কেননা তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস আদদূরী (র) বলেন, আমি একবার ইমাম আহমদ (রহ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবরের নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি তখন বলেছিলেন, 'না'। কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন (র)-কে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আলা ইবনে লাজলাজ কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত আলী ইবনে মূসা আল হাদ্দাদ (র) বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও হযরত মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ (র)-এর সঙ্গে এক জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। লাশ দাফনের পর জনৈক অন্ধ ব্যক্তি কবরের নিকট পবিত্র কুরআন পড়তে লাগলেন। তখন ইমাম আহমদ (র) বললেন, "এই যে শোন, কবরের নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা বিদ'আত।" আমরা যখন কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন হযরত মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ (র) ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত মুবাশ্বির হালাবী (র) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত মুবাশ্বির হালাবী (র) একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাঁর থেকে কোন রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন কী? তিনি বললেন, "হাঁ, করেছি।" মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ (র) বললেন, আমাকে হযরত মুবাশ্বির (র) আর তাঁকে হযরত আবদুর রহমান ইবনুল আলা ইবনুল লাজলাজ (র) আর তাঁকে তাঁর পিতা অসিয়ত করেছিলেন, তাঁর পিতার লাশ দাফন করার পর তাঁর শিয়রে যেন সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ থেকে পাঠ করা হয়। তাঁর পিতা তাঁকে আরো বলেছিলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে এরূপ করার জন্য অসিয়ত করতে শুনেছিলেন।" উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ (র) তাঁর মত পরিবর্তন করে ইবনে কুদামাহ (র)-কে বললেন, "ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে গিয়ে বলো, সে যেন কবরে কুরআন শরীফ পাঠ করে।"

হযরত আল-হাসান ইবনে আস-সাবাহ্ আয-যাফরানী (র) থেকে বর্ণিত। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে আমি ইমাম শাফেয়ী (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, "এতে আপত্তির কোন কিছু নেই।"

এ সম্পর্কে হযরত শায়বী (র) বলেন, আনসারদের কোন লোক ইনতিকাল করলে তাঁরা তাঁর কবরের নিকট গিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। হযরত হাসান ইবনে জারবী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর এক বোনের কবরের নিকট সূরা মুলক পাঠ করেছিলেন। পরে কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি তাঁকে এসে বললেন, আমি আপনার বোনকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বলেছেন, "আমার ভাইয়ের কুরআন পাঠে আমার খুবই উপকার হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে জাযায়ে খায়ের (উত্তম প্রতিদান) দান করুন।"

হযরত হাসান ইবনুল হাইসাম (র) বলেন, আমি আবূ বকর ইবনে আতরূশ (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি নিজের মায়ের কবরের নিকট গিয়ে প্রত্যেক জুমু'আ বারে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতেন। একদিন তিনি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহর কাছে দু'আ চাইলেন। "হে আল্লাহ! এই সূরা পাঠ করলে যেই সওয়াব পাওয়া যায়, তা আপনি এই কবরস্থানের সকল মৃতদেরকে পৌছিয়ে দিন।" পরের জুমু'আ বারে তাঁর নিকট একজন মহিলা এসে বললেন, আপনি কি অমুকের পুত্র অমুক? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। মহিলাটি বললেন, আমার একটি মেয়ে মারা গেছে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, সে নিজের কবরের পাশে বসে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখানে বসে আছো কেনো? সে আপনার নাম উল্লেখ করে বললো, তিনি নিজের মায়ের কবরের নিকট এসে সূরা ইয়াসীন পড়েন এবং এর সওয়াব সমস্ত মৃতদের জন্য বখশিয়ে দেন। সেই সওয়াবের কিছু অংশ আমিও পেয়েছি এবং সে জন্য আমাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে, আমার মেয়েটি আমাকে এ ধরনের আরো কিছু কথা বলেছিলো।

ইমাম নাসাঈ (রহ) এবং আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে।" এর দু'টি অর্থ হতে পারে, একটি হলো মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট পাঠ করা, অপরটি হলো মৃতদের কবরের নিকট পাঠ করা। তবে প্রথম অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো নির্দেশ রয়েছে, "তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীদের কাছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর তালকীন করবে।" এতে মৃত্যুবরণকারীদের উপকার হয়, কারণ এই পবিত্র কালিমায় তাওহীদ ও আখিরাতের বর্ণনা রয়েছে। তাওহীদে বিশ্বাসীদের জন্য

রয়েছে বেহেশতের শুভ সংবাদ আর তাওহীদের উপর যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের জন্য ঈর্ষা হয়, এই ইঙ্গিতও এখানে সুস্পষ্ট। মহা বরকতময় সূরা ইয়াসীনের মধ্যে হযরত হাবীব নাজ্জার (র)-এর কথা উল্লেখ আছে, "হায়! আমার কাওম যদি জানতো যে আমার রব আমাকে কি কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের মধ্যে স্থান দান করেছেন।" সকল রূহ এই শুভ সংবাদ শুনে সন্তুষ্ট হয় এবং আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে। অবশেষে আল্লাহ তাদের সাক্ষাৎ দান করেন। এই পবিত্র সূরা ইয়াসীনকে কুরআনের কালবস্বরূপ আখ্যায়িত করা হয়েছে। যখন কোন মুমিন মুসলমানের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁকে এই বরকতময় সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনানো হয়, যার উসীলায় শান্তির সাথে তাঁর ইনতিকাল হয়।

হযরত ইবনে জাওযী (র) সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে বলেছেন, "শাইখ আবুল ওয়াকত আবদুল আউয়াল (র)-এর অন্তিম সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর ইনতেকালের একটু আগে তিনি আসমানের দিকে তাকালেন ও মৃদু হাসলেন এবং এই আয়াত দু'টি পাঠ করলেন, "ইয়া লাইতা কাওমী ইয়ালামূন, বিমা গাফারালী রাব্বী ওয়া জাআলানী মিনাল মুকরামীন"। অর্থাৎ "হায়! আমার কাওম যদি জানতে পারতো– আমার রব কি কারণে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন"। (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-২৬, ২৭)

এরপর তিনি চিরবিদায় নিলেন। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মৃত্যুর সময়ে লোকদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠের নিয়ম চালু আছে। চার– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী– "তোমরা তোমাদের মৃতদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে" দ্বারা যদি সাহাবায়ে কিরাম কবরের নিকট কুরআন পাঠ করাকেই বুঝতেন তাহলে তাঁরা এই হুকুম সর্বদা পালন করতেন এবং এটা তাঁদের এক অভ্যাসে পরিণত হতো। পাঁচ– মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠের উদ্দেশ্য, তিলাওয়াতের সময় তাঁর মনোযোগ যাতে সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিলাওয়াত শুনতে শুনতে যাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আর কবরে সমাহিত ব্যক্তির আমল করার সুযোগ নেই, তবে কেউ তাঁর কবরের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পেয়ে থাকেন।

হাফিয আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইশবিলীও (র) উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের কাছে সওয়াব পেতে আশা করেন এবং তাঁদের আমলের বিষয়ও অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারেন। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"কোন ব্যক্তি যদি নিজের পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের নিকট যায় ও তাকে সালাম পেশ করে, তবে মৃত ব্যক্তি অবশ্যই তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকে"। আরো একটি রেওয়ায়েত আছে, অজানা কোন কবরবাসীকে সালাম জানালে তিনিও ঐ সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করেন এবং তাঁর কবরের নিকট গিয়ে বসেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠে না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গ অনুভব করে থাকেন ও আনন্দিত হন"।

হাফিয আবু মুহাম্মদ আবদুল হক (র) থেকে এই সম্পর্কে আরো তথ্য পেশ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ্ তাআলা আমার রূহ দেহে ফিরিয়ে দেন যাতে আমি সেই ব্যক্তির সালামের উত্তর দিতে পারি।"

হযরত সুলাইমান ইবনে নায়ীম (রহ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন ও তাঁর খিদমতে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোন মুমিন মুসলমান যখন আপনার রওযা শরীফে আসেন এবং আপনাকে সালাম পেশ করেন, আপনি কি তখন তা জানতে পারেন? তিনি ইরশাদ করেন, "হ্যাঁ, এর উত্তরও আমি দিয়ে থাকি।"

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন, কবরস্থানে প্রবেশের সময় তোমরা কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, "আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারে।" অর্থাৎ "হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এতে জানা গেলো, কবরবাসীরা জীবিতদের সালাম ও দু'আ সম্পর্কে জানতে পারে।

হযরত ফযল ইবনে মুওয়াফফিক (র) বলেছেন, আমি আমার পিতার কবরের কাছে ঘন ঘন যেতাম। এক পর্যায়ে আমি আরো বেশি করে সেখানে যেতে লাগলাম। একদিন একটি জানাযায় শরীক হলাম এবং বিশেষ কাজে জড়িত হয়ে পড়ায় ঐ দিন আমি আমার পিতার কবরের কাছে যেতে পারলাম না। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আজকে তুমি আমার নিকট আসনি কেনো? আমি আরয করলাম, আমার যাবার খবর কি আপনি জানতে পারেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সব সময়ই আমি তা জ্ঞাত থাকি। তুমি

যখন পুল পার হয়ে আমার নিকট এসে বসো, আবার ঐ পুল পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখতে পাই।"

হযরত আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত ঃ একজন মৃত ব্যক্তি দাফনের পূর্বে তাঁর পরিবার-পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকেন, এমনকি তাঁকে গোসল দেয়া ও কাফন পরানোর খবরও তিনি রাখেন আর সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, একজন মৃত ব্যক্তি আপন সন্তানদের পুণ্যের দরুন কবরে শান্তিতে থাকেন ও আনন্দ অনুভব করেন।

অতীতকাল থেকে মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরে তালকীন করার নিয়ম চলে আসছে। অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যিবাহ তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তিরা যে মৃত্যুর পরও শুনতে পায়, তালকীনের মাধ্যমেও তা প্রমাণিত হয়। এছাড়া তালকীনের দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়, তা না হলে তালকীন করার কোন অর্থই হয় না।

উক্ত বিষয়ে ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মৃত ব্যক্তিদেরকে তালকীন করা একটি নেক কাজ, লোকদের আমল থেকে তা প্রমাণিত হয়। তালকীন সম্পর্কে মু'জাম তাবারানী গ্রন্থের মধ্যে হযরত আবু উমামা (র) থেকে বর্ণিত একটি দুর্বল হাদীসও রয়েছে। হাদীসটি হলো, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেয়ার পর তোমাদের একজন তাঁর শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ও তাঁর মায়ের নাম ধরে ডাক দেবে। কেননা মৃত ব্যক্তি তা শুনতে পান কিন্তু উত্তর দিতে পারেন না। দ্বিতীয়বার তাঁর নাম ধরে ডাক দিলে তিনি উঠে বসেন। আর তৃতীয় ডাক দিলে তিনি উত্তর দেন, কিন্তু তোমরা তা শুনতে পাওনা। তোমরা তালকীনের মাধ্যমে বলবে, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহম করুন, আমাদের তালকীনের দ্বারা আপনি উপকৃত হোন। তারপর বলবে, আপনি তাওহীদ ও রিসালাতের যেই স্বীকৃতি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তা স্মরণ করুন। অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পাঠ করুন ও তা স্মরণ রাখুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, দীন ইসলাম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত এবং কুরআন মজীদ, আমাদের পথ প্রদর্শনকারী– এসব বিষয়ে যে আপনি রাজী ছিলেন, তাও স্মরণ করুন।" এই তালকীন শুনে মুনকার-নাকীর সেখান থেকে সরে যান, আর বলেন, চলো আমরা ফিরে যাই, এর নিকট থাকার আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। এ ব্যক্তিকে তাঁর ঈমান ও আকীদা সম্বন্ধে সবকিছু স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আর তিনি তালকীনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গিয়েছেন।

একদিন জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কবরস্থ ব্যক্তির মায়ের নাম স্মরণ না থাকে, তাহলে তাদের কি করতে হবে? ইরশাদ হলো, সেই অবস্থায় তার আদি মাতা হযরত হাওয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ করবে।

তালকীন সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ হলেও প্রায় সকল দেশে সর্বকালে তালকীনের এই আমল প্রচলিত আছে। তালকীনের গুরুত্ব সম্পর্কে এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট যে, বুযুর্গানে দ্বীন তালকীন করাকে একটি বরকতময় আমল হিসেবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে কেউ কোন সময় কোন প্রতিবাদ করেননি। বরং আগের যামানার লোকেরা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য এ নিয়ম চালু রেখে গেছেন, যাতে তারা সঠিকভাবে তাঁদেরকে অনুসরণ করেন। যদি কোন কবরবাসীকে সম্বোধন করা হয়, আর তাঁর শুনার ও বুঝার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে সম্বোধন যেন মাটি, কাঠ, পাথর বা কোন অস্তিত্বহীন বস্তুকে সম্বোধন করার সমতুল্য হবে। তালকীনের সম্বোধনের এই প্রক্রিয়াকে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যথার্থ মনে না করলেও বিজ্ঞ আলিম সমাজ এ অভিমতকে সমর্থন করে থাকেন।

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় শরীক হলেন। লাশ দাফন করার পর তিনি বললেন, "তোমাদের ভাইয়ের সঠিক উত্তর দানের জন্য তোমরা দু'আ করো। কেননা এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।" (আবূ দাউদ) এর দ্বারা জানা গেলো, যখন ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি তা শুনতে পান এবং তার উত্তরও দেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি তাঁর জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণকারীদের ফিরে যাওয়ার সময় তাঁদের জুতোর শব্দ পর্যন্ত যে শুনতে পান, তাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জনৈক নেককার ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার এক ভাইয়ের ইনতেকাল হলে আমি তাকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলাম, দাফনের পর আপনাকে কি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো? তিনি বললেন, আমার নিকট একজন আগমনকারী একটি আগুনের মশাল নিয়ে এসেছিলো। যদি দু'আকারীরা সে সময় আমার জন্য দু'আ না করতেন, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। [হযরত আবদুল হক র.]

হযরত শাবীব ইবনে শায়বা (রহ) থেকে বর্ণিত ঃ আমার আম্মার ইনতেকালের সময় তিনি আমাকে অসিয়ত করলেন, "শোন বৎস! আমার লাশ দাফন করার পর আমার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তুমি বলবে, "হে উম্মে শাবীব, 'আপনি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়ুন"। তিনি বলেন, দাফনের পর আমি

কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তালকীন করলাম। রাতে আম্মাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বরকতে আমি মুক্তি পেয়েছি, প্রিয় পুত্র, তুমি আমার অসিয়ত স্মরণ রেখেছিলে।

হযরত আইয়ুব ইবনে উয়াইনা (র)-এর স্ত্রী তামাযুর বিনতে সাহল (র) বলেন, আমি একবার হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই আইয়ুবকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি অধিক পরিমাণে আমার কবর যিয়ারত করে থাকেন, আজও তিনি আমার নিকট এসেছিলেন। তখন আইয়ুব বললেন, হাঁ, আজও আমি কবরস্থানে গিয়েছিলাম এবং হযরত সুফইয়ান (র)-এর কবরের নিকটও গিয়েছিলাম। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হযরত সাআব (রা) ও হযরত আউফ (রা) উভয়ে একে অন্যকে আপন ভাই মনে করতেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তাঁরা যে কেউ আগে ইনতেকাল করেন না কেনো, তাঁদের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা কখনো লোপ পাবে না এবং স্বপ্নেও তাঁরা একে অন্যের সাক্ষাত পাবেন। প্রথমেই ইনতেকাল করলেন সাআব (রা)। হযরত আউফ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাইজান, ইনতেকালের পর আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে? তিনি বললেন, "কিছু শাস্তি ভোগ করার পর আমি এখন মুক্তি পেয়েছি।" আমি তাঁর ঘাড়ে একটি কালো দাগ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এ কালো দাগটি কিসের? তিনি বললেন, শাস্তির, আমি এক ইয়াহুদী থেকে দশটি দীনার ধার নিয়েছিলাম। ঐগুলো আমার ঘরে একটি তীর রাখার থলের মধ্যে আছে, তা বের করে আপনি তাকে দিয়ে দেবেন। আমার বাড়িতে যা কিছু ঘটে থাকে আমি সেসব খবর জানতে পারি। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে যে বিড়ালটি মারা গেছে, সে খবর পর্যন্ত আমার কাছে আছে। জেনে রাখুন, আমার মেয়েটা আর মাত্র ছয়দিন পর ইনতেকাল করবে। আপনি তাকে একটু আদর করবেন ও সান্ত্বনা দেবেন। সকালে আমি তাঁদের বাড়ি গেলাম। বাড়ির লোকেরা আমাকে দেখে খুশি হলেন তবে তাঁরা অনুযোগ করলেন, আপনার ভাইয়ের উত্তরাধিকারীদের সাথে আপনি এটা কেমন ব্যবহার করলেন। সাআবের ইনতেকালের এতোদিন পর আজ আপনি খোঁজ নিতে আসলেন। আমি তাঁদের কাছে মাফ চাইলাম। তারপর তীর রাখার থলে নামিয়ে আনলাম। তার ভেতরে একটি থলি পাওয়া গেলো, যার মধ্যে দীনারগুলো ছিলো। তারপর আমি ইয়াহুদীকে ডেকে জিজ্ঞাস করলাম, সাআবের নিকট কি আপনার কিছু দীনার পাওনা ছিলো? তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তিনি আল্লাহর রাসূলের একজন উত্তম সাহাবী ছিলেন। তাঁর কাছে আমার যা কিছু পাওনা ছিলো,

আমি তা সবই মাফ করে দিয়েছি। আমি জানতে চাইলাম, তবুও বলুন, তাঁর কাছে আপনার কত দীনার পাওনা ছিলো? তিনি বললেন, দশ দীনার। আমি তাকে সে দশটি দীনার বের করে দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এই দীনারগুলোই আমার দেয়া দীনার। আউস (রা) মনে মনে ভাবলেন, স্বপ্নের একটি কথাতো ঠিক পাওয়া গেলো। অতঃপর আমি সাআব (রা)-এর পরিবার-পরিজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সাআবের ইনতেকালের পর বাড়িতে কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে কী? তাঁরা বললেন, অমুক অমুক ঘটনা ঘটেছে। এমনকি বিড়ালের মৃত্যুর কথাও তাঁরা উল্লেখ করলেন। আমি ভাবলাম, আরেকটি কথাও ঠিক পাওয়া গেলো। তারপর আমি জানতে চাইলাম, আমার ভাতিজীটি কোথায়? তাঁরা বললেন, সে খেলছে। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে আদর করলাম। তার শরীরে তখন জ্বর ছিলো। আমি বললাম, আপনারা তার মাথা ধুয়ে দিন। এর ঠিক ছয়দিন পর মেয়েটি মারা গেলো।

হযরত আউফ (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও ছিলেন। ইনতেকালের পর সাআব (রা) তাঁকে স্বপ্নে যা বলেছিলেন, তিনি তা সঠিকভাবে পালন করেছিলেন। যেমন, ইয়াহুদীর দশটি দীনারের কথা। এটাও এক ধরনের ফিকাহ্ যা বিজ্ঞ আলিমগণ অনুধাবন করতে পারেন। এছাড়াও হযরত সাআব (রা) ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত আউফ (রা) কিভাবে কেবলমাত্র স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পেয়ে ইয়াতীমদের প্রাপ্ত দীনার ইয়াহুদীকে ফেরত দিলেন। এরূপ করা তাঁর পক্ষে কি করে বৈধ হলো? সুতরাং এরূপ প্রজ্ঞার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদিগকে অনুগৃহীত করে থাকেন। এই ঘটনাটির তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করার জন্য উদাহরণস্বরূপ হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-এর অন্য একটি ঘটনা এখানে বর্ণিত হলো ঃ

হযরত আবূ আমর আবদুল বার (রা) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "সাবিত, তুমি কি এটা চাওনা যে, তোমার জীবন প্রশংসিত হোক, শাহাদাত নসীব হোক এবং বেহেশত লাভ করো।" এই পবিত্র আশ্বাস বাণী যে বাস্তবে পরিণত হলেছিলো তা হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। পরবর্তীকালে সাবিত (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীন হন। "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।" (সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত-২)

যখন এই আয়াত নাযিল হলো, তখন সাবিত (রা)-এর এক কন্যা বলেছিলেন, আমার পিতা ঘরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলেন। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে যখন তাঁকে দেখতে পেলেন না, তখন তাঁর সংবাদ নেয়ার জন্য লোক পাঠালেন। সাবিত (রা) সে সময় বললেন, আমার কণ্ঠস্বর উঁচু, আমার ভয় হয়, তজ্জন্য আমার আমল না সব বরবাদ হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, "না, না, তুমি তাদের মধ্যে নও, বরং তোমার জীবন ও মরণ উভয়ই মঙ্গলময়।"

"গর্বিত ও অহঙ্কারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (সূরা লোকমান, আয়াত ঃ ১৮)

যখন এই পবিত্র আয়াত নাযিল হলো, তখনও সাবিত (রা) ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে না দেখে তাঁর অবস্থা জানার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাজ-সজ্জা যেমন আমার নিকট প্রিয় ঠিক তেমনি আমার গোত্রের নেতৃত্বও আমার নিকট প্রিয়। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি অহঙ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত নও, বরং তোমার জীবন প্রশংসিত, তোমার মৃত্যু হবে শহীদের এবং তুমি বেহেশতী।"

ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত সাবিত (রা) ও হযরত সালিম (রা)-এর শহীদ হওয়া প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত সাবিত (রা)-এর কন্যা বলেছিলেন, আমার পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা)-এর সংগে ছিলেন। যখন মুসলমান ও মুসাইলামা কাযযাবের ফৌজের মধ্যে যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত সাবিত (রা) এবং সালিম (রা)– যাঁরা হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন, বলেছিলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দুশমনদের বিরুদ্ধে এর আগে আমরা আর কখনো এতো দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিনি। তারপর তাঁরা উভয়ে এক একটি গর্ত খনন করে ভেতরে থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে হযরত সাবিত (রা)-এর পরণে একটি মূল্যবান বর্ম ছিলো। জনৈক মুসলমান যোদ্ধা তাঁর শরীর থেকে বর্মটি খুলে নেন। এই ঘটনার পর অন্য একজন মুসলমানকে হযরত সাবিত (রা) স্বপ্নযোগে বলেছিলেন, আমি তোমাকে একটি অসিয়ত করছি, সাবধান, স্বপ্নের অসিয়ত মনে করে এটাকে উপেক্ষা করো না। আমি যুদ্ধে শহীদ হবার পর জনৈক মুসলমান আমার বর্মটি খুলে নিয়ে গিয়েছে। তার বাড়ি মহল্লার শেষ প্রান্তে, সেখানে লম্বা রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা আছে। ঐ বাড়িতে আমার বর্মটিও রাখা আছে। সেই বর্মটিকে উটের একটি হাওদা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর হাওদাটির উপর আসবাবপত্রও রাখা আছে। তুমি হযরত

খালিদ (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে বলো তিনি যেন লোক পাঠিয়ে আমার ঐ বর্মটি আনিয়ে নেন্। আর যখন তুমি মদীনা শরীফ যাবে, তখন খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট গিয়ে বলবে, "আমার এই পরিমাণ ঋণ আছে। আর আমার অমুক অমুক গোলাম এখন থেকে মুক্ত।" ঐ ব্যক্তি হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট এসে তাঁর স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব খুলে বললেন। হযরত খালিদ (রা) লোক পাঠিয়ে বর্মটি নিয়ে আসেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে স্বপ্নের ঘটনা বললে তিনিও হযরত সাবিত (রা)-এর অসিয়ত মতো সব কাজ সমাধা করেছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবূ আমর ইবনে আবদুল বার (র) বলেন যে, হযরত সাবিত (রা)-এর এই ঘটনা ছাড়া কারো মৃত্যুর পর অন্য কোন অসিয়ত কার্যকর হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অতএব লক্ষণীয় যে, স্বপ্নের অসিয়তকে বাস্তবায়িত করার জন্য হযরত খালিদ (রা), হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁদের সহযোগী অন্যান্য সাহাবীগণও একমত হয়েছিলেন। যে লোকটির কাছে বর্মটি ছিলো তার কাছ থেকে হযরত খালিদ (রা) তা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। হযরত সাবিত (রা)-এর এই ঘটনাটি ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল ফিকাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যখন ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম মালিক (র) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কোন জিনিসের দাবীদার বা ফরিয়াদী হলে শুধু ঐ উক্তিকে যা তার জন্য সঙ্গত, তার সত্যবাদিতার সূত্র ধরে গ্রহণ করে থাকেন, তখন স্বপ্নের অসিয়ত মান্য তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) একটি দেয়াল সম্পর্কে যেদিকে ইট, সুরকি ও রশি ইত্যাদি রাখা ছিল, দেয়ালটির দাবীদারের দাবী সেই ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাও একজন স্বামীর কসমের উপর ভিত্তি করে একজন স্ত্রীকে শাস্তির বিধান দিয়েছেন– যখন তার ক্ষেত্রে অন্য কোন "কারীনা" বা সূত্র কিংবা সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে না। কেননা এটা স্বামীর সত্যবাদিতার একটি বড় দলীল বা প্রমাণ। এছাড়া, 'কাসামাহ' বা শপথের মাধ্যমে কোন ফয়সালার ক্ষেত্রে হত্যার সূত্র বা নিদর্শন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাবীদারদের শপথের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তকে হত্যা করা হয়। এমনিভাবে, কোন একজন লোক সফরের সময় যদি মৃত্যুবরণ করে ও মৃত্যুর আগে দু'জন অমুসলিমের নিকট কোন অসিয়ত করে যায়, তাহলে তাদের এই সাক্ষ্য ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কোন শপথের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে এবং তাদের দাবীর বিষয়ে হকদার হয়ে যেতে পারে। অমুসলিমদের এরূপ কোন শপথ যাদের জন্য অসিয়ত করা হয়েছে, তাদের শপথের চেয়ে উত্তম। কুরআন মজীদের সূরা মায়িদায়ও

অনুরূপ আদেশ রয়েছে। এই হুকুমকে নসখ বা রহিতকারী আর অন্য কোন হুকুম পবিত্র কুরআনে নাযিল হয়নি। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম-এর উপর আমল করেছিলেন।

কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারে আলামতের উপর ভিত্তি করে যদি কোন ফয়সালা করা যায়, তাহলে হত্যাজনিত কোন বিষয়ে আলামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসা বৈধ। একইভাবে, সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্তে আসা আরো অধিক যুক্তিগ্রাহ্য।

চোরের নিকট থেকে অপহৃত মালামাল উদ্ধারের ক্ষেত্রে ন্যায়বান বিচারকগণ স্পষ্ট আলামতের উপর নির্ভর করে থাকেন। এইরূপ প্রক্রিয়াকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরাও বিচারকদের সহায়তায় তাঁদের অপহৃত সম্পদ উদ্ধার করে নেন।

সাক্ষ্য দানের একটি ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফে বর্ণনা করেছেন। ঐ ঘটনায় সাক্ষ্যদাতা, ইউসুফ (আ) ও আযীযের স্ত্রীর মধ্যকার ঘটনাটি আলামতের সাহায্যে ফয়সালা করেছিলেন। ঐ সাক্ষ্যদাতা বলেছিলেন, ইউসুফ (আ) সত্যবাদী আর মহিলাটি মিথ্যাবাদিনী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ফয়সালাকে রদ করেননি, বরং তা বহাল রাখার জন্যই কুরআনে সেই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ)-এর ঘটনাটিও উল্লেখ করেছেন ঃ দু'জন মহিলার মধ্যে একটি শিশুর অধিকার নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিলো। উভয় মহিলাই নিজ নিজ উদ্ভাসিত সূত্রের সাহায্যে শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করেছিলো। হযরত সুলাইমান (আ) নির্দেশ দিলেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি শিশুটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে ওদের প্রত্যেককে এক একটি অংশ দিয়ে দেবো। তখন মধ্য বয়স্কা মহিলাটি বললো, আমি এতে রাযী আছি, এ কারণে যে, মূলতঃ বাচ্চাটি তার ছিলো না। কাজেই তার এতে কষ্ট হবে কেন? কনিষ্ঠা মহিলাটি বললো, হুজুর বাচ্চাটি দু'টুকরা করবেন না, বাচ্চাটি ওকেই দিয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত হযরত সুলাইমান (আ) কনিষ্ঠা মহিলাটিকেই শিশুটি দিয়েছিলেন। কারণ শিশুটি কেটে ফেলার কথা শুনে তার অন্তরে এমনি ভালোবাসা ও দয়ার উদ্রেক হয়েছিলো যে, সে বয়স্কা মহিলাটির কাছে শিশুটিকে অর্পণ করতে রাযী হয়ে যায়। কেননা ঐরূপ করা হলে অন্তত তার সন্তানটি তো বেঁচে থাকবে, আর স্নেহ-মমতাও বজায় থাকবে।

উপরে বর্ণিত বিচারের এই পদ্ধতিটি অতিশয় কল্যাণকর ও সুবিচারের সহায়ক। ইসলামী শরী'আত এই নিয়মটি বহাল রেখেছে এবং এর বৈধতাকে স্বীকৃতি

দিয়েছে। অবশ্য কেয়াফা বা মুখমণ্ডলের রেখাপাত দেখে স্বভাব নিরূপণ বিদ্যার মাধ্যমে হুকুম জারী করা এবং এর দ্বারা বংশ তালিকার মিল দেয়া ঠিক নয়। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পন্থার মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

উপরোক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্যে হলো, হযরত আউফ ইবনে মালিক (র) এবং হযরত সাবিত ইবনে কায়স (রা)-এর ঘটনাটিতে যেসব সূত্র বা আলামত উল্লেখ রয়েছে, তা উপরে বর্ণিত সূত্রগুলো থেকে দুর্বলতো নয়ই, বরং অধিক শক্তিশালী। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী ও কারিগর-এর ব্যাপারে শুধুমাত্র ইট, রশি ইত্যাদির বিদ্যমানতা ও মালের উপযুক্ততার সূত্র ধরে ফরিয়াদীর পক্ষে রায় প্রদান করা হয়। মানুষের স্বভাব এবং বুদ্ধি বিবেচনাও এসব ঘটনাবলী যে সঠিক সেটা প্রমাণ করে। অবশ্য মানুষের যাবতীয় কার্য আল্লাহ্‌রই সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা হয়ে থাকে, তখন একজন যিয়ারতকারীর সালাম ও দু'আ সম্পর্কে অবহিত করা আরো অধিক স্বাভাবিক, সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর রূহের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয় কিনা

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রূহ দু'প্রকারের– সিজ্জীনবাসী ও ইল্লিয়্যীনবাসী। সিজ্জীনবাসী রূহ শাস্তি পায়। এদের পরস্পরে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কোথায়? কিন্তু যেসব রূহ শান্তি লাভ করেছে ও স্বাধীন, তারা পরস্পর মেলামেশা করে। আর দুনিয়ায় থাকাবস্থায় যেসব ঘটনা ঘটেছিলো, তারা সেগুলোও স্মরণ করে। এছাড়া ঐসব ঘটনাবলী নিয়েও তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, যেসব ঘটনা দুনিয়াবাসীদের সম্মুখে ঘটে থাকে। রূহ সম্পর্কে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক রূহ নিজের সঙ্গী-সাথী ও বিশেষ আমলকারী রূহের সাথে মেলামেশা করে থাকে। এই কারণেই হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক 'রফীকে 'আলার মধ্যে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে থাকবে যাঁদেরকে আল্লাহ্ (তা'আলা) নি'আমত দান করেছেন। আর তাঁরা হলেন-নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ, এঁরা কতোই না উত্তম সাথী। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।" (সূরা নিসা, আয়াত : ৬৯-৭০)

দুনিয়া, বরযখ ও আলমে আখিরাত– এই তিনটি স্থানে মানুষ আপনজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে। এই প্রসঙ্গে হযরত মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত ঃ সাহাবাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, দুনিয়ায় এক মুহূর্তও আপনার নিকট থেকে দূরে থাকা আমাদের সহনীয় নয়। কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আপনার অবস্থান হবে অনেক উর্ধ্বে আর আমরা আপনার দীদারের জন্য লালায়িত থাকবো। উপরোক্ত আয়াতটি সেই প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিলো।

হযরত শাআবী (র) বলেন, একদিন একজন আনসার কাঁদতে কাঁদতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছো কেন?" তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নন তাঁর কসম, আপনি আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ থেকেও প্রিয়। যখন আপনার

কথা ঘরে থাকাকালীন সময়ে মনে পড়ে, তখন আপনাকে না দেখে আমার শান্তি হয় না। তারপর আমার ও আপনার ইনতেকালের কথা স্মরণ হয়, তখন আমি চিন্তা করি, দুনিয়াতে তো আপনার সাহচর্য লাভ করে থাকি, কিন্তু আপনার ইনতেকালের পর আপনি তো নবীদের সাহচর্যে চলে যাবেন, আর আমি যদি জান্নাতবাসীও হই, তবুও আপনার চেয়ে নীচে থাকবে আমার স্থান। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার কোন উত্তর দিলেন না। পরক্ষণেই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলো, "আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সে তাঁদের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ নি'আমত দান করেছেন। আর তাঁরা হলেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ এবং এরা কতোইনা উত্তম সঙ্গী। এটা আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা, আয়াত : ৬৯-৭০)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেছেন, "হে পরিতৃপ্ত চিত্ত, তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা আল ফাজর, আয়াত : ২৭-৩০)

অর্থাৎ আমার পরিতৃপ্ত বান্দদের সাথে তুমি মিলিত হও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো। এই একই কথা মৃত্যুর সময়েও রূহকে বলা হয়।

মি'রাজ শরীফের ঘটনায় উল্লেখ আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হয়েছিলো। প্রথমে তিনি হযরত ইবরাহিম (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিয়ামত কবে হবে? কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন কিছু বলতে পারেননি। তারপর হযরত মূসা (আ)-কেও এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনিও এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে পারেননি। তারপর হযরত ঈসা (আ)-কেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছেন- কিয়ামতের আগে দাজ্জাল বের হবে আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠাবেন। আমি আসমান থেকে অবতরণ করবো, দাজ্জাল আমার হাতে নিহত হবে। জনগণ আবার তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু এর পর ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাহাড় থেকে নেমে আসবে, এরা সাগরের পানি পান করে নিঃশেষ করে দেবে। সেই অবস্থায় জনগণ আমার নিকট এসে অভিযোগ করবে ও সাহায্যপ্রার্থী হবে। সে সময় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রার্থনা করবো। আল্লাহ পাক এদেরকে মেরে ফেলবেন। যমীন

এদের মৃতদেহের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করবে। অবশেষে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করবো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে এদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে যাবে। তারপর পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে আর যমীনকে চামড়ার মতো গুটিয়ে ফেলা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে এই ওয়াদাই করেছেন। যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন কিয়ামত এতোই নিকটবর্তী হবে যে, তখনকার অবস্থাকে একজন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে সে মহিলা সন্তান প্রসব করতে পারে। উক্ত হাদীস শরীফটি রূহের একত্রিত হওয়ার এবং তাদের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন : "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৯-১৭১)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রূহের পরস্পর মেলামেশার তিন প্রকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক– যেহেতু রূহকে রিয্ক দেয়া হয় এবং এঁরা জীবিত, তাই তাঁরা পরস্পর মেলামেশা করে। দুই– আপন ভাইদের আগমন ও সাক্ষাতের দরুন তারা আনন্দিত হয়। অর্থাৎ একে অপরকে শুভ সংবাদ দান করাকে বুঝায়। বহু লোকের পারস্পরিক স্বপ্ন দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত আছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত আতা সালামী (র) এর ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত সালিহ ইবনে বশীর বসরী (র) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আতা সালামী (রা)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি দুনিয়াতে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় থাকতেন। তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর শপথ, এখন আমি অশেষ আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যে আছি। আল্লাহ তা'আলা সেই চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত করেছেন।" আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবস্থান এখন কোথায়? তিনি বললেন, "আমি আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা আর সালিহীনদের সঙ্গে আছি।"

হযরত সুফাইয়ান সওরী (রা)-এর স্বপ্নের একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। একদিন হযরত ইবনুল মুবারক (রা) হযরত সুফাইয়ান সওরী (রা)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মহান সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। হযরত ইবনুল মুবারক (রা)-এর ইনতেকালের পর হযরত সাখার ইবনে রাশিদ (রা) একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি ইবনুল মুবারক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি ইনতেকাল হয়নি? তিনি বললেন, কেন নয়? অবশ্যই। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তাআলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমার সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে গেছে। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুফইয়ান সওরী (রা)-এর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, মারহাবা! তিনি তো আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীনদের সাথে আছেন।

ইবনে আবিদ্দুনিয়ার আসল নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ। তিনি ২৮১ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার ইয়াকযা বিনতে রাশিদা (রা), হযরত মারওয়ান মাহমিলী (রা)-কে স্বপ্নে দেখলেন। এই মহিলা তাঁর একজন প্রতিবেশিনী ছিলেন। মারওয়ান মাহমিলী (রা) একজন কাযী ও বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ইনতেকালে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। একবার উক্ত মহিলাটি তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মেহেরবানী করে বলুন, আপনার অবস্থা এখন কেমন? তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বেহেশ্ত দান করেছেন।" আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন কোন প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? তিনি বললেন, "আমি হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইবনে সীরীন (র) এবং হযরত মাইমূন ইবনে সিয়াহ্ (র) প্রমুখের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

হযরত উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা) বসরা নগরীর শ্রেষ্ঠ রমণীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি যেন একটি সুন্দর গৃহে প্রবেশ করেছেন এবং একটি অতি মনোরম বাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন, যিনি স্বর্ণের সিংহাসনে আরামে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর চারদিকে পেয়ালা হাতে খাদেমরা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এই রাজসিক অবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ ঘোষণা করা হলো, হযরত মারওয়ান মাহমিলী আসছেন। ঘোষণা শোনামাত্র স্বর্ণ

সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি সোজা হয়ে বসলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং আমি দেখতে পেলাম, আমার ঘরের পাশ দিয়ে হযরত মারওয়ানের লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বহু সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমেও রূহের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও পরিচয় এবং পরিচিতির অনেক প্রমাণ রয়েছে।

হযরত আবূ লাবীবাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত বাশার ইবনে মারুর (রা)-এর মৃত্যু হলে তাঁর মা উম্মে বাশার ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খিদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বাশার ইবনে মারুরের বংশের অনেক লোক মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃতেরা কি একে অপরকে দেখতে পান ও সাক্ষাৎ লাভ করেন? যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাদেরকে আমার সালাম জানাবো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, উম্মে বাশার, আল্লাহর শপথ, মৃতেরা একে অপরকে চিনতে পারে। এ ঘটনার পর সালমা গোত্রের কেউ মারা গেলে উম্মে বাশার তাঁর কবরের কাছে গিয়ে সালাম পেশ করে বলতেন, হে কবরবাসী, তুমি আমার ছেলে বাশারের নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও।

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ একজন মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়ার সংবাদের অপেক্ষায় থাকে, তাঁদের কাছে কোন সদ্য মৃত ব্যক্তির রূহ আসলে তাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, অমুক অমুকের অবস্থা কেমন? মৃত ব্যক্তির রূহ তখন বলে, সব ঠিক আছে। আর যদি সে ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে বলে, তিনি কি তোমাদের নিকট আসেননি? এঁরা বলেন, "না"। তখন রূহ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়েন আর বলেন, তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমাদের পথে আনা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে হযরত সালিহ্ মারযী (রা) বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, মৃত্যুর সময় রূহেরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে। আর আগন্তুক রূহদের জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের স্থান ছিলো কোথায়? তোমারা উত্তম দেহে ছিলে না মন্দ দেহে। এই অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে সালিহ্ (র)-এর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) কর্তৃক বর্ণিত ঃ পূর্বে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের রূহ সদ্য মৃত ব্যক্তিদের রূহকে অভ্যর্থনা জানান এবং এদের নিকট তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের খবরা খবর জিজ্ঞেস করেন, যেমনিভাবে দূরের মুসাফির আপনজনদের খবর নতুন আগন্তুকের নিকট জিজ্ঞেস করে থাকেন– অমুক অমুক কমেন আছেন? যদি আগন্তুক রূহ বলেন, তিনি তো মারা গেছেন। মৃত ব্যক্তির রূহ

এঁদের কাছে না আসলে তারা বলে থাকেন, ওকে কি তাহলে হাবিয়া দোযখে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে?

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (র) কর্তৃক বর্ণিত ঃ যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তার মৃত আত্মীয় স্বজনেরা তাকে অভ্যর্থনা জানায়, যেমন একজন অনুপস্থিত ব্যক্তি হঠাৎ উপস্থিত হলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) বলেছেন, আমি যদি আমার মৃত পরিবার পরিজনদের রূহের সাক্ষাৎ স্বপ্নযোগে না পেতাম, তাহলে এটা আমার জন্য চরম শোকের কারণ হতো এবং এটা আমার মৃত্যুরও কারণ হতো।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন বান্দার রূহ কবয হওয়ার পর তাঁর রূহকে আল্লাহর নিকটস্থ রহমতের ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য পবিত্র রূহেরা এমনিভাবে সম্বর্ধনা জানান যেমনিভাবে দুনিয়াতে কোন শুভ সংবাদদাতাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। আর তারা বলেন, আগন্তুক রূহকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দিন। কেননা এই রূহ খুব অশান্তির মধ্যে ছিলো। পরে সেই রূহকে বিভিন্ন লোকের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁরা কেমন আছেন? অমুক মেয়ের কি বিবাহ হয়েছে? তারপর এর আগে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের কথাও তাঁরা জিজ্ঞেস করেন। এই রূহ তখন উত্তর দেয়, আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। তখন এঁরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" পড়েন ও বলেন তাহলে কি তার রূহকেও হাবিয়া দোযখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? দোযখ যেমনি একটি নিকৃষ্ট স্থান তেমনি সেখানে যাকে পাঠানো হয়, সেও নিকৃষ্ট।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে বিস্তাম (র)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, হযরত মুসামি ইবনে আসিম (র) আমাকে বলেছেন, আমি হযরত আসিম জাহদারী (র)-কে তাঁর ইনতেকালের দু'বছর পর স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি এখন কোথায় আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের একটি উদ্যানে আছি। আমি এবং আমার একদল বন্ধু প্রতি শুক্রবার রাতে ও সকালে হযরত বকর ইবনে মুযনী (র)-এর কাছে মিলিত হই এবং তোমাদের খবরা-খবর নেই। আমি বললাম, আপনারা সশরীরে মিলিত হন, না আপনাদের রূহ মিলিত হয়? তিনি বললেন, আমাদের দেহ তো ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন আমাদের রূহই একে অন্যের সাথে মিলিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের রূহ্ পরস্পর সাক্ষাৎ করে কিনা

একজন জীবিত ব্যক্তি ও একজন মৃত ব্যক্তির রূহ যে পরস্পর সাক্ষাৎ করে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। অনুভূতি ও সত্য ঘটনাবলীর মাধ্যমে তা জানা যায়। জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির রূহ এমনিভাবে মিলিত হয় যেমনি জীবিত ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ রূহ্ কবয করেন এবং যারা জীবিত তাদের রূহও কবয করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত তিনি তার রূহ আটকে রাখেন এবং অন্যদের রূহ্ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। এতে নিদর্শন রয়েছে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী, একজন জীবিত ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায়ও মৃত ব্যক্তিদের রূহের সাথে সময় সময় মিলিত হয়ে থাকে এবং কথাবার্তাও বলে। আর একজন জীবিত ব্যক্তির যদি নিদ্রিত অবস্থায় মৃত্যু না হয়, তাহলে তার রূহ দেহে ফিরে আসে। নিদ্রার মধ্যে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের রূহ আর দেহের মধ্যে ফিরে আসে না।

হযরত আসবাত (র), হযরত সুদ্দী (র) থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যারা মরেনি তাদের রূহও কবয করেন।" তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার মধ্যেও রূহকে কবয করেন। জীবিত ও মৃতদের রূহ্ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে ও একে অন্যকে চিনতে পারে। তারপর জীবিতদের রূহকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তবে কোন কোন মৃত ব্যক্তির রূহ যখন তাদের দেহের দিকে ফিরে যেতে চায়, তখন তাদেরকে আটকে রাখা হয়।

উপরোক্ত আয়াতের প্রথম ব্যাখ্যা হলো, যিনি মারা গেছেন তাঁর রূহকে আটকে রাখা হয়। আর যিনি জীবিত এবং যাঁর রূহ নিদ্রার সময় দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে রূহ দেহে ফিরে আসে।

এই আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, আটককৃত রূহ ও মুক্ত রূহ, উভয় রূহই জীবিতদের। এসব রূহকে নিদ্রাবস্থায় কবয করা হয়। অতঃপর এদের মধ্যে যার জীবনকাল পূর্ণ হয়ে গেছে, সেই রূহকে আটকে রাখা হয় এবং কিয়ামতের আগে সেই রূহকে তার দেহের মধ্যে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। আর যার জীবনকাল শেষ হয়নি, তার রূহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি আরো দাবী করেছেন যে, তাঁর এই অভিমত কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যে রূহকে আল্লাহ তা'আলা নিদ্রাজনিত কারণে মৃত্যু দান করেছেন, তাদের মধ্য থেকে যেসব জীবিত ব্যক্তির রূহকে মৃত্যুর সময় কবয করা হয়, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় না এবং যাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয় না, সেসব রূহ তদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়।

কিন্তু এখানে রূহ সম্পর্কে প্রথম ব্যাখ্যাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে দু'টি মৃত্যুর কথা বলেছেন, একটি বড় ধরনের মৃত্যু এবং অপরটি ছোট ধরনের মৃত্যু অর্থাৎ নিদ্রা। আর রূহ দু'প্রকারের বলে উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার রূহ হলো ঐ রূহ যাদের উপর মৃত্যুর হুকুম বর্তিয়েছে। এসব রূহকে তো আল্লাহ তা'আলা নিজের নিকট রেখে মৃত্যুদান করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার রূহ হলো, ঐ সমস্ত রূহ যাদের নির্ধারিত মৃত্যুর মেয়াদ এখনো পূর্ণ হয়নি। এসব রূহকে আল্লাহ তা'আলা তাদের বয়স পূর্তির জন্য এদের দেহে ফিরিয়ে দেন। আর উপরোক্ত দু'টি মৃত্যুর জন্য দু'টি হুকুম উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আটকে রাখা ও ছেড়ে দেয়া রূহ।

আরো বলা হয়েছে, জীবিত রূহ হলো ঐসব রূহ যেসব রূহকে নিদ্রাজনিত মৃত্যু দান করা হয়েছে। এখন নিদ্রাজনিত মৃত্যু যদি দু'প্রকারের হয়, যথা– মৃত্যু ও নিদ্রা, তাহলে আল্লাহ তা'আলার বাণী, "যে নিদ্রার মধ্যে মরেনি" বলার প্রয়োজন হতো না। কেননা তার রূহ কবযের সময়েই মৃত্যুবরণ করে, অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন, সে মরেনি। তাহলে যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার রূহকে আটক রেখে দেন, বলাটা কি করে ঠিক হতো? উত্তরে বলা যায়, নিদ্রাজনিত মৃত্যুর পর আল্লাহ আসল মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন। মোটকথা হলো, ওফাতের আয়াতে উভয় প্রকার মৃত্যুই যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে দু'ধরনের মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে– একটি হলো মৃত্যুজনিত মৃত্যু ও অপরটি হলো নিদ্রাজনিত মৃত্যু। এছাড়া মৃত্যুজনিত রূহকে আটক রাখার ও দ্বিতীয় প্রকার রূহকে ছেড়ে দেয়ার উল্লেখ আছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির রূহকে আটক করা হয়, সে নিদ্রাবস্থায় মারা যাক বা জাগ্রত অবস্থায় মারা যাক।

জীবিত ও মৃতদের রূহের মিলিত হওয়ার এটিও একটি প্রমাণ যে, জীবিত বুযুর্গ ব্যক্তিরা স্বপ্নে মৃতদের দর্শন লাভ করেন এবং এদের কাছ থেকে তাদের পরিস্থিতি জেনে নেন। আর মৃতরা এমন অজ্ঞাত তথ্যের সংবাদ দেন যেগুলো অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলীও হয়ে থাকে। কোন কোন সময় মৃত ব্যক্তি মাটিতে পুঁতে রাখা সঞ্চিত ধন সম্পদের সংবাদও দিয়ে থাকেন, যে সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ জানতো না। কোন কোন সময়ে তাঁরা একজনের কাছে অন্যজনের ঋণের কথাও বলে দেন। এমনকি ঐ ঋণের সাক্ষ্য প্রমাণও উল্লেখ করেন। এছাড়া

কখনো কখনো দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও খবর দিয়ে থাকেন, যা তিনি ছাড়া দুনিয়াতে আর অন্য কেউ অবগত নয়। সেই মৃত ব্যক্তি কখনো কখনো বলে থাকেন, তুমি অমুক সময়ে আমার নিকট আসবে, এই সংবাদটাও সত্যে পরিণত হয়ে যায়। কোন কোন সময়ে তিনি এমন সব তথ্যও বলে দেন, যেগুলো সম্পর্কে জীবিতদের দৃঢ় বিশ্বাস, এইগুলো তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ জানতো না। এসব ঘটনার সাথে জড়িত হযরত সাআব, হযরত আউফ, হযরত সাবিত ইবনে কায়স, হযরত সাদাকা ইবনে সুলাইমান জাফরি, হযরত শুবায়েব ইবনে শায়বাহ এবং ফযল ইবনে মুয়াফফিক (রা)-এর ঘটনাবলী ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) এবং হযরত সালমান ফারসী (রা) পরস্পর মিলিত হন এবং উভয়ের মধ্যে এই ওয়াদা হয় যে, তাঁদের মধ্যে যিনি আগে মারা যাবেন, তিনি অপরজনকে স্বপ্নে দেখা দেবেন আর আল্লাহর কাছ থেকে যে ব্যবহার পাবেন তাও জানাবেন। সে সময় তারা একে অপরের সাথে একথা বলেছিলেন, আচ্ছা ভাই, জীবিত ও মৃতদের মধ্যে কি দেখা সাক্ষাৎ হয়? উত্তরে অপরজন বলেছিলেন, হ্যাঁ। তবে নেককারদের রূহ জান্নাতে থাকে এবং যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিচরণ করতে পারে। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন মারা গেলেন এবং অপরজনের সাথে স্বপ্নযোগে দেখা করলেন এবং বললেন "আল্লাহর উপর দৃঢ়ভাবে তাওয়াক্কুল করুন, এতে খুশি হতে পারবেন। আমি তাওয়াক্কুলের চেয়ে উত্তম আর কোন আমল পাইনি।"

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেছেন, আমি হযরত উমর (রা)-কে স্বপ্নে দেখার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। অবশেষে তাঁর শাহাদাত প্রাপ্তির প্রায় এক বছর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি কপালের ঘাম মুছছেন আর বলছেন এখনই আমি ব্যস্ততা থেকে অবসর পেলাম। আমার মনে হচ্ছিলো যেন আমার (ঘরের) ছাদ এক বিকট শব্দে ধ্বসে পড়বে, যদি না পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করতেন তাহলে আমি নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যেতাম। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ কৃপায় আমি রক্ষা পেয়ে গেছি।

হযরত শারীহ্ ইবনে আবিদ (র)-এর যখন অন্তিম অবস্থা, তখন হযরত গাযীফ ইবনে হারিস (র) তাঁর নিকট গেলেন এবং আরয করলেন আপনি আপনার ওফাতের পর যদি আমার কাছে আসতে পারেন এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানাতে পারেন তাহলে অবশ্যই তা করবেন। এই ধরনের কথা তৎকালীন বুযুর্গ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। হযরত শারীহ্ (রা)-এর ওফাতের দীর্ঘদিন পর গাযীফ (র) তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন, "আমাদের মধ্যে কেবল

'আহরায' ছাড়া আর অন্য সকলেই মুক্তি পেয়েছে।" তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আহরায' কারা ? তিনি উত্তর দিলেন, "কোন কথা প্রসঙ্গে যাদের প্রতি অঙ্গুলীর ইশারা করা হয়।"

হযরত আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি একবার আমার পিতা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি যেন এক বাগানের মধ্যে আছেন। তিনি আমাকে কয়েকটি নাশপাতি খেতে দিলেন। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম, আমার এক পুত্র সন্তান হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার কোন্ আমলটি উত্তম পেয়েছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! 'ইসতিগফার'। (অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে গুনাহ্ মাফ চাওয়া)।

হযরত মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিক (র) হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি যদি জানতে পারতাম, আপনার ওফাতের পর আপনি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? তিনি বললেন, হে মাসলাহ! এখন আমি একটু জিরোতে পারছি। আল্লাহর কসম, এখন আমি একটু শান্তির মধ্যে আছি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখন কোথায় আছেন? তিনি বললেন, "আমি এখন হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের সাথে জান্নাতে আদনে আছি।"

হযরত সালিহ বার্রাদ (র) বলেন, আমি যুরারাহ ইবনে আওফা (র)-কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আর আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবুল আলা ইবনে ইয়াযীদ মুতরাফের ভাইয়ের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, তিনি তো উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দৃষ্টিতে কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও কামনা-বাসনা হ্রাস করা'।

হযরত মালিক ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি একবার হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে তাঁকে সালাম পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সালামের কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তখন তাঁকে বললেন, আমি তো মৃত। তোমার সালামের জবাব কিভাবে দেবো? তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর পর আপনি কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি অনেক ভয়াবহ ভূমিকম্পের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।

তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী হলো? তিনি বললেন, তোমার কোন পরম দাতা থেকে যেমন আশা করো তেমনই হলো। আল্লাহ্ তা'আলা আমার পুণ্যসমূহ গ্রহণ করে আমার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আর তিনি দয়া পরবশ হয়ে এই অধমের যিম্মাদার হয়ে গেছেন। তা শ্রবণে হযরত মালিক (রা) প্রচণ্ড চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এই ঘটনার পর তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে ইনতেকাল করেন।

হযরত হাযাম (র)-এর ভাই হযরত সুহায়েল (রা) বলেন, আমি মালিক ইবনে দীনার (রা)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ ইয়াহইয়া (রা), আমি যদি জানতে পারতাম, আপনি আল্লাহর কাছে কী নিয়ে গিয়েছেন? তিনি বললেন, অনেক গুনাহ্ নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা ছিলো আর তার কারণেই আমাকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত রাজা ইবনে হাইওয়াহ (র)-এর ওফাতের পর জনৈক পুণ্যবতী মহিলা তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল মিকদাম, আপনি কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কল্যাণের দিকে না অকল্যাণের দিকে? তিনি উত্তর দিলেন, কল্যাণের দিকে। কিন্তু তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পর আমি এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম কিয়ামত এসে গেছে। মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত জাররাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ তাঁদের অর্জিত এতো পুণ্যসম্ভার নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাতে জান্নাতের দরজায় ভিড় জমে গিয়েছিলো।

হযরত জামীল ইবনে মুর্রাহ (র) বলেন ঃ হযরত মুয়াররিক আজলী (র) একাধারে আমার একজন প্রিয় ভাই ও বন্ধু ছিলেন। আমরা পরস্পর ওয়াদা করেছিলাম যে, আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে, সে তার বন্ধুর কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে তার অবস্থা জ্ঞাত করবে। ঘটনাক্রমে মুয়াররিক আগে মারা গেলেন। জামীলের স্ত্রী তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি পূর্বের ন্যায় তাদের দরজায় টোকা দিচ্ছেন। জামীলের স্ত্রী যথারীতি দরজা খুলে দিলেন এবং আরয করলেন, আপনি ভেতরে আসুন, আপনার বন্ধুর ঘরে এসে বসুন। তিনি বললেন, আমি কিভাবে আসবো, আমি তো মৃত্যুবরণ করেছি। আমি আমার বন্ধুকে আল্লাহ্র দয়ার শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। তাঁকে বলবেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর খাস বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন।

হযরত ইবনে সীরীন (র)-এর ওফাতের পর তাঁর জনৈক বন্ধু খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি একবার তাঁকে স্বপ্নে খুব ভালো অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং বললেন, ভাই, আপনার এই ভালো অবস্থা দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এবার বলুন, হযরত হাসান বসরী (র)-এর অবস্থা কেমন? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত হাসান (র) আমার চেয়ে সত্তর গুণ অধীক উচ্চ মর্যদা লাভ করেছেন।

হযরত ইবনে উয়াইনাহ (র) বলেন, আমি হযরত সুফইয়ান সওরী (র)-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, লোকজনের সাথে কম মিলামিশা করবে।

হযরত আম্মার ইবনে সাঈফ (র) বলেন, আমি হযরত হাসান ইবনে সালিহ (র)-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, আমি তো আপনার একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনার অবস্থা এখন কেমন? তিনি বললেন, "তুমি জেনে খুশি হবে যে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা পোষণ করার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোন আমল আমার জানা নেই।"

জনৈক ব্যক্তি হযরত যাইগাম আবিদ (র)-কে একবার স্বপ্নে দেখলেন। হযরত যাইগাম তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য দু'আ করোনি কেন? সে লোকটি ঐ ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে মাফ চাইলে তিনি বললেন, "তুমি আমার জন্য দু'আ করলে ভালো হতো।"

হযরত রাবিআ বসরী (র) ইনতেকাল করার পর তাঁর সঙ্গী সাথীদের মধ্য থেকে জনৈকা মহিলা তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি মিহিন রেশমের পরিচ্ছদ এবং সেই সাথে মোটা রেশমের দোপাট্টা পরে আছেন। আসলে কম্বলের একটি জুব্বা ও একটি পশমের দোপাট্টা পরিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। উক্ত মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঐ জুব্বা ও পশমের দোপাট্টা কোথায়? তিনি বললেন, ঐগুলো খুলে নিয়ে আমাকে এই পোশাক পরানো হয়েছে। আর সেগুলো ভাঁজ করে পুটুলীতে ভরে তার উপর সীলমোহর মেরে ইল্লিয়্যীনে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামতের দিন আমি এর সওয়াব পেয়ে যাই। মহিলাটি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন; আপনি কী এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার নেক আমল করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার মনে হয়, আল্লাহর ওলীদের প্রতি তাঁর যে সম্মানজনক আচরণ দেখেছি সে তুলনায় আমার আমল কোন স্তরেই পড়ে না। তিনি আরো জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আবিদাহ বিনতে কিলাব (র)-এর অবস্থা কেমন? আল্লাহর কসম, তিনিতো আমার চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, কেনো? মানুষ তো আপনাকে অধিক ইবাদতগুযার মনে করতো। হযরত রাবিআ বসরী (র) বললেন, তিনি দুনিয়ায় যখন যে অবস্থায় থাকতেন সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি আরো জানতে চাইলেন, হযরত আবু মালিক যাইগাম (র)-এর অবস্থা কেমন? তিনি বললেন, তাঁর যখন ইচ্ছা তখনই তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করে থাকেন। তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত ইবনে মনসুর (র) কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তো আশাতিরিক্ত নিআমত দান করেছেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য আমাকে কোন আমল বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতে থাকো, তাহলে কবরে তুমি দীর্ঘদিন ঈর্ষণীয় অবস্থায় থাকবে।

হযরত আবদুল আযীয ইবনে সুলাইমান (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন। তিনি সবুজ রংয়ের পোশাক ও মণি মুক্তা খচিত মুকুট পরিহিত অবস্থায় আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন, আপনার মৃত্যুকালীন অবস্থা কেমন ছিলো, আর সেখানে কি দেখলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা আর জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রত্যেকটি অন্যায় কাজকে ঢেকে দিয়েছেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহেই আমার প্রতি সদয় হয়েছেন।

হযরত সালিহ্ ইবনে বাশার (র) বলেন, আমি আতা সালমী (র)-এর ওফাতের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি? তিনি বললেন, কেন নয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুর পর আপনি কি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ আমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক অবস্থায় শ্রেষ্ঠ উপকারী ও ক্ষমাপ্রদর্শনকারী সত্তার নিকট পৌঁছে গিয়েছি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দুনিয়াতে সব সময় চিন্তিত থাকতেন না? তিনি মৃদু হেসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ, হ্যাঁ, আমি সব সময় চিন্তিত থাকতাম। এরই বিনিময়ে আমি চিরশান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পেরেছি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনি কোথায় আছেন? তিনি বললেন, আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাহচর্যে আছি।

হযরত আসিম জাহ্দারী (র)-এর ইনতেকালের পর তাঁর কোন প্রিয়জন তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি? তিনি বললেন, কেনো নয়? আসিম জাহ্দারী (র)-কে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি বেহেশতের বাগানে আছি। আমি এবং আমার সঙ্গীরা জুমুআর দিনে, জুমুআর রাতে ও পরের দিন সকালে হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মুয়ানী (র)-এর নিকট সমবেত হই আর তোমাদের খবরাখবর নিয়ে থাকি। হযরত আসিম জাহ্দারীর নিকট তিনি আবার জানতে চাইলেন, আপনাদের এই উপস্থিতি শারীরিক না আধ্যাত্মিক? তিনি বললেন শরীর তো বিনষ্ট হয়ে গেছে, আমরা শুধু রূহানীভাবে একত্রিত হয়ে থাকি।

হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র)-কে জনৈক ব্যক্তি একবার স্বপ্নে দেখলেন। হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) তাঁকে বললেন, "বান্দার কল্যাণের ক্ষেত্রে আমি রাব্বুল আলামীনের চেয়ে উত্তম আর কাউকে পাইনি।"

হযরত মুর্রা হামাদানী (র) এতো দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকতেন যে, তাঁর কপালে মাটির দাগ পড়ে গিয়েছিলো। তাঁর পরিবারের কোন একজন লোক তাঁর ইনতেকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর সিজদার জায়গা অতি উজ্জ্বল তারার মত ঝলমল করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চেহারা কি জন্য

ঝলমল করছে? তিনি বললেন, মাটির এ চিহ্নের দরুন আমার কপালকে উজ্জ্বলতা দান করা হয়েছে। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আখিরাতে আপনার মর্যাদা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, "আমি উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম বালাখানা পেয়েছি, যার বাসিন্দাদের সেখান থেকে সরানো হবে না এবং তাঁদের আর মৃত্যুও হবে না।"

হযরত আবু ইয়াকুব কারী (র) বলেন, পিঙ্গল রংয়ের দীর্ঘ আকৃতির জনৈক ব্যক্তিকে তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন। তাঁর পেছনে অনেক লোকজন সারিবদ্ধভাবে ছিলো। আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? লোকেরা বললো, ইনি হযরত ওয়ায়িস কারণী (র)। অবশেষে আমিও তাঁর পেছনের সারিতে শামিল হলাম এবং তাঁর কাছে আরয করলাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি আমাকে মনোযোগের সাথে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তাই আমি আবার আরয করলাম, আমি হিদায়াত প্রার্থী, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর রহমত তাঁর আনুগত্যের মধ্যে তালাশ করো। আর গুনাহের আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, এতেই আল্লাহর শাস্তি নিহিত রয়েছে। সেই লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

হযরত ইবনে সাম্মাক (র) বলেন, আমি মিসআর (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বিবেচনায় কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, "যিকরের মজলিস"।

হযরত আজলাহ (র) বলেন, আমি সালমাহ্ ইবনে কাহীল (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন আমলটি শ্রেষ্ঠ পেয়েছেন? তিনি বললেন, 'তাহাজ্জুদের নামায'।

হযরত আবু বকর ইবনে আবী মারইয়াম (র) বলেন, আমি ওফা ইবনে বাশার (র)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবস্থা কেমন? তিনি বললেন, অতি কষ্টে মুক্তি পেয়ে গেছি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আপনি উত্তম পেয়েছেন? তিনি বললেন, "আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা।"

হযরত মূসা ইবনে ওয়ারদান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাবীবাহ (র)-কে তাঁর ইনতেকালের পর একবার স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে আমার সমূহ পাপ ও পুণ্যকে দেখানো হলো, আমার সৎকাজের মধ্যে আমি যে আনারের দানাগুলো মাটি থেকে তুলে খেয়েছিলাম, তাও দেখতে পেলাম। আর পাপের মধ্যে আমার টুপিতে যে রেশমের দুটি সূতা ব্যবহৃত হয়েছিলো, তাও দেখতে পেলাম।

জুয়াইরিয়াহ ইবনে আসমা (র) বলেন, আমরা তখন আবাদানে ছিলাম। আমাদের

নিকটেই জনৈক কূফাবাসী যুবক এসে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতকারী ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি মারা গেলেন। তখন খুব গরম পড়েছিলো। আমরা সকলে সিদ্ধান্ত নিলাম, আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা হলে তাঁর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। এরপরে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম– আমি যেন কবরস্থানে আছি। সেখানে মণি মুক্তা খচিত এমন একটি বন্ধ গম্বুয দেখতে পেলাম যার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা ছিলো এক কষ্টকর ব্যাপার। হঠাৎ গম্বুযটি ফেটে গেলো এবং সেখান থেকে এক সুন্দরী যুবতী বেরিয়ে আসলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে আল্লাহর শপথ, যুহরের নামাযের সময়ের মৃত যুবকটিকে আমার নিকট আসতে যেন বিলম্ব না হয়। তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তারপর আমি তৎক্ষণাৎ যুবকটির দাফন-কাফনের কাজে লেগে গেলাম। আর আমি ঐস্থানে কবর খনন করলাম, যেখানে গম্বুযটি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আর তাঁকে ঐ কবরে দাফন করলাম।

আবদুল মালিক ইবনে আত্তাব লাইসী (র) একবার আমির ইবনে আবদে কায়স (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁর কোন্ আমলটি উত্তম পেয়েছেন? তিনি বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমল করা হয়"।

ইয়াযীদ ইবনে হারূন আবুল আলা আইয়ুব ইবনে মিসকীন (র)-কে একবার স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?" তিনি বললেন, "আমাকে মাফ করা হয়েছে।" আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আমলের বদৌলতে? তিনি বললেন, নামায-রোযার কারণে। আবার তিনি জানতে চাইলেন, হযরত মনসুর ইবনে যাযান (র) সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন, তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাঁর বালাখানা আমরা কেবল দূর থেকে দেখতে পাই।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে নায়ামা (র) বলেন, একটি মেয়ে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার পিতা তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আখিরাত সম্পর্কে কিছু বলো। সে বললো, আব্বাজান আমি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে গেছি, যেখানে আমাদের ইলম বা জ্ঞান আছে কিন্তু কোন আমল করতে সক্ষম নই। আর আপনারা আমল করতে পারেন তবে সে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। আল্লাহর শপথ, কিছু তাসবীহ পাঠ কিংবা দু'এক রাকআত নামায আদায় করার সওয়াব আমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, আমার নিকট তার চেয়েও অধিক প্রিয় ও মূল্যবান।

হযরত কাসীর ইবনে মুর্রা (র) একবার স্বপ্নে দেখলেন তিনি বেহেশতের এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন এবং ঘুরে ফিরে তা দেখছেন ও আনন্দিত হচ্ছেন। হঠাৎ ঐ স্থানের এক কোণে মসজিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলাকে দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে সালাম পেশ করলেন এবং

জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন আমলের বদৌলতে এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে পৌঁছতে পেরেছেন? তাঁরা বললেন, "সিজদাহ ও তাকবীরের বদৌলতে আমরা এই সম্মান লাভ করেছি"।

হযরত ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিক (র) হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর পত্নী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক রাতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয ঘুম থেকে জেগে বললেন, আমি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। আমি তখন তাঁকে বললাম, আপনার জন্য আমার জান কুরবান, বলুন আপনি কি স্বপ্নে দেখেছেন? তিনি বললেন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি তা বলবো না। সুবহে সাদিকের পর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে বাসায় ফিরে আসলেন। আমি এ সময়টিকে অত্যন্ত উপযুক্ত মনে করে স্বপ্নটি শুনবার জন্য তাঁর কাছে আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, কে একজন যেন আমাকে প্রশস্ত, সবুজ-শ্যামল এক প্রান্তরে নিয়ে গেলো, যেখানে যামরুদের বিছানা পাতা রয়েছে। আমি সেখানে রৌপ্যের মতো সাদা রংয়ের একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। সেখানে আরো দেখতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি ঐ মহল থেকে বের হয়ে এসে উচ্চস্বরে হাঁক দিচ্ছে- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব কোথায়? আল্লাহর রাসূল কোথায়? এমন সময় দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে ঐ মহলে প্রবেশ করলেন? তারপর উক্ত মহল থেকে আরো এক ব্যক্তি বের হয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দিলো, আবু বকর সিদ্দীক কোথায়? ইবনে আবু কুহাফা কোথায়? তখন হযরত আবু বকর (রা) তাশরীফ আনলেন এবং উক্ত মহলেই প্রবেশ করলেন। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে হাঁক দিলো- কোথায় উমর ইবনে খাত্তাব? হযরত উমর (রা) এসে ঐ মহলে প্রবেশ করলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ থেকে হাঁক দিলো- উসমান ইবনে আফফান কোথায়? তখন হযরত উসমান (রা) এসে ঐ মহলেই প্রবেশ করলেন। এরপর আরো এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে হাঁক দিলো- আলী ইবনে আবী তালিব কোথায়? তখন হযরত আলী (রা) এসে ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসে হাঁক দিলো, কোথায় উমর ইবনে আবদুল আযীয? তখন আমি অগ্রসর হয়ে এ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলাম। সাহাবীরা তখন তাঁর চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কোথায় বসবো? শেষ পর্যন্ত আমার নানা হযরত উমর (রা)-এর পাশে বসে পড়লাম। সেখানে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে হযরত আবু বকর দিদ্দীক (রা) ও বাম পাশে হযরত উমর (রা) বসে আছেন। তারপর আরো লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর মধ্যে অপর এক মহৎ ব্যক্তি

বসে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? আমাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ)। তারপর নূরানী পর্দার আড়াল থেকে একটি আওয়ায এলো, "হে উমর ইবনে আবদুল আযীয, তুমি যে পথে আছো সেই পথকে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং এর উপর স্থির থাকো।" অতঃপর আমাকে বাইরে আসার অনুমতি দেয়া হলো, আমি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হলাম এবং পেছনে ফিরে দেখি আমার পেছনে পেছনে হযরত উসমান (রা) এই বলতে বলতে আসছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' আরো দেখলাম, তাঁর পেছনে হযরত আলী (রা) এই বলে বলে আসছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন'।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে আরো বর্ণিত ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) তাঁর পাশে বসে আছেন। তিনি তাঁকে সালাম করে সেখানে বসে পড়লেন। এর মধ্যে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা)-কে সেখানে নিয়ে আসা হলো, তাঁদেরকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হযরত আলী (রা) তাড়াতাড়ি সেখান থেকে এই বলে বের হয়ে আসলেন, "কাবার রবের কসম, আমার বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেছে।" এরপর হযরত মুআবিয়া (রা) এই বলে বেরিয়ে আসলেন, "কাবার রবের কসম, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট এসে বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, তাঁর ডান পাশে হযরত আবু বকর (রা) ও বাম পাশে হযরত উমর (রা) রয়েছেন। সে সময় দু'জন লোক ঝগড়ারত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। আর আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসা ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে উমর ইবনে আবদুল আযীয! যখন তুমি ইবাদত-বন্দেগী করবে, তখন এই দুই ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ বকর ও উমরের মতো আমল করবে।" হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তখন ঐ ব্যক্তিকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যি সত্যি এরূপ স্বপ্ন দেখেছো? সেই ব্যক্তি কসম করে তার সত্যতা স্বীকার করলো। তখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) কেঁদে ফেললেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা) বলেন ঃ তিনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে তাঁর ওফাতের তিন বছর পর স্বপ্নে দেখলেন তিনি একটি ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার রয়েছেন। আর তাঁর পেছনে গৌর বর্ণের কিছু লোক সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আছেন। এই অবস্থায় হযরত মুআয (রা) কুরআন পাকের এই আয়াত দু'টি পাঠ করলেন,

"হায় আমার কাওম যদি জানতে পারতো, আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-২৬-২৭)

তারা বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির (বেহেশতের) অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো। নেক আমলকারীদের জন্য কতোই না উত্তম প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৭৪)

তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা)-এর সাথে মুসাফাহা করলেন ও সালাম জানালেন। হযরত কুবায়সা ইবনে উকবাহ (র) বলেন, আমি একদিন সুফইয়ান সওরী (র)-কে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন, যার মর্মার্থ হলো ঃ আমি আমার রবকে আমার সামনে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনে সায়ীদ, আমার সন্তুষ্টি তোমার জন্য কল্যাণকর হোক। কেননা রাতের বেলায় তুমি যখন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে, তখন তোমার চোখ থেকে ব্যথার অশ্রু ঝরতো আর অন্তর থাকতো ব্যথাতুর। এখন তুমি যেই মহল ইচ্ছা তা বেছে নাও, আর আমি তোমার অতি নিকটে আছি। তুমি যতো ইচ্ছা আমাকে দর্শন করতে থাকো।

হযরত ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, "আমি একবার হযরত সুফইয়ান সওরী (র)-কে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বেহেশতের মধ্যে এক খেজুর গাছ থেকে উড়ে গিয়ে অন্য এক খেজুর গাছে বসছেন আর বলছেন, "এরূপ নিআমত লাভের জন্য সাধনাকারীদের সাধনা করা উচিত।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ আমলের বদৌলতে আপনি বেহেশত লাভ করেছেন? তিনি বললেন, তাকওয়া ও পরহেযগারীর জন্য। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত আলী ইবনে আসিম (র) কেমন আছেন? তিনি বললেন, "তাঁকে আমরা আকাশের তারকারাজির মতো দেখতে পাই।"

হযরত শোয়বা ইবনে হাজ্জাজ (র) ও হযরত মিসআর ইবনে কুদাম (র) উভয়ে কুরআনে হাফিয ছিলেন। তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন। হযরত আবু আহমদ বারীদী (র) বলেন, 'আমি তাঁদের দু'জনকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ বিসতাম; আল্লাহ্ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে আমার এই কবিতাটি হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দান করুন। কবিতাটির মর্মার্থ হলো, আমাকে আমার প্রভু বেহেশতে এমন এক মহল দান করেছেন, যার এক হাজার দরজা রয়েছে, যা চান্দি ও মণি মুক্তার তৈরি। দয়ালু আল্লাহ্ পাক আমাকে বললেন, হে শোয়বা! তুমি অধিক

পরিমাণে জ্ঞান আহরণে পটু ছিলে, এখন তুমি আমার নিকট আনন্দ উপভোগ করো। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আর আমার বান্দা মিসআর-এর প্রতিও আমি সন্তুষ্ট। কেননা সে তাহাজ্জুদগুযার ছিলো। মিসআর-এর জন্য এই মর্যাদাই যথেষ্ট যে তার জন্য আমার দীদার লাভ হয়েছে। আমি তার জন্য আমার পবিত্র চেহারা উন্মুক্ত করে দেই। ইবাদতকারীদের সাথে আমার ব্যবহার এই রকমই যে, যারা অতীতে কোন পাপে লিপ্ত ছিলো না।

হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ লাবাদী (র) বলেন, 'আমি একবার ইমাম আহমদ (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে বলছেন, হে আহমদ, তোমার হয়তো মনে আছে, তুমি আমার জন্য ষাটটি চাবুকের ঘা খেয়েছিলে। তিনি বললেন, হাঁ, আমার মনে আছে। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, আমি আমার চেহারা তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিলাম। তুমি এখন এর দীদারের আনন্দ উপভোগ করতে থাকো।

একবার জনৈক তুরতূসী আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কবরবাসীদেরকে দেখাও, তাহলে আমি তাঁদের কাছে ইমাম আহমদ (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, আপনি তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন। এরপর দশ বছর চলে গেলো। আমি স্বপ্নে দেখলাম, কবরবাসীরা কবর থেকে বের হয়ে এসেছেন। প্রত্যেকেই আমার সাথে আগে কথা বলতে চান। তাঁরা আমাকে বললেন, আপনি দশ বছর যাবত দু'আ করছিলেন যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার সাথে দেখা করান। আর আপনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যিনি আপনার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ফেরেশতারা তূবা বৃক্ষের নিচে তাঁকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সুসজ্জিত করে রেখেছেন। এই সম্পর্কে আবু মুহাম্মদ আবদুল হক (র) বলেন, মৃত ব্যক্তিদের পরিবেশিত এইরূপ তথ্য ইমাম আমহদ (র)-এর উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ মাকাম লাভের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর উচ্চ সম্মান লাভের বর্ণনার ক্ষেত্রে এর চেয়ে অধিক সুন্দর ও বাস্তবধর্মী আর কোন ভাষা মৃত ব্যক্তিরা খুঁজে পাননি।

হযরত বাশার ইবনে হারিসের বন্ধু হযরত আবু জাফর সাক্কা (র) থেকে বর্ণিত ঃ আমি একবার হযরত বাশার হাফী (র) ও হযরত মারূফ কারখী (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তাঁরা যেন কোথা থেকে আসছেন। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোত্থেকে তাশরীফ আনছেন? তাঁরা বললেন, জান্নাতে ফিরদাউসে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরছি।

হযরত আসিম জাযারী (র) বলেন, স্বপ্নে বাশার ইবনে হারিস (র)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু নসর, আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেন ইল্লিয়্যীন থেকে আসছি। আমি আবার জিজ্ঞেস

করলাম, হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর অবস্থা কেমন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এখনই তাঁকে আবদুল ওহাব ওয়ারাক (র)সহ আল্লাহর সামনে রেখে এসেছি। তাঁরা উভয়েই সেখানে পানাহার করছেন। আমি বললাম, আর আপনি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ জানেন, পানাহারের প্রতি আমার ততো আগ্রহ নেই। তাই তিনি তাঁর দীদার লাভের পথ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবূ জাফর সাক্কা (র) আরো বলেন, আমি হযরত বাশার (র)-কে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়া, অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, হে বাশার, আমি মানুষের অন্তরে তোমার জন্য যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছি, তুমি যদি জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপরও সিজদাহ করতে তবুও তার শুকরিয়া আদায় হতো না। আল্লাহ্ আমার জন্য অর্ধেক বেহেশত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি সেখানে যথা ইচ্ছা যেতে পারি ও যা খুশি খেতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছিলেন, তাদের সবাইকে ক্ষমা করারও ওয়াদা করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু নসর তাম্মারের অবস্থা কেমন? উত্তরে তিনি বললেন, দারুণ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সবর করার দরুন তিনি সবার উপরে মর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত আবদুল হক (র) বলেন, সম্ভবত এখানে অর্ধেক বেহেশত বলতে বেহেশতের অর্ধেক নিআমতের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা বেহেশতের নিআমতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ আধ্যাত্মিক ও অপর ভাগ শারীরিক। বেহেশতীরা আলমে বরযখে রূহানী নিআমত উপভোগ করবেন। আর কিয়ামতের দিন রূহ যখন নিজ নিজ দেহে ফিরে আসবে তখন রূহানী নিআমতের সাথে শারীরিক নিআমতও যোগ হবে। কারো কারো মতে, বেহেশতের নিআমতসমূহ ইলম ও আমলের উপর নির্ভর করে, কাজেই বাশার (র)-এর ইলমী নিআমতের অনুপাতে আমলী নিআমতসমূহ অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত।

এক সময় জনৈক নেককার ব্যক্তি হযরত শিবলী (র)-কে স্বপ্নে দেখলেন তিনি বাগদাদের রুসাফাহ্ নামক একটি স্থানে সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে জীবিতকালে যে জায়গায় বসতেন ঠিক সেখানে বসে আছেন। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে সালাম করলাম এবং তাঁর সামনে বসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার একান্ত বন্ধু কে? তিনি উত্তর দিলেন, যিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকর করেন এবং যিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহর হকের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, আর যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বেশি তৎপর ও সতর্ক, তিনিই আমার বন্ধু।

হযরত আবূ আবদুর রহমান সাহিলী বলেন, আমি মায়সারাহ্ ইবনে সালীম (রা)-কে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো দীর্ঘ দিন ধরে অজ্ঞাত রয়েছেন। তিনি বললেন, এটি আমার খুবই দীর্ঘ সফর।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কেন না আমি রুখসত বা সহজ গ্রহণীয় ফতওয়া দিতাম। আমি বললাম আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "সুন্নাতের অনুসরণ এবং আল্লাহ প্রেমিকদের সাহচর্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেয় আর আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে।"

হযরত আবূ জাফর যারীর (র) বলেন, আমি ঈসা ইবনে যাযান (র)-কে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তখন তিনি যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন সেটির মর্মার্থ হলো- "কতোই না ভালো হতো যদি তুমি আমার চতুর্পাশে পানীয় ভরা পেয়ালা হাতে সুন্দরীদেরকে দেখতে যারা সুমিষ্ট সুরে কুরআন পাঠে রত এবং তারা তাদের পরিধেয় পোশাক টেনে টেনে এগিয়ে আসছে।"

হযরত ইবনে জুরায়েজ (র)-এর জনৈক বন্ধু বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম মক্কা শরীফের কবরস্থানের মধ্যে রয়েছি। সেখানে দেখলাম প্রত্যেক কবরের উপর শামিয়ানা টানানো রয়েছে। কিন্তু একটি কবরের উপর শামিয়ানার সাথে তাবুও খাটানো রয়েছে এবং সেখানে একটি কুল বৃক্ষও রয়েছে। আমি তাঁবুর দরজায় গিয়ে সালাম পেশ করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে হযরত মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র)-কে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম করে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ খালিদ! ব্যাপার কি? প্রত্যেক কবরের উপর শামিয়ানা রয়েছে কিন্তু আপনার কবরের উপর শামিয়ানার সাথে তাঁবুও রয়েছে এবং একটি কুল বৃক্ষও আছে। তিনি বললেন, আমি যে অধিক পরিমাণে রোযা রাখতাম এটা তারই প্রতিদান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে জুবায়েজের কবর কোন দিকে এবং তাঁর মর্যাদা কি রকম? আমি দুনিয়ার জীবনে তাঁর সাথে উঠাবসা করতাম, এখন তাঁকে আমি সালাম করতে চাই। এই কথা শুনে তিনি হাতের ইশারায় বললেন, ঐখানে। তারপর তিনি তর্জনী ঘুরিয়ে বললেন, ইবনে জুরায়েজের ঠিকানা আবার কোথায়, তাঁর আমলনামা তো ইল্লিয়্যীনে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

হযরত হাম্মাদ ইবনে সালমাহ (র) তাঁর কোন এক বন্ধুকে তাঁর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, তুমি তো দুনিয়াতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলে, এখন আমি তোমাকে এবং তোমার মতো অন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্যকারীদেরকে চিরশান্তি দান করেছি।

স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলী অতি ব্যাপক ও অর্থবহ। যদি কেউ এর সত্যতা স্বীকার না করে আর মনে করে যে, এগুলো স্বপ্ন বৈ আর কিছু নয়। স্বপ্ন সত্য হতে পারে আর মিথ্যাও হতে পারে, তাই এই বিষয়টিকে সে এড়িয়ে যেতে চায়। সেই ক্ষেত্রে তার উচিত, ঐ ব্যক্তির স্বপ্নের কথা চিন্তা করা যে তার কোন বন্ধু বা প্রিয়জনকে কিম্বা

অন্য কাউকে স্বপ্নে দেখলো এবং সে তাকে এমন সব বিষয়ের সংবাদ দিলো, যেসব বিষয়ের কথা সে ছাড়া আর অন্য কেউ জানতো না। যেমন পুঁতে রাখা ধন সম্পদের তথ্য অবগত করানো অথবা ভবিষ্যৎ বিপদাপদের সংবাদ দেয়া, সামনে যেসব ঘটনা ঘটবে সেসবের সংবাদ দেয়া এবং তা সত্যে পরিণত হওয়া। এছাড়া অমুক ব্যক্তি বা অমুক পরিবারের অমুক ব্যক্তি এতো দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে, আর বাস্তবে তাই ঘটলো অথবা তাকে বাজারের জিনিস পত্রের দামের সঠিক সংবাদ বা দুর্ভিক্ষের খবর দেয়া, কোন দুশমনের হামলা কিম্বা আসন্ন কোন বিপদের বা কোন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, কারো দায়দায়িত্বের খবর দেয়া, আর সেসব খবর অনুযায়ী সমস্ত কিছু সত্য পরিণত হওয়া। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সব সময় ঘটছে আর এতে সর্বশ্রেণীর লোক জড়িত রয়েছেন। আর সকলেই এ ধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী অবলোকন করছেন।

অনেকে মনে করে থাকেন, স্বপ্ন একটি নিছক কল্পনাপ্রসূত বিষয় মাত্র, এটাকে বিশ্বাস করার কিছুই নেই। যেসব স্বপ্ন, দর্শনকারীর সামনে ছবির মতো ধরা দেয়, সেসব স্বপ্ন কোন ব্যক্তির রূহ নিদ্রার সময় দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্ত হলে দেখে থাকে। কিন্তু এটা একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব ধারণা। কোন নাফসের পক্ষে ঐসব বিষয় জানার কোন ক্ষমতা বা জ্ঞান নেই, যা স্বপ্নের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায়, বরং ঐ বিষয়গুলো নাফসের ধারণারও অতীত। এছাড়া নাফসের সঙ্গে এ সবের কোন যোগসূত্র বা সম্পর্ক নেই। তাবে কোন কোন সময় ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। অবশ্য মানুষের অনেক স্বপ্ন শুধু তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তারই প্রতিফলন মাত্র, সেটা কোন বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতেই হোক বা অন্য কোন কারণে দৃষ্ট হোক।

স্বপ্ন তিন প্রকার। এক– কোন কোন স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। দুই– কোন কোন স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে ঘটে থাকে। তিন– কোন কোন স্বপ্ন নিজের ধ্যান-ধারণা থেকে দেখা যায়। আবার সত্য স্বপ্নও কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা ঃ প্রথম– ইলহামী স্বপ্ন : যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক কোন বান্দার দিলের মধ্যে নিদ্রাবস্থায় কোন বিষয় অবহিত করে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেন স্বপ্নের মাধ্যমে সেই বান্দার সাথে কথা বলেন। যেমন, হযরত উবায়দা ইবনে সামিত (রা) প্রমুখের ঘটনাবলী।

দ্বিতীয়– তামসীলী স্বপ্ন : যেই স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতারা বান্দাকে রূপকের সাহায্যে কোন কথা বলে দেন বা ইঙ্গিত করেন।

তৃতীয়– রূহানী স্বপ্ন : এই স্বপ্নের দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ তার কোন মৃত আত্মীয় বা প্রিয়জনের রূহের সাথে মিলিত হয়। আর ঐ মৃত ব্যক্তির রূহ তার জানা বিষয়সমূহের সংবাদ নিদ্রিত ব্যক্তিকে দিয়ে থাকে।

চতুর্থ– উরূজী স্বপ্ন : কোন নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ যখন আল্লাহর দিকে উড়ে যায়, তখন সে এই স্বপ্ন দেখে।

পঞ্চম– জান্নাতী স্বপ্ন : এই স্বপ্নের মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ বেহেশতে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে অনেক কিছু দেখে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবিত ও মৃতদের রূহ একত্রিত হওয়ার বিষয়টিও সত্য স্বপ্নেরই রকম বিশেষ যেটা মানুষের কাছে অনুভূত বিষয়সমূহের সমশ্রেণীর। তবে এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে।

কারো কারো মতে রূহের মধ্যে সর্বপ্রকার ইলম বিদ্যমান। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের পার্থিব কর্মচাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা ঐ জ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে নিদ্রাবস্থায় যখন কোন রূহ সাময়িকভাবে দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখন সেই রূহ আপন যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী অনেক বিষয় অবলোকন করে থাকে। আর যেহেতু মৃত্যুজনিত কারণে দেহ থেকে রূহ পুরোপুরিভাবে মুক্তি লাভ করে, সেই হেতু রূহ জ্ঞান ও চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু সত্য ও কিছু ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। কেননা, মুক্তিপ্রাপ্ত রূহ ছাড়া ঐসব জ্ঞান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কোন রূহ পুরাপুরি মুক্তি লাভ করা সত্ত্বেও, আল্লাহর ঐসব জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না, যেসব জ্ঞান তিনি তার রাসূলগণকে প্রদান করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর রূহ, পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের কাওমের বিস্তারিত কোন তথ্য, যেমন– পরকাল, কিয়ামতের আলামত, কোন কাজের ভালোমন্দ ফলাফল, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিবরণ, আল্লাহ পাকের আসমাউল-হুসনা, আল্লাহর গুণাবলী, কার্যাবলী ও শরীআতের বিস্তারিত বিষয়টিও জানতে পারে না। কেননা এই সমস্ত বিষয় শুধু ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানা যায়। মুক্তি প্রাপ্ত রূহের পক্ষে এসব বিষয় জানা সহজ হয়ে উঠে। তবে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ ও সঠিক।

কারো কারো দৃষ্টিতে স্বপ্ন হলো ঐ জ্ঞান, যা আল্লাহ পাক বিনা কারণেই সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। এই অভিমত ঐসব লোকের, যাঁরা পার্থিব কার্যকরণ ও হিকমতকে অস্বীকার করেন। তাঁদের এই ধারণা সঠিক নয়, বরং এটা শরীআত ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী।

আল্লাহ তাআলা বান্দার যোগ্যতা অনুযায়ী কোন কোন কথা উপমার আকারে বর্ণনা করে থাকেন। তাই কখনো কখনো উপমা বা রূপকের মাধ্যমেও স্বপ্ন দেখা যায়। আবার কখনো কখনো যা কিছু দৃষ্ট হয়, হুবহু তাই ঘটে থাকে। সত্য স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী দৃষ্ট হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল হাসান, আপনি অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে থাকেন, আমরা যখন থাকি না। আর কোন কোন সময় আমরা থাকি কিন্তু আপনি থাকেন না। আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন রাখছি। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার জানা থাকলে তা অবশ্যই বলবেন। হযরত আলী (রা) বললেন, প্রশ্নগুলো কি? হযরত উমর (রা) বললেন, একজন লোক অন্য একজন লোককে ভালোবাসেন, অথচ বিনিময়ে তিনি কোন ভালো ব্যবহার পান না। আবার একজন লোকের সাথে অন্য একজন লোকের দুশমনী আছে, অথচ তজ্জন্য তার নিকট থেকে সে কোন খারাপ ব্যবহার পায় না। হযরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রূহ হচ্ছে এক সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়, এরা মহাশূন্যে একে অপরের সাথে মিলামিশা করে। তখন যেসব রূহের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মে এবং যাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয় না, তাদের মধ্যে দুনিয়ায়ও কোন সম্পর্ক বা ভালোবাসা জন্মে না। এদের সাথে দুনিয়াতেও তারা অজানা ও অচেনা থেকে যায়। হযরত উমর (রা) বললেন, হাঁ, একটি প্রশ্নের উত্তর তো পেয়ে গেলাম। তারপর বলুন, মানুষ কেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে কথা ভুলে যায়, তারপর ভুলে যাওয়া কথা আবার মনে পড়ে, এর কারণ কি? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক প্রকার মেঘমালা রয়েছে, যেমন মেঘমালা চাঁদের জন্য রয়েছে। যখন চাঁদকে মেঘমালা ঢেকে দেয়, তখন চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে যায়। তারপর যখন মেঘমালা সরে যায়, তখন চাঁদ আবার আলোকিত হয়ে উঠে। ঠিক এমনিভাবে, কথাবার্তার মাঝে মানুষের স্মৃতিশক্তির উপরও মেঘমালা ছেয়ে যায়, ফলে সে ব্যক্তি ঐকথা ভুলে যায়। আবার যখন মেঘমালা সরে যায় তখন ভুলে যাওয়া কথা তার মনে পড়ে। হযরত উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, দু'টি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। তিন– তারপর হযরত উমর (রা) বললেন, মানুষ স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কোন কোন স্বপ্ন সত্য হয়, আবার কোন কোন স্বপ্ন মিথ্যে হয়, এর কারণ কি? হযরত আলী (রা) বললেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন তাঁর রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়, সে সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখেন, তা সত্য হয়। অন্যথায়, সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, তা সত্য পরিণত হয় না। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি মৃত্যুর পূর্বে আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) আরো বলেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন সময় মানুষ এমন সব স্বপ্ন দেখে যা কখনো তার অন্তরে উদিত হয়নি, অথচ সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

আবার কোন কোন সময় এমন সব স্বপ্নও দেখে যা কখনো সত্যে পরিণত হয় না। একথা শুনে হযরত আলী (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ মৃত্যুর সময় রূহকে কবয করেন। আর যারা জীবিত, তাদের রূহকে নিদ্রার মধ্যে কবয করে নেন। এরপর ঐ রূহকে যেগুলোরে ব্যাপারে মৃত্যু অবধারিত সেগুলো আটক করে রাখেন। আর অন্যান্য রূহকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

এছাড়া, যে সব রূহকে নিদ্রার সময় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, তারা আসমানে যা কিছু দেখে আসে ঐগুলো সঠিক প্রমাণিত হয়। আর যখন ঐসব রূহকে নিজ নিজ দেহের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়, তখন মহাশূন্যে তাদের সাথে শয়তানের দেখা হয়। এই সুযোগে এদেরকে শয়তান মিথ্যে কথা শিখিয়ে দেয়। শয়তানের এই ধরনের শিখিয়ে দেয়া স্বপ্নই মিথ্যে হয়ে থাকে। (কিতাবুন নুফূস ওয়াররূহ)

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নিকট থেকে কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। মানুষ কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোন কথা ভুলে যায়, আবার ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে এবং মানুষের স্বপ্ন কখনো সত্য হয়, আবার কখনো মিথ্যে হয়, এর কারণ কি? হযরত উমর (রা) বললেন, মানুষের অন্তরে এক প্রকার মেঘমালা রয়েছে যেমন চাঁদেরও মেঘমালা রয়েছে। যখন মেঘমালা মানুষের অন্তরকে ঢেকে দেয় তখন সে তার কথা ভুলে যায়। আর যখন মেঘমালা সরে যায় তখন ভুলে যাওয়া কথা তার মনে পড়ে। আর মানুষের স্বপ্ন কখনো সত্য আবার কখনো মিথ্যে হওয়ার কারণ হলো– আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "আল্লাহ মৃত্যুর সময় রূহ কবয করে নেন, এরপর যেগুলোর ব্যাপারে মৃত্যু অবধারিত সেগুলো রেখে দেয়া হয়। আর অন্যান্য রূহগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে সব রূহ ঊর্ধ্বলোকে প্রবেশ করে তাদের স্বপ্ন সত্য হয়, আর যে সব রূহ ঊর্ধ্বলোকের বাইরে থাকে তাদের স্বপ্ন মিথ্যে হয়।

এ প্রসঙ্গে তাবারানী গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতটিও নিম্নে বর্ণিত ঘটনাবলীকে সমর্থন করে। হযরত আবূ দারদা (রা) কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, যখন কোন নেককার বান্দা ঘুমিয়ে পড়েন, তখন তাঁর রূহ উপরের দিকে ছুটে যায়, এমনকি আরশের নিকট গিয়ে পৌঁছে। যদি ঘুমন্ত ব্যক্তি পাক অবস্থায় থাকেন, তাহলে তাঁর রূহ আল্লাহকে সিজদাহ করার অনুমতি

লাভ করে। আর যদি সে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় থাকে তাহলে সিজদাহ করার অনুমতি সে পায় না।

এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রূহ হলো এক সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়, এরা পরস্পর মিলামিশা করে। এদের মধ্যে কোন কোন রূহ এক জাতীয় ঘোড়ার মতো অশুভ ও অপয়াও হয়ে থাকে। সুতরাং যেই রূহের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে ভালোবাসাও জন্মে। আর যাদের মধ্যে কোন পরিচয় হয় না, তাদের মধ্যে দুনিয়ায়ও কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এরূপ ধারণা বহু পূর্ব হতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। জামীল ইবনে মুআম্মার তাঁর এক কবিতায় বলেন, "আমি সারাদিন হতবুদ্ধি হয়ে থাকি, কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে আমার রূহ আমার প্রেয়সীর রূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসে।"

জীবিত মানুষও সময় সময় অন্য জীবিত মানুষকে স্বপ্নে দেখে থাকে এবং তাকে সম্বোধন করে কথাবার্তাও বলে থাকে। অনেক সময় উভয়ের মধ্যে বিরাট দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও একে অন্যকে সম্বোধন করে কথাবার্তা বলে। এই অবস্থায় তাদের রূহ কিভাবে মিলিত হতে পারে? এর উত্তর হলো, এটা হচ্ছে একটি সাদৃশ্য বা উপমার ব্যাপার, যাকে স্বপ্নের ফেরেশতারা সাদৃশ্যের অনুকরণে পেশ করে থাকেন। আসলে একজন স্বপ্ন দর্শনকারীর ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা তার স্বপ্নের মধ্যে কোন আকৃতি ধারণ করে সামনে আসে। যেমন ঃ হাবীব ইবনে আউস তাঁর এক কবিতায় বলেন, "হে আমার প্রেয়সী! আল্লাহ তোমার চিন্তাধারাকে সজীব রাখুন। তার বদৌলতে তোমার সাথে আমার যিয়ারত সম্পন্ন হয়েছে। হে আমার কল্পনা, তোমার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। তোমারই বদৌলতে আমি আমার প্রেয়সীর সামনা-সামনি হয়ে থাকি।"

কোন কোন সময় দু'টি রূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাদের মধ্যে নিবিড় ও গোপন যোগাযোগ গড়ে উঠে। এরই ফলশ্রুতিতে এক ব্যক্তির রূহ অন্য কোন ব্যক্তির রূহের কোন না কোন ঘটনা অবহিত হয়ে থাকে। অনেক লোক এ বিষয়ে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। মোট কথা, জীবিতদের রূহ অপর জীবিতদের রূহের সাথেও একত্রিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ জীবিত মানুষের রূহের সাথেও মিলিত হয়।

প্রথম যুগের কোন কোন আলিমের অভিমত হলো, মহাশূন্যে রূহের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও পরিচয় ঘটে থাকে। এদের মধ্যে কথোপকথনও হয়। তারপর স্বপ্নের ফেরেশতা ভালো-মন্দ বিষয় নিয়ে এদের কাছে হাযির হন যা তাদের সঙ্গে সংঘটিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সত্য স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একজন ফেরেশতাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তিনি পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানেন ও চিনেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ ফেরেশতাকে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান

দিয়ে রেখেছেন। সেই ফেরেশতা সকল অনাগত, ইহলৌকিক, পারলৌকিক ও ধর্মীয় ঘটনাবলী অবগত আছেন এবং মানুষের সব রকমের অবস্থা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, তাঁর কোন কিছুই অজানা নেই। আর সেই ফেরেশতা তাঁর জানা বিষয়ে কোন ভুল করেন না। ঐ ফেরেশতা উম্মুল কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর অদৃশ্যের ভাণ্ডার থেকে সে সব ঘটনাবলীর পাণ্ডুলিপি যা মানুষের জীবনে ঘটবে, তা অবহিত হন। তারপর ঐ ফেরেশতা তা রূপক ও উপমার সাহায্যে সহজভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। তাই কখনো কখনো সেই ফেরেশতা মানুষের অতীত বা ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন। আবার কখনো কখনো ঐ সব গুনাহ্ সম্পর্কে যা সে করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো বা যে গুনাহে সে জড়িয়ে পড়েছে, সে সব ব্যাপারেও তাকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়। আর কোন কোন সময় ঐ ফেরেশতা মানুষের মন্দকাজ সম্পর্কে ঘৃণা প্রদর্শন করেন যা পূর্বে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য যেসব কারণে মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, সেগুলোকে তিনি মিটিয়ে দেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগ-সুবিধা রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাআলা রূহের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই স্বপ্নের মাধ্যমেও অনেক লোকের সংশোধন হয়ে যায়। আর তাঁরা গুনাহ থেকে খাঁটি অন্তঃকরণে তাওবাহ করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে যান এবং আখিরাতের সঠিক পথের সন্ধানও পেয়ে যান। এমনকি অনেকে স্বপ্নের মাধ্যমে লুক্কায়িত ধন-সম্পদও লাভ করে থাকেন।

জনৈক বুযুর্গব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা তিন জন লোক সফরে রওয়ানা হলাম। এই সফরের মধ্যে আমাদের একজন ঘুমিয়ে পড়লেন। আমরা দেখলাম, তাঁর নাক থেকে একটি রৌশনী বের হয়ে নিকটবর্তী একটি গর্তে চলে গেলো, তারপর ফিরে এসে আবার তাঁর নাকে প্রবেশ করলো। লোকটি চোখ মেলে উঠে বসলেন আর বললেন, আমি একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি, আমি দেখলাম ঐ গর্তে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। অতঃপর আমরা ঐ গর্তে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে ধন ভান্ডারের কিছু অংশ যা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তা পেয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নের মাধ্যমে যমযম কূপের অবস্থান বলে দেয়া হয়েছিলো। সেখান থেকে তিনি ধন-ভান্ডারও লাভ করেছিলেন।

এক সময় হযরত উমায়ের ইবনে ওহাব (রা)-কে স্বপ্নে বলা হয়েছিলো, আপনি আপনার ঘরের অমুক অমুক জায়গা খনন করুন, সেখানে আপনার পিতার পুঁতে রাখা ধনসম্পদ পাবেন। ইনতেকালের পূর্বে তাঁর পিতা যে ধনসম্পদ পুঁতে রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি অসিয়ত করে যাবার সুযোগ পাননি। হযরত উমায়ের (রা) এই স্বপ্ন দেখার পর ঐ জায়গা খুঁড়েন এবং সেখান থেকে দশ হাজার দিরহাম ও বিপুল পরিমাণ সোনা দানা পেয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধ

করেন ও তাঁর জীবন যাত্রার মানও উন্নত করেন। এটা ছিলো তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। যখন এই ধন সম্পদ পাওয়া গেলো, তখন তাঁর ছোট মেয়েটি তাঁকে বলেছিলো, "আব্বা, যে মা'বূদ আমাদেরকে দীনের বদৌলতে নবজীবন দান করেছেন, তিনি নিশ্চয় 'হুবল' ও 'উয্যা' দেবদেবীর থেকে উত্তম। কেননা মাত্র কিছু দিন থেকে আমরা তাঁর ইবাদত শুরু করেছি। আর তিনি আপনাকে এই বিপুল ধন-সম্পদের মালিক করে দিয়েছেন।"

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব কায়রাওয়ানী (র) যিনি একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন, তিনি বলেন, হযরত উমায়ের (রা)-এর স্বপ্নের উক্ত ঘটনাটি এতো আশ্চর্যজনক নয় যে এর চেয়েও বিস্ময়কর যে ঘটনা আমি নিজের জীবনে, নিজের শহরে, নিজের চোখে হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র)-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি। হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র) একজন নেককার বান্দা ছিলেন। তিনি মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখে তাঁদের কাছ থেকে গোপনীয় অনেক তথ্য জেনে নিতেন এবং এসব বিষয় তাঁদের পরিবার-পরিজন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি একজন পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাই দেশবিদেশে এ জন্যে তাঁর সুনাম ও পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। অনেক দূর থেকে কেউ এসে তাঁকে বলতো, আমার অমুক বন্ধু ইনতেকাল করেছেন, তাঁর কাছে ধনসম্পদ ছিলো কিন্তু তা কোথায় আছে তা তিনি মৃত্যুর পূর্বে কাউকে বলে যাবার সুযোগ পাননি। কোথায় সে সব ধনসম্পদ তিনি পুঁতে রেখেছিলেন তা আমরা জানি না। তিনি এরূপ কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ যদি চান তা অবশ্যই পাওয়া যাবে। তুমি আগামীকাল এসো। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং রাতে উল্লেখিত মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে তার কাছ থেকে সেই পুঁতে রাখা ধন-সম্পদের কথা জেনে নিতেন।

একবার একজন নেককার বৃদ্ধা মহিলা ইনতেকাল করলেন। তাঁর কাছে জনৈকা মহিলা সাতটি দীনার আমানত রেখেছিলেন। ঐ মহিলা কাঁদতে কাঁদতে হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র)-এর কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্তসহ তাঁর নাম ঠিকানা বলে বিদায় নিলেন। দ্বিতীয় দিন সেই মহিলা আবার তাঁর কাছে আসলেন। হযরত আবু আবদুল্লাহ (র) তাঁকে বললেন, "ঐ বৃদ্ধা স্বপ্নের মধ্যে আমাকে বলেছেন, তাঁর ঘরের ছাদে সাতটি বর্গা আছে, আর আপনার দীনারগুলো সপ্তম বর্গার মধ্যে রেশমী কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় আছে। সেখান থেকে দীনারগুলো আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাঁর দীনারগুলো সেখানে পেয়ে গেলেন।

হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র) আরো বলেন, আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত লোক একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। একজন মহিলা কোন এক ব্যক্তিকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন যেন সে তাঁর পুরাতন ঘরটি ভেঙ্গে সেখানে একটি নতুন ঘর তৈরি করে দেয়। শ্রমিকটি যখন ঘরটি ভাঙ্গতে লাগলো, তখন ঐ মহিলা

এবং তার পরিবারের অন্য কেউই ঘর থেকে বের হলো না। কাজের লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? ঐ মহিলা বললেন, এই ঘর ভেঙ্গে ফেলার কোন প্রয়োজন আমার ছিলো না। কিন্তু আমার আব্বা ইনতেকাল করেছেন, তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। অথচ তাঁর ইনতিকালের পর আমরা বিশেষ কোন ধন-সম্পদ পাইনি। তাই ভাবলাম, তাঁর ধন-সম্পদ হয়তো মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে। তাই ঘরটি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে এর মধ্যে কিছু ধন-সম্পদ পাওয়া যায়। তখন উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বললেন, এর চেয়ে সহজ অন্য একটি পন্থা আছে, যা তোমাকে বলতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ঘরের মালিক বললেন, সেটা কী? সে ব্যক্তি তখন বললেন, অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে ঘটনাটি ব্যক্ত করুন হয়তো তিনি আপনার পিতাকে স্বপ্নে দেখে তাঁর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে পারবেন। অযথা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় ছাড়াই আপনি আপনার পিতার ধন-সম্পদ পেয়ে যাবেন। তখন মহিলাটি সেই ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং তাঁর ও তাঁর পিতার নাম তাঁর কাছে বলে আসলেন। পরের দিন প্রত্যূষে তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি বললেন, আমি আপনার পিতাকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তাঁর কাছে মালামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, ঐ ধন-সম্পদ মিহরাবের মধ্যে পুঁতে রাখা আছে। পরে সেই মহিলা মিহরাবের মাটি খনন করে সেই মাল উদ্ধার করলেন। কিন্তু লোকেরা মালের পরিমাণ কম দেখে আশ্চর্য হলো। এ জন্য মহিলাটি আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন, আপনার নির্দেশিত স্থান থেকে মাল বের হয়েছে কিন্তু তা পরিমাণে খুবই সামান্য। তিনি বললেন, আপনি আবার আগামীকাল আমার কাছে আসুন। তার পরের দিন মহিলাটি তাঁর কাছে আবার গেলেন। তিনি তখন বললেন, আপনার পিতা যাইতুন তেলের গুদাম ঘরে যে চতুষ্কোণ একটি হাউজ রয়েছে, সেটার নিম্ন অংশ খনন করতে বলেছেন। মহিলাটি ঐ নির্দেশিত কামরাটি খুললেন এবং সেখানে একটি চতুষ্কোণ হাউজ দেখতে পেলেন। সেই জায়গাটি খুঁড়লে সেখানে একটি বড় পানপাত্র পাওয়া গেলো, কিন্তু এতেও মহিলাটির ধনের লিপসা মিটলো না। তাই তিনি আবার ঐ ব্যক্তির নিকট গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আগামী কাল আবার আসুন। মহিলাটি পরের দিন খুব ভোরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই ব্যক্তি তখন তাঁকে বললেন, আপনার পিতা বলেছেন, আপনার ভাগ্যে যা ছিলো তা আপনি পেয়ে গেছেন। আপনার পিতার অবশিষ্ট ধন-সম্পদের উপর জিনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেই সম্পদ যার ভাগ্যে আছে সেই পাবে।

এই প্রসঙ্গে আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। স্বপ্নের মাধ্যমেও অনেক রোগের ঔষধ বলে দেয়া হয়েছে। সেই ঔষধ ব্যবহার করে আল্লাহর মেহেরবানীতে রোগীরাও আরোগ্য লাভ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু ইমাম তাইমিয়া (র)-এর ভক্ত ছিলেন না এমন কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে ফারায়েয সংক্রান্ত

কিছু জটিল মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেছিলেন। শাইখ সেসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন।

আসলে এসব ঘটনা ঐসব লোকেরাই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে, যাদের রূহ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়।*

---

* মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর পর মানুষ পার্থিব দেহে আর ফিরে আসে না। তবে হাশরের দিন সকল মানুষ সশরীরে উত্থিত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মুমিনূন ঃ আয়াত ১৫, ১৬)

কিন্তু মৃত ব্যক্তির রূহ তার জীবিতকালের দেহের আকৃতি ধারণ করে জীবিতদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী ছাড়াও রূহের এরূপ আরো অনেক ঘটনা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

এই সম্পর্কে শাহ্ উল্লাহ দেহলভী (র) এর সম্মানিত পিতা মাওলানা আবদুর রহীম (র) এর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

মাওলানা আবদুর রহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার আকবরবাদে তাঁর উস্তাদ মির্যা মুহাম্মদ যাহিদের কাছ থেকে ঐদিনের পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে শেখ সাদী (র)-এর এই চরণগুলো খুব আনন্দের সাথে আবৃত্তি করছিলেন–

জুয ইয়াদে দোস্ত হারছে কুনী উমর যায়ে আস্ত,
জুয সির্রে ইশক হারছে বখানী বতালাত আস্ত।
সাদী বশো লাওহে দেল আয নকশে গায়রে হক,

অর্থ ঃ বন্ধুর (আল্লাহর) স্মরণ ছাড়া অন্য যা কিছু করো, তাতে তোমার জীবন বিফল। প্রেমের রহস্য ভিন্ন যা পাঠ করো তা' ধ্বংসশীল। হে সাদী! তোমার দেলের উপরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের যে নকশার চাপ পড়েছে, তা ধুয়ে ফেলো। কিন্তু কবিতাটির শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পঙ্ক্তিটি তাঁর স্মরণ হচ্ছিলো না। এতে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর সামনে এক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ লোক উপস্থিত হলেন এবং ঐ কবিতার চতুর্থ পংক্তিটি তাঁকে বলে দিলেন। পঙ্ক্তিটি হলো– "ইলমে কে রাহ বহক্ক নানুমায়েদ জেহালাত আস্ত।" অর্থাৎ যে বিদ্যা সত্যের সন্ধান দেয় না, তা অধিক মূর্খতাই বৃদ্ধি করে।

এই চতুর্থ পঙ্ক্তিটি জানতে পারায় তিনি খুব উৎফুল্ল বোধ করলেন এবং ঐ লোকটিকে বললেন, "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, আপনি আমার মনের অস্বস্তি দূর করে দিয়েছেন।"... এরপর আগন্তুক তাঁকে বললেন, "আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।" তিনি বললেন, "চলুন।" এরপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগলেন। মাওলানা আবদুর রহীম (র) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব! আপনার পরিচয়?" তিনি বললেন, "আমি শেখ সাদী"। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (তথ্যসূত্র : আনফাসুল আরেফীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী র.।) –অনুবাদক

চতুর্থ অধ্যায়

রূহের, না কেবল দেহের মৃত্যু হয়

এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে রূহ মৃত্যুবরণ করে। কেননা, রূহও একটি প্রাণী এবং প্রাণী মাত্রই মরণশীল। যাঁরা রূহকে মরণশীল মনে করেন- তাঁদের কাছে এই সম্পর্কে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাঁরা বলেন, আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর কোন কিছুই চিরঞ্জীব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, স্থায়ী হচ্ছে কেবল আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" (সূরা আর রাহমান ঃ আয়াত ২৬-২৭)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।" (সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৮৮)

তাঁরা বলেন, যখন ফেরেশতাগণও মরণশীল, তখন মানবাত্মার মৃত্যু হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁরা আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের যে উক্তি উল্লেখ করেছেন তা হলো, "হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যুদান করেছো, আর দু'বার জীবন দান করেছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন মুক্তির কোন পথ আছে কি?" (সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত- ১১)

উক্ত দু'রকমের মৃত্যুর মধ্যে প্রথমবার মুত্যু হলো দেহের, আর দ্বিতীয়বার মৃত্যু হলো রূহের।

আবার কারো মতে রূহের কোন মৃত্যু নেই। কেননা, রূহকে জীবিত থাকার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং দেহেরই কেবল মৃত্যু হয়। পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় দেহে ফিরে না আসা পর্যন্ত শান্তি বা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কাজেই রূহ যদি মরেই যায় তাহলে শান্তি বা শাস্তি ভোগ করার অবকাশ কোথায়?

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা

আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯-১৭১)

উপরোক্ত মত পার্থক্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যদি রূহের মৃত্যু বলতে দেহ থেকে তাদের পৃথক হওয়াকে বুঝায় তাহলে অবশ্যই রূহ মৃত্যুবরণ করে। আর যদি এর অর্থ এই হয় যে, এরাও দেহের মতো সব সময়ের জন্য হারিয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে রূহ মৃত্যুবরণ করে না। বরং জন্মের পর থেকে চিরকাল বিদ্যমান থাকে, শান্তির মধ্যে থাকুক বা অশান্তির মধ্যে থাকুক। স্পষ্ট দলীল দ্বারা জানা যায় যে, রূহ আলমে বরযখে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করতে থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হাশরের দিন পুনরায় দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।

আহমদ ইবনে কুনদী (র) এই মত পার্থক্যকে একটি কবিতার মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এর মর্মার্থ হলো, "মানুষের মধ্যে এতো বেশি মত পার্থক্য রয়েছে যে, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতেই তাদের কোন মতৈক্য হয় না, এমনকি মৃত্যুর মধ্যেও তাদের মতবিরোধ থেকে যায়। কেউ কেউ বলেন, মানুষের রূহ অক্ষয় হয়ে থাকবে, আবার কেউ কেউ বলেন, রূহেরও মৃত্যু হবে।"

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে আকাশ ও যমীনের বাসিন্দারা সব বেহুঁশ হয়ে যাবে, তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ হিফাযত করার ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা আয যুমার ঃ আয়াত-৬৮)

কারো কারো মতে যাঁদের মৃত্যু নেই তাঁরা হচ্ছেন মহান শহীদগণ। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রা) প্রমুখ এই অভিমত পোষণ করতেন। কারো কারো মতে তাঁরা হচ্ছেন বেহেশতের আয়ত-নয়না হুর, সিজ্জীনে শাস্তি ভোগকারী লোক সকল এবং জাহান্নামের প্রহরীগণ। হযরত আবু ইসহাক (র) প্রমুখ শেষোক্ত অভিমতটি পোষণ করতেন।

ইমাম আহমদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন হুর ও গেলমান মরবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "প্রথম মৃত্যুর পর তারা আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আপনার প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।" (সূরা দুখান ঃ আয়াত-৫৬)

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, হুর গেলমান মাত্র একবারই মৃত্যুবরণ করবে। তারা যদি আবার মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদের দু'বার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এখন আসছে জাহান্নামীদের কথা। তারা বলবে, "হে রব তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দান করেছো আর দু'বার জীবন দান করেছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন মুক্তির কোন পথ আছে কি? (সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত-১১)

এর ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে, "তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তারপর তোমাদেরকে আল্লাহ জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় জীবন দান করবেন, পরিণামে তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৮)

অর্থাৎ তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ও মায়ের গর্ভে শুক্রের আকারে অস্তিত্বহীন ছিলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করলেন। তারপর মৃত্যু দান করে পুনরায় কিয়ামতের দিন নবজীবন দান করবেন। এই আয়াতের দ্বারা কিয়ামতের পূর্বে শিঙ্গার ফুঁ এর দ্বারা রূহকে মৃত্যু দান করা বুঝায় না। অন্যথায় তিনবার মৃত্যুর সমস্যা দেখা দেবে। শিঙ্গায় ফুঁ এর কালে রূহের চৈতন্য হারিয়ে ফেলার অর্থ মৃত্যু নয়, বরং বেহুঁশ হওয়া।

একটি সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর সর্বপ্রথম আমার হুঁশ আসবে, তখন আমি হযরত মূসা (আ)-কে আরশের পায়া ধরা অবস্থায় দেখতে পাবো। জানি না, তিনি আমার আগে চৈতন্য ফিরে পাবেন, না তূর পাহাড়ে বেহুঁশীর বিনিময়ে তিনি এখানে বেহুঁশই হবেন না।

হাশরের ময়দানে এভাবে মানুষ চেতনা ফিরে পাবার পর যখন আল্লাহ তা'আলা বিচারের জন্য আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর নূরের তাজাল্লিতে হাশরের ময়দান ঝলমল করে উঠবে, তখন আবার সবাই চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তাদেরকে উপেক্ষা করে চলো সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পড়বে" (সূরা আত্তূর ঃ আয়াত-৪৫)

কাজেই এই বেহুঁশী বলতে যদি মৃত্যুকে বুঝায়, তাহলে পুনরায় মৃত্যুবরণ জরুরী হয়ে পড়ে আর এর দ্বারা দু'বার মৃত্যু হওয়া বুঝায়।

উক্ত বিষয়টির প্রতি কোন কোন বিজ্ঞ আলিমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী (র)। তাঁর মতে, এই হাদীসে চৈতন্য

হারানোর বাহ্যিক অর্থ হলো বেহুঁশ বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মৃত্যু নয়। শাইখ আহমদ ইবনে আমর (র) বলেন, দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ এর পর লোকেরা বেহুঁশ হয়ে যাবে এটাই এর বাহ্যিক অর্থ। এ সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেছেন, নবীদের মধ্যে সম্ভবত হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যুই হয়নি, কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কাযী আয়ায (র)-এর মতে, এই চৈতন্য হারানোর অর্থ কবর থেকে উঠার পর কিয়ামতের মাঠে দাঁড়ানোর ভয়-ভীতিজনিত চেতনাহীনতা, যেহেতু তখন আসমান ও যমীন বিদীর্ণ হতে থাকবে। কিন্তু হযরত কুরতুবী (র) বলেন, কাযী আয়ায (র)-এর এই উক্তি ভ্রান্ত। কেননা হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রওযা থেকে বের হবেন, তখন তিনি হযরত মূসা (আ)-কে আরশের পায়া ধরা অবস্থায় দেখতে পাবেন। আর শিঙ্গায় ভয়ঙ্কর আওয়াযে এই ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে, শাইখ আহমদ ইবনে আমর (র) বলেছেন, মৃত্যুই মানুষের শেষ অবস্থা নয়, বরং স্থান পরিবর্তন মাত্র।

উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলে ইনশাআল্লাহ এরূপ জটিলতার অবসান ঘটবে। প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, হত্যাজনিত মৃত্যুর পরও শহীদগণ জীবিত থাকেন, পানাহার করেন, আল্লাহর নি'আমতসমূহ উপভোগ করেন, দুনিয়াবাসী আত্মীয়-স্বজনের জন্যও সন্তোষ প্রকাশ করেন। সুতরাং বরযখে অবস্থানকারী শহীদগণের অবস্থাই যখন এমন, তাহলে নবীগণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, "নবীদের দেহ মুবারক বিনষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা প্রমাণিত আছে যে, তিনি শবে মি'রাজের সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কিরামের এক সমাবেশে যোগদান করেছিলেন এবং আসমানেও নবীদের সাথে বিশেষ করে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, কোন মুসলমান যখন আমাকে আমার ওফাত শরীফের পর সালাম করে তখন তার সালামের উত্তর দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে আমার মধ্যে ফিরিয়ে দেন। এই সব বর্ণনা মতে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম বরযখী জীবনে জীবিত আছেন। এই অবস্থায় যখন হযরত ইসরাফীল (আ) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন আসমান যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, কেবল তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ পূর্বের অবস্থায় স্থির রাখবেন। কাজেই নবীগণ ছাড়া অন্যদের বেহুঁশীর অর্থ হবে মৃত্যু, আর নবীগণ

হবেন শুধু বেহুঁশ। তারপর যখন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠবে, আর আম্বিয়াদের হুঁশ ফিরে আসবে। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ করেছেন, "সবার আগে আমার চৈতন্য ফিরে আসবে, কাজেই হযরত মূসা (আ) ছাড়া অন্য সবার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে এই কারণে যে, এটা মূসা (আ)-এর এক বিরাট ফযীলত। কিন্তু এরূপ কোন একটি ফযীলতের ঘটনার দ্বারা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে তাঁর ফযীলত যে অধিক এটা প্রমাণিত হয় না। কেননা কারো আংশিক ফযীলতের কোন একটি ঘটনা দ্বারা তাঁর সামগ্রিক মর্যাদা ও ফযীলতের কোন বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লামা কুরতুবী (র)-এর অভিমত এই যে, যদি এই হাদীসটির দ্বারা ময়দানে হাশরে মৃত্যুকে বেহুঁশী অর্থে ধরা হয়, তাহলে এ সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় না। তবে এর দ্বারা যদি শিঙ্গার ফুঁজনিত মৃত্যু বুঝায়, তাহলে কিয়ামতের অর্থ এখানে কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গায় ফুঁ-এর মাধ্যমেই কিয়ামতের সূচনা হবে। তাহলে এই হাদীসটির অর্থ হবে এই যে, মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হওয়ার জন্য যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সবার আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র শির উঠাবেন। অর্থাৎ রওযা শরীফ থেকে তিনি বের হবেন। আর সে সময় তিনি মূসা (আ)-কে আরশের পায়া ধরা অবস্থায় দেখতে পাবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, "আমি জানি না, তিনি আমার পূর্বে চেতনা ফিরে পাবেন, না কূহে তূরে চেতনা হারানোর ফলে তাঁকে এখানে এ মর্যাদা দেয়া হবে।" আল্লামা কুরতুবী (র) আরো বলেন, হযরত মূসা (আ) বেহুঁশ হবেন কি হবেন না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। তিনি এও বলেছেন, "সবার আগে আমার হুঁশ ফিরে আসবে।" এখানে যদি হাদীসের দ্বারা মৃত্যুর বেহুঁশী বুঝাতো, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্বাস এহং হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতো। কিন্তু এরূপ ধারণা বহু দলীলের মাধ্যমে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই জানা গেলো যে, এখানে বেহুঁশী অর্থ মৃত্যু নয়, বরং নিছক সম্বিত হারানো মাত্র। উক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুজনিত শিঙ্গায় ফুঁয়ে রূহ মরে যাবে। তবে এটা অবশ্য বুঝা যায় যে, সমস্ত জীবিত মাখলূকই মরে যাবে। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন কিংবা

যাঁদের মৃত্যু নেই, হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তারা পুনর্বার মৃত্যুবরণ করবে না।

এটা যদি বলা হয়, হাদীসের এসব শব্দের কি অর্থ হবে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, তারপর সর্বপ্রথম মাটি ফেটে যাবে। এরপর আমি মূসা (আ)-কে আরশের পায়া জড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাবো, জানিনা, মূসা (আ) আমার পূর্বে চেতনা ফিরে পাবেন, না তিনি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অন্যতম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।" এটা সুস্পষ্ট যে, যাঁরা অব্যাহতি পাবেন, তাঁরা তা পাবে মৃত্যুজনিত বেহুঁশী থেকে, কিয়ামতের দিনের বেহুঁশী থেকে নয়। এখানে মৃত্যুজনিত বেহুঁশীই উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে যার ফলে আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তাঁরা ব্যতীত, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিফাযত করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবেন। রাব্বুল আলামীনের নূরে হাশরের ময়দান আলোকিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে হাযির করা হবে এবং সবার মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৬৮-৭০)

কোন কোন হাদীসের দ্বারা হাশরের ময়দানে কে আগে চৈতন্য ফিরে পাবেন, এ সম্পর্কে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর বিস্মৃতিজনিত কারণে দু'টি হাদীসের বাক্য একত্রিত করে ফেলেছেন। হাদীসগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

এক– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, সবার আগে আমার হুঁশ আসবে।

দুই– আমি প্রথম ব্যক্তি যাঁর জন্য কিয়ামতের দিন মাটি ফেটে যাবে। এছাড়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীস তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সর্দার হবো, এজন্য আমার গর্ব নেই। আর আমার হাতে 'হামদ' নামক ঝাণ্ডা শোভা পাবে, এজন্যও আমার কোন গর্ব নেই। আর ঐ দিন সকল নবী আমার ঝাণ্ডার নিচে অবস্থান করবেন। আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যাঁর

উপর থেকে মাটি ফেটে যাবে, সেজন্যও আমার কোন গর্ব নেই।" সুতরাং হাদীস বর্ণনাকারী যে উভয় হাদীসকে একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত হাদীসের অর্থ আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো? হযরত মূসা (আ), নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে হুঁশে আসবেন, নাকি তিনি ওদের মধ্যে হবেন যাঁদেরকে আল্লাহ বেহুঁশী থেকে ব্যতিক্রম রেখেছেন, ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁজনিত বেহুঁশী থেকে তিনি ব্যতিক্রম হবেন, ময়দানে হাশরের বেহুঁশী থেকে নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, এতে আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা বেহুঁশ হয়ে যাবে, কিন্তু তারাই রক্ষা পাবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চান।" এর উত্তর হলো, হাদীসের শব্দগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত নয়, তা কোন বর্ণনাকারীর কল্পনাপ্রসূত মাত্র। যে শব্দগুলো সহীহ্ রেওয়ায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐগুলোই সংরক্ষিত। আর তা হলো, "এটা জানা নেই, হযরত মূসা (আ) আমার আগে হুঁশে আসবেন, নাকি তূর পর্বতের বেহুঁশীর পরিবর্তে তিনি আর বেহুঁশই হবেন না।" কিন্তু কোন কোন বর্ণনাকারী মনে করেন যে, এখানে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁজনিত বেহুঁশীকেই বুঝানো হয়েছে। আর হযরত মূসা (আ)-এর মধ্যে শামিল আছেন যদিও তিনি বেহুঁশ হননি। তবে এ রকম অর্থ হাদীসের ধারাবাহিকতার সরাসরি বিরোধী। কারণ, হুঁশ বলতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের হুঁশে আসাকেই বুঝায়। সেক্ষেত্রে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী– "জানা যায় না তাঁর আগে মূসা (আ) হুঁশে আসবেন, নাকি কূহে তূরের বেহুঁশীর পরিবর্তে তিনি এ সময় আর বেহুঁশই হবেন না" ভ্রান্ত হয়ে যায়। এটা একটি বিশেষ চিন্তা-ভাবনার বিষয় বটে। তাই চিন্তা-ভাবনা করেই কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত। এছাড়া, এখানে আলোচিত বিষয়টি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করাও প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন রূহ কিভাবে চেনা যায়

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহকে কি চেনা যায়? রূহের কি পরস্পর পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়? দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ কি কোন বিশেষ আকৃতি ধারণ করে? এসব বিষয় সম্পর্কে সম্ভবত আগে কেউ কোন আলোকপাত করেননি। এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে কোন কিছু উল্লেখ নেই। তবে কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধারণা অনুযায়ী রূহ কোন বস্তু বা পদার্থ নয়। এছাড়া, রূহের অবস্থান দুনিয়ার মধ্যে অথবা দুনিয়ার বাইরে নেই। রূহের কোন আকৃতি বা আকারও নেই যাঁরা রূহকে বিবর্তনশীল বলে মনে করেন, তাঁদেরও এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। কেউ কেউ মনে করেন, রূহের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য বা বৈষম্য বিদ্যমান নেই। তাই মৃত্যুর পর রূহের মধ্যে কোন তারতম্য থাকে না, বরং অপরাপর পরমূর্তের ন্যায় রূহের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। অবশ্য আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী রূহ একটি স্বতন্ত্র সত্তা। রূহ আসা যাওয়া ও উঠানামা করে, একত্রিত হয় এবং পৃথকও হয়, ভেতরে ও বাইরে আসা যাওয়া করে। এভাবেই রূহের স্থিরতা ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। এটাই আহলে সুন্নাতের অভিমত। এই বিষয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীস, কিয়াস ও ইজতিহাদের দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থকারের বৃহৎ গ্রন্থ 'মাআরেফাতুর রূহ ওয়ান্নাফস' এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি অনেক দলীল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, রূহ ইহজগত ও পরজগতের সর্বত্র বিচরণ করে, রূহকে কবয করে উঠিয়ে নেয়া হয়। রূহ নিজের আবাসের দিকেও প্রত্যাবর্তন করে। এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় ও বন্ধ করে দেয়া হয়। রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যদি আপনি দেখতেন, যালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশতারা তাদের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত করে বলবে, হে রূহেরা বেরিয়ে এসো। কারণ, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলতে ও তাঁর আয়াত সম্পর্কে অহঙ্কার করতে।

অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।" (সূরা আল-আন'আম ঃ আয়াত-৯৩)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সেই সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে। (তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট)। কাজেই আমার বান্দাদের মধ্যে দাখিল হও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ করো।" (সূরা আল ফাজর ঃ আয়াত-২৭-৩০)

রূহকে যখন দেহ থেকে পৃথক করা হয়, তখনই উপরোক্ত কথাগুলো বলা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "রূহের ও রূহের সুবিন্যস্তকারীর শপথ, যিনি তাকে তার ভালো-মন্দ জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সূরা আশ-শামস ঃ আয়াত-৭-১০)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, তিনি দেহের ন্যায় রূহকেও সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। "হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের রূহকে সুবিন্যস্ত করেছেন যেরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন দেহকে। দেহকে এজন্য সুঠাম ও সুন্দর করেছেন, যাতে তা রূহের ছাঁচে গঠিত হয়। দেহকে সুঠাম করা আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং আসল উদ্দেশ্য হলো, দেহকে একটি সুন্দর আধারে পরিণত করা। কেননা, দেহ হচ্ছে রূহের আবাসস্থল।

অতএব জানা গেলো, রূহের আকার ও আকৃতি আছে এবং তা দেহের সাথে মিশে এমন এক রূপ ধারণ করে, যাতে মানুষ একে অপর থেকে এক একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। কেননা, দেহের ন্যায় রূহও প্রভাবিত হয়। দেহের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণে রূহও পবিত্র বা অপবিত্র হয়ে যায়। কাজেই দেহ ও রূহের মধ্যে ঐরূপ যোগসূত্র ও সমন্বয় বজায় থাকে, যেরূপ সম্পর্ক অন্য কোন দুটি পার্থিব বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। এজন্যই দেহ থেকে রূহের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বলা হয়, "হে পবিত্র রূহ! যে পবিত্র দেহে রয়েছো আর হে অপবিত্র রূহ যে অপবিত্র দেহে রয়েছো, সেখান থেকে বেরিয়ে এসো।" পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ মানুষের রূহগুলোকে মৃত্যু দান করেন তাদের মৃত্যুর সময়, আর যারা মৃত্যুবরণ করে না তাদের নিদ্রার সময়, আর যার মৃত্যুর

নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে আটকে রাখেন এবং অন্যগুলোকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

রূহ সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে, তাদেরকে উপরে উঠানো হয়, আটক রাখা হয় এবং ছেড়ে দেয়া হয়। রূহ বিভিন্ন স্থানে আসা-যাওয়া করতে পারে এবং তাদেরকে সমন্বিতও করা হয়। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রূহকে কবয করার পর রূহ যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তা দেখতে থাকে।" তিনি আরো বলেছেন, মালাকুল মউত রূহ কবয করেন, অতঃপর অন্যান্য ফেরেশতারা তাঁর হাত থেকে সেটাকে নিয়ে যান। সে রূহ নেককার বান্দাদের হলে, মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধ বেরিয়ে আসে আর বদকার বান্দার রূহ হলে, পচা গলা লাশের চেয়েও বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, পরমূর্ত বা ছায়াতুল্য বস্তু থেকে কোন গন্ধ বের হয় না, একে আটকেও রাখা যায় না। আর তাকে হস্তান্তরও করা যায় না। তাই রূহকে কোন পরমূর্ত বস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় না।

পবিত্র হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, নেক রূহ যখন আসমানের দিকে উঠতে থাকে, তখন আসমান ও যমীনের সকল ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করেন, তাঁর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। অতঃপর সে রূহ এক আসমান থেকে অন্য আসমানে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ আসমানে গিয়ে পৌঁছে যেখানে আল্লাহ তা'আলার আরশ রয়েছে। এরপর ঐ রূহকে আল্লাহর মহান দরবারে হাজির করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন, এর নাম ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনবাসীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হোক। অতঃপর মুমিনের রূহ সসম্মানে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর কাফিরের রূহ তাচ্ছিল্যের সাথে নিচের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয়। অতঃপর সেসব রূহকে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে তাদের দেহে প্রবেশ করানো হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের রূহ পাখির ন্যায় বেহেশতের গাছপালা থেকে ফল-ফলাদি খেতে থাকে, যতোক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা সেই রূহকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে নেন।" হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, শহীদগণের রূহ সবুজ রং-এর পাখিদের গলায় ঝুলন্ত থলেতে অবস্থান করে, এরা বেহেশতের নহরসমূহের উপর দিয়ে উড়াউড়ি করে এবং বেহেশতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে। আর বরযখী জীবনে রূহকে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি অথবা শান্তি প্রদান করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের কাওমের সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, "তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরাউনের কাওমকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।" (সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত-৪৫-৪৬)

অপরপক্ষে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শহীদদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯-১৭১)

উপরে বর্ণিত জীবনকাল বলতে রূহানী জীবনকেই বুঝায়, আর তাঁরা সেখানে সবসময় জীবিকা পাচ্ছেন। কারণ, তাঁদের দেহ তো কবেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জীবনের এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাঁদের রূহ সবুজ রং-এর পাখির পক্ষপুটের মধ্যে থাকে। আর তাঁদের জন্য আরশের নিচে ঝাড়বাতি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা বেহেশতের মধ্যে ঘুরাফেরা করেন, আর ঐসব প্রদীপে অবস্থান করেন। তখন তাঁদের রব তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের আর কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তাঁরা উত্তরে বলেন, আমরা তো বেহেশতে যথা ইচ্ছা বিচরণ করছি, এরপর আমাদের আর কি চাওয়ার আছে? আল্লাহ তা'আলা এভাবে তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করবেন। শহীদগণের এসব রূহ যখন বুঝবে উত্তর না দিয়ে রক্ষা নেই, তখন তাঁরা বলবে, আমাদের দেহে আমাদের রূহকে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করতে পারি, এটাই আমাদের বাসনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ পাখিদের মধ্যে অবস্থান করে এবং বেহেশতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে তোমাদের ভাইগণ শহীদ হলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের রূহ ঐ সমস্ত পাখিদের পক্ষপুটে রেখে দিলেন, যারা বেহেশতের নহরসমূহের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, বেহেশতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে আর আরমের ছায়ায় সোনার ঝাড়বাতিসমূহের মধ্যে অবস্থান করে। এরপর

তাঁরা যখন নিজেদের উত্তম সুস্বাদু খাবার ও পানীয় এবং আরাম আয়েশের মনোরম মহলসমূহ দেখবেন তখন তাঁরা বলে উঠবেন, হায়! যদি আমাদের ভাইয়েরা জানতে পারতো এসব নি'আমতের কথা, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন তাহলে তারা জিহাদের প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত হতো আর যুদ্ধ থেকে পিছপা হতো না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলে দিয়েছেন, "আমি তোমাদের খবর তোমাদের ভাইদের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছি।"

সুতরাং, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের প্রতি আয়াত নাযিল করলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯-১৭১) ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রূহের পানাহার, চলাফেরা ও পরস্পর কথাবার্তা বলা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। যখন রূহের মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা দেহের চেয়ে অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে। দেহের মধ্যে অনেক সময় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু রূহের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই।

মহান আম্বিয়া, সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত ইমামগণের দেহ মুবারক স্বচক্ষে দেখার আমাদের সৌভাগ্য হয়নি, অথচ তাঁরা আমাদের চেতনার মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই অনুপম বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র দেহের ফলশ্রুতিতে নয়, এটা হচ্ছে, তাঁদের রূহানী গুণাবলীর সুফল। গুণের দিক দিয়ে দেহের চেয়ে রূহের বৈশিষ্ট্য অধিক। একজন মুমিন ও একজন কাফিরের দেহ অনেক ব্যাপারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তাদের রূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। দু'সহোদর ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাদের রূহের মধ্যে অধিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যখন এই দু'টি রূহ তাদের দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন এদের উভয়ের পারস্পরিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। দেহ ও রূহের অবস্থার উপর লক্ষ্য করলে তা স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। কুৎসিত আকৃতির দেহ তারই সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতির রূহের বাহক হয়ে

থাকে। যদি দেহের মধ্যে কোন বিপদাপদ দেখা দেয়, তাহলে তারই অনুকূল বিপদাপদ রূহের মধ্যেও দেখা দেয়। এই কারণেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেহের আকৃতি ও অবস্থাদৃষ্টে রূহের অবস্থা জেনে নেন। এ সম্পর্কীয় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণত মোহনীয় ও সুন্দর আকৃতির দেহের সাথে যে রূহ সংশ্লিষ্ট আছে, সেই রূহও সুন্দর, সুশ্রী ও পূতপবিত্র হয়ে থাকে। শর্ত এই যে, সেই দেহ ও রূহের মধ্যে যেন কোন গরমিল না থাকে। যখন কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রূহ ও নিম্নপর্যায়ের রূহ দেহ ছাড়াই পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তখন দেহধারী রূহ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিক দাবীদার বটে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা দেহধারী না হওয়া সত্ত্বেও একে অপর থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জিনেরাও একে অপর থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। তাহলে মানুষের রূহ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে না কেন? বরং পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবরে মুনকার-নাকীরের সওয়াল জওয়াবের সময়ে মৃত ব্যক্তির রূহ কিভাবে দেহে ফিরিয়ে আনা হয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আর রূহ দেহে ফিরে আসার বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এখানে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমি 'বাকী গারকাদ' নামক গোরস্থানে এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং বসে পড়লেন। আমি তাঁর পাশে চুপচাপ বসে রইলাম। মৃত ব্যক্তির জন্য লাহাদ ধরনের কবর খনন করা হচ্ছিলো। তিনি তিনবার কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইলেন। তারপর তিনি বললেন, নেককার বান্দা যখন দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতে প্রবেশ করতে থাকে, আর দুনিয়ায় তার শেষ নিঃশ্বাসের সময় উপস্থিত হয়, তখন তার নিকট সূর্যের মতো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করেন। তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত ফেরেশতার সমাগম ঘটে। মালাকুল মউত এসে তার শিয়রের দিকে বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো। তখন সেই রূহ এরূপ সহজভাবে দেহ থেকে বের হয়ে আসে যেরূপ মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। তারপর মউতের ফেরেশতা সেই রূহকে নিয়ে যান। তারপর ফেরেশতারা সেই রূহকে গ্রহণ করেন। এরপর অন্যান্য ফেরেশতারা এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাঁর হাত থেকে সেই রূহকে নিয়ে যান। তারপর ফেরেশতারা সেই রূহকে খুশবুযুক্ত জান্নাতী কাফনে জড়িয়ে নেন। তখন ঐ রূহ থেকে মেশকের চেয়েও অধিক খুশবু ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ফেরেশতারা ঐ রূহকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। আর এঁরা ফেরেশতাদের যেসব জামাআতের নিকট দিয়ে যেতে থাকেন, তাঁরাই জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রূহটি কার? সেই রূহের বহনকারী ফেরেশতারা যার রূহ তার ভালো নামটি উল্লেখ করে বলেন, এই রূহটি অমুকের পুত্র অমুকের। এভাবে ঐ রূহকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে নিয়ে যান এবং ঐ রূহের জন্য দরজা খুলে দিতে বলা হয়। দরজা খুলে দেয়া হলে ঐ আকাশের সকল

আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা ঐ রূহকে দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। এমনিভাবে ঐ আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যান যেই আকাশটি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার কিতাব অর্থাৎ আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রেখে দাও। আর তার রূহকে যমীনের দিকে পাঠিয়ে দাও। কেননা, আমি মাটি দ্বারাই একে পয়দা করেছি, আর মাটির মধ্যেই ওকে ফিরিয়ে আনবো, দ্বিতীয়বার মাটি থেকে একে পয়দা করবো।" তারপর মৃত ব্যক্তির রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

উক্ত মৃত ব্যক্তির কবরে দু'জন ফেরেশতা এসে তাঁকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, আপনার রব কে ? তিনি জবাব দেন, আমার রব আল্লাহ। এরপর প্রশ্ন করা হয়, আপনার দ্বীন কি ? তিনি উত্তর দেন, আমার দ্বীন ইসলাম। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনাদের হিদায়াতের জন্য যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তিনি কে ? তিনি জবাব দেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। পুনরায় প্রশ্ন করা হয়। তিনি যে আল্লাহর রাসূল, তা কিভাবে জানলেন ? তিনি জবাব দেন, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং এর প্রতি ঈমান এনেছি আর এটার সত্যতার স্বীকৃতিও দিয়েছি। এভাবে রাসূলের রিসালাতের কথা আমি জানতে পেরেছি। অতঃপর আসমান থেকে আওয়ায আসে, আমার বান্দা সত্যি কথা বলেছে। তার নিচে জান্নাতের শয্যা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের দরজা তার জন্য খুলে দাও। তখন তার কবরের মধ্যে বেহেশতের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। এরপর তার কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তখন তার নিকট অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরিহিত একজন লোক এসে বলেন, একটি আনন্দদায়ক সংবাদ শুনুন, আজকের এই দিনটি সম্পর্কে আপনার সাথে দুনিয়ায় ওয়াদা করা হয়েছিলো। মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে ? আপনার চেহারায় শুভ সংবাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আগন্তুক ব্যক্তি উত্তর দেন যে, আমি আপনার নেক আমল। এই কথা শুনে মৃত ব্যক্তি দু'আ করেন, হে আমার রব, তুমি কিয়ামত কায়িম করো। তাহলে আমি আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পারবো।

এমনিভাবে কোন কাফির যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় ও আখিরাতে প্রবেশ করে, তখন ভয়ানক কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা আকাশ থেকে অবতরণ করে তার নিকট আসেন। ফেরেশতাদের হাতে একটি নেকড়া থাকে তাঁরা ঐ কাফিরের দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকেন। তারপর মালাকুল মউত এসে ওর শিয়রে বসে বলেন, হে অপবিত্র রূহ, আল্লাহর ক্রোধ ও গদ যবের দিকে বেরিয়ে এসো। কিন্তু তার রূহ বের না হয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এই অবস্থায়

মালাকুল মউত ঐ রূহকে এমনিভাবে টান দেন, যেভাবে ভিজা তুলা বা পশমের ভেতর থেকে কোন কাঁটাযুক্ত লৌহ্ শলাকা টান দিলে যে নাযূক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেভাবে তার রূহকে বের করে ধরে আনেন। কিন্তু ফেরেশতারা এক মুহূর্তের জন্য ঐ রূহকে মালাকুল মউতের হাতে থাকতে দেননা, তাঁর থেকে ঐ রূহকে নিয়ে নেকড়ার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেন। ঐ রূহ থেকে খুব বেশি পচা গলা লাশের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তারপর ফেরেশতারা ঐ রূহকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। ফেরেশতাদের যে কোন জামায়াতের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র রূহ কার ? ফেরেশতারা তখন তার দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট নামটি উল্লেখ করে বলেন, এই রূহ অমুকের পুত্র অমুকের। তাঁরা এই রূহকে নিয়ে প্রথম আকাশে গিয়ে পৌছেন এবং দরজা খোলতে বলেন, কিন্তু দরজা খোলা হয় না। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পড়ে শুনালেন। "যাঁরা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহঙ্কারবশতঃ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আসমানের ফটকগুলো খোলা হবেনা এবং তারা বেহেশতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যেই পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্রপথে প্রবেশ করবে। (এটা একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই কাফিরদের বেহেশতে যাওয়াও অসম্ভব।) এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা এবং জাহান্নামের আগুনই হবে উপরের আচ্ছাদন। আমি এমনিভাবে যালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকি।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত ৪০-৪১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "এর আমলনামা সিজ্জীনের সবচেয়ে নিচু যমীনে নিয়ে যাও। তারপর তার রূহকে ওর উপরেই ছুঁড়ে মারা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজিদের এই আয়াত পাঠ করলেন, "যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো, অতঃপর একে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো কিংবা বাতাস ওকে দূরে উড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৩১)

এই অবস্থায় ঐ রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর দু'জন ফেরেশতা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে ? সে জবাব দেয়, হায় হায়! আমার জানা নেই। এরপর জিজ্ঞেস করা হয়, ইনি কে ? যাঁকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সে জবাব দেয়, হায় হায় আমি তাঁকে চিনি না। তারপর আকাশ থেকে আওয়ায আসে, আমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী। ওর নিচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। আর জাহান্নামের জানালা খুলে দাও। এরপর তার কবরে

জাহান্নামের প্রচণ্ড গরম ও দুর্গন্ধ আসতে আরম্ভ করে। তাকে তারা এমনভাবে চাপ দেয় যে, এদিকের হাড়-গোড় ওদিকে, ওদিকের হাড়-গোড় এদিকে বের হয়ে যায়। তারপর তার নিকট কুৎসিত আকৃতির ও দুর্গন্ধযুক্ত বিশ্রী পোশাক পরা একজন লোক এসে বলে, তুমি একটি দুঃসংবাদ শোন! আজকের দিনটি ঐদিন, তোমার সাথে যেই দিনটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিলো। সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে ? তোমার চেহারা থেকে অশুভ লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে জবাব দেয়, আমি হলাম তোমার বদ আমল। তারপর সেই ব্যক্তি দুআ করে, আল্লাহ্ কিয়ামত কায়িম করো না। (আহ্মদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, আবূ উআনা)

এখানে ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে যে মৃত ব্যক্তি কবরে জীবিত হন, এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন, "তারা বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন আবার দু'বার জীবন দিয়েছেন। আমরা এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি। এখন আমাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কী?" (সূরা মুমিন ঃ আয়াত-১১)

কুরআন পাকে আরো উল্লেখ রয়েছে, "কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরি অবলম্বন করছো? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন। আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অতঃপর তারই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৮) কুরআন পাকের এই আয়াতসমূহ উক্ত ধারণাকে সমর্থন করে। কেননা, যদি মৃতব্যক্তির কবরে জীবিত হওয়ার কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে দু'টি মৃত্যুর পরিবর্তে তিনটি মৃত্যু ও তিনটি জীবন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরূপ কোন ধারণা ভ্রান্ত ও পবিত্র কুরআনের পরিপন্থি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ কাউকে কোন নবীর মু'জিযার বদৌলতে জীবিত করে দেন, তাহলে সেটা হবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হাজার হাজার মানুষকে জীবিত করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো? অথচ তারা ছিলো সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক এর শোকর আদায় করে না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৪৩)

এমনিভাবে হযরত উযায়ের (আ) একবার বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে যাবার সময় দেখলেন,শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। ঐ সময় আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং এক শতাব্দী পর তাঁকে জীবিত করলেন। এই ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন, "আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেননি যে এমন একটি জনপদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো, তার ঘর-বাড়ী সব ভেঙ্গে ধ্বংসস্ত ূপে পরিণত হয়েছিলো। সে বললো, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ ঐ লোকটিকে মৃত অবস্থায় একশ বছর রাখলেন। তারপর তাকে উঠালেন অর্থাৎ জীবিত করলেন। আল্লাহ তাকে বললেন তুমি কতকাল এভাবে ছিলে? সে বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয়, বরং তুমিতো ছিলে একশ বছর। এবার চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়-এর দিকে। সেগুলো পচে যায়নি। তোমার গাধাটির দিকেও চেয়ে দেখো। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকেও চেয়ে দেখো আমি এগুলোকে কেমন করে জোড়া দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৫৯)

কুরআন পাকের এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে রূহ তার দেহের মধ্যে ফিরে আসে না। "আল্লাহ মানুষের রূহ কবয করেন তার মৃত্যুর সময় আর যারা মরে না, তাদের নিদ্রার কালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত তার রূহ আটকে রাখেন এবং অন্যান্যদের রূহ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

সুতরাং কুরআন শরীফের তিনটি আয়াতের দ্বারা জানা গেলো যে, রূহ কিয়ামতের আগে দেহে ফিরে আসবে না। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি পবিত্র মি'রাজের সময় প্রথম আকাশে হযরত আদম (আ)-এর ডান দিকে সৌভাগ্যবানদের আর বাম দিকে দুর্ভাগাদের রূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এছাড়া বদরের যুদ্ধের দিন তিনি নিহত কাফিরদের লাশগুলোকে যখন সম্বোধন করেছিলেন, তখন তারা তাঁর কথা শুনতে পেরেছিলো। সে সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বললেন, ওদের লাশতো পচে গলে গেছে, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা অস্বীকার করেননি, বরং তিনি বলেছিলেন, তবুও তারা আমার কথা শুনেছে। এর দ্বারা জানা গেলো তার সম্বোধন

ছিলো রূহের প্রতি এবং তাদের রূহ তার কথা শুনেছিলো। অবশ্য ওদের দেহে কোন অনুভূতি ছিলো না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে পারবেন না।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-২২)

যেহেতু দেহই কবরে বাস করে, রূহ নয়, তাই এখানে শুনতে না পারার বিষয়টি দেহের জন্যই প্রযোজ্য। কোন মুসলমান এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, আল্লাহ্ যাকে শুনার অযোগ্য বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শুনার যোগ্য বলবেন। অর্থাৎ দেহ্ শুনতে পায় না, রূহ শুনতে পায়। কোন সহীহ্ হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত নয় যে, কবরে মুনকার-নাকীরের সওয়ালের সময় মৃতদের রূহ দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাহলে সেটা গ্রহণ করা যেতো। কবরে দেহের মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একমাত্র মিনহাল ইবনে আমর (র) অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছেন, যদিও তাঁর এই অভিমত ততো জোরদার নয়। হযরত শুবা (র) প্রমুখের নিকটও এ ধারণা গ্রহণযোগ্য ছিলো না। তাঁর সম্পর্কে ইমাম মুগিরা ইবনে মুকসিম মানাবী (র)-এর অভিমত হলো, ইসলামের কোন বিষয় সম্পর্কে মিনহালের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়। সব সহীহ্ হাদীস এরূপ বাড়াবাড়ির বিপক্ষে। এ ছাড়া মহান সাহাবীগণও এই অভিমত সমর্থন করেছেন।

হযরত সুফিয়া বিনতে শায়বা (রা)-বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) একদিন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর লাশ পড়ে আছে। তাঁকে বলা হলো যে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ও এখানে আছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) হযরত আসমা (রা)-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন, এসব লাশ কিছুই নয়। নিশ্চয় তাঁর রূহ আল্লাহর কাছে রয়েছে। তখন হযরত আসমা (রা) জবাব দিলেন, আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এ শির মুবারক বনী ইসরাইলের একজন পতিতাকে উপহার দেয়া হয়েছিলো। তাহলে আমাদের অবস্থা আর কি হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র)-এর বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে, আবার কিছু বিভ্রান্তিও আছে। কবরের মধ্যে জীবিত হওয়া সম্পর্কে ইবনে হাযম (র)-এর অভিমতটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো, যদি তাঁর কথার অর্থ দুনিয়ার জীবনের ন্যায় জীবন হতো। অর্থাৎ দেহের মধ্যে রূহ অবস্থান করে, দেহের সকল কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে এবং রূহ বিদ্যামান থাকা অবস্থায়ই দেহের পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ জীবন

লাভের অভিমত অবশ্যই ভ্রান্ত। এই অভিমতকে শুধু কুরআন-হাদীসই অস্বীকার করে না বরং বিবেক বুদ্ধিও এটাকে অস্বীকার করে। আর এর অর্থ যদি বরযখী জীবন হয়, যা দুনিয়ার জীবনের মতো নয়, তাহলে কবরে দেহের মধ্যে রূহ অবশ্যই ফিরে আসে, যাতে তার পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ সে মুনকার-নাকীরের সওয়ালের জওয়াব দিতে পারে। কিন্তু রূহের এরূপ প্রত্যাবর্তন দুনিয়ার প্রত্যাবর্তনের মত নয়। যদি তা হয় তবে উক্ত অভিমতটি সঠিক। আর যাঁরা উপরোক্ত অভিমত পোষণ করেন তাঁরা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত।

ইমাম ইবনে হাযম (র) প্রমাণ হিসেবে কুরআন শরীফের যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ হলো, "তারা বলবে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দু'বার প্রাণহীন অবস্থায় রেখেছো আবার দু'বার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন মুক্তির কোন উপায় আছে কি?" (সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত-১১)

কুরআন পাকের এ আয়াতের দ্বারা সাময়িকভাবে দেহের মধ্যে রূহ ফিরে আসাকে অস্বীকার করা হয়নি। যেমন বনী ইসরাঈলের জনৈক নিহত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে জীবিত করা হয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর সে আবার মৃত্যুবরণ করেছিলো, একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে তাকে কিছুক্ষণের জন্য জীবনদান করাকে স্বাভাবিক জীবন হিসেবে গণ্য করা যায় না। কেননা, লোকটিকে সামান্য সময়ের জন্য জীবিত করা হয়েছিলো। জীবিত হয়েই সে বলে দিয়েছিলো, আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে। এরপর সে আবার মৃত্যুবরণ করে। তদুপরি রূহকে দেহে ফিরিয়ে দিলেই তাতে স্বাভাবিক জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। বরং দেহের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় মাত্র। আর রূহের সম্পর্ক তার অশরীরী দেহের সাথে সব সময়ই বজায় থাকে যদিও দেহ পচে গলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায়।

রূহের সাথে দেহের পাঁচ রকমের সম্পর্ক থাকে এবং প্রত্যেকটি সম্পর্কই স্বতন্ত্র বটে। প্রথম সম্পর্ক মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে। দ্বিতীয় সম্পর্ক দুনিয়াতে আসার পর। তৃতীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় নিদ্রার মধ্যে। সাধারণত দেহের রূহের সম্পর্ক নিদ্রিত অবস্থায় অটুট থাকে। তবে সময় সময় রূহ নিদ্রিত ব্যক্তির দেহ থেকে সময়িক বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। রূহের চতুর্থ সম্পর্ক বরযখী জীবনে হয়ে থাকে, যদিও মৃত্যুর পর রূহ দেহ থেকে পৃথক হয়ে মুক্ত হয়ে যায়। তবে এমনভাবে রূহ পৃথক হয় না যে, দেহের সাথে তার কোনই সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না। ইতিপূর্বে কবরে রূহের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, মৃত ব্যক্তিকে

কেউ সালাম করলে সেই সালামের উত্তর দেয়ার জন্য তার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়ার এটা একটা বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া যে জন্য কিয়ামতের পূর্বে দেহের নব জীবন লাভ করা কোন অত্যাবশ্যক নয়। দেহের সাথে রূহের পঞ্চম সম্পর্ক মৃত্যুর পরে অর্থাৎ আখিরাতে স্থাপিত হবে। আর সেটা হবে দেহের সাথে রূহের সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও নিবিড় সম্পর্ক। এই প্রেক্ষাপটে দেহের সাথে রূহের উপরোক্ত চার ধরনের সম্পর্ক নগণ্য বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম ইবনে হাযম (র) তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন তা হলো, "আল্লাহ্ মানুষের রূহকে কবয করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার রূহকে আর ছেড়ে দেয়া হয় না। অন্যান্য (নিদ্রিত ব্যক্তিদর) রূহকে ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী"। (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

নিদ্রিত ব্যক্তির রূহকে সাময়িকভাবে তার দেহের মধ্যে আটকিয়ে রাখার অর্থ এই নয় যে, সেই রূহ তার দেহের মধ্যে কোন সময়ই ফিরে আসতে পারবে না। কবরের মধ্যে রূহকে যখন মৃত ব্যক্তির দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন দুনিয়ার স্বাভাবিক জীবন আর ফিরে পাওয়া যায় না।

একজন নিদ্রিত ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় সে জীবিত নয়, আবার মৃতও নয়, বরং সে এক মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে। অথচ দেহে রূহ আছেই বলে আমরা তাকে জীবিত বলি। কিন্তু সে জীবন জাগ্রত অবস্থার জীবন থেকে ভিন্ন ধরনের, যেহেতু নিদ্রা হলো মৃত্যুর সহোদর ভাই। ঠিক তেমনিভাবে মৃতব্যক্তির রূহকে যখন তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন রূহের অবস্থা হয় মধ্যবর্তী ধরনের। না মৃত না জীবিত। তবে সাধারণত এই অবস্থাকে মৃতই বলা হয়। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অনেক জটিলতা দূর হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, তিনি মি'রাজ শরীফের রাত্রে আম্বিয়া কিরামের দর্শন লাভ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বিশারদের অভিমত হলো, তিনি তাঁদেরকে সশরীরে দেখেছিলেন। কেননা, আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের রবের নিকট জীবিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-কে বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি হযরত মূসা কলীমুল্লাহ (আ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছিলেন এবং তাঁর শারীরিক আকৃতি কিরূপ ছিলো তাও বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ ও শানুয়া

গোত্রের লোকের মতো দীর্ঘদেহী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিলো, যেন তিনি এই মাত্র গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-কে কোন সময় দেখেনি সে যেন আমাকে দেখে নেয়। কিন্তু অনেক আলিমের অভিমত হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের রূহ দর্শন করেছিলেন। কেননা নবীদের পবিত্র দেহ তো তাদের কবরেই আছে। যা কিয়ামতের আগে উঠানো হবে না। অন্যথায় সকল নবী রাসূলগণকে কিয়ামতের পূর্বেই কবর থেকে উঠানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গায় ফুঁ-এর সময় তাঁদের আবার মৃত্যুবরণ করতে হবে। যেই জন্য তাঁদের তিনবার মৃত্যুবরণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়। এরূপ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত।

যদি নবী-রাসূলগণের পবিত্র দেহ কবর থেকে উঠিয়ে নেয়া হতো, তাহলে আল্লাহ তাঁদের সাথে বেহেশতের ওয়াদা করতেন না। তাঁরা জান্নাতেই অবস্থান করতেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগে আম্বিয়া কিরামের জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সবার আগে তিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং সবার আগে তিনিই কবর থেকে উঠবেন। নিঃসন্দেহে তাঁর দেহ মুবারক কবরের মধ্যে স্বাভাবিক ও সুন্দর অবস্থায় আছে।

একদা সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে আরয করেছিলেন, আপনি কবরবাসী হওয়ার পর আমাদের প্রেরিত দরূদ শরীফ আপনার খেদমতে কিভাবে পেশ করা হবে। তখন তিনি ইরশাদ করেছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া কিরামের পবিত্র দেহকে নষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক কবরে বিদ্যমান আছে বলে স্বীকার করা না হয়, তাহলে উপরোক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কবরে ফেরেশতাদের নিয়োজিত রাখবেন, যাঁরা তার খিদমতে অহরহ উম্মতদের সালাম পৌঁছাতে থাকবেন। এছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হয়েছিলেন, হযরত আবু বকরও তাঁর সাথে ছিলেন। সে সময় তিনি ইরশাদ করেছিলেন, আমাদেরকে ঠিক এমনিভাবে (হাশরের দিন) জীবিত করা হবে। তবে এটাও দৃঢ় সত্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ আলা ইল্লিয়্যীনে আম্বিয়া কিরামের পবিত্র রূহের সাথে আছে।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, পবিত্র মিরাজের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা (আ)-কে কবরের মধ্যে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে আবার ষষ্ঠ অথবা সপ্তম আকাশেও দেখেছিলেন। অতএব জানা গেলো যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পবিত্র দেহ কবরে আর তাঁর পবিত্র রূহ আসমানে ছিলো। আর তাঁর রূহের সাথে দেহেরও এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বা যোগাযোগ বিদ্যমান ছিলো, যেমন, তিনি কবরে নামাযরত ছিলেন এবং সালামকারীদের সালামের উত্তরও দিচ্ছিলেন। অথচ সে সময় তাঁর পবিত্র রূহ রফীকে আলার মধ্যে ছিলো। অতএব, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নেই।

রূহের অবস্থা ও দেহের অবস্থা এক নয়। যদিও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া রূহের ও দেহের মধ্যে অনেক সম্পর্ক বিদ্যমান। অপর দিকে, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারী দু'টি রূহের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে দেহের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রূহ আসমান যমীনে সর্বত্র চলাফিরা করতে পারে। আর দেহের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যেমন, রূহ কবয হওয়ার পরই সপ্তম আকাশে পৌঁছে যায় আবার নেমেও আসে। ঠিক তেমনিভাবে একজন জীবিত মানুষের রূহ নিদ্রিত অবস্থায় যথা ইচ্ছা উঠানামা করে থাকে।

কেউ কেউ রূহকে সূর্য ও সূর্যের কিরণের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, সূর্য আকাশে অবস্থান করে অথচ তার কিরণ পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু শাইখ ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, এরূপ উদাহরণের কোন অর্থ নেই। সূর্য আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে না। কেবল তার কিরণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাই সূর্যের কিরণ সূর্য নয়। এটা সূর্যের কোন গুণও নয়। সূর্য পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়ার কারণে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, রূহ নিজেই উঠানামা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করেছিলেন, আপনি কি ঐ সমস্ত লোকদের সাথে কথা বলছেন, যাদের লাশ পচে গলে বিকৃত হয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তারা আমার কথা শুনছে। এ মন্তব্য একথার পরিপন্থি নয় যে, ঐ সময় তাদের রূহ তাদের দেহে ফিরে এসেছিলো। যে জন্য তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে পেরেছিলো, যদিও তাদের দেহ পচে গলে গিয়েছিলো। আসলে সম্বোধন করা হয়েছিলো তাদের রূহকে, আর রূহ যে দেহের সাথে সম্পৃক্ত, সেই দেহই পরে পচে গলে গিয়েছিলো, রূহ নয়।

ইমাম ইবনে হাযম (র) কুরআন শরীফের অন্য দু'টি আয়াতের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহে রূহ ফিরে আসে না। এ আয়াত দু'টির অর্থ হলো, "আর জীবিত ও মৃত সমান নয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। যারা কবরবাসী তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না। আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-২২-২৩)

এই আয়াত দু'টির পূর্বাপর অর্থ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের অন্তর হলো মৃত, আপনি আপনার সম্বোধনের মাধ্যমে তাদের কোন উপকার করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত কালামের অর্থ এই নয় যে, কবরবাসীরা কোন সময়ই শুনতে পায় না। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের জুতোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পান। তিনি আরো বলেন, বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিরা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সালাম পেশ করার এমন নিয়ম প্রবর্তন করেছেন, যাতে করে তারা সালামকারীর ঐ সালাম শুনতে পায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, কোন মুমিন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিদেরকে সালাম করলে তাঁরা সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন। উপরে বর্ণিত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো দু'টি আয়াতের অর্থ এখানে উল্লেখ করা হলো, "আপনি আহ্বান শুনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরদেরকেও, যখন তাঁরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আত্মসমর্পণকারী।" (সূরা আন্ নামল ঃ আয়াত ৮০-৮১)

এখানে বধিরদেকে শুনাতে পারবেন না এবং মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না, এ দু'টো কথা পাশাপাশি উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, এদের কারোরই শুনবার কোন ক্ষমতা নেই। এদের অন্তর যেহেতু মৃত ও বধির, তাই এদেরকে শুনানো সম্ভব নয়। আর এদেরকে সম্বোধন করা, মৃত ও বধিরদেরকে সম্বোধন করারই শামিল। এই অর্থ যদি সঠিকও হয়, তাহলে মৃত্যুর পরে রূহকে তিরস্কার করা, ধমক দেয়া বা রূহকে কোন কথা শুনানো যাবে না। সেটা ঠিক বুঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ যাকে শুনাতে চান না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শুনাতে পারবেন না। তিনি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ আল্লাহ রাসূলকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছেন, যার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত।

কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ শুনাতে চান না তাদেরকে শুনাবার ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়নি।

ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর পূর্বে উল্লেখিত মন্তব্য ঃ "এই হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন একমাত্র মিনহাল ইবনে আমর, যিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন" তবে এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। কারণ এই হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে হযরত যাযান (রা) বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা), হযরত মুহাম্মদ ইবনে উকবা (রা), হযরত মুজাহিদ (রা)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে কিছুটা শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। এই হাদীসটি হযরত মুজাহিদ (রা)ও বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, এই হাদীসটি স্বীকৃত, সুপরিচিত ও সহীহ বলে প্রতিষ্ঠিত।

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ (র) তাঁর "কিতাবুর রূহ ওয়ান নাফস" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা একদিন জনৈক আনসারের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা যখন কবরস্থানে গিয়ে পৌছলাম, তখন আনসারের কবর খোঁড়া হচ্ছিলো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসে পড়লেন। আমরাও চুপচাপ বসে পড়লাম, আমাদের মাথার উপর যেন পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শির মুবারক তুলে বললেন, "যখন কোন মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের দিকে রওয়ানা হন এবং হযরত আযরাঈল (আ) মুমিন ব্যক্তির শিয়রের কাছে বসেন এবং বলেন, হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। তখন ঐ রূহ দেহ থেকে ঠিক তেমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন সহজে মশক থেকে পানি বেরিয়ে আসে। যখন কোন মুমিন ব্যক্তির রূহ এভাবে বেরিয়ে পড়ে, তখন মানুষ ও জিন ছাড়া আসমান-যমীনের অন্য সবাই তাঁকে সালাম জানায়। এইভাবে মুমিন ব্যক্তির রূহ আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। তখন সেই রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আসমানের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতারা অন্য আসমান পর্যন্ত সেই রূহকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমান অতিক্রম করে সে রূহ আল্লাহর 'আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। রূহ 'আরশের নিকট পৌছার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয়, আমার এই নেক বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রেখে তাকে কবরে পাঠিয়ে দাও। নিশ্চয়ই,

আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। "আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব, সেখান থেকেই তোমাদের আবার বের করবো।" (সূরা তাহা ঃ আয়াত-৫৫)

তখন বান্দার সেই রূহকে কবরের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এরপর তার কবরে মুনকার-নাকীর এসে তাঁকে বসান আর তাঁকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, হে অমুক ব্যক্তি, আপনার প্রভু কে? তিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ। তখন ফেরেশতারা বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন? আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার দীন কি? তিনি বলেন, আমার দীন হলো ইসলাম। তখন ফেরেশতারা বলেন, আপনার নবী কে? তিনি বলেন, আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন ফেরেশতারা তাঁকে বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সেই মুমিন ব্যক্তির কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। সে সময় তাঁর কাছে অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে বলেন, আল্লাহ আপনাকে এর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর ইবাদতে তৎপর ছিলেন এবং নাফরমানীতে ছিলেন পশ্চাৎপদ। তখন মুমিন ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ আপনাকে এর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন। বলুন আপনি কে? তখন তিনি বলেন, আমি আপনার নেক আমল। এরপর তাঁর জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বেহেশতে তাঁর জন্য যে আসন ও স্থান নির্ধারিত আছে, তা তিনি দেখতে পান। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি এই অবস্থায় থাকবেন।

পক্ষান্তরে, যখন কোন কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন দোযখের আগুনের কাফন ও শবাধার নিয়ে ফেরেশতারা তার কাছে আসেন এবং দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত জায়গা জুড়ে তারা বসে পড়েন। অতঃপর হযরত আযরাঈল (আ) এসে ঐ ব্যক্তির শিয়রে বসে বলেন, হে অপবিত্র রূহ, তুই আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের দিকে বেরিয়ে আয়। তখন ঐ ব্যক্তির রূহ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বের হতে চায় না, বরং দেহের বিভিন্ন অংশে লুকাবার চেষ্টা করে। তখন হযরত আযরাঈল (আ) তার রূহকে দেহ থেকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন ভিজা পশম থেকে কাঁটাযুক্ত শলাকা টেনে বের করা হয়। যখন তার রূহ বের হয়ে পড়ে, তখন মানুষ ও জিন ছাড়া দুনিয়া ও আসমানের আর সবাই তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। এরপর তাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয় না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাকে তার কবরে

ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তখন ভয়ানক আকৃতি ধারণ করে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় তার কাছে আসেন। তাঁদের স্বর বিদ্যুতের কড়কড়ে শব্দের মতো। তাঁরা এই ব্যক্তিকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে অমুক, তোমার প্রভু কে? সে বলে, আমি জানিনা। তখন ফেরেশতারা গুর্জ দিয়ে তার উপর আঘাত করেন এবং তার কবরকে এভাবে সঙ্কুচিত করে দেন যার ফলে তার এপাশের পাঁজর ওপাশে চলে যায় এবং ওপাশের পাঁজর এপাশে চলে আসে। তারপর তার কাছে বিশ্রী চেহারার বিশ্রী পোশাক পরা দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি এসে বলে, আল্লাহ তোকে খারাপ প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম, তুই আল্লাহর ইবাদতে ছিলি পশ্চাৎপদ এবং আল্লাহর নাফরমানীতে ছিলি তৎপর। তখন সে মৃতব্যক্তি বলে তুমি কে? সে উত্তর দেয়, আমি তোমার বদ আমল। এরপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে তার যে নির্ধারিত স্থান রয়েছে তা দেখতে পায়। আবূ নযর (র) থেকে ইমাম আহমদ (র), মাহমূদ ইবনে গায়লান প্রমুখ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রূহকে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং মুনকার-নাকীর এসে মৃত ব্যক্তিকে বসান এবং তাঁর সাথে সওয়াল-জওয়াব করেন। ইবনে মানদাহ (র) থেকে বর্ণিত ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ, তাঁকে বলেছেন খাসীফ জাবরী, তাঁকে বলেছেন মুজাহিদ, আর মুজাহিদকে বলেছেন বারা ইবনে আযিব (রা)। আমরা জনৈক আনসারের জানাযায় শরীক হয়েছিলাম এবং সেই জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাশরীফ এনেছিলেন। আমরা কবরস্থানে গেলাম, কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং বললেন, মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, মৃত্যুর ফেরেশতারা সুগন্ধি ছড়িয়ে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। সেই ফেরেশতা মুমিন ব্যক্তির জান কবয করার জন্য তাঁর পাশে বসেন। তখন ঐ ব্যক্তির নিকট আরো দু'জন ফেরেশতা বেহেশতী কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা মুমিন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু দূরে অবস্থান করেন। মালাকুল মউত ঐ ব্যক্তির দেহ থেকে তাঁর রূহকে লুফে নেন এবং জান্নাতী কাফন পরিয়ে রূহটিতে সুগন্ধি মাখেন। তারপর রূহকে নিয়ে তাঁরা বেহেশতের দিকে রওয়ানা হন। তাঁদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং আসমানের ফেরেশতারা এই রূহকে নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, যে রূহের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয় হলো, এই পবিত্র রূহটি কার? তখন ফেরেশতারা তাঁর দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর নামটি উল্লেখ করে বলেন, এ রূহটি অমুকের। তখন

ফেরেশতারা রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকেন, তখন প্রত্যেক আসমানের আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাঁকে অপর আসমান পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানান। শেষ পর্যন্ত সেই রূহটিকে আরশের নিকট আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয় তখন ইল্লিয়্যীন থেকে তাঁর আমলনামা বের করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই নেককার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা তখন তাঁর আমলনামায় সীল মোহর লাগিয়ে পুনরায় তা ইল্লিয়্যীনে রেখে দেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এই বান্দার রূহকে যমীনের দিকে নিয়ে যাও। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি তাদেরকে সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করলেন, "এ মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবো এবং তা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো। (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত-৫৫)

যখন কোন মুমিন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তাঁর পায়ের কাছে একটি দরজা বেহেশতের দিকে খুলে দেয়া হয় এবং তাঁকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য এসব প্রতিদান রেখে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর শিয়রের কাছে একটি দরজা জাহান্নামের দিকে খুলে দেয়া হয় এবং তাঁকে বলা হয়, দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার থেকে কি ভয়াবহ শাস্তি সরিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে বলা হয়, এবার শান্তির সাথে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ুন। তখন ঐ মুমিন ব্যক্তির কাছে কিয়ামত আগমনের চাইতে প্রিয়তর আর কোন কিছু থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মুমিন ব্যক্তিকে তাঁর কবরে রাখা হয় তখন যমীন বলে, আপনি যখন আমার পিঠের উপর ছিলেন, তখন আমার প্রতি আপনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, এখন আপনি আমার পেটে এসেছেন, আমি চেষ্টা করবো, আপনার সাথে কতো ভালো ব্যবহার করতে পারি। অতঃপর তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন, যখন কাফির ব্যক্তিকে তাঁর কবরে রাখা হয়, তখন মুনকার-নাকীর এসে তাকে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? সে বলে আমি জানি না। তখন তাঁরা উভয়ে তাঁকে মারতে থাকেন, ফলে তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করা হয় এবং সে উঠে বসে। তখন তাকে বলা হয় এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলো? তখন সে বলে, কোন ব্যক্তি? তাঁরা উভয়ে বলেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন সে বলে, হ্যাঁ লোকে

বলতো, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন তাঁরা আবার তাকে মারতে থাকেন। তখন সে ছাই ভস্মে পরিণত হয়ে যায়। হাদীসের হাফিযগণ কেউ কেউ এই হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা হাদীসের এমন কোন ইমাম পাইনি, যিনি এই হাদীস সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। আর কবরের আযাব ও আরাম মুনকার নাকীরের সওয়াল ও জওয়াব এগুলো দীন ইসলামের মূলনীতির মধ্যে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। "যাযান ব্যতীত, অন্য আর কেউ এই হাদীসটি বর্ণনা করেননি", ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর উপরোক্ত বক্তব্যটি তাঁর মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। উল্লেখ্য, এই হাদীসটি আলিমদের একটি বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক বর্ণিত। এছাড়া হাদীসটির সবগুলো সনদ ইমাম দারু কুতনী একটি পুস্তিকায় একত্রিত করেছেন। হযরত যাযান (র) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী। যিনি হযরত উমর (রা) প্রমুখ উচ্চ শ্রেণীর সাহাবাগণ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর রেওয়ায়েত করা হাদীস মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে। ইবনে মুয়ীন (র) ও যাযানকে একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হামীদ ইবনে হেলাল (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তাঁর অভিমত এই যে, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবী। এরূপ একজন সম্মানিত রাবীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। ইবনে আদী (র) বলেন, হযরত যাযান (র) যখন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়েত করেন, তখন তাঁর রেওয়ায়েতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারেনা।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত মিনহাল (র) ছিলেন একজন নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত রাবী। তিনি হাদীসের বর্ণনায় কোন অত্যুক্তি করেননি। ইবনে মুয়ীন (র) ও আজলী (র) তাঁকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় একটি অভিযোগ হলো, তাঁর ঘর থেকে সঙ্গীতের শব্দ শোনা যেতো। শুধু এই কারণেই তাঁর রেওয়ায়েতকে ত্রুটিযুক্ত মনে করা উচিত নয়। ইমাম ইবনে হাযম (র), যাযান (র)-কে দুর্বল রাবী হিসেবে অভিহিত করেছেন, তবে এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। যাযান (র) ছিলেন হাদীসটির একক বর্ণনাকারী। এছাড়া তাঁর অন্য কোন দুর্বলতা ছিলো না। ইমাম ইবনে হাযম (র) এ সম্পর্কে আর অন্য কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারেননি। আসলে মিনহাল (র) এই হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে একা নন। তাই যাযান (র)-কে একক বর্ণনাকারী বলাটা ইবনে হাযম (র)-এর বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, মৃত ব্যক্তির নিকট তার রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর রূহ তাঁর কবরে ফিরে আসে, তারপর মৃত ব্যক্তি উঠে বসে, মুনকার-নাকীর তাকে

কবরে বসান, এই হাদীসগুলো সবই সহীহ্, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত বা সন্দেহ নেই। তবে কেউ কেউ এর মধ্যেও কিছু ত্রুটি বের করার চেষ্টা করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, "হযরত বারা (রা) থেকে হযরত যাযান (র)-এর সরাসরি শোনার কোন প্রমাণ নেই।" তবে এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অচল।

হযরত বারা (রা) থেকে যাযান (র)-এর হাদীস শোনার প্রমাণ প্রসঙ্গে, হযরত আবূ উয়ানা ইসফারাহনী (র) তাঁর গ্রন্থে যেই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে হযরত বারা (রা) থেকে যাযান (র)-এর হাদীস শোনার কথা ব্যাখ্যাসহকারে উল্লেখ রয়েছে। যাযান (র) নিজেই বলেছেন, তিনি বারা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। হাফিয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ (র) বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল ও মশহুর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া এই হাদীসটি বারা (রা) থেকে একদল বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করেছেন। যদি জটিলতার কারণে বারা (রা)-এর হাদীসটিকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই, তাহলেও অন্যান্য হাদীসমূহে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতারা হাযির হন। আর যদি সেই ব্যক্তি সৎ হন, তাহলে মউতের ফেরেশতা বলেন, হে পবিত্র রূহ! পবিত্র দেহ থেকে বের হও, আরামদায়ক জীবন যাপনের এবং তোমার রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। অবশেষে উক্ত রূহ বের হয়ে আসে এবং সেই রূহকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন ফেরেশতারা তাঁর জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলেন, তখন তাদেরকে বলা হয়, এই রূহ কার? ফেরেশতারা এই পবিত্র রূহকে খোশ আমদেদ জানান। আরামদায়ক ও উত্তম জীবন উপভোগ করার জন্য এবং আপনার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি বেহেশতে প্রবেশ করুন, সেই পবিত্র রূহকে এভাবে বারবার সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। অবশেষে সেই রূহকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত করা হয়।

অপরপক্ষে, যদি রূহ বদকার হয়, তাহলে আযরাঈল (আ) রূহকে সম্বোধন করে বলেন, অপবিত্র দেহে অবস্থানকারী হে রূহ! লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হও, আর ফুটন্ত পানি ও পুঁজ খেয়ে সন্তুষ্ট থাকো। শেষ পর্যন্ত তার রূহ বেরিয়ে আসে এবং সেই রূহকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরেশতারা যখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলেন, তাঁদেরকে তখন বলা হয়, এই রূহ কার? ফেরেশতারা বলেন, এই রূহ অমুকের বা অমুকের সন্তান অমুকের। তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেন, অপবিত্র দেহে অবস্থানকারী এই অপবিত্র রূহের জন্য কোন প্রকার অভ্যর্থনা নেই। হে অপবিত্র রূহ, তুমি লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে

যাও। তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। তখন সে রূহ তার কবরে ফিরে আসে।

একজন নেককার বান্দা তাঁর কবরের মধ্যে শান্তিতে অবস্থান করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? আর ইনি কে? তখন তিনি বলেন, ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছি। অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল। .....এভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ নায়ীম (র) থেকে বর্ণিত, এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র)ও একমত। আর আগেকার নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিসীন যেমন, ইবনে আবী ফুদায়েক, আবদুর রহীম ইবরাহীম (র) প্রমুখ ইবনে আযীব (রা) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়াতে করেছেন। আবার অনেকেই তাঁর থেকে হাদীসটি সংকলনও করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত : দেহে রূহ ফিরিয়ে আনা সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা ইবনে মানদাহ (র) ও প্রমাণ পেশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন নবী করীম (সা) বসা ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "আপনি যদি যালিমদের ঐ সময়ে দেখতে পেতেন, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমরা নিজেরাই তোমাদের প্রাণ বের করে আনো। তোমাদের আমলের বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে, কারণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে যা তোমরা অকারণ প্রলাপ বকছিলে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে অহঙ্কার ও অবাধ্যতা দেখাচ্ছিলে।" (সূরা আল-আনয়াম ঃ আয়াত-৯৩)

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাঁর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে তার স্থান জান্নাতে না জাহান্নামে তা সে দেখতে পায়। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় মৃত ব্যক্তির সামনে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ফেরেশতাদের দু'টি সারি সুশৃঙ্খলভাবে মোতায়েন থাকে। তাঁদের চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। মৃত্যু পথযাত্রী যখন তাঁদের দিকে তাকায়, তখন তার আশে পাশের লোকেরা মনে করেন, সে যেন তাঁদেরকেই দেখছে। ঐসব ফেরেশতাদের কাছে কাফন ও সুগন্ধি থাকে। যদি মৃত্যু পথযাত্রী মুমিন হন, তাহলে ফেরেশতারা তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আর বলেন, হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর জান্নাত ও তাঁর

সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আল্লাহ তোমার জন্য সম্মানিত স্থান ও শ্রেষ্ঠ নিআমত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের চেয়েও তা উত্তম। এভাবে ফেরেশতারা তাঁকে অনবরত সুসংবাদ দিতে থাকেন ও ঘিরে রাখেন। তাঁরা রূহকে প্রত্যেক নখ ও প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে টেনে বের করতে থাকেন। দেহের যে সমস্ত অংশ থেকে রূহকে ক্রমান্বয়ে টেনে বের করা হয়, সে সব স্থান নির্জীব হয়ে যায়। এতে তাঁর রূহ আরাম বোধ করে, যদিও মনে হয় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। অবশেষে, তার রূহ কণ্ঠস্থলে গিয়ে পৌছে। নবজাত শিশু সন্তান তার মায়ের গর্ভ থেকে বের হতে যে কষ্ট পায়, তার চেয়েও কম কষ্টে সে পবিত্র রূহ দেহ থেকে বের হয়ে আসে। এরপর প্রত্যেক ফেরেশতাই সেই রূহকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আজরাঈল (আ) সেই রূহকে তাঁর হাতে তুলে নেন। অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন, “বলুন, তোমাদের রূহ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের রূহ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা সাজদা ঃ আয়াত-১১)

এছাড়া ফেরেশতাগণ শুভ্র কাফন নিয়ে ঐ শ্রেণীর রূহকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং বুকের সঙ্গে তাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন, যেভাবে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মা তাকে জড়িয়ে ধরেন। না, তাঁরা মায়ের চেয়েও ঐ রূহকে অধিক স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেন। শুধু তাই নয়, ঐ রূহ থেকে মেশকের চেয়েও বেশি খুশবু ছড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতারা রূহের খুশবুর ঘ্রাণ নেন এবং রূহকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। তাঁরা রূহকে বলতে থাকেন, হে পবিত্র রূহ! খোশ আমদেদ, আর তাঁরা এই বলে দু'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! এই রূহের প্রতি আপনি করুণা বর্ষণ করুন। আর ঐ দেহের প্রতিও রহম করুন, যে দেহ থেকে এই রূহ বের হয়ে এসেছে। অতঃপর তাঁরা রূহটিকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকেন।

মহাশূন্যে আল্লাহর এক ধরনের সৃষ্টি আছে, যাদের সংখ্যা কতো তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐ আগত সুগন্ধযুক্ত রূহের খুশবু তাঁরাও পান, যা মেশকের চেয়েও উত্তম। তাঁরাও এই রূহের জন্য দু'আ করেন এবং একে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। তারপর রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। ঐ রূহ যে আসমানই অতিক্রম করে সেখানকার ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করেন। অবশেষে ঐ রূহ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে পৌছে যায়। আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র রূহকে স্বাগত জানান আর সেই রূহের দেহকেও স্বাগত জানান যেখান থেকে সে বের হয়ে এসেছে। আল্লাহ যখন কাউকে স্বাগত জানান, তখন প্রত্যেক

জিনিসই তাকে স্বাগত জানায়। আর সেই রূহের যাবতীয় অসুবিধা দূর হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের হুকুম দেন, "একে বেহেশতে নিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দাও। আর আমি এ রূহের জন্য যে সম্মান ও আরামদায়ক নিআমত তৈরি করে রেখেছি, সেগুলোও তাকে দেখিয়ে দাও। তারপর তাকে যমীনের দিকে নিয়ে যাও। কেননা, আমার সিদ্ধান্ত হলো, "আমি মানুষকে মাটি দিয়েই সৃষ্টি করেছি, আর মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং মাটি থেকেই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবো।" কসম সেই মহান সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, রূহকে দেহ থেকে বের করে আনা ততো কঠিন কাজ নয়, তাকে বেহেশত থেকে বের করে আনা যতোটা কঠিন। রূহ তখন বলে, আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো সেই দেহের দিকে নিয়ে যাচ্ছো কি যেখানে আমি আগে ছিলাম? ফেরেশতারা তখন বলে হ্যাঁ, আমাদের প্রতি তাই নির্দেশ এবং তোমারও ঐ নির্দেশ মানা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে বেহেশত থেকে নামিয়ে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফনের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, ফেরেশতারা তখন তাঁর রূহকে সেই কাফন পরিহিত দেহে প্রবেশ করিয়ে দেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেলো, রূহকে দেহ ও কাফনের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তবে এই অবস্থার সাথে দুনিয়ার যিন্দেগীর কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নেই। এটা একটি পৃথক ব্যাপার। মৃত্যুর পূর্বে রূহের সাথে দেহের যে সম্পর্ক থাকে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এছাড়া নিদ্রার সময় দেহের সাথে রূহের যে সম্পর্ক থাকে, সেই সম্পর্কের সাথেও এর কোন মিল নেই। মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াবের জন্য এটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির দেহে রূহের এক বিশেষ ধরনের প্রত্যাবর্তন। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেন, সকল সহীহ ও মুতাওয়াতর হাদীস দ্বারা জানা যায়, মুনকার-নাকীরের সওয়ালের সময় রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অনেকের ধারণা, রূহকে নয়, কেবল দেহকে সওয়াল করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ অভিজ্ঞ আলেম এই অভিমতকে স্বীকার করেন না। আবার অনেকে মনে করেন, শুধু রূহকে সওয়াল করা হয় দেহকে নয়। ইমাম ইবনে হাযম (র)ও এই অভিমত সমর্থন করেন। কিন্তু উভয় মতই ভ্রান্ত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত। সওয়াল যদি শুধু রূহকেই করা হয়, তাহলে কবরের সাথে রূহের তো কোন সংশ্লিষ্টতা বা সম্পর্ক থাকতো না। এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কবরের আযাব ও আরাম রূহ ও দেহের উপর হয়, না, শুধু রূহের উপর হয়, না,

শুধু দেহের উপর হয়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্য এই যে, কবরের আযাব ও আরাম রূহ ও দেহ উভয়ের উপর হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত রূহের অবস্থা সম্পর্কে আহলে হাদীস, আহলে সুন্নাত ও মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য অভিমত রয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে ছোটখাটো আরো অনেক অভিমতও রয়েছে। তবে এসব আহলে হাদীস বা আহলে সুন্নাতের মতবাদ নয়। দার্শনিকরা বলেন, আযাব বা আরাম শুধু রূহের সাথে সম্পর্কিত, দেহের সাথে নয়। তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অস্বীকার করে। তাই তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। ন্যায় শাস্ত্রবিদেরা এবং মুতাযিলা সম্প্রদায় মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা বলেন, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বরযখে নয়, হাশরের দিন তা প্রকাশ পাবে। এই দলটি বরযখে দেহের আযাব আরামের সমর্থক। তাঁরা বলে থাকেন, বরযখে শুধু রূহের উপর আযাব বা আরাম হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের অন্য একটি মত এই যে, কিয়ামতের দিন রূহ এবং দেহ উভয়ের উপরই আযাব আরাম হবে। মুসরমানদের মধ্যে আহলে হাদীস ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের এক শ্রেণীর লোকের অভিমতও তাই। ইবনে হাযম (র) এবং ইবনে মুর্রা (র) এই অভিমতটি সমর্থন করেছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী উলামা ও ইমামদের অভিমত অনুযায়ী কবরের শাস্তি বা শান্তি উভয়ই বাস্তব ও সত্য। আর এই শান্তি বা শাস্তি রূহ ও দেহের উভয়ের উপরই হয়ে থাকে। এছাড়া রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর এর অস্তিত্ব টিকে থাকে এবং আযাব বা আরাম ভোগ করে। কখনো কখনো রূহ দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং দেহ ও রূহের সাথে আযাব বা আরাম ভোগ করে। কিয়ামতের দিন রূহকে নিজ নিজ দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। হাশরের দিন কবর থেকে উঠে মানুষ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাযির হবে। দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে মুসলমান, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সবাই অভিন্ন মত ও ধারণা পোষণ করে থাকেন।

কবরের আযাব ও মুনকার-নাকীরের সওয়াল প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক মুতাওয়াতর বা ধারাবাহিক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই দুটি কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে, এটা কোন বড় ধরনের অপরাধের কারণে নয়, বরং এদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকতো না, অপরজন ছিলো পরদোষ চর্চাকারী। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের একটি তাজা ডাল আনিয়ে দু'টুকরো করে ঐ দু'কবরে পুঁতে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি

উদ্দেশ্যে আপনি এরূপ করলেন? জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, হয়তো আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি ডাল না শুকানো পর্যন্ত, তাদের আযাব লঘু করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে বনী নাজ্জারের বাগিচায় ভ্রমণ করছিলেন। আমরা সবাই তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তাঁর খচ্চরটি ভীত-চকিত হয়ে এমনভাবে ছটফট করে উঠলো যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমন সময় চার. পাঁচ অথবা ছয়টি কবর আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কেউ এই কবরবাসীদের পরিচয় জানো? একজন আরয করলেন, তাদের অবস্থা আমার জানা আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, এদের মৃত্যু কি অবস্থায় হয়েছিল? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললেন, এরা মুশরিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলো। তখন ইরশাদ হলো, তাই নাকি? তিনি আরো বলেন, আমার উম্মতেরাও অনেকে কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। তোমরা যদি মৃতদের লাশ দাফন করা ছেড়ে দেবার ভয় আমার না হতো, তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতাম, যেন তিনি আমার মতো তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনিয়ে দেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা দোযখের আগুন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দোযখের আগুন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি আরো বললেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দুরূদ পড়া শেষ করে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। এক. জাহান্নামের আযাব, দুই. কবরের আযাব, তিন. জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, চার. মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে। (মুসলিম)

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (সাহাবায়ে কেরামকে) কুরআন শরীফ যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, সেইভাবে নিম্নোক্ত দু'আটি শিক্ষা দিতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরে, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া আউযুবিকা মি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে ও কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ফিতানা থেকে।" (মুসলিম)

কবরের আযাব সম্পর্কে হযরত আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে এসে একটি আওয়াজ শুনে বললেন, "ইয়াহুদীদেরকে তাদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন জনৈকা ইয়াহুদী বৃদ্ধা মহিলা তাঁর নিকট এসে বললেন, "কবরবাসীদেরকে কবরের মধ্যে শাস্তি দেয়া হয়।" আমি তার কথা মিথ্যা বলে গণ্য করলাম। একথা আমার বিশ্বাস হলো না। এরপর বৃদ্ধা মহিলাটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলেন। আমি ঐ ইয়াহুদী বৃদ্ধা মহিলার কথাটি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, "সে সত্য কথা বলেছে কবরে আযাব হয় এবং তা সমস্ত জীবজন্তু শুনে থাকে।" এরপর থেকে প্রত্যেক নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে দেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মে মুবাশ্বির (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার কাছে তাশরীফ আনলেন, আর বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কবরে কি আযাব হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর সে আযাব সমস্ত জীবজন্তু শুনতে পায়। (ইবনে হাব্বান)

কোন কোন আলিম বলে থাকেন, যখন কোন পশুর পেটে ব্যথা দেখা দেয়, তখন লোকজন পশুদেরকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মুনাফিকদের, যেমন– ইসমাঈলী, নাসীরিয়াহ, কারমিতাহ প্রমুখ, যারা মিসর ও সিরিয়ার অধিবাসী তাদের কবরের নিকট নিয়ে যায়। তখন কোন জানোয়ার বিশেষ করে ঘোড়া কবরের আযাব

শুনতে পেয়ে চমকে উঠে আর ভীত হয়ে লাফাতে থাকে, তখন তার পেটের ব্যথা সেরে যায়।

আবুল হিকাম ইবনে বারখান বলেন, লোকেরা ইশবীলীয়ারের উঁচু কবরস্থানে এক ব্যক্তির লাশ দাফন করে সেই কবরের নিকট বসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। একটি পশু নিকটেই চরছিলো। এরমধ্যে পশুটি অনেক দূরে চলে গিয়ে আবার কবরের দিকে ফিরে এলো এবং এমনভাবে কান খাড়া করলো যেন সে কোন কিছু শুনতে পাচ্ছে, পশুটি কয়েকবার এরূপ করলো। আবুল হিকাম বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই কথাটি আমার মনে পড়ে গেলো যে, কবরে আযাব হয় যা পশুরাও শুনতে পায়। আশবীলী বলেন, সহীহ মুসলিমের পাঠদান সময় আবুল হিকাম এই ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, পশুরা আযাবে লিপ্ত কবরবাসীর চিৎকার শুনতে পায়। হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ সম্পর্কীয় হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পশুরাও কবরের আযাব শুনতে পায়। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা আমার কাছে এলো এবং কবরের আযাবের কথা বললো। কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁকে ঐ কথা জানালাম। তিনি ইরশাদ করলেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় (গুনাহগার) কবরবাসীরা শাস্তি ভোগ করে, এমনকি জীবজন্তুরাও তাদের আর্তচিৎকার শুনতে পায়।

কবরে সওয়াল জওয়াব সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা অনেক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরে মৃতদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন তাঁরা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে কায়িম রাখবেন এবং যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

উক্ত হাদীসটি সুনানে এবং মুসনাদসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রূহকে মৃত ব্যক্তির দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর কবরের চাপের কারণে মৃত ব্যক্তির এ দিকের পাঁজর ওদিকে এবং ওদিকের পাঁজর এদিকে এসে যায়। এর দ্বারা জানা গেলো, দেহ ও রূহ উভয়ের উপরই আযাব হয়ে থাকে। অন্য একটি হাদীসে আছে, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে লোকজন ফিরে আসতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের চলে যাওয়ার জুতোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে

পায়। এই অবস্থায় একজন মুমিন বান্দার শিয়রের দিকে তার নামায, ডান পাশে তার রোযা, বাম পাশে তার যাকাত এবং পায়ের দিকে তার সাদকা, খয়রাত ইত্যাদি আমল তাকে ঘিরে রাখে। ফেরেশতারা তার শিয়রের দিকে আসতে চাইলে নামায বলে, আমার এদিকে কোন প্রবেশ পথ নেই। তাঁরা ডান দিকে আসতে চাইলে রোযা, বাম দিকে আসতে চাইলে যাকাত এবং পায়ের দিকে আসতে চাইলে অন্যান্য আমল ফেরেশতাদেরকে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এ দিকেও কোন প্রবেশ পথ নেই। তখন মৃত ব্যক্তিকে উঠে বসতে বলা হয়। সে উঠে বসে এবং তার কাছে মনে হয় যেন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, রাসূল হিসেবে যিনি এসেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? তুমি তাঁকে কি মনে করো? তখন মৃত ব্যক্তি বলে, আমাকে আগে নামায আদায় করতে দাও। উত্তরে তাঁরা বলেন, নামায তো পড়বেই। প্রথমে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন মৃত ব্যক্তি উত্তর দেয়, তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর নিকট থেকে তিনি সত্য দীনসহ তাশরীফ এনেছিলেন। তারপর তাকে বলা হয়, এই বিশ্বাসের উপর তুমি জীবিত ছিলে, আর 'এ বিশ্বাসের উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছো। ইনশাআল্লাহ, এই বিশ্বাসের উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তখন তার জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, এই বেহেশত এবং আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য অন্য যে সব নিয়ামত রেখেছেন, এ সবই তোমার। এই সব কিছু দেখে মৃত ব্যক্তির আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। এছাড়া তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত এবং আলোকিত করে দেয়া হয়। আর তার দেহ সেই মাটির সাথে মিশে যায়, যেই মাটি থেকে তাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আর তার রূহকে অন্যান্য পবিত্র রূহের সাথে রেখে দেয়া হয়, যাদের সাথে তার রূহ পাখির আকার ধারণ করে জান্নাতের ফল ফলাদি ভক্ষণ করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে– "আল্লাহ তা'আলা এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে মুমিনদের পার্থিব জীবনে এবং পরকালে প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

ফেরেশতারা কাফিরদের সম্পর্কে এর ঠিক বিপরীত অবস্থার বিবরণ দেন। কাফিরদের কবর এতোই সংকীর্ণ হয় যে, মৃত ব্যক্তির এক পাঁজরের মধ্যে অন্য পাঁজর ঢুকে পড়ে। এটাই হলো এমন একটি ভয়াবহ জীবন যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। "এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে,

তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিলো, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। সেভাবে আজ আমিও তোমাকে ভুলে যাবো। এভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেবো, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না আর পরকালে শাস্তি কঠোরতর এবং দীর্ঘস্থায়ী।" (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১২৪-১২৭)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা ফিরে আসতে থাকে তখন তাদের জুতোর আওয়ায পর্যন্ত সে শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসান এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন ইনি কে? যদি সে মৃত ব্যক্তি মুমিন হন তাহলে তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন ফেরেশতারা তাকে বলেন, তাকিয়ে দেখো তোমার জাহান্নামের স্থানকে, যেটাকে আল্লাহ তোমার জান্নাতের আবাসস্থানে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে তখন এক সাথে দু'টি জায়গাই দেখতে পাবে। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, উক্ত রেওয়ায়েতে আরো বর্ণিত আছে, সেই মৃত ব্যক্তির কবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অপরপক্ষে, মৃত ব্যক্তি যদি কাফির বা মুনাফিক হয়, তাহলে সে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিনা, লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন ফেরেশতারা লোহার একটি হাতুড়ি দিয়ে তার দু'কানের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ কপালে আঘাত করতে থাকেন। সে তখন চিৎকার করতে থাকে, তার ঐ চিৎকারের শব্দ জিন ও ইনসান ছাড়া অন্য সবাই শুনতে পায়।

সহীহ্ আবূ হাতিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে কবরে কাফিরের আযাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মৃত মানুষকে দাফন করা হয়, তখন তার কাছে কালো চেহারার ও নীল রংয়ের চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন। তাঁদের একজনকে বলা হয় নাকীর এবং অপরজনকে বলা হয় মুনকার। উভয় ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে

জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলতে? তখন সে তাই বলে, যা দুনিয়াতে বলতো। যদি মৃত ব্যক্তি মুমিন হন, তাহলে তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন ফেরেশতারা বলেন, আমরা জানতাম আপনি একথাই বলবেন। অতঃপর তাঁর কবরটি সত্তর হাত লম্বা ও সত্তর হাত চওড়া ও আলোকিত করে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, "আরামে ঘুমিয়ে থাকুন।" তখন তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পত্তির দিকে ফিরে যেতে চাই এবং তাঁদেরকে এ সুসংবাদ দিতে চাই। তখন ফেরেশতারা তাঁকে বলেন, আপনি কিয়ামত পর্যন্ত নববধূর মতো ঘুমিয়ে থাকুন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ আপনাকে আবার জাগান, যেমন একজন স্বামী তার নববধূকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন।

আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয়, তাহলে সে বলে, আমি জানিনা ইনি কে? আমি শুনতাম, মানুষ তাঁকে কিছু একটা বলতো, আর আমিও তাই বলতাম। তখন ফেরেশতারা তাকে বলেন, আমরা জানতাম, তুমি এটাই বলবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তুমি তাকে চেপে ধরো। তখন যমীন ঐ মুনাফিক ব্যক্তিকে এমনভাবে চেপে ধরবে যে, তার এক দিকের পাঁজর অন্যদিকে চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় কবর থেকে না উঠানো পর্যন্ত সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এর দ্বারা জানা গেল যে, দেহের উপরই আযাব হয়ে থাকে। কবরে যে মুমিনদের জন্য রয়েছে শান্তি ও কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি সে বিষয়ে আবু হাতিম (র) তাঁর এক সহীহ্ গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। কোন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে রহমতের ফেরেশতারা তাঁর কাছে আসেন। যখন তাঁর রূহ কবয করা হয় তখন ফেরেশতারা তাঁকে সাদা রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিয়ে গিয়ে আসমানের দরজায় পৌছেন। আর তাঁরা বলতে থাকেন, এর চেয়ে অধিক মন মাতানো সুগন্ধি আমরা আর কখনো পাইনি। অতঃপর বলা হয়, অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা কি মর্যাদা সম্পন্ন কাজ করেছেন? তখন তাঁদেরকে বলা হয়, তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, তাঁকে বিশ্রাম নিতে দাও। কেননা, সে দুনিয়াতে দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলো।

আর কাফিরদের রূহ যখন কবয করা হয় তখন তাকে পাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন পাতালের প্রহরীরা বলেন, এর চেয়ে বিকট দুর্গন্ধ তো আমরা আর কখনো পাইনি। অতঃপর তাকে পাতালের একেবারে নিচে নিয়ে যাওয়া হয়।

হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা) সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইবনে মুআয (রা) ঐ ব্যক্তি যাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠেছিলো। আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। আর সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। তবুও কবর তাঁকে চাপ দিয়েছিলো, আবার চাপ থেকে তাঁকে অব্যাহতিও দেয়া হয়েছিলো। (নাসাঈ শরীফ)

হযরত আবী মালিকা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ কবরের চাপ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি, এমনকি সাআদ ইবনে মুআয (রা) পর্যন্ত রক্ষা পাননি, যাঁর রুমালটির মর্যাদা ছিলো দুনিয়ায় ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অধিক।

হযরত নাফি (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রা)-এর জানাযায় এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা এর আগে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। আমি আরো জানতে পেরেছি যে, হযরত সাআদ (রা)-কেও কবর চাপ দিয়েছিলো। হযরত নাফি (রা) আরো বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা)-এর স্ত্রী সুফিয়া বিনতে আবী উবায়েদ (রা)-এর নিকট আমি এক সময় গেলাম, সে সময় তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? তখন তিনি বললেন , আমি জনৈকা উম্মুল মুমিনীনের নিকট থেকে এসেছি। তিনি বললেন , নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কারো কবরের আযাব মাফ হতো, তাহলে সাআদ (রা)-এরই মাফ হতো, কিন্তু তাকেও কবর চাপ দিয়েছিলো।

মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক মেয়েকে দাফন করে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ পেলো। একটু পরে তাঁর চিন্তাযুক্তভাব দূরীভূত হলো। সাহাবায়ে কেরাম এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন , আমার নিজের মেয়ের কথা, তার অসহায় অবস্থা ও কবরের আযাবের কথা আমার মনে পড়লো, তাই আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তার আযাব দূর করে দিলেন। আল্লাহর কসম, কবর তাকে এমনভাবে চাপ দিলো, যার শব্দ সমস্ত আকাশ-যমীনের মধ্যস্থিত সবাই শুনতে পেয়েছিলো।

শুয়াইব ইবনে দীনার ইবরাহীম আলগানাবী (র) জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, কবরের চাপ দেয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় একটি শিশুর জানাযা সেদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে হযরত আয়িশা সিদ্দীক (রা) কেঁদে ফেললেন।

আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, আমি শিশুটির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তার জন্য কাঁদলাম এ জন্য যে, এ শিশুটিকে তার কবর চাপ দেবে।" এ ঘটনা থেকে জানা গেলো, রূহের মাধ্যমেই দেহের উপর কবরের আযাব হয়।

কবরের আযাব যে বাস্তব ও সত্য সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে তা জানা গেল। আহলে সুন্নাতের আলিমগণ এ বিষয়ে একমত। ইমাম মারুযী (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, কবরের আযাব সত্য, পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ও পথ ভ্রষ্টকারী ছাড়া আর কেউ এটা অস্বীকার করেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ আবদুল্লাহকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এই হাদীসগুলো বিশ্বস্ত সনদের দ্বারা প্রমাণিত। তাই এগুলো অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এসব হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করারই শামিল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা আল হাশর ঃ আয়াত-৭)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হযরত আবূ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবরের আযাব কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। তিনি আরো বললেন, আবূ আবদুল্লাহ (র)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, "কবরের আযাব, নাকীর-মুনকার, বান্দাকে কবরের সওয়াল জবাবের কথা এ সবই আমরা বিশ্বাস করি।" আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত বাক্য দ্বারা মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করেন পার্থিব জীবনে ও পরকালে এবং আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

আহমদ ইবনে কাসিম (র) বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নাকীর-মুনকার এবং কবরের আযাব সম্পর্কে যা হাদীসে বর্ণিত আছে, তা স্বীকার করেন? তিনি উত্তর দিলেন, সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তা স্বীকার করি। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কবরে সওয়ালকারীদেরকে আপনি নাকীর-মুনকার বলেন, না শুধু ফেরেশতা বলেন? তিনি উত্তর দিলেন নাকীর-মুনকার বলি। আমি বললাম, কেউ কেউ বলে থাকেন, হাদীস শরীফে মুনকার-নাকীরের শব্দ দু'টি নেই। তিনি বললেন, না, আছে। তবে অধিকাংশ মুতাযিলীর

মতে, নাকীর-মুনকার শব্দ দ্বারা আল্লাহর ফেরেশতাদের নামকরণ বৈধ নয়। আবূ হুযায়েল ও মারীসী থেকে বর্ণিত, মুমিনদেরকে কবরে কোন আযাব দেয়া হয়না। তবে বেঈমানদের মৃত্যুর পর কিয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁ ও পুনরুত্থানের মধ্যকার সময় শাস্তি হবে, আর সেই সময় তাদেরকে সওয়ালও করা হবে। জুব্বাই ও তদীয়পুত্র বালাজীর অভিমত হলো, কবরের আযাব সত্য, তবে তা মুমিনদের জন্য নয়, তা শুধু কাফির ও ফাসিকদের জন্য, কবরের আযাব সম্পর্কে এটাই তাদের মূল ধারণা।

হযরত সালিহ (র) বলেন, মুমিনদেরও কবরের আযাব হয় তবে তাদের দেহে রূহ ফিরিয়ে আনা হয় না। মৃত ব্যক্তির পক্ষে রূহ ছাড়াই ব্যথা অনুভব করা সম্ভব। এছাড়া হুঁশ-জ্ঞান থাকাও সম্ভব, কারামিয়া নামক একটি সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করে।

এক শ্রেণীর মুতাযিলীর মতে, আল্লাহ তা'আলা কবরের মধ্যে মৃতদেরকে শাস্তি দেন, তবে কিয়ামতের দিন যখন এদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে তখন তারা সেই শাস্তির দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করবে। তাদের মতে আযাবে লিপ্ত মৃতদের দৃষ্টান্ত হলো, নেশাগ্রস্ত ও বেহুঁশ মানুষের মতো। এ অবস্থায় যদি তাদেরকে কেউ প্রহার করে, তাহলে তারা তা অনুভব করে না। কিন্তু যখন নেশার ভাব কেটে যায় এবং চেতনা ফিরে আসে তখন তারা ঐ আঘাতের ব্যথা অনুভব করে। কোন কোন মুতাযিলী কবরের আযাবকে মোটেই স্বীকার করে না। তন্মধ্যে রয়েছে, যারার ইবনে আমর, ইয়াহইয়া ইনে কামিল প্রমুখ। মারিসীও এই অভিমত পোষণ করতেন। তবে এটা হলো ভ্রান্ত ও বিপথগামীদের অভিমত।

উল্লেখ্য যে, কবরের আযাব বলতে বরযখের আযাবকেই বুঝায়। যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য তাকে বরযখে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাকে দাফন করা হোক বা না হোক। যেমন কোন ব্যক্তির দেহ হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং সেই ছাই বাতাসে উড়ে গিয়েছে, কিম্বা তার দেহ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে আছে, কিম্বা সেই দেহ সমুদ্রে ডুবে গেছে, সেই অবস্থায় তার রূহ ও দেহের উপরই বরযখে আযাব বা আরাম হয়ে থাকে।

হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ফজরের নামায আদায় করতেন, নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং বলতেন, আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছো কী? সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, এই অবস্থায় কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতেন এবং আল্লাহ যেমন তাঁকে জানাতেন তিনি স্বপ্নের তাবীর সেভাবে বলে দিতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছো। আমরা জবাব দিলাম না, আমরা কেউ কোন স্বপ্ন দেখিনি। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখেছি, তারা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেলো। সেখানে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছে আর তার পাশেই অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে আছে একটি লোহার কাঁটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলছে, অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঐ কাঁটাটি ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলেছে। এর মধ্যে তার প্রথম চোয়ালটি জোড়া লেগে ভালো হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাঁটা ঢুকিয়ে আগের মতো করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার? এই অবস্থায় তারা দু'জন আমাকে বললো, চলুন। সুতরাং আমরা চলতে থাকলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম, যে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি তার মাথার কাছে এক খণ্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার উপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে আঘাত করছে প্রস্তর খণ্ডটি তখন ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতোই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা আবার তাকে আঘাত করছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা দু'জন বললো আরো আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং তন্দুরের মতো একটি গর্তের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। এটির উপরিভাগ ছিলো সংকীর্ণ, কিন্তু নিম্নভাগ ছিলো প্রশস্ত, আর এর নিচে ছিলো জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন উপরে উঠছে তখন ভেতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নিচে চলে যাচ্ছে। ঐ গর্তের সংকীর্ণ মুখের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সংগী দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম এ কি কাণ্ড? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা আবার অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নদীর কিনারে উপনীত হলাম যার মধ্যে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে অন্য এক বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনে হারূন এবং ওয়াহাব ইবনে জাবীর ইবনে হাযেম উল্লেখ করেছেন, নদীর মাঝখানে একজন লোক এবং নদীর তীরে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরো দেখলেন নদীর তীরে দাঁড়ানো লোকটির সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতিমধ্যে নদীর মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিলো। এভাবে যখনই সে তীরে উঠতে চেষ্টা করছে, তখনই লোকটি

তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিলো সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ব্যাপার দেখছি? তারা দু'জন আবার বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে চললাম এবং এমন একটি শ্যামল তরুতাজা বাগিচায় প্রবেশ করলাম যেখানে একটি বিরাট গাছ ছিলো। গাছটির নিচে এক বৃদ্ধ ও কিছু সংখ্যক শিশু বসা ছিলো। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন জ্বালাচ্ছিলো। আমার সাথী দু'জন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলো যে ঘরের চেয়ে উত্তম ও সুন্দর কোন ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিলো। অতঃপর তারা দু'জন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং পুনরায় আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলো যেটি ছিলো সবচেয়ে বেশি সুন্দর আর সেখানে ছিলো শুধু বৃদ্ধ ও যুবকেরা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই অবস্থায় আমি আমার সাথী দু'জনকে বললাম, তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এতোক্ষণ যেসব বিষয় আমি দেখতে পেলাম সে সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত করো। তারা বললো, হ্যাঁ, তা করছি। যাকে আপনি দেখলেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে, সে হলো মিথ্যাবাদী সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো। লোকেরা তার থেকে কথা শুনে অন্যদের তা বলতো এভাবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ আচরণ করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছে। এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন কিন্তু তা থেকে সে গাফিল হয়ে রাতে ঘুমিয়েছে আর দিনেও সেই অনুযায়ী কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে। যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলেন সে হলো সুদখোর। গাছের নিচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ), আর তাঁর চারদিকে শিশুরা হলো মৃত নাবালিগ সন্তানগণ। যাকে আগুণ জ্বালাতে দেখলেন, সে হলো দোযখের ফেরেশতা মালেক। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা হলো সাধারণ ঈমানদারদের ঘর আর অপরটি হলো শহীদদের ঘর। আমি হলাম, জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল। এরপর তিনি বললেন, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে উপরে মেঘ মালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা দু'জন বললেন, ওটি আপনার জায়গা। আমি বললাম, আপনারা আমাকে আমার জায়গায় যেতে দিন। তাঁরা দু'জন বললেন, আপনার আয়ু এখনো বাকী আছে, এখনো তা পূর্ণ হয়নি। আপনার আয়ু পূর্ণ হলে আপনার ঘরে যেতে পারবেন। (বুখারী) এ হাদীসের দ্বারা আলমে বরযখের আযাব ও আরাম যে সত্য,

তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন ওহীর সমতুল্য।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কোন এক বান্দাকে তার কবরে একশত চাবুক মারার হুকুম দেয়া হলো। কিন্তু ঐ বান্দা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র এক চাবুক মারা বাকী রইলো, সেই অবস্থায় তার কবরটি আগুনের চুলায় পরিণত হয়ে গেলো। অবশেষে তার আযাব যখন দূর হলো এবং সে চেতনা ফিরে পেলো, তখন সে জানতে চাইলো, কী কারণে তাকে এই শাস্তি দেয়া হলো? ফেরেশতাগণ তখন জবাব দিলেন, "তুমি এক ওয়াক্ত নামায বিনা ওযূতে আদায় করেছিলে। আর একবার তুমি জনৈক মযলূম ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলে কিন্তু তুমি তাকে কোন সাহায্য করোনি।" (তাহাবী)

শবে মি'রাজ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি এক রাত্রে তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চার দিকে আমি বরকত দান করেছিলাম, যেন তাঁকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-১)

তিনি এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, অতঃপর আমার নিকট বুরাক নিয়ে আসা হয়। আমি তার উপর সওয়ার হলাম। ঐ বুরাকের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছতো। এভাবে যাচ্ছিলাম এবং জিবরাঈল আমাদের সাথে ছিলেন। অতঃপর আমরা এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা একদিন ফসল রোপন করে আর পরের দিন ফসল কেটে নেয়। আর কাটার পরই মাঠ আবার আগের মতো ফসলে ভরে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো আল্লাহর পথে জিহাদকারী। এদের পুণ্যের সংখ্যা সাতশত পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ কররেছেন, "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।" (সূরা সাবা ঃ আয়াত-৩৯)

অতঃপর আমরা এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে গেলাম যাদের মাথা পাথর মেরে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। আর তাদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরই আবার তা ঠিক হয়ে যাচ্ছিলো। এই আযাব এক মুহূর্তের জন্যও মুলতবী করা হচ্ছেলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল এরা কারা? তিনি বললেন, এরা নামাযে

আলসেমী করতো। এভাবে আমরা এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের দেহের সম্মুখ ও পশ্চাদ ভাগে কিছু কাপড়ের টুকরো বা পট্টি রাখা আছে আর বাঁধন ছাড়া পশুর ন্যায় কাঁটাতার ও বিষাক্ত গাছগাছালি এবং জাহান্নামের পাথর ইত্যাদির উপর দিয়ে তারা ছুটে চলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা যাকাত দিতো না, আবার আমরা এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে গেলাম যাদের সামনে পাক-পবিত্র ও টাটকা এবং রান্না করা গোশত রাখা আছে এবং পচা গোশতও রাখা আছে। কিন্তু এরা উত্তম ও টাটকা গোশত ছেড়ে দিয়ে পচা, অপবিত্র গোশত খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো ঐসব লোক যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে পতিতাদের নিয়ে রাত কাটাতো। তারপর আমি দেখলাম রাস্তায় একটি কাঠের টুকরো পড়ে আছে, কাঠের টুকরোটি যা কিছু সামনে পায় সব কিছুই ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল এটা কি? তিনি বললেন, এটা হলো আপনার উম্মতের মধ্যে যারা ডাকাত তাদের উপমা, যারা রাস্তায় বসে থাকে এবং পথিকদের ধন-সম্পদ লুটপাট করে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য পথে-ঘাটে বসে থেকো না।" (সূরা আরাফ ঃ আয়াত-৮৬)

এরপর অন্য এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে গেলাম যে ব্যক্তি লাকড়ির এমন ভারী বোঝা জমা করে রেখেছে যা সে উঠাতে পারছেনা অথচ আরো বেশি লাকড়ি একত্রিত করার চেষ্টা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, এই ব্যক্তি আপনার উম্মতের সেই লোক যার কাছে লোকের আমানত গচ্ছিত আছে। আর সে ঐগুলো দিচ্ছে না, অথচ সে আরো আমানত জমা করার ইচ্ছা পোষণ করছে। তারপর আমরা এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে গেলাম যাদের ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। কাটার পরক্ষণে ঠোঁট আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিলো এ আযাব এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হচ্ছিলো না। আমি বললাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা হলো সব ফিতনার যামানার বক্তা। এরপর আমরা এমন একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের নিকট দিয়ে গেলাম যার ভেতর থেকে উজ্জ্বল আলো বের হচ্ছিলো, পরক্ষণে এ আলো ফিরে যেতে চায় কিন্তু ফিরে যেতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, এ হলো সে ব্যক্তি যে কোন খারাপ কথা বলে তার জন্য লজ্জাবোধ করে এবং তা প্রত্যাহার করতে চায় যদিও তা সম্ভব হয় না।

উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী শেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আসমানের দরজা খুললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে যে আকৃতিতে পয়দা করেছেন আমি সেই আকৃতিতে তাঁকে দেখলাম। এছাড়া সে সময় তাঁকে তাঁর মুমিন সন্তানদের রূহসমূহ দেখানো হলো, তা দেখে তিনি বলছিলেন, এগুলো হলো পাক পবিত্র রূহ আর পাক নাফস, এদেরকে ইল্লিয়্যীন রাখো। আদম (আ)-এর বেঈমান সন্তানদের রূহ তাঁকে দেখানো হলো, তিনি সেগুলো দেখে বললেন, এগুলো হলো অপবিত্র রূহ ও অপবিত্র নাফস, এগুলোকে সিজ্জীনে রাখো। তারপর আমরা আরেকটু অগ্রসর হলাম এবং দেখলাম, একটি দস্তরখানে পাক পবিত্র ও টাটকা গোশত রাখা আছে কিন্তু এর ধারে কাছে কেউ নেই। আরেকটি দস্তরখান দেখলাম যার মধ্যে পঁচা গলা ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত রাখা আছে, আর লোকেরা তা খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা হালাল পরিত্যাগ করে হারাম খায়। এরপর আমরা আরো একটু অগ্রসর হলাম, তখন আমরা ঐ সব লোক দেখতে পেলাম যাদের পেট কলসের মতো বড় আকারের। এদের মধ্যে কেউ দাঁড়াতে চাইলে পড়ে যায় আর দুআ করে হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়িম করো না। এরা হলো ঐসব লোক যাদেরকে ফিরআউনের কাফিলা পদদলিত করে চলে যায় আর তারা চিৎকার করতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা সুদখোর এবং জিনে আক্রান্ত লোকদের মতো এরা দাঁড়াতে চায়।

এভাবে আমরা আরো অগ্রসর হলাম, তখন এমন কিছু লোকদেরকে দেখতে পেলাম যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো, জোর করে ওদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যা তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছে আর এরা এই অবস্থায় চিৎকার করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করতো। আমরা আরেকটু অগ্রসর হয়ে দেখলাম, কিছু সংখ্যক মহিলা যাদের বক্ষদেশ বেঁধে রাখা হয়েছে আর তারা ঝুলছে। আর তারা করুণভাবে চিৎকার করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক। আমরা আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলাম, সেখানে এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম যাদের পার্শ্বদেশ থেকে মাংস কাটা হচ্ছে এবং তাদের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে, এটা খাও, যেমনিভাবে তোমরা নিজের ভাইয়ের মাংস খেতে। আমি

জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা পরের দোষ চর্চা করতো। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (বায়হাকী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেছেন, মি'রাজ শরীফে আমরা এমনি ধরনের কিছু লোকের নিকট গেলাম, যাদের নখ ছিলো তামার। আর সেগুলো দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আঁচড় কাটছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা হলো ঐসব লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ পরনিন্দা করতো এবং তাদের সম্মান হনন করতো। (আবূ দাউদ) আবূ দাউদ তায়ালিসীর গ্রন্থের মধ্যে খেজুর গাছের তাজা ডাল সম্পর্কীয় হাদীসের উল্লেখ আছে, যা দু'টুকরো করে দু'কবরে পুঁতে দেয়া হয়েছিলো। হাদীসটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত কবরবাসীদের সম্পর্কে মতভেদ আছে, এরা কাফির ছিলো না মুমিন ছিলো। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, এরা ছিলো কাফির। এই হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, তাদের কোন বড় গুনাহের কারণে আযাব হচ্ছিলো না, অর্থাৎ শিরক ও কুফরীর তুলনায় এটা ছিলো সাধারণ গুনাহ। এই হাদীসের দ্বারা জানা গেলো যে, এরা আযাব থেকে মুক্ত হয়নি। তাদের আযাব সাময়িকভাবে লাঘব করা হয়েছিলো মাত্র। তারা যদি মুমিন হতো তাহলে তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন এবং তারা আযাব থেকেও মুক্তি পেতো। উক্ত হাদীসের এক সনদেও এরা যে কাফির ছিলো এটা উল্লেখ আছে। লোকগুলোর এই আযাব অন্য গুনাহর কারণে ছিল, শিরক বা কুফরীর জন্য নয়। এতে জানা গেলো যে, কাফিরদের কুফরী ও শিরকের যেমন আযাব হয় তেমনি অন্যান্য গুনাহের জন্যও আযাব হয়। এই অভিমত আবুল হিকাম ইবনে বারখানও সমর্থন করেছেন। ইমাম কুরতুবীর অভিমত অনুযায়ী ঐ দুই কবরবাসী মুসলমান ছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, কুফরী ও শিরকের কারণে এদের আযাব হচ্ছিলো না। কারণ কুফরী ও শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ। এছাড়া এটা এমন কোন বিষয় নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল গুনাহগার মুসলমান যারা কবরের আযাবে লিপ্ত, তাদের জন্য সুপারিশ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, একবার জনৈক মুসলমান জিহাদে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হওয়ার পূর্বে তিনি একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই মুজাহিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, এই মুজাহিদের কবরে আগুনের চাদর প্রজ্জ্বলিত রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যুর পর কবরের আযাব হয় কিনা, কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয় কিনা

কবরের আযাব, কবরের প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, কবর জাহান্নামের অংশ বা জান্নাতের বাগিচা হয়ে যাওয়া, কবরের মৃত ব্যক্তিদের বসা ইত্যাদি বিষয় যারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে না, তাদেরকে কি বলা যেতে পারে। তাদের কথা হচ্ছে, যে কোন কবর খুলে দেখলে সেখানে অন্ধ ও বধির ফেরেশতা যাঁরা লোহার হাতুড়ি দ্বারা মৃতদেরকে প্রহার করেন তাঁদেরকে দেখা যায় না। সেখানে কোন অজগর সাপ বা প্রজ্বলিত আগুনও দেখা যায় না। এমনকি মৃত দেহের মধ্যেও এগুলোর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। মৃত দেহকে অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়, আর যদি মৃতদের চোখের উপর পারদ আর বুকের উপর সরষে রেখে দেয়া যায়, তাহলে সেগুলোকে ঠিক সে অবস্থায় দেখা যায়। এমনিভাবে কবরের সংকীর্ণতা বা প্রশস্ত তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। কবরের যে পরিমাণ জায়গা খনন করা হয় ঠিক তদ্রূপই দেখা যায়। ছোট্ট একটি কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহ, ফেরেশতা, বিবিধ আকৃতিধারী আমলসমূহ সে স্বল্প পরিসরে কিভাবে সংকুলন হতে পারে? বিদ'আতী ও গুমরাহ লোকদের ধারণা, যেসব কথা সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনায় আসে না তা অবশ্যই ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। ফাঁসি কাষ্ঠে দীর্ঘদিন মৃত ব্যক্তির দেহ লটকে থাকলে তখন তার সওয়াল জবাব কিভাবে হয়? কবরের মধ্যে দেহের কোন প্রকার নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায় না আর ঐ দেহে কোন আগুন ও দৃষ্টিগোচর হয় না। যেসব মৃত দেহকে হিংস্র জন্তু কিম্বা পাখিরা খেয়ে ফেলে এবং মৃত দেহের অংশগুলো তাদের পেটে হযম হয়ে যায় কিংবা যাদের দেহ পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় বা সমুদ্রে বা নদ-নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, মৃত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে অবস্থায় কি করে মৃত ব্যক্তিদের সওয়াল-জবাব হয়? কি করে ওদের সামনে ফেরেশতারা উপস্থিত হন? কি করে কবর জান্নাতের বাগিচা বা জাহান্নামের অংশে পরিণত হয়? কি করে তাদেরকে কবর চাপ দেয়? এসব বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

এক- এই সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কেরাম এমন কোন তথ্য প্রদান করেননি যা জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী বা একেবারেই অসম্ভব। বরং তাঁরা দু'রকমের খবর দিয়েছেন। ক. কোনগুলোতে এমন যে, যেগুলো সহজ ও সরল প্রকৃতির লোক মেনে নেয় এবং এগুলোর সত্যতা সাক্ষ্য প্রদান করে।

খ. আবার তাঁরা এমন সব কথা বলেছেন, যা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। যেমন, গায়েবের খবর, বরযখ ও কিয়ামতের বিস্তারিত বৃত্তান্ত, কবরের আযাব ও আরামের খুঁটি-নাটি বিষয় ইত্যাদি। আম্বিয়ায়ে কেরামের বর্ণিত বিষয়গুলো কখনো জ্ঞান বা যুক্তির পরিপন্থী নয়। তবে যে বিষয়গুলো সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার পরিপন্থী বলে ধারণা করা হয় সেগুলো দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। হয় সেটা মিথ্যা খবর যা আম্বিয়ায়ে কেরাম উল্লেখ করেননি বরং সেগুলো তাঁদের অভিমত বলে প্রচারিত। তবে সেটা বাতিল বুদ্ধি-বিবেচনা প্রসূত বা শয়তানী ধ্যান-ধারণাজনিত প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "হে নবী! জ্ঞানী লোকেরা ভালোভাবেই জানেন যে, আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে এটা মানুষকে পুরোপুরি সত্য এবং পরাক্রমশালী মহা প্রশংসিত আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।" (সূরা সাবা ঃ আয়াত-৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে অন্যত্র আরো ইরশাদ করেছেন, "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এই কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল-এর কতক অংশ অস্বীকার করে। বলো, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহ্বান করছি, আর তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।" (সূরা রাদ ঃ আয়াত-৩৬)

উল্লেখ্য যে, মানুষের বিবেক কখনো অসম্ভব কথায় পরিতৃপ্ত হয় না। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "হে মানব সমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে, এটা মানব মনের যাবতীয় ব্যাধির পূর্ণ নিরাময়কারী, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। হে নবী! বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে তিনি এটা পাঠিয়েছেন। এ জন্য তাঁদের আনন্দ উল্লাস করা উচিত। এটা সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ত করেছে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৫৭, ৫৮)

যা কিছু অবাস্তব ও অসম্ভব তার মধ্যে কোন রোগমুক্তি, হিদায়াত, রহমত আশা

করা যায় না এবং তাতে কেউ সন্তুষ্টও হতে পারে না। এরূপ সন্দেহে ঐসব লোক পতিত হয়, যাদের অন্তরে ঈমানের শিকড় সুদৃঢ় হতে পারেনি ও যাদের কদম ইসলামের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এজন্য তারা সব সময় সন্দেহ ও সিদ্ধান্ত হীনতায় এবং অস্থিরতায় ভোগে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোন বাণীর মর্মার্থ কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বাণীর এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত যেই অর্থের কোন গ্রহণযোগ্যতা ও সারবত্তা নেই। উপরোক্ত মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জ্ঞানী এবং মহৎ ব্যক্তির মধ্যে সঠিক উপলব্ধির অভাব দেখা যায়।

পক্ষান্তরে, ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারীদের নিয়ত কলুষিত ও বিকৃত হওয়ার কারণে মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা উল্টোটাই বুঝে। এভাবে দীনদার ব্যক্তিদের সাধনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা দেখা দেয়। আসলে, মারজিয়াহ, কাদরিয়া, খারিজী, মুতাযিলা, জাহমিয়াহ ইত্যাদি ফিরকার গুমরাহির এটাই প্রধান কারণ। এসব ভ্রান্ত ফিরকার কারণে দীন ইসলামের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণী থেকে ও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনের জ্ঞানের উৎস থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতিও তারা মোটেই কোন ভ্রূক্ষেপ প্রদান করেনি। উপরোক্ত অভিমতের স্বপক্ষে বহু উদ্ধৃতি বাদ দেয়া হলো। অন্যথায় এ সম্পর্কে দশ হাজারেরও বেশি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত গুমরাহ ফিরকার প্রবক্তারা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও শরী'আতের বিধি-বিধানকে মোটেই উপলব্ধি করতে পারেনি। বস্তুত পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা ও মর্মবাণীকে তাঁরাই যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা আগেকার দিনের হিদায়াতপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের আদর্শ ও ধ্যান ধারণার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত। ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরা অতি সুকৌশলে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য দীনী মাসয়ালা-মাসায়েলকে নানাভাবে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ফিরকার আবর্ত থেকে রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য তিন প্রকারের আবাসস্থল তৈরি করে রেখেছেন, যথা, দুনিয়া, বরযখ ও আখিরাত। এই সব আবাসস্থলের জন্য তিনি বিশেষ ধরনের নিয়ম-কানুন ও হুকুম-আহকাম তৈরি করেছেন। আর তিনি মানুষকে দেহ

ও রূহের দ্বারা সুগঠিত করেছেন। দুনিয়ার হুকুম-আহকাম দেহের উপরই প্রযোজ্য। এজন্যই শরীআতের হুকুম আহকাম, মানুষের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও কাজ কর্মের উপর কার্যকর হয়, তাদের মনের চিন্তাধারা ও কল্পনার উপর নয়। অপরপক্ষে বরযখী জীবনের হুকুম-আহকাম ও কার্যকারণ রূহের সাথে সম্পৃক্ত। পার্থিব ব্যাপারে রূহ দেহের অনুসরণ করে, মানুষ সুখ, দুঃখ ও ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। এর কারণ এই যে, দেহের মাধ্যমেই রূহ প্রভাবিত হয়। তেমনি বরযখে সুখ-দুঃখের সম্পর্ক সরাসরি রূহের সাথে হয়ে থাকে। আর রূহের মাধ্যমে দেহের উপরও এর প্রভাব পড়ে। দেহ হলো প্রকাশ্য একটি সত্তা। কিন্তু রূহ হলো অপ্রকাশ্য সত্তা। এছাড়া দেহ হলো রূহের অস্থায়ী নিবাস। তবে বরযখে রূহ হচ্ছে সক্রিয় একটি সত্তা, আর দেহ অপ্রকাশ্যভাবে কবরে বিদ্যমান থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর হিদায়াত ও অনুগ্রহে দুনিয়ার মধ্যে বরযখের একটি নমুনা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করেছেন। আমাদের স্বপ্নের মধ্যে যে আনন্দ ও দুঃখ বেদনা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে এটা রূহের মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং এর প্রভাব দেহের উপরও পড়ে। আবার কোন কোন সময় এরূপ স্বপ্ন এতো বেশি বাস্তবমুখী হয়ে থাকে যে, তার কার্যকারিতা নিদ্রা থেকে জেগে উঠার পরেও অনুভূত হয়। যথা কেউ স্বপ্নে দেখলো, কেউ তাকে প্রহার করছে, আর সে চিৎকার করছে, জাগ্রত হওয়ার পরে সে আঘাতের চিহ্ন তার দেহের মধ্যে দেখতে পায়। অথবা কেউ স্বপ্নে দেখলো, সে কোন কিছু খেয়েছে, জেগে উঠার পর সে খাবারের স্বাদ ঐ ব্যক্তি অনুভব করে থাকে। এমনকি একজন নিদ্রিত ব্যক্তির ক্ষুধা পিপাসাও এইভাবে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

এভাবে একজন নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা অবস্থায় দাঁড়িয়েও যায় এবং একজন জাগ্রত মানুষের ন্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যকে মারধরও করে। অথচ সেই ব্যক্তি তখনও নিদ্রিত অবস্থায় দুনিয়ার সকল বিষয় সম্পর্কে থাকে অনবহিত ও বিচ্ছিন্ন। রূহ যখন এইভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে তখন সময় সময় অন্য দেহের সাহায্যও গ্রহণ করে। কেননা রূহ যদি নিদ্রিত ব্যক্তির দেহে ফিরে আসতো তাহলে সে ব্যক্তি জেগেই যেতো আর সব বিষয় অনুভব করতে পারতো। অতএব কোন নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ যেমন একাকিত্বে প্রভাবান্বিত হয়, ঠিক তেমনি বরযখী রূহের একাকিত্ব আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়। মৃত্যুজনিত কারণে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক একেবারেই শেষ হয়ে যায় না, তখনও এক প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর পরে দেহ পুরোপুরি অটুট থাকুক অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটি, পানি বা অন্য

কিছুর সঙ্গে মিশে অন্য কোন আকৃতি বা রূপ ধারণ করুক, তবে কিয়ামতের দিন দেহ ও রূহ সরাসরি আযাব বা আরাম ভোগ করবে। এই রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে যখন উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের সমাধান হয়ে যাবে। আর এটাও বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কর্তৃক বর্ণিত কবরের আযাব বা আরাম, কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হওয়া, জাহান্নামের অংশ বা জান্নাতের উদ্যানে পরিণত হওয়া ইত্যাদি বিষয় বিবেক-বুদ্ধি সম্মত ও সন্দেহ বিবর্জিত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন, "অনেক কথাই সঠিক ও সত্য কিন্তু যে বুঝবে তার বোধ শক্তি হলো দুর্বল ও ক্ষীণ।"

এটা কি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, দু'জন লোক বিছানায় ঘুমুচ্ছে, কিন্তু একজনের রূহ নিআমত ভোগ করছে আর অন্যজনের রূহ শাস্তি ভোগ করছে। তারপর তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ নিজ দেহে কোন কোন সময় শান্তি বা শাস্তির চিহ্ন দেখতে পায়। আলমে বরযখের অবস্থা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক। বরযখও আখিরাতের বিষয়সমূহ মানুষের সাধারণ অনুভূতি ও উপলব্ধির নাগালের বাইরে। আল্লাহ্ তা'আলা বরযখ ও আখিরাতের বিষয়সমূহ দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, যা তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব যাতে করে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। দুনিয়াতেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। দুনিয়া থেকে বিদায়ী ব্যক্তি তাদেরকে দেখতে পায়। ফেরেশতারা তার কাছে এসে বসে যান ও তার সাথে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের নিকট জান্নাত বা জাহান্নামের কাফন, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ মওজুদ থাকে। তাঁরা উপস্থিত লোকজনদের দুআর সময় আমীনও বলে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তিকে সালাম করে থাকেন আর সে ব্যক্তি তাঁদের সালামের উত্তরও দিয়ে থাকেন। আর ঐ ব্যক্তি যদি সালামের উত্তর মুখে দিতে বা ইশারাও করতে না পারেন, তাহলে তিনি মনে মনেই এর জবাব দিয়ে থাকেন। এই কারণে কোন কোন সময় আসুন, আসুন, তাশরীফ নিয়ে আসুন, বলতে শোনা যায়। গ্রন্থকারের মহা সম্মানিত উস্তাদ থেকে বর্ণিত, জনৈক নেককার মৃত্যুপথ যাত্রী ঠিক তার শেষ মুহূর্তে আসুন, আসুন, তাশরীফ রাখুন ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে ফেরেশতাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

হযরত খাইরুন নাসসাজ (র) তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমি সবর করবো, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মাফ করুন, তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ তা অপরিবর্তনীয়, এর কোন হেরফের হবে না, আমার আয়ুর পেয়ালা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তিনি বলেছিলেন, এখন তোমরা তোমাদের রবের নির্দেশ পালন

করো, এই বলে তিনি চিরবিদায় নিয়েছিলেন। হযরত খাইরুন নাসসাজ (র) এর উক্ত ঘটনাটি বহুল প্রচারিত ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) যে দিন শেষ বিদায় নেবেন, সেদিন তিনি বলেছিলেন, আমাকে তুলে বসাও। সেখানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে উঠিয়ে বসালেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, আমি হচ্ছি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম পালনে অবহেলা করেছি, আর গুনাহ করতে সংকোচবোধ করিনি। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পাঠ করলেন এবং মাথা তুলে মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন। সে অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, আমি এমন অদ্ভুদ ধরনের আকৃতিধারীদেরকে দেখছি যাঁরা ইনসান বা জিন নন। তারপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, হযরত মাসলামাহ (র) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর অন্তিম সময়ে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে আমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে বললেন। আমরা সবাই বাইরে চলে গেলাম এবং একটি গম্বুযের পাশে বসে গেলাম তখন একজন মাত্র খাদিম তাঁর কাছে ভেতরে রইলো। সে সময় তিনি কুরআন শরীফের যে পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন সে আয়াতের অর্থ হলো, "এই পরলোকের ঘর যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য; যারা দুনিয়াতে বড় হতে চায় না, অশান্তি সৃষ্টি করে না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম"। (সূরা আল-কাসাস ঃ আয়াত-৮৩)

এই পবিত্র আয়াত পাঠের পর তিনি বলে উঠলেন– "নিশ্চয় তোমরা মানুষও নও, জিনও নও"। তারপর খাদিম বাইরে এসে আমাদেরকে ভেতরে যেতে বললো। আমরা ভেতরে গিয়ে দেখলাম তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন।

হযরত ফুযালা ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' (র)-এর অন্তিম সময়ে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন, "হে আমার ফেরেশতা, এসো, যাবতীয় ক্ষমতা ও শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ"। সেই সময় অতিশয় প্রিয় ও প্রাণ মাতানো খুশবু ভেসে এলো। তারপর তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো এবং তিনি চিরবিদায় নিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সমর্থনে বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা

তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না"। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত-৮৩-৯৫)

অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তোমাদের চেয়েও বেশি তার নিকটবর্তী হন, কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে দেখতে পাও না। এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত আর বরযখী জীবনের শুরু। এ কারণেই মৃত্যু পথযাত্রীর সামনে থেকে পর্দা তুলে দেয়া হয়। সে সময়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যা কিছু দেখতে পায়, দুনিয়ার মানুষ তা দেখতে পায় না। অতঃপর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে রূহকে সম্বোধন করেন এবং সেই রূহকে কবয করে নেন। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকজনেরা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান না, তাঁদের কথাও শুনতে পান না। এইভাবে দেহ থেকে রূহ বের হয়ে আসে। নেককার বান্দার রূহ থেকে তখন সূর্যের কিরণের ন্যায় আলো এবং মেশকের চেয়ে অধিক প্রাণ মাতানো খুশবু ভেসে আসতে থাকে। উপস্থিত লোকজনেরা সে আলোর কিরণ দেখতে পান না, তবে সে খুশবু অনুভব করে থাকেন। তারপর ফেরেশতারা যে রূহকে আকাশে নিয়ে যান, তাও কেউ দেখতে পায় না।

রূহকে আবার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সেই রূহ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া সবকিছু প্রত্যক্ষ করে আর বলতে থাকে; "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি করো? কিন্তু তার এসব কথা মানুষ শুনতে পায় না। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা লাশকে মাটি দেয়ার পর কবরে আসেন। তাঁদের জন্য কবরের উপরের মাটি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। মাটি খুঁড়ে, পাথর কেটে তার মধ্যে লাশ রেখে সীসা গালিয়ে কবরের মুখ সীল মোহর করে দিলেও, ফেরেশতারা লাশের নিকট পৌছে যান। কেননা স্থূলবস্তুকে সূক্ষ্মদেহী ফেরেশতারা অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারেন। এমনকি জিনেরাও সেসব বাধা অতিক্রম করতে পারে। পাখিরা যেমন হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় ফেরেশতারাও তেমনি স্থূলবস্তু জগতে সাঁতরিয়ে বেড়ান।

একজন নেককার বান্দার জন্য তাঁর কবরের প্রশস্ততা কোন মাধ্যম ছাড়াই হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, রূহের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তবে দেহের জন্য কবরের প্রশস্ততা রূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আলমে বরযখের ঘটনাবলী রূহের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর দেহের সাথে রূহের মাধ্যমে সেটা কার্যকর হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবরের মধ্যে নেককার বান্দার লাশ দু'তিন হাত জায়গায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে কবর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। যদি কোন কবর খুলে দেখা হয়, তাহলে লাশটিকে স্বাভাবিক অবস্থায়ই দেখা যায়। কিন্তু কবর

কোন কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, এদিকের পাঁজরের হাড় ওদিকে ও ওদিকের পাঁজরের হাড় এদিকে ঢুকে পড়ে। এই যে অবস্থা এটা সাধারণ উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও সহজাত ধ্যান-ধারণার বহির্ভূত একটি ব্যাপার। যদি কোন লাশ কবর ছাড়া অন্য কোথাও রাখা হয় তবুও একথা বলা যাবে না যে সে লাশটি কবরের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত কবরের এই সব ঘটনাবলী যারা বিশ্বাস করে না তারা ধর্মহীন বা বেঈমান ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিশ্বস্ত ও নেককার ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি তিনটি কবর খনন করেছিলেন। খনন করার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে দু'জন ফেরেশতা সেখানে নেমে আসলেন এবং উক্ত তিনটি কবরের মধ্যে থেকে একটি কবরের নিকট দাঁড়িয়ে ফেরেশতারা একে অপরকে বললেন, এ কবরটির পরিধি হবে তিন মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ, লিখে নিন। তারপর দ্বিতীয় কবরটির নিকট গিয়ে তাঁরা বললেন, এর আয়তন হবে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া, এটাও লিখে নিন। তারপর তৃতীয় কবরটির কাছে গিয়ে বললেন, এর আয়তন হবে মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া, লিখে নিন। এরপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। এর মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির জানাযা সেখানে নিয়ে আসা হলো। তাঁকে প্রথম কবরটিতে দাফন করা হলো। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির জানাযা আনা হলো। তাঁকে দ্বিতীয় কবরটিতে দাফন করা হলো। অবশেষে শহরের একজন বিখ্যাত ও মালদার মহিলার জানাযা আনা হলো। সেই জানাযায় শহরের প্রত্যেক এলাকার সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শরীক হলেন। সেই জানাযায় ছিলো মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। তৃতীয় কবরটিতে সেই মহিলাটিকে দাফন করা হলো, যে কবর সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেছিলেন যে, এটার আয়তন হবে মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া।

কবরের আগুন ও কবরের বাগান, দুনিয়ার আগুন ও দুনিয়ার বাগানের মতো নয় যে, দুনিয়ার মানুষ তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। বরং আখিরাতের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর আখিরাতের বাগান দুনিয়ার বাগানের চেয়ে অনেক বেশি মনোরম। আখিরাতের অবস্থা দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, বরং যে মাটি ও পাথরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় আল্লাহ তা'আলা সেই মাটি ও পাথরকে উত্তপ্ত করে দেন। আর সেগুলো দুনিয়ার সাধারণ মাটি ও পাথরের চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা স্পর্শ করলেও বিন্দুমাত্র গরম অনুভব করে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কবরের ঐ মাটি ও পাথরকে মনোরম বাগ-বাগিচায় পরিণত করে দেন। এমনকি একই

কবরের দু'ব্যক্তি সমাহিত হলেও একজনের জন্য সেই কবরটি জাহান্নামে পরিণত হতে পারে, আর এর উত্তাপ অন্যজনের অনুভূত হয় না। একইভাবে কবরে সমাহিত অপর ব্যক্তির জন্য জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য আরামদায়ক নিআমত ও সুখ অপর ব্যক্তির অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ মহান আল্লাহর কুদরত এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ায় তাঁর কুদরতের আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না, সেগুলোকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ্ সেসব বিষয়ে উপলব্ধি করার জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছেন ও অসত্য থেকে রক্ষা করেছেন তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অপরপক্ষে, কাফিরদের কবরে আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যার ফলে তাদের কবর তন্দুরের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। কাফিরদের এই অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন কোন বান্দাকে অবহিত করে থাকেন যদিও অন্যদের কাছে তা অজ্ঞাত থেকে যায়। কবরের এ অবস্থা সবই যদি জানতে পারে তাহলে গায়েবের প্রতি মানুষের ঈমান কি করে ঠিক থাকবে? সেক্ষেত্রে মানুষ মৃতদেরকে কবরে দাফন করাই ছেড়ে দেবে। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা মৃতদের দাফন করা ছেড়ে দেবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, যেন আমার ন্যায় তোমাদেরকেও তিনি কবরের আযাব দেখিয়ে দেন ও শুনিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম) যেহেতু পশুদের মধ্যে এ রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি নেই তাই এরা কবরের আযাব শুনতে পায় এবং বুঝতেও পারে। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর কবরবাসীর কবরের আযাব শুনে এমন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিলো মনে হচ্ছিলো যেন তাঁকে তার পিঠ থেকে ফেলে দেবে।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে উযায়ের হার্রানী (র) বলেন, আমি 'আমদ' নামক স্থানে আসরের নামায পড়ে আমার ঘর থেকে বের হয়ে একটি বাগানের দিকে গেলাম এবং সূর্যাস্তের একটু আগে কয়েকটি কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, একটি কবর কর্মকারের চুল্লীর মতো জ্বল জ্বল করছে। আর মৃত ব্যক্তি সেই কবরে সমাহিত আছে। আমি আমার চোখ ঘসতে লাগলাম এবং ভাবতে লাগলাম, আমি কি জেগে আছি নাকি ঘুমিয়ে আছি। তারপর শহরের পাঁচিল দেখে আমার সম্বিত ফিরে এলো। বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় বাড়িতে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসলাম। আমার সামনে খাবার দেয়া হলো কিন্তু আমি তা খেতে পারলাম না। পরে আমি শহরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম,

ঐ কবরে আজকেই একজন যালিম কর আদায়কারীকে দাফন করা হয়েছে। কবরের আযাবের এরূপ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন সময় নেককার বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন, যেমনি তিনি কোন কোন সময় জিন অথবা ফেরেশতাকে দেখিয়ে দেন।

হযরত শা'বী (রা) থেকে বর্ণিতঃ একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরয করলো, আমি বদরের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম একজন মানুষ মাটির নিচ থেকে বের হয়ে আসছে এবং অপর এক ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করছে। পিটুনী খেতে খেতে ঐ লোকটি আবার মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার বের হয়ে আসছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই লোকটি হলো আবু জাহল, কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক লিখিত 'কিতাবুল কুবূর' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

এই সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি আমার সওয়ারীতে চড়ে পবিত্র মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে সফরের জিনিসপত্র বাঁধা ছিলো। পথিমধ্যে একটি কবরস্থান অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি তার কবর থেকে উঠে এলো, তার সারা দেহে আগুন জ্বলছিলো। তার ঘাড়ে একটি শিকল বাঁধা ছিলো। সে এটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমাকে দেখে সে বললো, "আবদুল্লাহ! আমার উপর পানি ছিটিয়ে দাও।" জানিনা সে আমাকে চিনতো কিনা, না কি লোকাচার হিসেবে সে আমাকে "আবদুল্লাহ' নাম ধরে ডাকছিলো। এর মধ্যে অপর এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে এসে বললো, "হে আবদুল্লাহ! এর উপর পানি ছিটিওনা।" তারপর সেই ব্যক্তি তার শিকল ধরে টেনে হেঁচড়ে তাকে কবরের ভেতর নিয়ে গেলো। তখন আমি সওয়ারীর উপর চেতনা হারিয়ে ফেললাম। আর সওয়ারীটি আমাকে বয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলো। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

হযরত উরওয়াহ (রা)ও উপরে বর্ণিত ঘটনাটি কিঞ্চিত শব্দগত পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই ভয়াবহ ঘটনাটির কারণে আমার মাথার চুল রাতারাতি সাদা হয়ে গিয়েছিলো। আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে এই ঘটনাটি জ্ঞাত করলে, তিনি মুসলমানদেরকে ঐ পথে একাকী ভ্রমণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

হযরত আবূ কুযাআ (রা) বলেন, আমি একবার একটি পানির কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যা বসরার রাস্তায় অবস্থিত ছিলো। তখন সেখানে গাধার চিৎকারের ন্যায় একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি তখন লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এ গাধার আওয়ায কোত্থেকে আসছে? এটা কিসের আওয়ায? লোকেরা বললো, এক ব্যক্তি আমাদের নিকটেই বসবাস করতো। যখন তার মা তার সাথে কথা বলতেন তখন সে বলতো, তুমি গাধার মতো চেচাচ্ছো কেন? ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার কবর থেকে প্রত্যহ গাধার আওয়ায শুনা যাচ্ছে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

হযরত আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত ঃ মদীনায় একজন লোক বাস করতেন। তাঁর বোনও মদীনার শহরতলীতে বাস করতো। তাঁর বোনটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখাশুনার জন্য প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। একদিন তাঁর সেই বোনটি মারা গেলে তাকে দাফন করা হলো। এরপর তাঁর মনে হলো ভুলবশত তাঁর কোন একটি জিনিস কবরের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর এক বন্ধুকে সাথে করে কবর খুঁড়ে তাঁর পড়ে যাওয়া জিনিসটি উদ্ধার করলেন। এরপর তাঁর সাথীকে বললেন, তুমি একটু সরে দাঁড়াও। আমি আমার বোনকে এক নজর ভালো করে দেখে নেই, সে কি অবস্থায় আছে। তখন তিনি দেখতে পেলেন সেই কবরের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তিনি তাড়াতাড়ি কবরটি ঠিক করে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তোর বোনকে কি অবস্থায় দেখলি? তিনি বললেন, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন না। সে তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনি আমাকে বলুনতো সে কি কি কাজ করতো? মা বললেন, "সে দেরীতে এবং বিনা ওযূতে নামায পড়তো, আর প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শুনতো।" (সূত্র ঃ ইবনে আবিদ দুনিয়া)

মারশাদ ইবনে হাওশ কর্তৃক আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ তিনি একদিন ইউসুফ ইবনে উমরের নিকট বসা ছিলেন। তার নিকট আর একজন লোকও উপস্থিত ছিলো যার একটি গাল ছিলো লোহার পাতের মত শক্ত। ইউসুফ লোকটিকে বললো, মারসাদকেও তোমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাটি শুনাও। লোকটি বললো, আমি তখন নওজোয়ান ছিলাম, পাপকে ততোটা ভ্রূক্ষেপ করতাম না। একবার প্লেগ মহামারী দেখা দিলে আমি ইচ্ছা করলাম সীমান্তের ওপারে চলে যাবো। তারপর ঠিক করলাম, আমি কবর খনন করবো ও কাফন চুরি করবো। একদিন মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আমি একটি কবর খনন করলাম এবং অন্য একটি কবরের মাটির সাথে হেলান দিয়ে বসলাম। এর মধ্যে

একটি লাশ আনা হলো এবং একে খনন করা কবরে দাফন করা হলো। লোকজন চলে গেলে আমি দেখলাম উটের ন্যায় বিরাট আকৃতির দু'টি সাদা রংয়ের পাখি পশ্চিম দিক থেকে এসে একটি কবরের শিয়রের দিকে এবং অপরটি পায়ের দিকে নামলো আর উভয়ের কবরের মাটি সরালো। তারপর একটি পাখি কবরে প্রবেশ করলো আর অপরটি কবরের ধারে রইলো। আমি এই অবস্থায় ভয় পেলাম না। আমি শুনতে পেলাম ঐ পাখি মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলছে, তুমি গেরোয়া রংয়ের পোশাক পরে গর্ব ও অহঙ্কার সহকারে কি তোমার শ্বশুরালয়ে যেতে না? মৃত ব্যক্তি বললো, আমি এখন খুবই দুর্বল। তারপর পাখিটি তাকে এমন আঘাত করলো, এতে তার কবর তেল ও পানিতে ভরে গেলো। এমনিভাবে পাখিটি তাকে তিনবার আঘাত করলো, আর প্রত্যেক বারই একই কথা বললো। প্রত্যেকবার কবরটি তেল ও পানিতে ভরে যেতো। পাখিটি এরপর মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ওহে, এখানে বসে আছো কেন? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত থেকে তোমাকে দূরে রাখুন। এরপর পাখিটি আমার গালে তার পাখা দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলো যে আমি মাটিতে পরে গেলাম এবং সারারাত সেখানেই সে অবস্থায় পরে রইলাম। ভোর বেলা দেখলাম, কবরটি যেমন ছিলো তেমনই আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও ঐসব তেল ও পানি মনে হয়েছিলো আসলে তা ছিলো জলন্ত আগুন যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ জ্বলছিলো। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, তার কাছে পানি ও আগুন থাকবে। ঐ আগুন হবে আসলে শীতল পানি, আর ঐ পানি হবে শিখা বিশিষ্ট আগুন।

জনৈক অসৎ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত ঃ সে ছিলো কাফন চোর। সে কবর খুলে কাফন চুরি করতো। তখন সে দেখতে পেতো, কোন কোন মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার বিপরীত দিকে ঘুরানো। এই অবস্থা দেখে সে অনুতপ্ত ও ভীত হয়ে গেলো। এই ঘটনাটি হযরত আবূ ইসহাক ফাযারী (র)-কে জানানো হলে, তিনি চুপ রইলেন ও ইমাম আওযায়ী (র)-কে লিখিতভাবে জানালেন। উত্তরে ইমাম আওযায়ী (র) বললেন, কাফন চোরের তাওবাহ কবুল হবে যদি সে খালিস নিয়তে তাওবাহ করে এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়। আর যাদের মুখ কিবলার বিপরীত দিকে ঘুরানো ছিলো তারা সুন্নাতের পরিপন্থী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। তাই তাদের এই অবস্থা।

অন্য একজন কাফন চোর যে তাওবাহ করেছিলো, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তোমার জীবনে দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনাটা কি? সে বললো, একবার

আমি একজন মৃত ব্যক্তির কবর খুলে দেখতে পেলাম, তার সারা শরীরে পেরেক মারা রয়েছে। একটি বড় পেরেক ছিলো তার মাথায় ও আরেকটি বড় পেরেক ছিলো তার পায়ে।

আরো একজন কাফন চোরকে তার জীবনের আশ্চর্যজন ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিলো, সে একজন মৃত ব্যক্তির কবরে তার মাথার খুলি সীসায় ভর্তি অবস্থায় দেখেছিলো। অপর এক কাফন চোরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তোমার তাওবাহ করার কারণ কি? সে বলেছিলো, কবর খুঁড়লে পর সাধারণত মৃতদের মুখ কিবলার উল্টো দিকে ঘুরানো অবস্থায় দেখা যেতো। এই অবস্থা দেখে আমি তাওবাহ্ করে কাফন চুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। (সূত্র ঃ কিতাবুল কুবূর)

হযরত আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাসসাব সালামী (র) একজন অতি নেককার ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার একজন লোক বাগদাদ নগরীর বাজারে জনৈক কর্মকারের নিকট দু'মাথা বিশিষ্ট ছোট ছোট কিছু পেরেক বিক্রয় করেছিলো। ঐ কর্মকার পেরেকগুলোকে নরম করতে চাইলো কিন্তু আগুন ও হাতুড়ির পিটুনীতে সেগুলো নরম হলো না। সে খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে বসে রইলো। পরে ঐ কর্মকার পেরেক বিক্রেতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এসব পেরেক তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছো? সে বললো, এগুলো আমার নিকট ছিলো। অবশেষে পীড়াপীড়ি করায় সে বললো ঃ এসব পেরেক আমি একটি খোলা কবরের ভেতর পেয়েছি এবং এগুলোর সাথে মৃতের হাড়গোড় আটকানো ছিলো। আমি পেরেকগুলোকে হাড়গোড় থেকে খুলে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পাথর দিয়ে মৃত ব্যক্তির হাড়গুলো ভেঙ্গে এসব পেরেক বের করে এনেছি। হযরত আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাসসাব সালামী (র) বলেন, আমি এ পেরেকগুলো দেখেছি, সেগুলো দেখতে ছোট ও দু'মাথা বিশিষ্ট ছিলো।

হযরত আবুল হুরায়েশ (র) থেকে বর্ণিত ঃ আমার আম্মা আমাকে বলেছেন, খলীফা আবূ জাফর যখন কুফা নগরীতে পরিখা খনন করালেন, তখন লোকেরা তাদের আত্মীয় স্বজনের লাশ সেখান থেকে সরিয়ে নিলো। আমি ঐ সব মৃতদের মধ্যে একজন নওজোয়ানকে দেখতে পেলাম, সে নিজের হাত কামড় দিয়ে আছে।

হযরত সাম্মাক ইবনে হারব (র) কর্তৃক বর্ণিত ঃ একদা হযরত আবূ দারদা (রা) কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "হে কবরবাসীরা! তোমাদের কবরের উপরের দিকে কতো শান্তি আর ভেতরে কতই না অশান্তি বিরাজমান।

কবরের আযাব সম্পর্কে হযরত সাবিতুল বানানী (র) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন

তিনি কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর পেছন থেকে এক আওয়ায আসলো। তিনি শুনতে পেলেন, হে সাবিত! কবরস্থানের নীরবতায় ধোঁকা খেয়ো না। কারণ এদের মধ্যে অনেক দুঃখী ও হতভাগ্য লোক রয়েছে। তিনি পেছনে ফিরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই।

হযরত হাসান (রা) কোন এক সময়ে এক কবরস্থান দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, এখানকার মৃতদের অবস্থা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কারণ এদের অবস্থা বাহ্যিকভাবে নীরব ও নিথর, অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই চরম অশান্তিতে আছে।

খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিক (র)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পিতাকে কে দাফন করেছিলো? তিনি উত্তর দিলেন, একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অলীদকে কে দাফন করেছিলো? মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিক বললেন, আমার আর এক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তখন বললেন, এ বিষয়ে আমি যা জানতে পেরেছি, আমি তোমাকে তাই বলছি। যখন তোমার পিতাকে ও অলীদকে দাফন করা হয়, আর তাদের কাফনের গিরা খোলা হয় তখন তাদের মুখ উল্টোদিকে ঘুরানো ছিলো। হে মাসলামাহ! শোন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে কবরে রাখার পর, তুমি আমার মুখ খুলে দেখবে তাদের মতো আমার মুখও কিবলার উল্টো দিকে ঘুরানো, নাকি আমাকে ওদের অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মাসলামাহ (র) বলেন, আমি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর লাশ কবরে রাখার পর তাঁর মুখ দেখেছিলাম, তা যেমনটি কিবলামুখী করে রাখা হয়েছিলো, ঠিক তেমনি আছে।

আগেকার দিনের জনৈক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর একটি মেয়ে মারা গেলে তিনি তার লাশকে কিবলামুখী করে নিজ হাতে কবরে রাখলেন। পরে সেই কবরের ইট ঠিক করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, লাশের মুখ কিবলার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, মেয়েটি তাঁকে বলছে আব্বাজান, আপনি আমার মুখ কিবলার উল্টো দিকে ফিরা অবস্থায় দেখে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। সাধারণত আমার আশেপাশের সকল লাশই কিবলার থেকে বিপরীতমুখী। এর কারণ হলো, যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় মারা যায়, মৃত্যুর পর তাদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হয়ে থাকে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত ঃ অলীদ ইবনে আবদুল মালিককে যাঁরা কবরে নামিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। তিনি তাকে যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, এতে তাঁর ছেলে বলেছিলেন, "কাবার রবের কসম, আমার পিতা এখন কবরের মধ্যে ভালো অবস্থায় আছেন।" হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এই কথা শুনে বলেছিলেন, "কাবার রবের কসম! তোমার পিতার দুনিয়ার জীবনও সুখের এবং শান্তির ছিলো।" এ ঘটনা থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ইয়াযীদ ইবনে মুহলাবকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন, তখন তাঁকে উপদেশস্বরূপ বলেছিলেন, "আল্লাহকে ভয় করে চলবে। তাহলে মৃত্যুর পর কবরে তুমি শান্তিতে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মালিকের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাকে দাফনের পর ভালো অবস্থায় দেখা গিয়েছিলো।"

হযরত আবদুল হামীদ (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট একদিন বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু লোক এসে জানালো– তাঁরা হজ্জে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় "যুল সাফফাহ" নামক স্থানে তাঁদের একজন সাথী মারা যান। তাঁরা তাঁর দাফনের জন্য কবর খনন করেন। যখন কবর তৈরি হলো তখন একটি কালো রংয়ের সাপ এসে কবরে ঢুকে পড়লো। এই অবস্থায় তাঁরা সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় আর একটি কবর খনন করেন। সেখানেও ঐ সাপটি চলে এলো। তাঁরা তৃতীয় জায়গায় আর একটি কবর খনন করলেন। সেখানেও সাপটি এসে হাযির হলো। এই অবস্থায় তাঁরা তখন কি করবেন। তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর শরণাপন্ন হলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, এটা তার চুরি করার পরিণাম। যাও, তাকে যে কোন একটি কবরে রেখে দাও। আল্লাহর কসম, দুনিয়ার যে কোন জায়গায় তার কবর খনন করা হোক না কেন, ঐ সাপটি সেখানে যাবেই। অবশেষে তাঁরা ঐ লোকটিকে একটি কবরে দাফন করে দিলেন। হজ্জের শেষে তাঁরা তার সামান-পত্র তার বাড়িতে পৌছে দিলেন এবং তার বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন– "তোমার স্বামী কি কাজ করতো? তার স্ত্রী বললো, "সে খাদ্য শস্যের ব্যবসা করতো। খাদ্য শস্যের মধ্য থেকে পরিবারের জন্য প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য সরিয়ে নিতো এবং সে পরিমাণ অন্য কোন জিনিস শস্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতো।

হযরত আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত ঃ তাঁকে এক মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার জন্য ডাকা হলো। তিনি যখন মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে চাদর সরালেন, তখন দেখতে পেলেন, তার ঘাড়ে একটি বড় আকারের সাপ জড়িয়ে আছে। অবশেষে তিনি

তাকে গোসল না দিয়েই চলে এলেন। লোকেরা তখন বলতেছিলো- "ঐ ব্যক্তি নাকি মহান সাহাবাগণকে গালি-গালাজ করতো।" তাই তার এই পরিণতি।

বসরাবাসী জনৈক কবর খননকারী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন একটি কবর খুঁড়লেন এবং পরে ঐ কবরের নিকট ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন তাঁর নিকট দু'জন মহিলা আসলেন। তন্মধ্যে একজন মহিলা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর ওয়াস্তে ঐ মহিলার লাশটি আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে আমার পাশে দাফন করো না। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ইতিমধ্যে এই কবরের নিকট একজন মহিলার জানাযা আনা হলো। তখন তিনি ঐ মহিলার লাশটিকে এ কবরে দাফন না করে অন্য কবরে দাফন করতে বললেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে আবার সেই দুইজন মহিলা তাঁকে দেখা দিলেন। একজন মহিলা তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার নিকট থেকে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি সরিয়ে দিয়েছো। তিনি বললেন, এই মহিলা কেনো আপনার মতো কোন কথা বলছেন না? তিনি বললেন, এই মহিলা মৃত্যুর পূর্বে প্রয়োজনীয় কোন অসিয়ত ও উপদেশ না দিয়েই মারা গিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারবেন না। (কবরের এই সব বিষয় সম্পর্কে যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁরা ইবনে আবিদ দুনিয়ার 'কিতাবুল মানামাত' এবং কাইরাওয়ানীর 'কিতাবুল বুস্তান' পাঠ করতে পারেন।)

আলমে বরযখের ঘটনাবলীর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দুনিয়াতেও ঘটতে দেখা যায়। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হতেন ও কথা বলতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর কথা শুনতে পেতেন। অথচ তাঁর আশেপাশের লোকজন তাঁকে দেখতে পেতেন না এবং তাঁর কথাও শুনতে পেতেন না। সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা ছিলো ঠিক এ রকম। কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঘণ্টা ধ্বনির শব্দের মতো অহী আসতো, যা তিনি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেতেন না। যেমন জিনেরা আমাদের মধ্যে অবস্থান করে ও উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলে, কিন্তু আমরা তাদের কথাবার্তা শুনতে পাই না। কোন কোন সময় ফেরেশতারা কাফিরদেরকে চাবুক মেরেছেন সেজন্য তারা চিৎকারও করতো। মুসলমানেরা নিকটে থেকেও ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেতেন না, তাঁদের কথাও শুনতে পেতেন না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়ার অনেক বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতেন অথচ উপস্থিত লোকজন তা শুনতে পেতেন না। প্রকৃতপক্ষে, যিনি আল্লাহর খাসবান্দা এবং তাঁর একচ্ছত্র কুদরতে বিশ্বাস করেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর অপার করুণায় ঐসব ঘটনাবলী যা সাধারণ মানুষ দেখতে বা বুঝতে পারে না তা তাঁকে অবহিত করেন। এটা কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে?

সাধারণ মানুষের দর্শন ও শ্রবণ শক্তি কবরের আযাব বা আরাম প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে পারে না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর খাস বান্দা কবরের ঐসব ঘটনাবলী বুঝতে পারেন ও শুনতে পারেন। কেউ কেউ কবরের ঐসব দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে যান, এমনকি মৃত্যুবরণও করে থাকেন। এসব ঘটনাবলীকে রহস্যগত কারণে আল্লাহ পাক যে আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। বরযখী জীবনে যখন এই সব রহস্যের অবসান ঘটবে তখন সবকিছু আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। এছাড়া একজন মানুষ কোন মৃত ব্যক্তির চোখ থেকে পারদ বা বুক থেকে সরষে তুলে অতিসত্বর ঐগুলো স্বস্থানে রেখে দিতে পারে, তাহলে ফেরেশতারা তো এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি যে কোন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা পুরস্কৃত করতে পারেন।

বরযখী জীবনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্পর্কে কোন অনুমান করা মূর্খতা ও গুমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর রাসূল এটাকে অস্বীকার করা, আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে অস্বীকার করারই শামিল। মানুষ একটি কবরকে প্রশস্ত বা সংকীর্ণ রূপে তৈরি করে, একটি লাশ সেখানে আড়াল করে রাখতে পারে বা নাও রাখতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একজন নেককার বান্দার ক্ষেত্রে একটি কবর দৃশ্যত দু'আড়াই হাত গভীর দেখা গেলেও সেটা অনেক প্রশস্ত, সুগন্ধিযুক্ত ও আলোময় হতে পারে। শুধু তাই নয়, বদকার ব্যক্তিদের কবর অতিশয় সংকীর্ণ, দুর্গন্ধময় ও অন্ধকার হতে পারে। তবে কবরের এই রূপ অবস্থা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি বা অনুভব করা সম্ভবপর নয়।

দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সেসব প্রত্যক্ষ করার শক্তি ও জ্ঞান দিয়েছেন। তবে আখিরাতের ঘটনাবলীর উপর পর্দা টেনে দিয়েছেন যাতে মানুষ ঐসব বিষয় না দেখেও বিশ্বাস করে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। বান্দার রহস্যের এ পর্দা যখন তুলে নেয়া হয়, তখন তার রূহ সব কিছুই দেখতে পায়। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির লাশ মানুষের সামনে রাখা থাকলেও ফেরেশতারা

এসে মৃত ব্যক্তিকে যেসব প্রশ্ন করেন, মৃত ব্যক্তি ফেরেশতাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। তবে জীবিত মানুষ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায় না ও তাদের কথাও শুনতে পায় না। সেই অবস্থায় একজন মৃত ব্যক্তি যে আযাব বা আরাম ভোগ করেন মানুষের পক্ষে তা জানা বা অনুভব করা সম্ভব নয়।

এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দুজন লোক একই বিছানায় শুয়ে থাকার পর একজন ঘুমিয়ে পড়ে অপরজন জেগে থাকে। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাকে প্রহার করা হচ্ছে, সে প্রহারের ব্যথাও অনুভব করছে কিন্তু তার পাশে জাগ্রত ব্যক্তি ঐসবের কোন কিছুই বুঝতে বা জানতে পারে না। এরূপ আঘাত ও কষ্টের চিহ্ন দেহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, যদিও রূহও সেই কষ্ট অনুভব করে। এটা কতোই না মূর্খতা ও মূঢ়তার বিষয় যে, কবরের পাথরের দেয়াল ভেদ করে মৃত ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাদের উপস্থিতিকে এক শ্রেণীর লোক অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের জন্য সবকিছু অতিসহজ করে দিয়েছেন- যেমন পাখিরা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। তাই কোন স্থুলবস্তু যে রূহের কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ধরনের আকীদা পোষণ করা মাহন রাসূলগণকে অস্বীকার করারই শামিল।

জড় পদার্থেও অনুভূতি ও সচেতনতা বিদ্যমান থাকে। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত কোন ব্যক্তি অথবা সমুদ্রে ডুবন্ত কোন ব্যক্তি, আগুনে ভস্মীভূত কোন দেহ অথবা অন্য যে কোন ধরনের লাশের মধ্যে রূহকে ফিরিয়ে আনা আল্লাহ পাকের জন্য কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। কেননা রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এটা সে ধরনের কোন জ্ঞান নয় যা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। একজন বেঁহুশ ব্যক্তি অথবা একজন মৃগী রোগী অথবা একজন অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি যখন জীবিত থাকে তখন তার রূহ তার দেহের মধ্যেই থাকে। কিন্তু সেই অবস্থায় তার জীবনী শক্তির স্বাভাবিক অবস্থা কেউ অনুভব করতে পারে না। যেসব লাশের অংশগুলো পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের চেতনা বা অনুভূতি সম্পর্কে আমরা কোন কিছুই জ্ঞাত নই। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মৃত ব্যক্তির নিশ্চিহ্ন অঙ্গগুলোর মধ্যে রূহকে ফিরিয়ে আনা মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। সেই মৃত ব্যক্তির কোন অংশ যদি মাশরিকে আর কোন অংশ মাগরিবে থাকে, তবুও ঐ অঙ্গগুলোর মধ্যে আযাব বা আরাম দেয়া আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলার জড়বস্তুর মধ্যেও অনুভূতি এবং সম্যক উপলব্ধি করার শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আল্লাহর ভয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পরে, পাহাড় ও বৃক্ষরাজি তাঁকে সিজদাহ করে। পাথরের টুকরো, বৃক্ষরাজি এবং পানির বিন্দুরাশি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায় রত। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এ সৃষ্ট জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৪৪)

আল্লাহর এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ যদি এদের স্রষ্টার কেবল অস্তিত্বকে প্রমাণ করা বুঝায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনো বলতেন না, "তোমরা তাসবীহ পাঠ ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারো না।" কেননা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, সৃষ্টি দ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়। প্রতিটি সৃষ্টিই পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আমি পর্বতমালাকে তার [দাউদ (আ)-এর] অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।" (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-১৮)

প্রকাশ থাকে যে, আপন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করাই কেবল উক্ত দু'টি সময়ের অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষীসকল, তোমরাও। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম।" (সূরা সাবা ঃ আয়াত-১০)

উল্লেখ্য যে, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি পরোক্ষভাবে সম্মান প্রদর্শন বা তাসবীহ পাঠ হযরত দাউদ (আ)-এর কোন নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ ব্যাপার ছিলো না। ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে বলে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা, ধ্বনি প্রতিধ্বনির সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, যে কোন শব্দেরই প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে। কাজেই হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে এ বিষয়ে সম্পর্কিত করার মধ্যে কোন নতুন কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আপনি কি দেখেন না, সবই আল্লাহকে সিজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে– সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে

অনেকে। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আপনি কি দেখেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীসকল তাদের পাখা বিস্তার করত আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এছাড়া প্রত্যেকেই তার যথার্থ ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নিয়ম কানুন জ্ঞাত আছে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-৪১)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেলো যে, এই সালাত ও তাসবীহর গুঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, যদিও এই বিষয়টি মূর্খেরা অথবা নবীদের উপর মিথ্যা আরোপকারীরা অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা পাথর সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন কোন পাথরও আল্লাহর ভয়ে নিজ স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো বা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে, যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর সেটা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-৭৪)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন যে, "যমীন ও আসমান তাঁর (আল্লাহর) কথা শুনে ও মানে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তারাও আল্লাহর কথা শুনেছে ও তার সঠিক উত্তর দিয়েছে।"

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ, অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশরাজিকে দু'দিনে সাত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" (সূরা হামীম সিজদা ঃ আয়াত-১১,১২)

কোন কোন সাহাবী খানা খাওয়ার সময় খাবারের তাসবীহ্ পাঠ শুনতে পেতেন। তাঁরা মসজিদে শুকনো কাষ্ঠখণ্ডের ক্রন্দনও শুনতে পেয়েছিলেন। সুতরাং যখন

এসব জড়বস্তুর মধ্যেও চেতনা ও অনুভূতি থাকে, তাহলে যেসব দেহের মধ্যে এককালে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রূহ বিদ্যমান ছিলো, সেগুলোর মধ্যে আরো বেশি চেতনা বা অনুভূতি ফিরে আসাতো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ায় রূহকে সে সমস্ত দেহের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যে সমস্ত দেহ থেকে তাদেরকে সাময়িকভাবে কবয করা হয়েছিলো। ঐ সমস্ত দেহ জীবিত হয়ে চলাফিরা করেছে, পানাহার করেছে, বিয়ে-শাদী করেছে এবং তারা সন্তানাদি জন্ম দিয়েছে আর মানুষ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো? অথচ তাঁরা ছিলো সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৪৩)

"আপনি কি সে লোককে দেখেননি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলা যার ঘর বাড়ি সব ভেঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। সে বললো, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন এবং বললেন, কতোকাল তুমি এভাবে ছিলে? সে বললো, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা নয় বরং তুমিতো একশ বছর অবস্থান করেছো। এবার তুমি চেয়ে দেখো নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে– সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখো নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো যে, আমি এগুলো কেমন করে জুড়ে দেই এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। অতঃপর যখন তার নিকট এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠলো– আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-২৫৯)

এই প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের ঐ নিহত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আবার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিলো আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আল্লাহ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত

করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা চিন্তা করো।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-৭২-৭৩)

ঐসব লোকের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলো, "আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত কখনো তাঁকে বিশ্বাস করবো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু দান করেছিলেন এবং আবার তাদের জীবিত করেছিলেন।" এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। "আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো। বস্তুতঃ তোমাদেরকে পাকড়াও করলো বিদ্যুৎ। আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-৫৫-৫৬)

এ প্রসঙ্গে আসহাবে কাহাফের ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দীর্ঘদিন ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিলো। যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তারা দুআ করে, হে পালনকর্তা, আমাদেরকে আপনার কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তারপর আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করি, একথা জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল পরিপূর্ণভাবে নির্ণয় করতে পারে। আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিলো কয়েকজন যুবক তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিলো। তখন তারা বললো, আমাদের পালনকর্তা, আসমান ও যমীনের পালনকর্তা, আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবো না, যদি করি তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা আমাদের স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া প্রদর্শন

করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। আপনি সূর্যকে দেখবেন, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী বা সাহায্যকারী পাবেন না। আপনি মনে করবেন তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিলো নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিলো সামনের পা দু'টো গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতেন তবে পেছন ফেরে পলায়ন করতেন এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, তোমরা কতোকাল অবস্থান করেছো? তাদের কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বললো, তোমাদের পালনকর্তাই বলতে পারবেন, তোমরা কতোকাল অবস্থান করেছো। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ করো, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য, সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। আর যদি তারা তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। এমনিভাবে আমি তাদের খবর মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিলো, তখন অনেকে বললো, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের পার্শ্বে মসজিদ তৈরি করবো।" (সূরা কাহাফ ঃ আয়াত-৯-২১)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর চারটি পাখির ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "যখন হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার পালন কর্তা, আমাকে দেখান কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি,

কিন্তু আমি এজন্য দেখতে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তিনি বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে আনো। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও তারপর সেগুলোকে ডাকো, তোমার নিকট এরা দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানী।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৬০)

উপরে বর্ণিত মৃত্যুর ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে পুনরায় পূর্ণ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তার বিস্ময়কর কুদরতের কাছে এটা অসম্ভব নয় যে, মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে এক ধরনের জীবন দান করবেন এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে কোন না কোনভাবে শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রদান করবেন। এটা আল্লাহ্‌র কাছে কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ্‌র কুদরত কাফির ও মিথ্যাবাদী ছাড়া অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কবরের আযাব ও আরাম বলতে বরযখী জীবনের আযাব ও আরামকে বুঝায়। বরযখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল মু'মিনূন ঃ আয়াত-১০০)

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময় বা অবস্থার নাম হলো বরযখ। সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটাকে কবরের আযাব বা আরাম এবং জান্নাতের বাগান বা দোযখের গর্ত বলা হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তি, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি এবং হিংস্র পশু বা পাখি কর্তৃক ভক্ষণ করা মানুষকেও তার আমল অনুযায়ী বরযখের আযাব বা আরাম প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে আযাব বা আরামের কার্যকারণ এবং এর অবস্থান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে কোন এক ব্যক্তি ধারণা করেছিলো, যদি তার লাশ পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে তার কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং কিছু অংশ প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে আযাব থেকে সে বেঁচে যাবে। সুতরাং সে ব্যক্তি তার ছেলেদের এরূপ অসিয়ত করে গেলো এবং মৃত্যুর পর ছেলেরা তার সে ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করলো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সমুদ্র ও ভূভাগ ঐ ব্যক্তির দেহের যাবতীয় বিক্ষিপ্ত অংশ একত্রিত করে দিলো এবং আল্লাহ্ পাক তাকে

দাঁড়াবার আদেশ করলেন। সে তখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরকম করলে কেন? সে উত্তর দিল, হে রব! আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমি আপনার ভয়েই এরকম করেছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন। তাহলে দেখা গেলো বিক্ষিপ্ত এবং বাহ্যিক নাম নিশানা বিহীন দেহের অণু-পরমাণুর উপরও বরযখের আযাব বা আরাম হয়ে থাকে। যদি কোন পাপী ব্যক্তির লাশকে শূন্যে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলেও সে তার আমল অনুযায়ী বরযখের আযাব ভোগ করবে। আর যদি কোন নেককার ব্যক্তির লাশকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে সে তার আমল অনুযায়ী বরযখে শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দেন। আর পাপী ব্যক্তির জন্য আগুনকে অতিশয় উষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক করে দেন। দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ ও উপাদান তাদের স্রষ্টার আজ্ঞাধীন। তারা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে না। বরং আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে সবের ব্যবহার করেন। আর কেউ যদি এ কথা না মানে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাবুবিয়াতকে অস্বীকার করারই শামিল।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মৃত্যুর পর দু'টো জীবন নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে সৎকর্মের প্রতিদান ও অসৎকর্মের শাস্তি প্রদান করা হয়। বরযখের প্রথম জীবন শুরু হয় যখন মানুষের রূহ দেহ থেকে পৃথক হয়ে আযাব বা আরাম ভোগ করতে শুরু করে। আরেক জীবন শুরু হবে যখন রোয কিয়ামতে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশে তাদের কবর থেকে উঠে আসবে এবং হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই একটি সহীহ হাদীসে উল্লেক আছে, "ঈমানের এটাও একটি অংশ যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।" কেননা প্রথম বরযখী জীবনকে তো কেউই অস্বীকার করতে পারে না, যদিও কেউ কেউ এর মধ্যে প্রতিদান, শাস্তি এবং আযাব বা আরামকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন-এর বর্ণনা সূরা আল মু'মিনুন, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা কিয়ামাহ, সূরা মুতাফফিফীন আর সূরা ফজরে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা অতিশয় বিচক্ষণ ও সুবিচারক। তাই তিনি নেককার ও বদকারদের পৃথক পৃথক আবাসস্থল তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে তারা রোয হাশরের বিচারের পর প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, আর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা আল মুমিনূন ঃ আয়াত-১৫-১৬)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "তারা বলতো, আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি পুনরুত্থিত হবো আমাদের পূর্ব পুরুষগণসহ। বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সকলেই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত-৪৭-৫০)

যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। এটা কাউকে করবে নিচু, কাউকে করবে সমুন্নত।" (সূরাওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত -১-৩)

"আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই এ ব্যাপারে যে, তোমাদের মতো লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই যা তোমরা জানো না। তোমরা অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেন? (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত-৬০-৬২)

কিয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়– মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করবো না? পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনেও ধৃষ্টতা দেখাতে চায়। সে প্রশ্ন করে, কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালন কর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।" (সূরা আল-কিয়ামাহ ঃ আয়াত ১-১২)

"তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে। এটা কিছুইতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি কি জানেন সিজ্জীন কী? এটা একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ৪-৯)

"নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়ীন কি? এটাও একটি সুলিখিত কিতাব।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ১৮-২০)

"কখনো নয় পৃথিবীকে যখন ক্রমাগত ছিন্ন ভিন্ন করে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে, এবং আপনরার পালনকর্তা আত্মপ্রকাশ করবেন এমতাবস্থায় ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ও জাহান্নামকে সেদিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, কিন্তু তখন তার বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়ায় কি লাভ হবে? সে বলবে, হায়, আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। সেদিনের শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দেবে না এবং তার বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ দেবে না। হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও

সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা আলফজর ঃ আয়াত ২১-৩০)

"আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। তাই আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই এতে প্রবেশ করবে, যে মিথ্যা আরোপ করে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ পথকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার উপর কারো কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না আর মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।" (সূরা আল লাইল ঃ আয়াত ১৩-২১)

"আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের রয়েছে অশেষ পুরস্কার। অতঃপর কেনো তুমি অবিশ্বাস করছো কিয়ামতকে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?" (সূরা ত্বীন ঃ আয়াত ৪-৮)

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে থেকে যেসব লোক কুফুরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব কিছু তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।" (সূরা বায়্যিনাহ ঃ আয়াত ৬-৮)

"পৃথিবী যখন তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল ঃ আয়াত ১-৯)

"সেকি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে, অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।"(সূরা আদিয়াত ঃ আয়াত ৯-১১)

"যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মতো। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে আর

যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়ায়। আপনি কি জানেন তা কি? তা প্রজ্বলিত অগ্নি।" (সূরা আল কারিয়াহ ঃ আয়াত ৪-১১)

আল্লাহর বিচক্ষণতা ও সুবিচারের শর্ত এই যে, তিনি সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীলদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদানের জন্য দু'টি গ্রহ তৈরি করেছেন। কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি প্রতিফল মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানের পর হাশর ময়দানে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ "প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন জিনিস নয়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮৫)

আল্লাহ তা'আলার সুবিচার, আসমায়ে হুসনা আর পবিত্র কামালিয়াতের এটাই চাহিদা যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের দেহ ও রূহকে শান্তিতে রাখবেন। আর দুশমনদের দেহ ও রূহকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণেই আল্লাহর অনুগতদের দেহ ও রূহ যথাযোগ্য নি'আমত ও আরাম দেওয়া হয়। আর অবাধ্যদের দেহ ও রূহকে যথাযোগ্য শাস্তি ও কষ্ট দেওয়া হয়। যেহেতু, দুনিয়া কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাস্থল, প্রতিদানের স্থল নয়, তাই এখানে প্রতিদানের ফল প্রকাশিত হয়না। অবশ্য বরযখ হচ্ছে নেক আমলের প্রতিদান ভোগ করার প্রথম আবাসস্থল। তবে প্রাথমিক আবাসস্থল হিসেবে সেখানে নেক আমলের প্রতিদান ও বদ আমলের প্রতিফল প্রকাশ পায়। বরযখী জীবনে মানুষের এটাই কাম্য। তবে কিয়ামতের দিন যার যেটা প্রাপ্য তা পুরাপুরি প্রদান করা হবে। উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা গেলো যে, বরযখের আযাব বা আরাম প্রমাণিত। যেমন একটি হাদীসে আছে, নেককার কবরবাসীর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর তাঁর কাছে বেহেশতের আরাম ও নি'আমত পৌঁছতে থাকে। আর বদকার কবরবাসীদের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং এর উত্তাপ ও অশান্তি সে ভোগ করে। ঐসব ব্যাপার মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির সীমা-পরিসীমার বাইরে। তবুও বিশেষ বিশেষ নেককার বান্দা সে সম্পর্কে অবহিত হন যদিও এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে তাঁরা অক্ষম।

কোন জিনিসের অস্তিত্ব সেটার ব্যাখ্যা বা উপলব্ধির উপর নির্ভর করে না। আসলে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। মৃত্যুর পর বরযখ জীবনের প্রতিক্রিয়া দ্রুত প্রকাশ পায়। দুনিয়া, বরযখী ও আখিরাতের অবস্থাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমতের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল করে রেখেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনে কবর আযাবের উল্লেখ আছে কি না

পবিত্র কুরআনে কবরের আযাবের কোন উল্লেখ নেই কেন? অথচ এ সম্পর্কে জানা ও ঈমান আনা খুবই প্রয়োজন, যেন মানুষের মনে ভয়-ভীতি জাগে ও তারা পরহেযগারীর পথে চলে। এর উত্তর সংক্ষেপে ও সবিস্তারে দু'ভাবে দেয়া যেতে পরে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো– আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট দু'ধরনের ওহী পাঠিয়েছেন এবং উভয় প্রকারের ওহীর উপর ঈমান আনা ও আমল করা মানুষের জন্য অপরিহার্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অপরিসীম।" (সূরা আন নিসা ঃ আয়াত-১১৩)

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিলো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৪)

"তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা জুমুআ ঃ আয়াত-২)

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।" (সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত-৩৪)

আগেকার অভিজ্ঞ আলিমগণের ঐকমত্য হলো, কিতাব অর্থ কুরআন এবং হিকমত অর্থ সুন্নাহ। আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোর উপর ঈমান আনা বা সেগুলোকে বিশ্বাস করা, সেরূপ

ওয়াজিব, যেরূপ ওয়াজিব আল্লাহর ঐসব বাণীর উপর ঈমান আনা, যা তিনি তাঁর রাসূলের ভাষায় আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এটা মুসলমানদের একটি সর্ববাদী সম্মত মূলনীতি। এটাকে একমাত্র ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে যে সত্যিকারের মুসলমান নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে কিতাবের সাথে সাথে তারই সদৃশ আর একটি জিনিস অর্থাৎ সুন্নাহও দেয়া হয়েছে। কাজেই কোন মাসয়ালা যদি কুরআনে না থাকে আর হাদীসে থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যেন এটি কুরআনেই আছে। কেননা হাদীস মূলত কুরআনেরই মতো।

প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআনের মধ্যেও একাধিক স্থানে বিস্তারিতভাবে বরযখের আযাব ও আরামের উল্লেখ আছে। যেমন "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি, যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন যালিমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের করো স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ্ থেকে অহঙ্কার করতে।" (সূরা আল-আন'আম ঃ আয়াত-৯৩)

ফেরেশতারা একথাগুলো মৃত্যুপথযাত্রীকে ঠিক মৃত্যুর সময় বলেন। আর ফেরেশতারা সতত সত্যবাদী। যদি মানুষের এই শাস্তি ইহকালে মৃত্যুবরণের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো 'আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে' একথা সত্যে পরিণত হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করলো। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরআউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।" (সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্ট ভাষায় বরযখ ও আখিরাতের আযাবের কথা উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ "তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ছেড়ে দিন, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পড়বে। সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। গুনাহগারদের জন্য

এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (সূরা আততুর ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

এখানে শাস্তির অর্থ হবে পার্থিব অথবা বরযখের শাস্তি। দ্বিতীয় অর্থই এখানে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা অনেক যালিম মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু দুনিয়ায় এদের কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, যে মরে গেছে তাকে বরযখের শাস্তি দেয়া হবে আর যে জীবিত আছে তার জন্য হত্যা ইত্যাদি ধরনের শাস্তি রয়েছে। সুতরাং এটা হলো তাদের জন্য পার্থিব ও বরযখী আযাবের সতর্কবাণী।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "গুরুতর শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" (সূরা সিজদাহ ঃ আয়াত-২১)

এই আয়াতের দ্বারা কবরে যে আযাব হয় সেটার প্রমাণ রয়েছে। যেসব বুযুর্গ ব্যক্তি এই অভিমত পোষণ ও সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)। কিন্তু এটা হচ্ছে, গ্রন্থকারের মতে পার্থিব আযাব যা তাদেরকে কুফুরী থেকে ফিরে আসার ও সতর্ক কারার জন্য দেয়া হয়। তবে মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও তাফসীর বিশেষজ্ঞ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূক্ষ্ম জ্ঞানে এই বিষয়টা ধরা না পড়ার কথা নয়, যেহেতু কুরআন বুঝার ব্যাপারে তিনি এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। সেই বিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতার সাহায্যে তিনি উক্ত আয়াত দ্বারা কবরে যে আযাব হয় তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেটা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কবরবাসীদের উপর দু'ধরনের আযাব হয়ে থাকে একটি কঠিন শাস্তি অপরটি লঘু শাস্তি। তিনি আরো বলেছেন, কোন কোন মানুষকে পার্থিব জীবনে ছোট শাস্তি দেয়া হয়, যাতে তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে। অতএব জানা গেলো যে, লঘু শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হয় না, কিছু অংশ বাকী থেকে যায়, যা পার্থিব জীবনের পরে দেয়া হয়। এ জন্যই "মিনাল আযাবিল আদনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'মিন' শব্দটি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আযাবুল আদনা'কে মিন ব্যতীত সরাসরি কর্মকারক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়নি। যেমন, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে– "অতঃপর তার জন্য অর্থাৎ কবরবাসীর জন্য জাহান্নামের একটি ছিদ্র খুলে দেয়া হয় যার মধ্য দিয়ে জাহান্নামের কিছু উত্তাপ ও আযাব আসতে থাকে,' সেহেতু আযাবের অধিক অংশ আখিরাতের জন্য থেকে যায়। তদ্রূপ কাফিরেরা বরযখী জীবনেও কিছু আযাব ভোগ করে থাকে, আর তাদের প্রাপ্য আযাবের বেশির ভাগ আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তার দিকে তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের থেকে তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না নেওয়াই ঠিক হয়, তাহলে তোমরা এ আত্মাকে ফিরিয়ে নাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে সুখ, উত্তম রিযক এবং নিআমতে পরিপূর্ণ উদ্যান। আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। এটা ধ্রুব সত্য। অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৩-৯৬)

উপরোক্ত আয়াতে মৃত্যুর সময় রূহের অবস্থা কি হবে সেটা বর্ণিত হয়েছে। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থানও উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পরে ও হাশরের দিনের অবস্থা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

রূহকে এরূপভাবে কখন সম্বোধন করা হয়, এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। একদলের মতে মৃত্যুকালীন সময়েই একথা বলা হয়। প্রকাশ্যভাবে আয়াতে শব্দাবলীর দ্বারা এ অর্থই বুঝা যায়। এরূপ সম্বোধন ঐ নেক রূহকে করা হয় যে রূহ দেহ থেকে বের হয়ে এসেছে। হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাহ-এর একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে যে, রূহকে বলা হয়, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে বের হও। তোমার রবও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। "রূহ বরযখে অবস্থান করে" নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে আরো বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্তিম অবস্থায় বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে সবচেয়ে উঁচু সাথীদের সাথে শামিল করো।" এছাড়াও আযাব বা আরাম সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা জানা যায়। পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করার তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন।

নবম অধ্যায়

কি কি কারণে কবরে আযাব হয়

কি কি কারণে কবরে আযাব হয়? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাঁর হুকুমের প্রতি অবজ্ঞা, তাঁর অবাধ্যতা, অন্যের হক বিনষ্ট করা এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকা। তবে আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বত ও মা'রেফাতের যাঁরা অধিকারী তাঁদের রূহের কোন আযাব হয় না। এছাড়া কবরের আযাব ও আখিরাতের আযাব হলো– আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণ। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্রোধ সঞ্চার করেছে এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছে সে যদি তাওবাহ্ না করে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্র অসন্তোষের কারণে বরযখে তার আযাব হবে– তা কম হোক বা বেশি হোক, বরযখের আযাবকে কেউ স্বীকার করুক বা না করুক।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন লোকের কবরে আযাব হতে দেখেছিলেন। তিনি তাদের আযাবের দু'টি কারণও উল্লেখ করেছেন। একজনের আযাব হচ্ছিলো এ জন্য যে, সে ছিলো চোগলখোর অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে এদিকের কথা ওদিকে, ওদিকের কথা এদিকে আদান প্রদান করতো, যে জন্য লোকের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতো যদিও সে যা বলতো তা সত্য হতো। অপর ব্যক্তির আযাবের কারণ হলো, সে পেশাবের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না, যা ছিলো তাঁর জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

যারা মিথ্যা আচরণ বা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে, আর যারা নামায আদায় করে না তারাও কবরের কঠিন আযাব ভোগ করবে। হযরত শো'বা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, জনৈক মৃত ব্যক্তির কবরে এমন চাবুক মারা হলো, যে জন্য তার কবর আগুনে ভরে গিয়েছিলো। কেননা সে বিনা ওযূতে একবার নামায পড়েছিলো এবং কোন এক মযলূম ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কোন সাহায্য সহায়তা করেনি।

বুখারী শরীফে হযরত সামুরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতো এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়তো, এমন একজন

ব্যক্তিও কবরের আযাব ভোগ করছিলো। আর এরূপ একজন ব্যক্তির কবরের আযাব হচ্ছিলো যে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতো এবং তার অর্থও বুঝতে পারতো বটে কিন্তু সে সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতো। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতো না। এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনাকারী পুরুষ মহিলা ও সুদখোরদের কবরে যে আযাব হয় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, কিছু সংখ্যক লোকের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছিলো, কেননা ঐসব লোক নামাযকে বোঝা মনে করতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছিলেন, আরো কিছু লোক বিষাক্ত গুল্ম ও যাক্কুম গাছের মধ্য দিয়ে পশুর মতো চলাফিরা করছিলো। কেননা এরা যাকাত দিতো না। তিনি আরো দেখেছিলেন, কিছু সংখ্যাক লোক দুর্গন্ধযুক্ত পচাগলা গোশত ভক্ষণ করছিলো। এরা ছিলো ব্যভিচারী পুরুষ। তিনি আরো দেখেছিলেন, ঐসব লোকদের কারো কারো ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিলো। কেননা ঐসব লোক নিজেদের কথা-বার্তা ও বক্তৃতা দ্বারা সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতো।

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে কারো কারো পেট ছিলো ঘরের মতো বিরাট আকৃতির আর ফিরআউনের লশকরেরা এদেরকে পদদলিত করে চলে যাচ্ছিলো। কেননা তারা ছিলো সুদখোর। আরেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকের মুখে আগুনের কয়লা ভরে দেয়া হচ্ছিলো, সেগুলো ওদের মলদ্বার দিয়ে বের হচ্ছিলো। এরা ছিলো ঐসব লোক যারা যুলুম করে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করতো। কিছু সংখ্যক মহিলার বক্ষ বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিলো– এরা ছিল ব্যভিচারিণী মহিলা। কিছু সংখ্যক লোকের পার্শ্বদেশ থেকে গোশত কেটে কেটে ওদেরকে খাওয়ানো হচ্ছিলো– এরা ছিলো চোগলখোর। কারো কারো নখ ছিলো তামার। এরা নখের সাহায্যে নিজের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিলো। কেননা এরা ছিলো লোকের সম্মান হরণকারী।

একবার একব্যক্তি গণীমতের মাল থেকে একখানা চাদর চুরি করেছিলো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তজ্জন্য তার কবরে আগুন জ্বলছে। অথচ সেই গনীমতের মালের মধ্যে তারও হক ছিলো। কাজেই যে ব্যক্তির মালের উপর কোন হক নেই, আর যুলুম করে কারো মাল আত্মসাৎ করে তার যে আরো বেশি আযাব হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের অন্তর, চোখ, কান, মুখ, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত-পা এবং সমস্ত

দেহের পাপের কারণেও কবরের আযাব হয়ে থাকে। এদিকের কথা ওদিকে বলা, মিথ্যাকথা বলা, চোগলখোর, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, পবিত্র লোকদের অপবাদকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী, প্ররোচনাকারী, (নিকৃষ্ট) বিদআত প্রচলনকারী, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী, আল্লাহ্র কালামের মনগড়া ব্যাখ্যাকারী, সুদখোর, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎকারী, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে হারাম ভক্ষণকারী, অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎকারী, নেশাখোর, নিষিদ্ধ খাদ্য আহরণকারী, সমকাম ও ব্যভিচারকারী, চোর, খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুদের কারবারে সাক্ষ্যদাতা ও লিখক, অন্যায়ভাবে টালবাহানাকারী ও তার সহযোগী, আল্লাহ্র ফরযগুলো এড়াবার জন্য টালবাহানাকারী, হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, মানুষকে কষ্টদাতা ও তাদের দোষ অন্বেষণকারী, শরীআতের পরিপন্থী আইনের দ্বারা মীমাংসাকারী, শরীআতের পরিপন্থী ফতওয়া দানকারী, পাপী ও অন্যায়কারীদের সহায়তাকারী, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, পবিত্র মক্কানগরীর মসজিদে হারাম এর এলাকায় ইসলাম বিরোধী কথা প্রচারকারী, নিজের অভিমত, আশা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তদবীরকে সুন্নাতের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহের ও গুণাবলীর বাস্তবতাকে অস্বীকারকারী এবং এগুলোর মধ্যে দীনের পরিপন্থী বিষয় প্রচারকারী, মৃতের জন্য শোক গীতিকার, শোকগীতি শ্রবণকারী, অশ্লীল গানও তা শ্রবণকারী, কবরকে মসজিদে পরিণতকারী, কবরে (অপ্রয়োজনীয়) বাতি বা প্রদীপ প্রজ্বলনকারী, কোন জিনিষ বিক্রয়কালে কম প্রদানকারী আর ক্রয়কালে অধিকগ্রহণকারী, যুলূমকারী, অহঙ্কারী, লোক দেখানো ইবাদতকারী ও দানকারী, চোখ ও মুখ দ্বারা অপরের দোষ অন্বেষণকারী, আগেকার লোকদেরকে গালমন্দকারী, ভবিষ্যতের গায়েবী সংবাদদাতা, গণক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎ প্রবক্তা ও তাদের নিকট সেই উদ্দেশ্যে গমনকারী এবং তাদের কথায় বিশ্বাসকারী, যালিমদের সাহায্যকারী, দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাত বিনষ্টকারী, আল্লাহ্র প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না ও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে না এমন ব্যক্তি, পাপ থেকে বিরত না থাকা ব্যক্তিদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে যদি পথ প্রদর্শন করা হয়, তাহলে তা অমান্য করে ও হিদায়াতের পথে আসে না এমন সব ব্যক্তি, আর যাদের প্রতি লোকের সুধারণা রয়েছে কেউ তাদের কুৎসা রটনা করলে তা বিশ্বাসকারী, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া আর অন্য কাউকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাসকারী, (তবে আল্লাহ অন্য যাদেরকে মাসূম বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, তাদের কথা ভিন্ন), যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে, কিন্তু এর শিক্ষা গ্রহণ করে না, আর এটাকে এক নিছক বোঝা মনে করে, যারা অশ্লীল আলোচনা, কথাবার্তা ও কুরুচিপূর্ণ আমোদ আহলাদে আনন্দ পায়,

যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামেও মিথ্যা কসম করে, যে গুনাহের কাজ করে গর্ববোধ করে, প্রকাশ্যে ও দম্ভ সহকারে গুনাহের কাজ করে যাদের থেকে মানুষের মান ইযযত ও সম্পদ নিরাপদ নয়, গুণ্ডামী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য যাদেরকে লোকেরা পরিত্যাগ করে, যারা নামাযের শেষ সময়ে নামায আদায় করে, যারা মোরগের ন্যায় ঠোকর মেরে তাড়াহুড়া করে নামায পড়ে, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, যাকাত আদায় করে না, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ পালন করে না, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা অপরের পাওনা পরিশোধ করে না, কুদৃষ্টি থেকে, অশ্লীল বাক্য থেকে হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করেনা, উপার্জনে হালাল-হারামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করে না, মিসকীন, বিধবা, ইয়াতীম এবং নির্বাক পশুদের সাথে নির্দয় ব্যবহার করে, ইয়াতীমদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেনা, অভাবী লোকদেরকে খাবার দেয় না এবং অন্যদেরকে সেজন্য উৎসাহিত করেনা, লোক দেখানো আমল করে, সাধারণ ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র দিয়ে অপরকে সাহায্য করেনা, যে নিজের দোষ ও পাপের প্রতি লক্ষ্য না রেখে অন্য লোকের দোষ তালাশ করে। মোটকথা, এসব লোকদেরকে কবরের আযাব ভোগ করতে হবে, তবে কারো আযাব হবে অধিক, কারো আযাব হবে লঘু।

বেশিরভাগ লোকদেরকেই কবরের আযাবের সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু বেশির ভাগ মানুষই গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে। কবরের আযাব থেকে নাজাত পাওয়া লোকের সংখ্যা খুবই কম। দৃশ্যত কবরের উপরের মাটি স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা গেলেও, এটা মর্মন্তুদ আযাব ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। বহু কবরের উপর নকশী পাথরের তৈরি ইমারত গড়ে উঠে সত্য, কিন্তু পাত্রের ভেতর খাদ্যদ্রব্য যেমন আগুনে সিদ্ধ হয়ে থাকে, অনেক কবরের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

হায় আফসোস! কবর থেকে অহরহ আওয়াজ আসছে আর কবর ডেকে বলছে, হে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা এমন আবাস তৈরি করে রেখেছো, যা অতিসত্তর তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর ঐ আবাসকে বিস্মৃত হয়ে আছো, যেখানে অতিসত্বর তোমাদেরকে যেতে হবে। আর তোমরা এমন ঘর আবাদ করে রেখেছো, যেখানে অন্যরা বসবাস করবে, আর তা ভোগ করবে। আর তোমরা ঐসব ঘর পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছো, যেখানে তোমরা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আসলে দুনিয়া হচ্ছে, যত শীঘ্র সম্ভব আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের স্থান। আর কবর হচ্ছে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের মাকাম, এটা কারো জন্য হবে জান্নাতের বাগিচা, আর কারো জন্য হবে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর গহ্বর।

দশম অধ্যায়

কবরের আযাব থেকে মুক্তির উপায়

কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো– মানুষ যেন রাতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সারাদিন যে কর্মকাণ্ড করেছে সে সম্বন্ধে কিছু চিন্তা-ভাবনা করে, ভালোমন্দ হিসাব-নিকাশ করে দেখে, কোন গুনাহের কাজ করে থাকলে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত চিত্তে তাওবাহ করে আর দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে বাকী জীবনে যেন সে আর কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত না হয়। এভাবে তাওবাহ করে নিদ্রা যাবে। যদি এরূপ কোন অনুতপ্ত ব্যক্তি সে রাতে মারা যান, তবে তাওবাহর অবস্থায়ই তিনি মারা গেলেন বলে গণ্য হবেন। আর তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তা হবে নেক আমল করার জন্য একটি পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য। এছাড়া এটাও মনে করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক আমল করার জন্য আরেকটি দিন বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এরূপ বান্দার নেক আমল আল্লাহর পবিত্র দীদার লাভের সহায়ক হয় একজন বান্দার জন্য এরূপ নিদ্রার চেয়ে অধিক বরকতময় ও কল্যাণকর আর অন্য কোন আমল হতে পারেনা। এরূপ নিদ্রিত ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর যিকির আযকার করতে থাকে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত দু'আ-দরূদ পড়তে থাকে।

এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় হাদীস শরীফ এখানে উল্লেখ করা হলো : **এক.** আল্লাহর রাস্তায় একদিন সীমানা পাহারা দেয়া একমাসের রোযা রাখা ও রাত্রে জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। পাহারারত অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সে নেক কাজ করার অবস্থায় থাকবে, তার রিযকও বন্ধ হবেনা আর কবরের সমস্ত ফিতনা থেকেও সে বেঁচে যাবে। (মুসলিম) **দুই.** প্রত্যেক ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর পথে পাহারায় নিযুক্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু হলে, তার সে আমল কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকে এবং কবরের ফিতনা থেকে সে রক্ষা পায়। (তিরমিযী) **তিন.** এক ব্যক্তি কোন এক সময়ে হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শহীদগণ ছাড়া আর সকল মুমিন বান্দাকে কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, এর কারণ কি?

ইরশাদ হলো, শহীদদের মাথার উপর তরবারীর ঝলকানি তাদের পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। (নাসায়ী) **চার.** আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শহীদদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা ঃ (ক) একজন শহীদের রক্ত ঝরার সাথে সাথেই তাঁর গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং তাঁর জান্নাতী বাসস্থান তিনি দেখতে পান। (খ) তিনি কবরের আযাব থেকে রক্ষা পান। (গ) তিনি কিয়ামতের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকেন। (ঘ) তাঁর মাথার উপর মানসম্মানের মুকুট শোভা পায় যার এক একটি ইয়াকূত দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেয়। (ঙ) বড় বড় চোখ বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুরের সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। (চ) সত্তরজন নিজ আত্মীয় ও বন্ধবান্ধবদের জন্য তিনি সুপারিশ করতে পারেন। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) **পাঁচ.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ জনৈক সাহাবী অজ্ঞাতসারে কোন এক কবরের উপর তাঁবু তৈরি করলেন। তখন কবরের ভেতর থেকে সূরা মুলক পড়ার শব্দ শুনা গেলো। ঐ কবরবাসী এই সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই পবিত্র সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী ও মুক্তিদানকারী। (তিরমিযী) **ছয়.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কোন এক ব্যক্তিকে এক সময় বলেছিলেন, তোমাকে কি তোহফা হিসেবে একটি হাদীস শুনাবো যা শুনে তুমি খুবই আনন্দিত হবে? সে ব্যক্তি বললো, অবশ্যই শুনাবেন। তখন তিনি বললেন, তুমি সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে, এই সূরাটি তুমি মুখস্থ করো, তোমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে, আর তোমার পরিবারের অন্যান্য লোকজন ও পাড়া প্রতিবেশী সকলকেও মুখস্থ করিয়ে দাও। কেননা এই সূরাটি (কবরের আযাব থেকে) মুক্তি প্রদানকারী ও প্রতিরোধকারী। এছাড়া এই পবিত্র সূরাটি কিয়ামতের দিন পাঠকারীর জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। সেই ব্যক্তি যদি জাহান্নামী হয়, তাহলেও এই সূরা আল্লাহ্ পাকের নিকট জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির দরখাস্ত করবে। আল্লাহ তা'আলা এই সূরার বরকতে তাকে কবরের আযাব থেকেও রক্ষা করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা যে, সূরা মুলক আমার উম্মাতের প্রত্যেকেরই মুখস্থ থাকুক। (আবদে ইবনে হামীদ) **সাত.** একটি সহীহ হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরা (মুলক) যে পাঠ করবে তাকে এই সূরা এরূপ সুপারিশ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন। (ইবনে আবদুল বার) **আট.** যে ব্যক্তি পেটের অসুখে বা কলেরায় মারা যাবে, সেই ব্যক্তি শহীদের

মর্যাদা লাভ করবে এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাবে এবং তার নিকট সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত থেকে রিযক আসতে থাকবে। (ইবনে মাজাহ) **নয়.** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াশকার (রা) বলেছেন, আমি সুলাইমান ইবনে সারদ ও খালিদ ইবনে আলফাতাহর নিকট একদিন বসা ছিলাম, তখন লোকেরা এসে বললো, এক ব্যক্তি পেটের অসুখে মারা গেছেন। এঁরা দুইজন তাঁর জানাযায় শরীক হতে চাইলেন। একজন বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, যে ব্যক্তি উদরাময় রোগে মারা যাবে তার কবরে কোন আযাব হবে না। (নাসায়ী) **দশ.** আবূ দাউদ তায়ালিসীতে এই হাদীসটি সম্পর্কে এতোটুকু অধিক বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে বলেছিলেন, "কেন নয়"? **এগার.** যে মুসলমান জুমুআর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করবেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী) তবে এই হাদীসের সনদ মুত্তাসিল বা ধারবাহিকতা বিশিষ্ট নয়। কেননা রাবীয়া (রা) নামক জনৈক সাহাবী ইবনে আমর (রা)-এর কাছ থেকে যে এই হাদীসটি শুনেছেন, সেটার কোন প্রমাণ নেই। অন্য এক বর্ণনায় আছে-রাবীয়া (রা) এবং ইবনে আমর (রা)-এর মধ্যে আয়ায ইবনে উকবাহ ফাহদরী (রা)ও রয়েছেন। (তিরমিযী) হাফিয আবূ নায়ীম (র) এই মারফু হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) থেকে আর তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যেই ব্যক্তি জুমুআর রাত্রে বা দিনে মৃত্যুবরণ করে, তাঁকে কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়। আর কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এমনভাবে উঠবে যে, তাঁর মধ্যে শাহাদাতের সীলমোহর লেগে থাকবে। কিন্তু উপরোক্ত ভাষ্যে উমর ইবনে মূসা ওয়াজিহী মাদানী একক বর্ণনাকারী মাত্র। এছাড়া ইনি রাবী হিসেবে দুর্বল।

"তার মাথার উপর তলোয়ারের আঘাতের ঝলক তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীর মর্মার্থ হলো, একজন শহীদের মাথার উপর শত্রুর তলোয়ারের আঘাতের ঝলকের মাধ্যমে তার নিফাক ও ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেহেতু সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়নি। এইভাবে জানা গেল, তার মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা ছিলো আর ঈমানের জোরেই আল্লাহর জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া তার অন্তরে আল্লাহর জন্য বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ, ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিলো যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর দীন জয়লাভ করে ও তাঁর কালিমার ইযযত বৃদ্ধি পায়। তাই কবরে তাঁর পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

এই প্রসঙ্গে আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী (র) বলেন, একজন শহীদকে যখন কবরে

প্রশ্ন করা হয় না, তখন একজন সিদ্দীককে কবরে প্রশ্ন না করাই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা সিদ্দীকের মর্যাদা একজন শহীদের মর্যাদার চেয়ে অধিক। পবিত্র কুরআনে শহীদগণের পূর্বে সিদ্দীকগণের উল্লেখ রয়েছে "আর যে কেউ আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সেই ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহ্ নি'আমত দান করেছেন, তাদের সঙ্গী-সাথী হবে তার তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যেই হলো উত্তম।" (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত-৬৯)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও নূর এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরা আল হাদীদ ঃ আয়াত-১৯)

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিতদেরকেও কবরে প্রশ্ন করা হবে না, যদিও তাদের মর্যাদা শহীদগণের চেয়ে কম। অপরপক্ষে সিদ্দীকদের মর্যাদা শহীদদের মর্যাদার চেয়েও অধিক। তবে সহীহ্ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে এরূপ সিদ্দীকদেরকেও কবরে প্রশ্ন করা হবে। এখানে হযরত উমর (রা)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো– একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, সিদ্দীকদের মাথার মুকুট। একথা শুনে হযরত উমর (রা) বিস্ময় সহকারে আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও কি ঐ অবস্থার শিকার হবো?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন "হাঁ"।

কবরে কি আম্বিয়া কেরামদেরকেও প্রশ্ন করা হয়েছে? এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) প্রমুখের দু'টি অভিমত রয়েছে। **এক**– আম্বিয়ায়ে কেরামও কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। **দুই**– তাঁদেরকে কবরে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। শহীদগণ কবরে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়ার কারণে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যে সিদ্দীকগণও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, যদিও তারা শহীদের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। ইবনে মাজাহ্র একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় থেকে মারা যান, তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন এবং কবরের ফিতনা থেকেও রক্ষা পাবেন। এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ্র ইফরাদ বা একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হওয়ার কারণে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয়। এছাড়া তাঁর এই গ্রন্থে কিছু কিছু অপ্রচলিত ও আপত্তিকর হাদীসও রয়েছে। এই

হাদীসটিকে যদি সহীহ্ হাদীস হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবুও সেটা ত্রুটিমুক্ত নয়।

তবে কবরের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া সম্পর্কে একটি সান্ত্বনাদায়ক হাদীস আছে। যেটা আবূ মূসা মাদানী (র) তাঁর তারগীব ও তারহীব শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফারাজ ইবনে ফুযালা, হিলাল আবূ জাবাল্লাহ থেকে তিনি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র) থেকে এবং তিনি আবদুর রহমান সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা একদিন মদীনার কোন এক বিশেষ স্থানে একত্রিত হলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় ইরশাদ করলেন, গত রাত্রে আমি একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম যে, মালাকুল মাউত তার রূহ কবয করার জন্য তার নিকট এসেছেন। কিন্তু সে ব্যক্তির মাতাপিতার প্রতি আনুগত্যের নেক আমল এসে মালাকুল মাউতকে সরিয়ে দিলো। অন্য এক উম্মতকে দেখলাম শয়তান তাকে ঘিরে রেখেছে এবং বিরক্ত করছে। কিন্তু আল্লাহর যিকর এসে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলো। আমার অপর এক উম্মতকে দেখলাম আযাবের ফেরেশতারা এসে তাকে ভয় দেখাচ্ছে। সেই অবস্থায় তার নামায এসে তাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করছে। আমার উম্মতের আরো একজনকে দেখলাম, সে পিপাসায় কাতর ও অস্থির। সে যে হাউযের কাছেই যায় সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এই সময়ে তার রামাযানুল মুবারকের রোযা এসে তাকে তৃপ্তির সাথে পানি পান করালো। আমি আরো দেখলাম, আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন, আর আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম সে যে সারিতে বসতে যায়, সেখানেই তাকে বাধা দেয়া হয় অবশেষে তার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল এসে তাকে হাত ধরে আমার কাছে এনে বসিয়ে দিলো। তারপর আমার উম্মতের অপর একজনকে দেখলাম, তার চারদিকে অর্থাৎ ডানে-বামে, উপরে, নিচে গভীর অন্ধকার আর সে জন্য সে হতাশাগ্রস্ত ও দিশেহারা। তখন তার হজ্জ ও উমরাহ এসে তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোতে পৌঁছে দিলো।

এই প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম, সে আগুনের গোলা ও জ্বলন্ত কয়লার আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, এমন সময় তার সাদকাহ এসে সেই আগুনকে আড়াল করে দিলো এবং তার মাথার উপর ছায়া দিতে লাগলো। আমার উম্মতের আরেকজনকে দেখলাম, সে মুমিনদের সাথে কথাবার্তা বলতে চায়, কিন্তু তাঁরা কেউ তার সাথে কথা বলছেন না। তখন তার "আত্মীয় বন্ধন" এসে বললো, হে মুসলমানগণ! এই

ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলো, তাই তোমরা তার সাথে কথাবার্তা বলো। অবশেষে ঐ মুমিন ব্যক্তিরা সেই লোকটির সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, আর তারা তার সাথে মুসাফাহাও করলেন। আমার উম্মতের অপর একজনকে দেখলাম, জাহান্নামের ফেরেশতারা তাকে পেরেশান করছেন, কিন্তু "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার" অর্থাৎ "সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এসে তাকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রহমতের ফেরেশতাদের হাতে তুলে দিলো। আমার উম্মতের অন্য একজনকে দেখলাম সে তার দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে, আর তার ও আল্লাহর মাঝখানে একটি পর্দা রয়েছে। তখন তাঁর "সদাচার" এসে তার হাত ধরে তাঁকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিলো। আমার উম্মতের অন্য একজনকে দেখলাম, তার আমলনামা তার বামহাতের দিকে যাচ্ছে, এমনসময় তার "আল্লাহ্ ভীতি" এসে আমলনামা তার ডানহাতে তুলে দিলো। আমার উম্মতের মধ্যে আরো একজনকে দেখলাম, তার নেক আমলের ওযন হালকা হয়ে গেছে, কিন্তু শিশুকালে তার যেসব সন্তানরা মারা গিয়েছিলো তারা এসে তার আমলের ওযন ভারী করে দিলো। আমার উম্মতের অপর একজনকে জাহান্নামের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম, কিন্তু তার নিকট "আল্লাহর প্রতি তার ঐকান্তিক দয়ার আশা" এসে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলো। আমার উম্মতের আরো একজনকে দেখলাম যে, সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এমন সময়ে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার "অশ্রু" এসে তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে দিলো। আমার উম্মতের অপর একজনকে দেখলাম, সে পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে যেন ঝড়ে কম্পিত খেজুর গাছের মতো কাঁপছে। তখন আল্লাহর "অপার করুণা সম্পর্কে তার সুদৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস" এসে তার ভয় ও ভীতি দূর করে দিলো। আমার উম্মতের অপর একব্যক্তিকে দেখলাম, পুলসিরাতের মধ্যে একবার হামাগুড়ি দিচ্ছে আবার ঝুলছে। তখন তার "নামায" এসে তাকে পুলসিরাতের অপর পাড়ে পৌঁছে দিয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা করছে। এভাবে আমার উম্মতের আরো একজনকে দেখলাম, সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। তখন "কালিমায়ে তাওহীদ" এসে তাকে দরজা খুলে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলো।

উপরে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয আবূ মূসা (র)-এর অভিমত এই যে হাদীসটি উচ্চস্তরে হাসান হাদীস শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ এই হাদীসটি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (র), হযরত উমর ইবনে যর (র)

এবং হযরত আলী ইবনে যায়িদ (র) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন, স্বপ্নে দেখা এই শ্রেণীর হাদীস আম্বিয়ায়ে কেরামের ওহীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ঐ হাদীসটির অর্থ সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য।

স্বপ্নে দেখা হাদীসের সম্পর্কে আরো কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার (যুলফাকার) তরবারিটি ভেঙ্গে গেছে। তিনি আরো বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম কিছু গাভীকে যবেহ করা হয়েছে। তিনি এই দু'টি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপ করলেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয়বরণ করবে। হযরত হামযা (রা)সহ অনেক মুসলমান শাহাদাতবরণ করবেন। হযরত সামুরা (রা), হযরত আলী (রা) এবং আবূ উমামা (রা) প্রমুখ বর্ণিত সহীহ রেওয়ায়েতগুলোতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্নে দেখা হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে বরযখে যাদেরকে আযাব বা আরাম দেয়া হবে তার বর্ণনা আছে। তবে এই ধরনের স্বপ্নে দেখা হাদীস ব্যাখ্যা-নির্ভরশীল। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে আযাবের সাথে ঐসব আমলেরও বর্ণনা রয়েছে, যেসব আমলের উসীলায় আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

হিলাল আবূ জাবাল্লা মাদানী একজন অপরিচিত রাবী। উপরোক্ত এই একটি মাত্র হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার কোন উল্লেখ নেই। হযরত আবি হাতিম (র) তাঁর পিতা থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ঠিক এমনিভাবে আবূ আহমদ, হাকিম আবূ আবদুল্লাহ, আবূ জাবাল্লা মুসলিম শরীফ থেকে নকল করে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আবূ জাবাল্লাহ থেকে ফারাজ ইবনে ফুযালাহ বর্ণনা করেছেন। ইনি একজন মধ্যম স্তরের হাদীস বর্ণনাকারী। একেবারে নির্ভরযোগ্য ও অগ্রহণীয় নন। তাঁর থেকে আবুল খতীব বাশার ইবনে অলীদ ফকীহও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাঁর চিন্তা ধারা ছিলো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) থেকে গ্রন্থকার এই হাদীসের মহত্ত্ব ও মর্তবার কথা শুনেছিলেন। হাদীসের মূলনীতির আলোকেও শাইখুল ইসলাম এই হাদীসটিকে উত্তম হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

কবরে কি মুমিন, মুনাফিক ও কাফির সবাইকে প্রশ্ন করা হয়

কবরে মুমিন, মুনাফিক ও কাফির সবাইকে প্রশ্ন করা হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

হযরত ইবনে আবদুল বার (র) বলেছেন, কবরে কিবলাপন্থীদেরকে পরীক্ষা করা হয়– সে ব্যক্তি মুমিন হোক বা মুনাফিকই হোক। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কবরে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দৃঢ়তা দান করেন, আর মুনাফিকেরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। কাফির ও মুশরিকেরা কবরে কোন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয় না। কারণ তাদের মুক্তির কোন পথ নেই। (কিতাবুত তামহীদ) কিন্তু কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কবরে মুমিন ও কাফির সবাইকে প্রশ্ন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এক প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়াতে ও আখিরাতে দৃঢ়পদ রাখেন, আর যালিমদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে দেন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

এই আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। কাজেই যালিম, মুনাফিক, মুশরিক, কাফির সবাইকে কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয়, আর জানাযায় অংশগ্রহণকারীগণ বিদায় নেন, মৃতরা তাঁদের জুতোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পান। (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, মুনাফিক ও কাফিরদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হয়– তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলো? সে জবাব দেয়, আমার জানা নেই, লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হবে তুমি জানার চেষ্টা করোনি কেন এবং কুরআন পড়োনি কেন? তারপর তাকে লোহার একটি হাতুড়ি দ্বারা প্রহার করা হয়, আর সে চিৎকার করতে থাকে। এর শব্দ জিন ও ইনসান ছাড়া নিকটস্থ অন্য সবাই শুনতে পায়। বুখারী শরীফে "ওয়া আম্মাল কাফিরু" বাক্যটি ওয়াও অক্ষর সহকারে উল্লেখ করা আছে। কাজেই কাফিরদেরকেও যে কবরে প্রশ্ন করা হয়, এটা তারই প্রমাণ।

আহমদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আমরা একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, তোমরা শুনে রাখো, আমার উম্মতগণকে কবরে পরীক্ষা করা হয়। যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে লোকজন চলে যায়, তখন ফেরেশতারা হাতুড়ি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি বলো? তিনি যদি মুমিন হন তাহলে বলেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। ফেরেশতারা তখন তাঁকে বলেন, "তুমি সত্যবাদী"। তারপর জাহান্নামের একটি দরজা খুলে তাঁরা বলেন, "তুমি যদি কাফির হতে তাহলে এটাই হতো তোমার বাসস্থান। আর সে ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক হলে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমার জানা নেই, তখন তাকে বলা হয়, তুমি জানতে চেষ্টা করোনি আর সরল পথেও আসোনি। তারপর তার সামনে জান্নাতের একটি দরজা খুলে তাকে বলা হয়, তুমি মুমিন হলে এটাই হতো তোমার বাসস্থান। তারপর ফেরেশতারা জাহান্নামের দরজা খুলে তাকে বলেন এটাই তোমার বাসস্থান। ফেরেশতারা তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে প্রহার করেন যা মানুষ ও জিন ছাড়া আল্লাহর অন্যসব সৃষ্টি তা শুনতে পায়। কোন একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন ব্যক্তিতো নেই, যার মাথার উপর ফেরেশতারা হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়াবে আর সে ভয় পাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াতটি পড়ে শুনালেন।

হযরত বারা (রা) কর্তৃক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যখন কোন কাফির দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য ফেরেশতারা আকাশ থেকে রুমাল বা চট নিয়ে আসেন। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে, কবরে মৃত ব্যক্তির রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, যদি সে ব্যক্তি কাফির হয়, তার নিকট মালাকুল মাউত এসে তার শিয়রে বসে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র রূহ কার? ফেরেশতারা তার একটি জঘন্য নাম উচ্চারণ করে বলেন, অমুকের। তারপর ফেরেশতারা যখন তার রূহকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে নিয়ে পৌছেন, তখন আকাশের দরজা বন্ধ

করে দেয়া হয়। আর আকাশ থেকেই ঐ রূহকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন, "এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে তার অবস্থা যেন সে আকাশ থেকে পড়ে গেলো এখন চাই তাকে মৃতদেহভোজী কোন পাখি ছোঁ মেরে তুলে নিলো কিম্বা বাতাস অন্য কোন দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৩১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর তার রূহ দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তার নিকট কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতারা আসেন এবং তাকে বসিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন– "তোমার রব কে?" সে জবাব দেয়, "হায় আমার জানা নেই।" ফেরেশতারা তখন বলেন, তুমিতো জানতে চেষ্টাই করোনি। ফেরেশতারা আবার প্রশ্ন করেন, "তোমাদের নিকট প্রেরিত নবীর অবস্থা কি?" সে বলে, আমি লোকজনের কাছে শুনেছি তারা তাঁকে নবী বলতো। আমার আর কোন কিছু জানা নেই, তিনি নবী ছিলেন কি ছিলেন না। তখন ফেরেশতারা বলেন, তুমি কি কখানো জানতে চেয়েছো? এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এক দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে আর আল্লাহ যালিমদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে 'ফাজির' শব্দের দ্বারা কাফিরকেও বুঝায়। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে আর দুষ্কর্মশীলরা থাকবে জাহান্নামে; সেখান থেকে তারা বিচার দিবসে প্রবেশ করবে। তারা সেখান থেকে পৃথকও হবে না।" (সূরা আল-ইনফিতার ঃ আয়াত ১৩-১৬)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে "এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত-৭)

হযরত বারা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, যখন কোন কাফির দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে, তখন দু'জন খুব শক্তিশালী ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা আগুনের পোশাক ও আলকাতরা পাজামা নিয়ে তার কাছে অবতরণ করেন, আর তাকে সেই পোশাক পরিয়ে দেন। তার রূহ এমনিভাবে টেনে বের করা হয়, যেমনিভাবে বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট শলাকা পশম জাতীয় কোন কিছুর ভেতর থেকে টেনে বের করা হয়। এইভাবে রূহকে বের করার পর দুনিয়া ও আকাশের মধ্যবর্তী প্রত্যেক ফেরেশতা এই রূহকে অভিশাপ দেন। এই প্রসঙ্গে হাদীসে আরো উল্লেখ আছে– কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর

লোকজন ফিরে আসার সময় তাদের জুতোর শব্দ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। তারপর মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার রব কে? তোমার নবী কে? আর তোমার দীন কি? সে তখন জবাব দেয়, আমার জানা নেই। তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি কখনো জানতে চেয়েছো?

হযরত বারা (রা) বর্ণিত হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে, আমরা একদিন জনৈক আনসারের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "যখন কোন কাফিরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার জন্য ফেরেশতারা আগুনের কাফন ও দুর্গন্ধ নিয়ে তার নিকট অবতরণ করেন। আর তার মৃত্যুর পর তার রূহকে কবরে ফেরত পাঠানো হয়। তারপর দাঁতের সাহায্যে মাটি সরিয়ে আর পশমের কাঁটার সাহায্যে ভূমি খনন করে মুনকার-নাকীর এসে তার কবরে উপস্থিত হন। তাঁদের গলার আওয়াজ বজ্রের মতো, আর চোখগুলো চমকপ্রদ বিদ্যুতের ন্যায়। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ও হে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমার জানা নেই। তখন আবার প্রশ্ন করা হয়, তুমি কি কখনো তা জানতে চেয়েছিলে? তারপর ফেরেশতারা তাকে এমন ভারী লোহার মুগুর দিয়ে আঘাত করেন যেটা সারা জগতের মানুষ চেষ্টা করলেও উঠাতে পারবে না। তাছাড়া তার কবরকে এতো সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যে, তার এক দিকের পাঁজর অন্য দিকের পাঁজরে ঢুকে পড়ে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

হযরত বারা (রা)-এর হাদীসটি যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁরা তাতে কাফির শব্দটি সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ 'ফাজির' শব্দটি উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ মুনাফিক ও মুরতাদ শব্দ দু'টি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহবশত একথাও বলেছেন, আমি জানিনা, তিনি মুনাফিক নাকি মুরতাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যারা 'কাফির' ও 'ফাজির' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারা কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই তা ব্যবহার করেছেন। অতএব যাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সংখ্যাও অনেক। তাঁদের বর্ণনা, এসব সন্দেহকারীদের বর্ণনার চেয়ে গ্রহণযোগ্য যারা এরূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ একাকী। এছাড়া উক্ত রেওয়ায়েতসমূহে কোন মতবিরোধও নেই। কেননা কাফির ও মুমিনের ন্যায় মুনাফিককেও সওয়াল করা হবে। অতএব আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সুদৃঢ় রাখবেন, আর সীমা লঙ্ঘনকারী অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিকদেরকে রাখবেন বিভ্রান্তিতে।

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে কাফির ও মুনাফিক দুইটি শব্দকে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি জানাযায় শরীক ছিলাম। এই হাদীসে বলা হয়েছে– যদি মৃত ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক হয়, তাহলে তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলো? সে বলে আমি কিছুই জানি না। এর দ্বারা জানা গেলো কাফির ও মুনাফিককেও কবরে সওয়াল করা হয়। আবূ আমর (র) যে বলেছেন, কাফিরকে কবরে সওয়াল করা হয় না, তা ঠিক নয়। বরং কাফিরকেও কবরে সওয়াল করা হয় আর এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য।

"কিয়ামতের দিন কাফিরকেও সওয়াল করা হবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,"এবং যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবে না।" (সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৬৫-৬৬)

"সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো ওদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে।' (সূরা হিজর ঃ আয়াত ৯২-৯৩)

"অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিলো এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো রাসূলগণকে। অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনার করবো, বস্তুতঃ আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ আয়াত ৬-৭)

কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তাহলে কবরে কেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না? কাজেই আবূ আমর (র)-এর উক্ত অভিমতের পেছনে কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই।

দ্বাদশ অধ্যায়

মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব কি কেবল শেষ নবীর উম্মতের জন্য, নাকি অন্য সকল নবীর উম্মতের জন্য ছিলো

এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। একশ্রেণীর আলিমের মতে মুনকার-নাকীরের সওয়াল কেবল শেষ নবীর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। আগেকার যামানার রাসূলগণ আসার পর উম্মতেরা যখন তাঁদেরকে অস্বীকার করতো, তখন তাঁরা নিরূপায় হয়ে তাদের থেকে সরে যেতেন এবং ঐসব লোকের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হতো আর তারা ধ্বংস হয়ে যেতো, তবে তারা আলমে বরযখের শাস্তি থেকে রেহাই পেতো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি আপনাকে সমস্ত আলমের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-১০৭)

যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাদের জন্য উপরোল্লিখিত শাস্তি স্থগিত রেখেছেন এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর দীনে প্রবেশ করে আর তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়। এভাবেই মুনাফিক সৃষ্টি হয়েছে। মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফুরী গোপন রাখতো আর বাহ্যিকভাবে তারা মুমিন সাজতো। তাই জীবদ্দশায় মুসলমানদের কাছে তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন থাকতো, তবে তারা যখন মৃত্যুবরণ করতো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের জন্য মুনকার-নাকীরকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদেরকে আল্লাহ এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখবেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-২৭)

হযরত আবদুল আশবীলী ও কুরতুবীর অভিমত হলো, উম্মতে মুহাম্মদীর ন্যায় অন্যান্য নবীর উম্মতকেও মুনকার-নাকীরের সওয়ালের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

হযরত ইবন আবদুল বার (র) প্রমুখ উপরোক্ত বিষয়ে কোন চূড়ান্ত মতামত প্রকাশে দ্বিধান্বিত। তাঁরা বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে। অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে– এই উম্মতকে সওয়াল করা হবে। এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, কবরের সওয়াল-জওয়াব তাঁর উম্মতদের জন্য নির্দিষ্ট। তবে এই অভিমতটি যে সঠিক ও সত্য সেটা সুদৃঢ়ভাবে বলা যায় না।

এছাড়া এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট অভিমতও ব্যক্ত করা যায় না যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের জন্যই কেবল কবরের সওয়াল-জওয়াব নির্দিষ্ট। তবে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে। আর এই উক্তির দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে, "আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, তোমরা তোমাদের কবরে পরীক্ষিত হবে।" এছাড়া ফেরেশতাদের উক্তি, "ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি যাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে?" মুমিন ব্যক্তি জবাব দেয়, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ কথা ঐ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে, কেননা মৃত ব্যক্তি উত্তরে নিজ নবীকে আল্লাহর রাসূল বলে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে এবং প্রশ্নও করা হবে। এটাও তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ। যাঁরা এ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন, তাঁরা এর উত্তর দিয়েছেন যে, এসব কথার দ্বারা এই উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। এই উম্মত শব্দ দ্বারা হয়তো সমগ্র মানব জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যমীনের উপর বিচরণশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখিই দেখো, এরা তোমাদের মতোই বিচিত্র জাতি-প্রজাতি, আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করায় কোন ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই তাদের রবের দিকে একত্রিত করে উপস্থিত করা হবে।" (সূরা আনআম ঃ আয়াত-৩৮)

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "কুকুরগুলো যদি অন্য উম্মতের মতো উম্মত না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম।" অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, একদা একজন নবীকে পিপঁড়া দংশন করেছিলো। সেজন্য তাঁর নির্দেশে পিঁপড়ার সমস্ত আস্তানা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তখন আল্লাহ তাআলা সেই নবীর কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছিলেন– তুমি একটি পিঁপড়া দংশনের কারণে আল্লাহ তা'আলার গুণগানকারী এক শ্রেণীর উম্মতকে পুড়িয়ে মেরে

ফেললে। এখানে এই উম্মত বলতে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে অন্য কোন উম্মতকে সওয়াল-জবাবের সম্মুখীন হতে হবে না, এটা অপরিহার্য নয়। বরং তাদের আলোচনা এ জন্য করা হয়েছে যে, তাদেরকে কবরের সওয়াল-জওয়াবের খবর জানানো হয়েছে একারণে উম্মতে মুহাম্মদী আগেকার উম্মতের সাথে সম্পর্কিত নন। কেননা এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এর উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য প্রমাণাদি অনুমান করতে হবে। অবশ্য একথা আলোচনা সাপেক্ষ যে, "এই ব্যক্তি" সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে মৃত ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করে, একথা সঠিক নয়। কেননা প্রত্যেক উম্মতের মৃত ব্যক্তিরা তাদের আপন নবীর নাম উল্লেখ করতেন। হাদীসের মধ্যে কোন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ কথার উল্লেখ আছে যে, "তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" যখন আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রমাণ পেশ করার পর প্রত্যেক উম্মতের উপর আযাব হবে, তাহলে আলমে বরযখে সওয়াল-জওয়াব খুবই স্বাভাবিক ও সমীচীন। আর এটাই হলো সঠিক উত্তর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কবরে কি শিশুদেরকেও সওয়াল জওয়াব করা হয়

কেউ কেউ বলেন, শিশুদেরকেও কবরে সওয়াল-জওয়াব করা হয়, আবার কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে সওয়াল-জওয়াব করা হয়না। ইমাম আহমদ (র)-এর অনুসারীরা এই দু'টি অভিমতেই বিশ্বাসী। যাঁরা কবরে শিশুদের সওয়াল-জওয়াবে বিশ্বাসী তাঁদের প্রমাণ হলো এই যে, শিশুদের জন্য জানাযার নামায আদায করা জরুরী এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়, "হে আল্লাহ! এদেরকে কবরের আযাব ও কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুর জানাযার নামায পড়লেন, আর উক্ত শিশুটির জন্য দু'আ করলেন– "হে আল্লাহ, একে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দু'আ করতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) নিজেই শুনেছেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)]

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট দিয়ে একবার একটি শিশুর জানাযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তিনি জানাযাটি দেখে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, শিশুটি এখন কবরে মাটির চাপের সম্মুখীন হবে, তাই তার জন্য আমার স্নেহের উদ্রেক হলো আর অশ্রু ঝরতে লাগলো। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) নিষ্পাপ শিশুদের জানাযার নামাযে বলতেন, "হে আল্লাহ, একে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" শিশুদেরকেও কবরে সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে, তাঁরা এই অভিমত পোষণ করতেন। এইরূপ অভিমত পোষণকারীরা বলে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা কবরে শিশুদের জ্ঞান পরিপূর্ণ করে দেন, যাতে তারা ইসলামী বা ইসলাম বিরোধী বিষয়ের পরিচয় লাভ করতে পারে এবং সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্তরে প্রশ্নের জবাব উদ্রেক করে দেয়া হয়। এরূপ মতাবলম্বীরা আরো বলে থাকেন যে, অনেক হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, শিশুদেরকে আখিরাতে পরীক্ষা করা হবে। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে কবরে তাদেরকে পরীক্ষা করার জটিলতা কোথায়, এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

আর যাঁরা কবরে শিশুদের সওয়াল-জওয়াবের কথা স্বীকার করেন না, তাঁরা বলে থাকেন, সওয়াল-জওয়াব তাকেই করা হয়, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর শরীআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাহলে সে বলতে পারবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছিলো কিনা এবং তাঁকে অনুসরণও করেছিলো কিনা। কিন্তু শিশুদের তো এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা অনুভূতি নেই। সুতরাং তাঁদের মতে শিশুদেরকে কবরে সওয়াল-জবাবের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাকেই শুধু এরূপ প্রশ্ন করা যায়, "তুমি তাঁর সম্পর্কে কি বলো? যাঁকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো?" যদি কবরে শিশুদের জ্ঞান পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়, তাহলেও শিশুদের নিকট এসব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা অর্থহীন। এছাড়া মৃত শিশুরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। শিশুদেরকে এরূপ প্রশ্নের দ্বারা তাদের উপকারের কোন অবকাশ নেই। তবে শিশুদেরকে আখিরাতে কোন প্রশ্ন করা হবে কিনা, এরূপ প্রশ্ন করা অবান্তর। কেননা আখিরাতে আল্লাহ পাক শিশুদেরকে রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার হুকুম করবেন। আর তাদের জ্ঞানও পরিপূর্ণ করে দেবেন, তাদের মধ্যে যারা আনুগত্য প্রকাশ করবে তারা নাজাত পাবে, আর যারা আনুগত্য প্রকাশ করবে না তারা জাহান্নামে যাবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেব শিশুদের কবরের আযাব বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে অনুসরণ না করা বা গুনাহের কাজ করার শাস্তি বুঝায় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেন না। যেহেতু শিশুরা মাসূম, তাই তাদের কবরে কোন শাস্তি হয় না। তবে কবরের আযাব অন্য কারণে হয়ে থাকে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "গৃহবাসীদের ক্রন্দনের কারণে মৃতদের আযাব হয়।" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "কারো বোঝা কেউ বহন করবে না।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-১৮)

তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– "প্রবাস হচ্ছে আযাবের অর্থাৎ দুঃখের একটি টুকরো।" এতে জানা গেলো, 'আযাব' শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে, কবরের দুঃখ যন্ত্রণা ও অশান্তি অনেক বেশি, যার দ্বারা শিশুরাও আক্রান্ত হয় এবং তারা তা অনুভব করে। এ জন্য যাঁরা জানাযা নামায পড়েন তাঁদের জন্য সুন্নাত হলো– নিষ্পাপ শিশুরাও যাতে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায়, তাঁরা যেন সেজন্য দু'আ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

কবরের আযাব স্থায়ী না সাময়িক

কোন কোন ক্ষেত্রে কবরের আযাব স্থায়ী হয়, আবার সাময়িকও হয়। **এক. স্থায়ী** কবরের আযাব বলতে ঐ আযাবকে বুঝায়, যা মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গায় প্রথম ফুঁ দেয়া পর্যন্ত চালু থাকবে। কোন কোন হাদীসে উল্লেখ আছে, শিঙ্গায় দু'টি ফুঁ এর মধ্যবর্তী বিরতির সময় কবরের আযাব লাঘব করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, আর তখন তারা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা ভীত-শঙ্কিত হয়ে বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে আমাদের শয়নগাহ্ থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো? এটা সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ্ যার ওয়াদা করেছিলেন। আর নবী রাসূলগণের কথাতো সঠিকই ছিলো। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর সকলকেই আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫১-৫৩)

নিম্নোক্ত আয়াতটিও কবরের আযাব যে স্থায়ী তা প্রমাণ করে– "অতঃপর আল্লাহ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করলো। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফিরআউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।" (সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন সম্পর্কীয় একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এ রকম শাস্তি হতে থাকবে।" (বুখারী) দু'টি কবরের উপর খেঁজুরের দু'টি তাজা ডাল পুঁতে দেয়া সম্পর্কীয় হাদীসে আছে– হয়তো ঐ ডাল শুকানো পর্যন্ত কবরের আযাব বন্ধ থাকবে। এ হাদীসে তাজা ডালের সজীবতা দূর হওয়ার শর্ত উল্লেখ রয়েছে। সজীবতা দূর হয়ে গেলে আবার কবরের আযাব শুরু হবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট আসলেন, যাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছিলো এবং চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পরক্ষণে আবার সেগুলো ঠিক হয়ে

যাচ্ছিলো। তাদেরকে এভাবেই সবসময় আযাব দেয়া হচ্ছিলো। অন্য একটি সহীহ হাদীসে ঐ লোকটির ঘটনা বর্ণিত আছে, যে লোকটি দু'খানা চাদর পরে গর্ব সহকারে চলাফেরা করতো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাটির নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে মাটির নিচে প্রবেশ করতে থাকবে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কাফির সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তারপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামে সে নিজের স্থান দেখে নেয়। এই অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই হাদীসের এক সনদের মাধ্যমে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তারপর তার জন্য জাহান্নামের একটি ছিদ্র খুলে দেয়া হয়, যার মাধ্যমে তার নিকট জাহান্নামের ধোঁয়া ও উত্তাপ কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

দুই. কবরের সাময়িক আযাব হবে তাদের জন্য যারা সাধারণ গুনাহগার বান্দা। ঐ গুনাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা আযাব ভোগ করবে, তারপর তার আযাব বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে রেহাই পেয়ে যাবে। কবরের এরূপ সাময়িক আযাব, সওয়াব রেসানী অর্থাৎ দুআ, সাদকাহ্, ইসতিগফার, হজ্জ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিদের আপনজনের পক্ষ থেকে ঐসব নেক কাজ করে মৃতদের জন্য সওয়াব পৌঁছালে তা তাদের নিকট পৌঁছে যায়। যেমন দুনিয়াতে কাউকে শাস্তি দেয়ার হুকুম হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুপারিশের মাধ্যমে সে ছাড়া পেয়ে যায়। এসব সুপারিশের ক্ষেত্রে কোন পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

কোন সুপারিশকারী আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে কোন সুপারিশ করতে পারেনা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারো প্রতি রহম করতে চান তখন তিনি নিজেই সুপারিশকারীকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এরূপ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষেরা যে নানারকম মনগড়া সুপারিশকারী ঠিক করে রেখেছে, তা সবই বাতিল ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "সে কে, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? তাদের সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে, সেসবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কেউ কোন কিছু আয়ত্ত করতে পারো না, তবে তিনি যতোটুকু ইচ্ছা করেন। আকাশ-পৃথিবী সর্বত্র তাঁর আসন পরিব্যাপ্ত। এদের হিফাযত তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ মহামর্যাদাশীল।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৫৫)

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তাঁরা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করেন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-২৮)

"তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করো না?" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৩)

"যার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর কাছে অন্য কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পর বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছে? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান।" (সূরা সাবা ঃ আয়াত-২৩)

"বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪৪)

সুপারিশের কারণে যে কোন মৃত ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে, সে সম্পর্কে একটি হাদীসে এখানে উল্লেখ করা হলো– হযরত ইবনে নাফি (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একজন মদীনাবাসী মারা গেলে তাঁকে কোন একব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জাহান্নামে আছেন। তা দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। কিছুদিন পর তিনি আবার তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতে আছেন। তখন তিনি সেই কবরবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জাহান্নামী ছিলে না? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ঘটনা তাই ছিলো। কিন্তু আমাদের পাশে একজন নেককার বান্দাকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী চল্লিশজন লোকের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর সুপারিশ কবূল করেছিলেন। আর আমি হচ্ছি ঐ চল্লিশজনের একজন।

কবরের আযাব থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে হযরত আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমাদের এক সঙ্গী বলেছেন, তাঁর এক ভাই মারা গেলে পর তিনি একবার তাকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন, দাফনের পর কবরে তুমি কি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলে? তিনি বললেন, ফেরেশতারা আগুনের গোলা নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঐ সময় আপনাদের দু'আর কারণে আমি বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। (ইবনে আবিদ দুনিয়া) এই প্রসঙ্গে হযরত আমর ইবনে জরীর (র) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর কোন মৃত ভাইয়ের জন্য দু'আ করেন তখন ঐ দুআকে একজন ফেরেশতা কবরে নিয়ে যান এবং বলেন, হে বিপদগ্রস্ত কবরবাসী, এই নাও,

তোমার দয়ালু ভাইয়ের নিকট থেকে প্রেরিত হাদিয়া। এতে জানা গেলো দু'আর বরকতে মৃত ব্যক্তিরা কবরে উপকৃত হন।

হযরত বাশশার ইবনে গালিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত রাবিআ বসরী (র)-এর জন্য অনেক দু'আ করতাম, একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, তোমার হাদিয়া নূরানী বর্তনে রেখে ও রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে আমার নিকট আনা হয়। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, যখন জীবিত মুমিন ব্যক্তি মৃতদের জন্য দু'আ করেন, আর সে দু'আ আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়, তখন ঐ দু'আ নূরানী বর্তনে নিয়ে রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে যার জন্য দু'আ করা হয়েছে তার নিকট ফেরেশতারা নিয়ে আসেন। আর মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, এসব আপনার নিকট অমুক ব্যক্তি হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

হযরত আবূ উবায়েদ (র) ইবনে বুহাইর (র) থেকে বর্ণিত আছে, আমার এক সাথী সওয়াব রেসানী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর এক মৃত সাথী ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবিতদের দু'আ কি আপনাদের নিকট পৌছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সে দু'আ নূরানী মিহির রেশমী কাপড়ের দ্বারা ঢেকে ফেরেশতারা নিয়ে আসেন, আর মৃত ব্যক্তি সেটা আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া) "জীবিতদের প্রেরিত হাদিয়া দ্বারা যে মৃতদের উপকার হয়" এই সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মৃত্যুর পর রূহ কিয়ামত পর্যন্ত কোথায় অবস্থান করে

মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত রূহ কোথায় থাকে– আকাশে না কি যমীনে, নাকি জান্নাতে? পার্থিব দেহ থেকে ভিন্ন এমন আর অন্য কোন দেহ কি কবরে তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়, যেটা আরাম বা আযাব ভোগ করে? নাকি রূহ অন্য কোথাও অবস্থান করে? নিঃসন্দেহে, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব বিষয়ের ফয়সালা কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করে।

উক্ত মতপার্থক্য সম্পর্কে কতিপয় অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। **এক–** এ বিষয়ে কারো কারো অভিমত এই যে, মুমিনদের রূহ জান্নাতে আল্লাহর নিকট থাকে- তারা শহীদ হোক বা না হোক। তবে শর্ত এই যে, তাঁদের জন্য কবীরা গুনাহ বা কোন ঋণ যেন কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না করে। রাব্বুল আলামীন তাঁদের সাথে ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করে থাকেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এই অভিমত পোষণ করতেন। **দুই–** আরেকটি অভিমত এই যে, মুমিনদের রূহ জান্নাতের চৌহদ্দীতে ও ফটকে অবস্থান করে থাকে। এছাড়া তাঁরা জান্নাতের শীতল বাতাস, রিযক ও অন্যান্য নি'আমত ভোগ করেন। **তিন–** কোন কোন আলিমের মতে, রূহ তাদের কবরের আশেপাশে অবস্থান করে। **চার–** ইমাম মালিক (র) এর অভিমত হলো– রূহ স্বাধীন ও মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা সেখানে আসা-যাওয়া করতে পারে। **পাঁচ–** ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত এই যে, কাফিরদের রূহ জাহান্নামের আর মুমিনদের রূহ জান্নাতে থাকে। **ছয়–** হযরত আবূ আবদুল্লাহ ইবনে মুনদার (র) বলেন, সাহাবী ও তাবিয়ীনদের কেউ কেউ এই মত পোষণ করতেন যে, মুমিনদের রূহ আল্লাহর কাছে অবস্থান করে। এর অধিক তাঁরা আর কিছু বলেননি। **সাত–** সাহাবী ও তাবিয়ীনদের কারো কারো অভিমত হলো, মুমিনদের রূহ জাবিয়া নামক স্থানে আর কাফিরদের রূহ বারহুতে অবস্থান করে। বারহুত হলো হাদ্রামাউতের একটি কূপের নাম। **আট–** হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি হযরত আবুল ইয়ামান আমর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুমিনদের রূহ কি একত্রিত হয়? উত্তরে তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

কিয়ামত কায়িম হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা সকল রূহকে স্ব স্ব দেহে প্রবেশ করাবেন। এটাই রূহের দ্বিতীয় জীবনকাল। এখানেই তাদের বিচারের কাজসম্পন্ন হবে। তারপর প্রত্যেকেই তার স্থায়ী বাসস্থান জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ করবে। **চৌদ্দ–** হযরত আবূ আমর ইবনে আবদুল বার (র)-এর অভিমত এই যে, শহীদগণের রূহ জান্নাতে আর অন্যান্য মুমিনদের রূহ নিজ নিজ কবরের আঙিনায় থাকে। **পনের–** হযরত মুজাহিদ (র)-এর অভিমত হলো, রূহ তো জান্নাতে থাকে না, তবে ওখানকার ফলফলাদিট ভক্ষণ করে ও খুশবুতে আনন্দ লাভ করে। **ষোল–** হযরত ইবনে শিহাব (র)-কে মুমিনদের রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির ন্যায় আরশের সাথে ঝুলে থাকে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতের বাগিচায় বিচরণ করে, আর প্রত্যহ তাদের রবকে সিজদাহ ও সালাম করে।

হযরত ইবনে আবদুল বার (র), হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির নিকট তার বরযখী বাসস্থান উপস্থাপন করা হয়। সে ব্যক্তি যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাত আর যদি জাহান্নামী হয় তাহলে জাহান্নাম তাকে দেখানো হয়। তাকে আরও বলা হয়, কিয়ামতের পর এটাই হবে তোমার স্থায়ী বাসস্থান। এ বক্তব্যের দ্বারা তাঁদের সেই অভিমতকে খণ্ডন করা হয়েছে যাঁরা বলেন, মৃত্যুর পর রূহ কবরের আঙিনায় থাকে, সহীহ হাদীসের দ্বারাও এই অভিমতটি সমর্থিত। গ্রন্থকারের মতে এর অর্থ হলো– কখনো কখনো রূহ কবরের আঙিনায় আসে, কিন্তু সবসময় সেখানে থাকে না। এই প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র) তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন, রূহ যেখানে ইচ্ছা চলাফিরা করে। **সতের–** হযরত মুজাহিদ (র) থেকে আরো বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পর রূহ প্রথম সাতদিন কবরের আঙ্গিনায় অবস্থান করে, এ সময় অন্য কোথাও যায় না। **আঠার–** কারো কারো ধারণা যে, রূহ দেহের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এঁরা রূহকে জীবন ও অনুভূতির ন্যায় দেহের একটি উপাদান বলে মনে করেন, যদিও তাঁদের এরূপ অভিমত কুরআন, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী। **উনিশ–** অপর একশ্রেণীর লোকের অভিমত হলো, রূহ অনুকূল স্বভাব ও গুণসম্পন্ন দেহে অবস্থান করে। যেমন, হিংস্র স্বভাবের রূহ হিংস্র জন্তুর দেহে, কুকুরের স্বভাবের রূহ কুকুরের দেহে, সাধারণ পশু স্বভাবের রূহ সাধারণ পশুর দেহে এবং হীন প্রবৃত্তির রূহ কীটপতঙ্গের দেহে অবস্থান করে। এই শ্রেণীর লোকেরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে না। এইরূপ অভিমত সকল ইসলামপন্থীদের অভিমত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অবাস্তব।

রূহ সম্পর্কিত যেসব ধ্যান-ধারণা এই গ্রন্থে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। রূহ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমতসমূহের সঠিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. যাঁরা বলেন, রূহ জান্নাতে থাকে, তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতটি পেশ করে থাকেন। "যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিযক এবং নিআমত ভরা উদ্যান।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৮-৮৯)

অর্থাৎ দেহ থেকে রূহ বের হওয়ার পরেই জান্নাতে অবস্থান করে। রূহ তিন ভাগে বিভক্ত- **এক.** আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী রূহ, এরা আল্লাহর নিআমতপ্রাপ্ত আর তারা জান্নাতে থাকবে। **দুই.** ডানদিকে অবস্থানকারী রূহ, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "আর যদি সে দক্ষিণ দিকের একজন হয় তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী, তোমার প্রতি শান্তি।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৯০-৯১) **তিন.** সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও বিভ্রান্ত রূহ। এই শ্রেণীর রূহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "কিন্তু সে যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও বিভ্রান্ত রূহ হয়, তাকে আপ্যায়ন করা হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা আর তাকে দাখিল করা হবে জাহান্নামে, এটা ধ্রুব সত্য। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৯২-৯৫)

একশ্রেণীর আলিমের অভিমত হলো রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর উপরোক্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়। কিয়ামতের দিন রূহের অবস্থা কি হবে তার বর্ণনা সূরা ওয়াকিয়ার প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- "যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই, এটা কাউকে করবে নিচু, কাউকে করবে সমুন্নত। যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা। অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, নি'আমতের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণখচিত সিংহাসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ১-১৬)

সূরা ওয়াকিয়াহর প্রথম ভাগে কিয়ামতে কুবরার বা বড় কিয়ামতের পরবর্তী অবস্থা, শেষভাগে কিয়ামতে সুগরার বা ছোট কিয়ামতের পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বলেন, রূহ জান্নাতে থাকে তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্মোক্ত আয়াতগুলো পেশ করে থাকেন- "হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার

নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

দুই. অনেক সাহাবী ও তাবিয়ীনের অভিমত এই যে, রূহকে মৃত্যুর সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার কালে উপরোক্তভাবে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এই শুভ সম্বোধন কেবল মৃত্যুর সময়েই হয় না, আখিরাতে এবং কবরেও রূহকে এভাবে সম্বোধন করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাঁদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, আর প্রতিশ্রুত জান্নাতের শুভ সংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে সবকিছু তোমাদের জন্য, তোমাদের যা মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো। এটাই হবে ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।" (সূরা হামীম সিজদাহ ঃ আয়াত ৩০-৩২)

উল্লেখ্য যে, এই শুভ সংবাদ মৃত্যুর সময়, কবরে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও দেয়া হয়। এছাড়া আখিরাতের প্রাথমিক শুভ সংবাদ মৃত্যুর সময়েও দেয়া হয়ে থাকে। **তিন.** হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে ফেরেশতারা রূহ কবয করার সময় বলেন, তুমি জান্নাতের শীতল বাতাস ও রিযক পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **চার.** কেউ কেউ দলীল হিসেব নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করে থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনদের রূহ হচ্ছে একটি পাখি, যে বেহেশতের তরুলতা, গাছগাছড়া থেকে ফলফলাদি ভক্ষণ করে যতোক্ষণ না আল্লাহপাক তাকে কিয়ামতের দিন আবার পুনরুত্থিত করেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র))

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "হাত্তা ইয়ারজিউল্লাহু ইলা জাসাদিহি" অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আল্লাহ তার রূহ দেহে ফিরিয়ে আনেন।

হাদীস শরীফে যে "নাসামাহ" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ হলো রূহ। তবে কারো কারো মতে "নাসামাহ" শব্দটি ইনসান শব্দের প্রতিশব্দ। রূহকে নাসামাহ বলা হয় এ জন্য যে, মানুষের দৈহিক জীবন রূহের উপর নির্ভরশীল। নাসামাহ বলতে ইনসানকেও বুঝায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীসটিও তার প্রমাণ– "মান আতাকা নাসামাতান মুমিনাতান" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি একজন মুমিনকে মুক্ত করলো।" আরবি নাসামাহ শব্দের অর্থ যে ইনসান, সেই সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ ওয়াল্লাযী ফালাকাল হাব্বাতা ওয়া বারায়ান নাসামাতা, অর্থাৎ "সে সত্তার শপথ, যিনি বীজ

অঙ্কুরিত করেছেন এবং ইনসান পয়দা করেছেন।" নাসামাহ্ শব্দের অর্থ যে ইনসান এর সমর্থনে জনৈক আরবি কবির একটি উক্তিও এখানে উল্লেখ করা হলো– ইযা নাসামাতু নাফদানুল গুবারা, অর্থাৎ "যখন মানুষ মাটি ঝেড়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে।" আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ খলীলের মতেও "নাসামাহ" শব্দের অর্থ মানুষ ও রূহ উভয়কে বুঝায়। এছাড়া নাসীম শব্দের দ্বারা প্রবাহিত বায়ুকেও বুঝায়।

আরবি 'তালুকু' শব্দের অর্থ কি সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, 'তালুকু' শব্দের লাম অক্ষরে যবর ও পেশ এর ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ খাওয়া, বিচরণ করা। রূহ জান্নাতে তরুলতা ও ফল পাকড়ি ভক্ষণ করে আর জান্নাতে চলাফিরা করে। ঠিক তেমনি উলুকাতু ও উলূক আরবি পরিভাষায় খাওয়া ও চলাফিরা উভয় অর্থই বুঝায়। যেমন বলা হয়– মাযাকাল ইওমা উলূকা অর্থাৎ "সে আজ খানা খায়নি।" হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর একটি উক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, ইন্নামাল ইয়াকুলনা উলকাতা মিনাত্তায়ামি অর্থাৎ ঐ সময়ে মহিলারা সামান্য খাবার খেতেন। উলকাতা শব্দটি তায়াল্লুক শব্দ থেকে বের হয়ে এসেছে অর্থাৎ যা খাদ্যের দ্বারা নাফস ও অন্তরকে তৃপ্তি দান করে।

পাঁচ. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে কোন কোন আলিম বলে থাকেন, মুমিনের রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে জান্নাতে থাকে। তিনি একজন শহীদ হোন বা না হোন। তবে শর্ত হলো, তিনি যেন কবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত না হয়ে থাকেন অথবা কারো কাছে ঋণগ্রস্ত না থাকেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ক্ষমা ও কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন।

হযরত আবূ আমর (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অভিমত হলো, মুমিনদের রূহ ইল্লিয়্যীনে ও কাফিরদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে। হযরত আবূ আমর (রা) বলেন, এই অভিমতের সাথে ঐ হাদীসের বিরোধ বাঁধে, যেখানে বলা হয়েছে, "তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সামনে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান পেশ করা হয়। যদি তিনি জান্নাতী হন তাহলে তাঁর সামনে জান্নাত, আর যদি সে ব্যক্তি জাহান্নামী হয় তাহলে তার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয়, এই অবস্থা কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।"

কারো কারো মতে উপরোক্ত হাদীসটির সারমর্ম হলো– সাধারণ মুমিনদের রূহ নয় বরং মহান শহীদগণের রূহ জান্নাতে থাকে, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা

আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯-১৭১)

এক. একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, শহীদগণ সকাল-সন্ধ্যা বেহেশতে চলাফিরা করেন, আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুস হলো তাঁদের বাসস্থান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাদেরকে যে ইযযত দিয়েছি, তোমাদের দৃষ্টিতে কি এর চেয়ে অধিক আর কোন ইযযত আছে? তাঁরা বলেন, 'না', তবে আমাদের একটা আকাঙ্খা যে, আমাদের রূহ আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যেন আমরা আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি।

দুই. যখন উহুদের যুদ্ধে তোমাদের ভাইগণ শহীদ হলো, তখন আল্লাহ তাঁদের রূহকে সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে রেখে দেন। তাঁরা জান্নাতী নহরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ান আর জান্নাতের ফলফলাদি ভক্ষণ করেন এবং আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত ফানুসে এসে অবস্থান করেন। যখন এঁরা নিজেদের উত্তম খানা-পিনা ও থাকার স্থান দেখেন, তখন তাঁদের ইচ্ছা হয়, যদি আমাদের ভাইয়েরা এ সংবাদ জানতেন যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি আর উৎকৃষ্ট পানাহার করি, তাহলে তাঁরাও জিহাদ থেকে বিরত থাকতেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলেন, তোমাদের পয়গাম আমি তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। (আহমদ, আবূ দাউদ)

তিন. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং তারা জীবিকা প্রাপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলে তিনি ইরশাদ করেছিলেন, শহীদদের রূহ বেহেশতে সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে অবস্থান করে ও তারা বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা চলাফিরা করে, তারপর আল্লাহর আরশের ফানুসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একবার আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কোন বাসনা আছে কি? তাঁরা বললেন, জান্নাতে তো সবই আছে আর কি চাইবো। কিন্তু আল্লাহ

তাআলা তিনবার এই প্রশ্ন করলেন। যখন তাঁরা বুঝলেন, জবাব দিতেই হবে, তখন তাঁরা বললেন, "হে আমাদের রব! আমরা চাই আমাদের রূহ আবার আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যাতে আবার আমরা তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি।" অতঃপর যখন আল্লাহ দেখলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, তখন তাঁদেরকে সেই অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন। (মুসলিম)

হযরত হারিসা ইবনে সুরাকা (রা)-এর মাতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে হারিসা (রা) সম্পর্কে বলুন, যে বদরের যুদ্ধে তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছিলো। সে যদি বেহেশতী হয় তাহলে আমি সবর করবো আর তা না হলে আমি কাঁদতে থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে উম্মে হারিসা! বেহেশত তো অনেকগুলো আছে, তোমার ছেলে জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে যেটা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

চার. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে থাকে ও জান্নাতে ফলফলাদি ভক্ষণ করে।

পাঁচ. হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, শহীদগণের রূহ সাদা রংয়ের পাখির আকৃতি ধারণ করে এবং বেহেশতী ফল ভক্ষণ করে।

ছয়. হযরত ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, শহীদগণের রূহ সাধারণ পাখির চেয়ে কিছুটা বড় ধরনের পাখির মধ্যে থাকে। এরা একে অন্যের সাথে পরিচিত এবং তারা জান্নাতী ফল খায়।

হযরত আবূ আমর (রা) বলেন, উপরোক্ত 'আসার' অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শহীদগণ সাধারণ মুমিনদের মতো নন, তাঁদের মাকাম হবে জান্নাতে। আবার কোন কোন বর্ণনায় পাখির পেটের কথা বলা হয়েছে, কোন বর্ণনায় সবুজ রংয়ের পাখির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ অভিমত অধিক যুক্তিগ্রাহ্য যিনি রূহকে পাখির আকৃতি ধারণ করে বলে উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনাটি হযরত কা'ব (রা)-এর অভিমতের অনুকূল যেখানে বলা হয়েছে, মুমিনের রূহ পাখির পেটের মধ্যে আছে। হযরত আবদুল্লাহ (রা) -এর বর্ণনায় রয়েছে– "কাতায়রিন খুদরিন" অর্থাৎ সবুজ পাখির ন্যায়। কিন্তু সহীহ মুসলিমে- "ফি আজওয়াফি তায়রিন খুদরিন" অর্থাৎ সবুজ রংয়ের পাখির পেটের মধ্যে এই কথা উল্লেখ আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিপ্রেক্ষিতে

ইরশাদ করেছেন, শহীদ মুমিনের রূহ একটি পাখি, যে জান্নাতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিদের নিকট সকাল-সন্ধ্যায় তাদের অবস্থান পেশ করা হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শহীদগণের জান্নাতী মনযিল যেটা খাস করে তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, সেখানে তারা কিয়ামতের দিন প্রবেশ করবে। কেননা শহীদগণের মহল ঐ সব ফানুস নয় যেখানে বরযখের মধ্যে তাঁদের রূহ অবস্থান করে। সুতরাং সাধারণ মুমিনদের মতো শহীদগণও ঐ ফানুস থেকে নিজ জান্নাতী আবাসস্থল প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় অবলোকন করে থাকেন। তাঁরা তো তাঁদের আসল নিবাস কিয়ামতের দিন লাভ করবেন, বরযখে নয়। এর বাস্তব উদারহণ হলো, ঐ সব দুর্ভাগা ব্যক্তি যাদের নিকট সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নাম হাযির করা হয়, কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে যা বরযখে দেখানো হয়েছিলো। জানা গেল যে, জান্নাতে এবং আলমে বরযখে রূহের আরাম বা শান্তি এক রকম, আর কিয়ামতের দিন জান্নাতে নিজ নিজ আবাসে যাওয়া অন্য রকম। বরযখে রূহের যে জান্নাতী খাবার দেয়া হবে, পরবর্তী জীবনে তাদেরকে সশরীরে জান্নাতে যে খাবার দেওয়া হবে তা হবে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তবে পুরোপুরি আনন্দ, আরাম ও শান্তি তারা লাভ করবে যখন তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে।" অতএব জানা গেল যে, উপরোক্ত হাদীসে দু'টোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং এদের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে। হযরত কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে শহীদদের প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা শব্দগতভাবে এর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ, শহীদদের সংখ্যা মুমিনদের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান শহীদের প্রতিদানকে ঈমানের গুণাগুণের শর্তাধীন বলে উল্লেখ করেছেন, শাহাদাতের গুণ হিসেবে নয়। ঈমানের সেই গুণকে তিনি শহীদগণের শাহাদাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। হযরত মিকদাম ইবনে মাআদীকারাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট শহীদরে ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে– **এক.** রক্তের প্রথম বিন্দু ঝরার সাথে সাথেই শহীদের ক্ষমা করা হয়। **দুই.** তাঁকে তাঁর জান্নাতী মহল দেখিয়ে দেয়া হয়। **তিন.** তাঁকে ঈমানের অলঙ্কার পরিয়ে দেয়া হয়। **চার.** তাঁকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। **পাঁচ.** তিনি সব রকম ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকেন। **ছয়.** তাঁর মাথায় ইয়াকূতের মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়, যার একটি একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও দুনিয়ার ভেতরকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম। বাহাত্তর জন সুলোচনা হুরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়, আর তাঁর সত্তরজন আপন লোকের জন্য

তাঁকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয় এবং তা গ্রহণ করা হয়। তাই আল্লাহ তাআলা ইন্না লিশশহীদ অর্থাৎ নিশ্চয়ই শহীদের জন্য বলেছেন ইন্নালিল মুমিন নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য বলেননি। এমনিভাবে হযরত কায়েস আল জাযযামী (রা) বর্ণিত হাদীসেও শহীদগণের ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শাহাদাতের প্রতিদান শর্তাধীন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত আয়াতে অথবা হাদীসে প্রতিদানকে ঈমানের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, সকল মুমিন তাতে শামিল আছেন– তাঁরা শহীদ হোন বা না হোন। ঐসব আয়াত ও হাদীস যে গুলোতে শহীদদের রিযক ও জান্নাতে তাঁদের রূহ থাকার উল্লেখ আছে, সেগুলো সবই সহীহ ও সঠিক। কিন্তু জান্নাতে যে সাধারণ মুমিনদের রূহ থাকবে না, এর কোন প্রমাণ নেই। তবে সিদ্দীকগণের রূহ যে জান্নাতে থাকবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তাঁদের মর্যাদা শহীদদের চেয়ে অধিক। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সিদ্দীকগণ জান্নাতে আছেন কি নেই, এর জবাব যদি ইতিবাচক হয়, আর সেটাই স্বাভাবিক, তা হলে জানা গেলো যে, ঐসব আয়াত বা হাদীসে কেবল শহীদদের সম্পর্কেই বলা হয়নি। আর এর জবাব যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বড় বড় সাহাবী যেমন– হযরত আবূবকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবুদ্দারদা (রা) ও হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) প্রমুখের রূহ জান্নাতে নন, ধরে নিতে হয়। এছাড়া আমাদের সময়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের রূহও জান্নাতে আছে বলে মেনে নিতে হয়। তাই এটা একটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা।

যদি ধরে নেয়া যায়, উক্ত অভিমত শুধু মাত্র শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, তাহলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও মরতবা উল্লেখ করা হলো কেন? এর জবাব হলো, আসলে এর দ্বারা শাহাদাতের ফযীলত এবং শহীদগণের উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই যাঁরা শহীদ, শাহাদাতের সওয়াব ও মরতবা তাঁদেরই প্রাপ্য। যাঁরা শহীদ নন তাঁদের তুলনায় বরযখী জীবনে শহীদগণ অধিক মর্যাদা লাভ করবেন। মর্যাদার দিক থেকে শহীদগণের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। আল্লাহ তা'আলা শহীদগণের রূহকে সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে রেখে দেন, যেহেতু তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে থাকেন। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে আলমে বরযখে অপরূপ দেহ দান করেন, যেখানে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবেন। আর শরীরের দ্বারা তাঁরা ঐসব রূহের আরামের চেয়ে অধিক আরাম ভোগ করেন, যাঁরা এরূপ দেহ লাভ করেননি। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মুমিনের রূহ পাখির পক্ষপুটে থাকে। লক্ষণীয় যে, মুমিনের রূহকে এখানে পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তাঁদের রূহ পাখির পক্ষপুটে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাক্য এখানে একটি অপরটিকে সমর্থন করে। এভাবে আরো জানা গেলো যে, এসব পবিত্র বাণী ও আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে এবং এগুলো অকাট্য সত্য। এরূপ সমন্বয় বিধান হযরত আবূ আমর (রা)-এর সমন্বয়ের বিধান থেকে উত্তম। এই রেওয়ায়েত দু'টি– "শহীদদের রূহ সবুজ পাখির মতো" বা শহীদদের "রূহ সবুজ পাখির পক্ষপুটে থাকে", সঠিক ও নির্ভুল।

রূহ জান্নাতে থাকবে এবং সেখানকার ফলফলাদি ভক্ষণ করবে ও খুশবু অনুভব করবে। এ প্রসঙ্গে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহীদগণ জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী নহরের পাশে সবুজ গম্বুজে অবস্থান করেন। তাঁদের রিযক সকাল-সন্ধ্যা বেহেশত থেকে তাঁদের কাছে পৌঁছে। এই হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা বেহেশতে অবস্থান করেন না। কেননা নহরটি জান্নাতের ফটকে থাকলেও সেটা বেহেশত থেকেই প্রবাহিত। উক্ত নহরের তীরে তাঁদের মহল থাকে আর জান্নাত থেকেই তাঁদের রিযক আসে। উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের পর শহীদগণ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবেন, বেহেশতের নহরের তীরবর্তী মহলে নয়।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, "বেহেশতের মহলে শহীদদের রূহ থাকবে না" এর অর্থ এই যে, হাশরের দিন বিচারের পর শহীদদের জন্য আগে যে সমস্ত জায়গা নির্ধারিত ছিলো, সেগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাঁরা বেহেশতের নতুন জায়গায় চলে যাবেন। তবে এ সম্পর্কিত আলোচনায় এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যেটা অতি সহজে বোধগম্য। আর এ সহজ ও স্বচ্ছ ভাষাই হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ভাষা। এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করলে আরো অনেক তথ্য জানা যাবে।

হযরত উম্মে কাবাসা বিনতে মারূর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন, আমরা তাঁর খিদমতে রূহ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন তিনি এমন এক বক্তব্য রাখলেন যা শুনে আমরা সবাই কাঁদতে লাগলাম। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, মুমিনদের রূহ ঐসব সবুজ পাখির পক্ষপুটে থাকে, যারা জান্নাতে বিচরণ করে ও জান্নাতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে এবং জান্নাতের পানি

পান করে। আর আরশের নিচে স্বর্ণের ফানুসে এসে অবস্থান করে। আর তাঁরা আরয করেন, হে আমাদের রব, আমাদের ভাইদেরকেও আমাদের নিকট নিয়ে আসুন। আর আপনি আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূরণ করুন। অপরপক্ষে, কাফিরদের রূহ ঐসব কালো পাখির পক্ষপুটে থাকে, যেসব পাখি আগুন ভক্ষণ করে আর আগুনের গর্তে বাস করে। আর তারা বলে, হে আল্লাহ! আমাদের কাছে আমাদের ভাইদেরকে আনবেন না। এছাড়া আপনি আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূরণ করবেন না। (ইবনে মানদা)

হযরত যুমরা ইবনে হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে মুমিনদের রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, এরা সবুজ পাখিদের মধ্যে থাকে এবং জান্নাতে যেখানে খুশি সেখানে বিচরণ করে। সাহাবীগণ তখন আরয করলেন, তাহলে কাফিরদের রূহ কোথায় থাকে? তিনি ইরশাদ করলেন, ঐগুলো সিজ্জীনে বন্দী থাকে। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের রূহ 'যার আযবার' নামক সবুজ পাখিদের মধ্যে থাকে আর বেহেশতী ফলফলাদি ভক্ষণ করে। কেউ কেউ এই উক্তিটি ইবনে আমরের নিজস্ব বক্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এটি কোন হাদীস নয়।

হযরত তামীমদারী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মালাকুল মাউত মুমিনের রূহ নিয়ে আকাশের দিকে উঠেন, তখন জিবরাঈল (আ) সত্তর হাজার ফেরেশতাসহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের মধ্যে আকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য ফেরেশতারাও শামিল থাকেন। মালাকুল মাউত আরশের কাছে গিয়ে সিজদায় পড়েন। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করেন, আমার বান্দার রূহকে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষে যেখানে স্তরে স্তরে কদলী গাছ সাজানো রয়েছে, তার সম্প্রসারিত ছায়ায় প্রবাহমান পানির পরিবেশে রেখে দাও। আর তার জন্য সুশোভিত ও আরামদায়ক আবাস্থল নির্ধারিত করে দাও, যেখানে পানাহারের প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে।

"রূহ কবরে থাকে" কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, তারা সেখান থেকে কখনো পৃথক হয় না, তাহলে সেটা হবে একটি ভ্রান্ত ধারণা। কুরআন ও হাদীসের দ্বারা এই ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো প্রমাণাদি পরে পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

যাঁরা মনে করেন, রূহ কখনো কখনো কবরে আসে অথবা অন্য কোন স্থায়ী আবাসস্থল থেকে কবরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, তাহলে সে বিষয়ে দ্বিমতের

কোনই অবকাশ নেই। তবে এর দ্বারা জানা গেল, কবর রূহের কোন স্থায়ী ঠিকানা নয়। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আবদুল বার (র)ও এই অভিমতটি সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ কথার সমর্থনে আরো সহীহ হাদীস ও হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া কবরকে উদ্দেশ্য করে সালাম পেশ করা সংক্রান্ত হাদীসগুলোও এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। এখানে মুতাওয়াতার বা ধারাবাহিক হাদীস বলতে হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত বারা ইবনে আযিব (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত জাবির (রা) প্রমুখের বর্ণিত হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া কবরবাসীদেরকে সালাম দেয়া সম্পর্কিত সমস্ত হাদীসও এর সঙ্গে যুক্ত আছে।

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে রূহ যে রফীকে আ'লায় অবস্থান করে সেটাই সঠিক। মৃতদের কাছে জান্নাতে বা জাহান্নামকে পেশ করার জন্য রূহের কবরে অবস্থান করা এমন কোন অপরিহার্য ব্যাপার নয়। নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রমাণিত হয়। আর সে সম্পর্কের ভিত্তিতেই রূহের অবস্থান জান্নাত বা জাহান্নামে হয়ে থাকে। কেননা রূহের ব্যাপারটা আলাদা। রূহ রফীকে আলা ও ইল্লিয়্যীনে থাকা সত্ত্বেও এমনিভাবে দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট যে, যখন মৃত ব্যক্তিদের প্রতি কেউ সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তিদের রূহ তাঁদের কবরে ফিরিয়ে দেন আর তাঁরা সেই সালামের উত্তর দেন, যদিও রূহ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে। সাধারণতঃ এখানে অনেকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা দেখা যায়, দেহের ন্যায় একই সময়ে রূহের দুই স্থানে উপস্থিতি অসম্ভব। এরূপ ধারণা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রূহ আকাশের উপর ইল্লিয়্যীনে থাকা সত্ত্বেও কবরে এসে যিয়ারতকারীর সালামের জবাব দেয়, আর সালামকারীকে চিনতেও পারে। লক্ষণীয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মুবারক সর্বদা রফীকে আ'লায় আছেন। কিন্তু তিনি তাঁর রওযা মুবারক যিয়ারতকারীদের সালাম শুনেন এবং তাদের জবাবও দিয়ে থাকেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে মি'রাজের সময় হযরত মূসা (আ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছিলেন এবং ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে গিয়েও তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। রূহ হয়তো এতোই দ্রুতগতি সম্পন্ন যে, এক পলকে হাজার বছরের দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। অথবা রূহের সাথে কবরের সম্পর্ক বজায় থাকে। যেমন সূর্য আকাশে আছে কিন্তু তার কিরণের দ্বারা যমীনের সঙ্গেও এই সম্পর্ক বজায় রাখে। একথা প্রমাণিত যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহ সামান্য সময়ের মধ্যে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদাহ

করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই রূহের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। রূহের জন্য জান্নাতে যে সমস্ত নিআমত রাখা হয়েছে ফেরেশতাগণ তাকে তা দেখিয়ে দেন। হযরত বারা (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের সামান্য অবকাশের মধ্যেই ফেরেশতারা তার রূহকে নামিয়ে নিয়ে আসেন এবং তার দেহের সাথে কাফনে প্রবেশ করিয়ে দেন।

এখানে হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হলো। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি একবার জঙ্গলে আমার পশুগুলোকে দেখতে গেলাম। রাত হয়ে গিয়েছিলো, তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হারাম (রা)-এর কবরের নিকট রয়ে গেলাম। আমি কবর থেকে কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এরূপ ভালো কিরায়াত আমি আগে কখনো শুনিনি। একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরয করলে, ইরশাদ হলো, তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হারাম (রা)-এর রূহ কবয করার পর ইয়াকূত ও যমরূদের ফানুসের মধ্যে রেখে বেহেশতের মধ্যখানে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রূহ রাত্রে তাঁর কবরে আসে আর সকালে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। তাই তুমি তার সুমিষ্ট কিরায়াত শুনতে পেয়েছিলে। (ইবনে মানদাহ্)

রূহ যে দ্রুতগতি সম্পন্ন এই হাদীসের দ্বারা সেটা প্রমাণিত হলো। রূহ সামান্য সময়ের মধ্যে আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত আর যমীন থেকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই জন্য ইমাম মালিক (র) প্রমুখ বলেছেন, রূহ মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তারা যাতায়াত করতে পারে। সাধারণ লোকও স্বপ্নে মৃতদের সাক্ষাৎ লাভ করে, এতে কেউ কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করে না, এরা অনেক দূর থেকে আগমন করে, আবার কোন কোন সময় জীবিতদের রূহ উড়ে গিয়ে উপরে অন্য রূহের সাথে দেখা করে আসে। কখনো কখনো মৃতদের রূহ অবতরণ করে আর তাদের কবরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। কবরবাসীদের প্রতি সালাম ও সম্বোধনের দরুন এটা জরুরী নয় যে এঁদের রূহ জান্নাতে না থেকে কবরের আশেপাশে থাকে।

কবরবাসীদের প্রতি সালাম ও সম্বোধনের জন্য রূহের কবরে থাকা জরুরী নয়। লক্ষণীয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মুবারক আ'লা ইল্লিয়্যীনে রফীকে আ'লার সাথে আছেন। তবে তিনি রওযা পাকে সালামকারীদের সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন। এছাড়া হযরত ইবনে বারা (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী শহীদগণের রূহ জান্নাতে থাকে। অথচ অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের ন্যায়

এঁদের প্রতিও সালাম পেশ করা হয়, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের প্রতি সালাম পেশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও উহুদের যুদ্ধের শহীদদের প্রতি সালাম পেশ করতেন। অথচ একথা প্রমাণিত যে, এঁদের রূহ জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এটা কি একটা আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, রূহ থাকে জান্নাতে আর কবরে সালামকারীদের সালামও শুনে আর তাদের সালামের উত্তরও দিয়ে থাকে। এই বক্তব্যটি হয়তো অনেকে বুঝতে অক্ষম, কিন্তু এর জবাব হলো, রূহকে দেহের সাথে অনুমান বা ধারণা করা ঠিক নয়। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছেন যে, তাঁর সাতশ ডানা রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি পাখা মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সবকিছু ঢেকে রেখেছে। তিনি জিবরাঈল (আ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে হাঁটু গেড়ে বসতেন এবং অল্প জায়গাতেই তাঁর সংকুলান হতো। চিন্তার বিষয় যে, তিনি উচ্চস্থানে নিজের জায়গায় আছে, আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনেও আছেন। তবে এ ধরনের ঘটনা যদি কারো বোধগম্য না হয়, তাহলে কিছু বলার নেই।

যিনি উপরোক্ত বক্তব্যটি বুঝতে অক্ষম তিনিই কেবল এই কথা অবিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। অথচ আল্লাহ আকাশমণ্ডলীর উপরে আরশে অবস্থান করছেন। আল্লাহ তা'আলার আসন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহীয়ান ও গরিয়ান। আবার আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের দিন সূর্য ঢলার পর আরাফাতে অবস্থানকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এমনিভাবে, কিয়ামতের দিন মাখলূকের হিসেব নিতেও তিনি আবির্ভূত হবেন, আর যমীন তাঁর নূরে ঝলমলিয়ে উঠবে। যখন তিনি যমীনকে ফরাশের মতো সুসমতল ও সুসজ্জিত করে ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছিলেন, তখনও তিনি দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিয়ামতের দিনও সেখানে আল্লাহর আবির্ভাব ঘটবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তারপর রাব্বুল আলামীন যমীনে অবতরণ করবেন অথচ সব বসতি তখন খালি পড়ে থাকবে। এখানে লক্ষণীয় যে, একই সময়ে তিনি যমীনে থাকবেন এবং আরশের উপরও থাকবেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "রাসূল ঈমান এনেছেন সেগুলোর উপর যা তাঁর পালনকর্তার নিকট থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে আর যারা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও হিদায়াতকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৮৫)

রূহের বিবিধ গুণের পার্থক্যের কারণে এর রকম-ফেরও ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন রূহের শক্তি খুব বেশি, আর কোন কোন রূহের শক্তি কম। কাজেই শক্তিশালী রূহের ক্ষমতার তুলনায় দুর্বল রূহের ক্ষমতা হবে কম। দুনিয়াতেও রূহের কার্যকরণ ও আচার-আচরণ নানাভাবে পরিদৃষ্ট হয়। রূহের অবস্থা, রূহের ক্ষমতা, দুর্বলতা, দ্রুততা, ধীরতা, সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যে রূহ দেহের বন্ধন এবং সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত, সে রূহের শক্তি, সাহস এবং আল্লাহর দিকে যাওয়ার ক্ষিপ্রতা অন্য রূহের চেয়ে অনেক বেশি। দেহে আটক অবস্থায়ও রূহের শক্তির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেহ থেকে রূহের মুক্তি লাভের পর এর অবস্থা ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এছাড়া দেহ থেকে মুক্তি লাভের পর রূহের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি একত্রিত হয়। সেই অবস্থায় রূহ তার মৌলিক উপাদান ও শক্তি ফিরে পায়। এরই ফলশ্রুতিতে রূহ অধিকতর শক্তি ও উদ্যোগের অধিকারী হয়।

মানুষের মৃত্যুর পর রূহের কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন রকমের বর্ণনা স্বপ্নের মাধ্যমে জানা যায়। রূহের বিভিন্ন উচ্চ মর্যাদা ও কর্ম তৎপরতা প্রকাশ পায়, যা রূহ দেহে থাকাবস্থায় সম্ভব ছিলো না। যেমন একাকী একটি বা দুটি বা কতিপয় রূহ বিরাট সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে অনেকে স্বপ্নে দেখেছেন যে, তাঁদের পবিত্র রূহ কাফির ও যালিমদের লশকরকে পরাস্ত করে দিয়েছে। পরে এসব ঘটনা বাস্তবায়িত হতে দেখা গিয়েছে। দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন বিপক্ষ দলের সেনাবহিনী, মুষ্টিমেয় এবং দুর্বল মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছে, এরূপ ঘটনাও ঘটেছে।

এছাড়া এটা কি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় যে, স্বপ্নযোগে দু'জন মুসলমান বন্ধুর রূহ পরস্পর সাক্ষাৎ করে থাকে অথচ তাদের মধ্যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান। কোন কোন রূহ একে অন্যের জন্য ব্যথাও অনুভব করে এবং তারা যে একে অপরের বন্ধু সেটাও উপলব্ধি করে। অথচ এটাতো তাদের মধ্যে কোন দৈহিক সাক্ষাৎকার নয়। অবশেষে তাদের যখন সশরীরে সাক্ষাৎ হয়, তখন তারা স্বপ্নে যা দেখেছিলেন তা হুবহু মিলে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ একজন মুমিনের রূহ অন্য কোন মুমিনের রূহের সঙ্গে বহু দূরে থেকেও সাক্ষাৎ করে; অথচ তারা একে অপরকে কোন দিনও দেখেননি। এই রেওয়ায়েতটিকে কেউ কেউ মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইকরামা (র) ও হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, নিদ্রার সময় রূহ তো দেহের মধ্যেই থাকে, মৃত্যুর মতো একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। তবুও রূহ দূরদূরান্তে উড়ে বেড়ায়। আবার সেই রূহ যখন দেহে ফিরে আসে তখন নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে উঠে। সূর্যের কিরণ যেমন সূর্য থেকেই বের হয়ে আসে এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় সূর্যের মূল কিরণ তো সূর্যের মধ্যেই থেকে যায় যদিও সূর্যের কিরণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এক শ্রেণীর আলিম বলে থাকেন, রূহ নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে আলো বিকিরণ করে, তবে দেহই হলো, রূহের মূল বাহন। রূহ মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। যেমন একটি প্রদীপ থেকে এর সলিতা বের করে নিলে এটা নিভে যায়, ঠিক তেমনি প্রদীপের মধ্যে যতোক্ষণ সলিতা থাকে, ততোক্ষণই এর আরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে রূহও নিদ্রাবস্থায় দেহ থেকে বের হয়ে দূরদূরান্ত ঘুরে আসে। এই অবস্থায় কোন কোন মৃত ব্যক্তির রূহের সাথেও দেখা করে আসে। যদি নিদ্রিত অবস্থায় ঐ রূহকে প্রহরী ফেরেশতারা কোন কিছু দেখান আর ঐ ব্যক্তি যদি নেককার ও বিচক্ষণ বান্দা হন, আর কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত না থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে যা কিছু দেখান তা তাঁর স্মরণ থাকে। পক্ষান্তরে, নিদ্রিত ব্যক্তি যদি বদকার ও অজ্ঞ হয়, তাহলে সে স্বপ্নযোগে যা দেখতে পায়, তা সত্য হয় না এবং সে কোন কিছু স্মরণও রাখতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একজন সৎ ও ধার্মিক লোক স্বপ্নযোগে তাই দেখে থাকেন যা তিনি চিন্তাভাবনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের জাগতিক ধ্যান-ধারণার বাহ্যিক প্রকাশ। যে যেমন চিন্তাভাবনা করে সে স্বপ্নে সেটাই প্রত্যক্ষ করে। সাধারণতঃ অসৎ ব্যক্তির অশ্লীল ও অশুভ বিষয়ে আগ্রহ থাকে এবং স্বপ্নযোগে সে সেটাই দেখতে পায়। জীবিতকালে সে ব্যক্তি যে সব কুকর্মে লিপ্ত ছিলো, মৃত্যুর পর সেজন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "বরং ওরা নিজের রবের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত"। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯)

উপরোক্ত আয়াতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হলো। **এক.** হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর নেক রূহকে আসমানে আল্লাহর সন্নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়, আর বদকার রূহের জন্য প্রথম আকাশের দরজাই খোলা হয় না। বরং ঐখান থেকেই সেই বদ রূহকে নিচে ছুঁড়ে মারা হয়, তারপর সে রূহ কবরে ফিরে আসে।

(সহীহ সনদ সহকারে ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত) **দুই.** হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, মুমিননের রূহ যখন দেহ থেকে বের হয়ে আসে, তখন ঐ রূহ থেকে মেশকের চেয়েও বেশি খুশবু বের হয়। তারপর ফেরেশতারা তাকে প্রথম আকাশের নিকট নিয়ে যান, আকাশবাসীরা জিজ্ঞেস করেন ইনি কে? রূহ বহনকারী ফেরেশতারা বলেন, ইনি অমুকের পুত্র অমুক, একজন নেককার ব্যক্তি। তখন ঐ ব্যক্তির নেক আমলের একটি ফিরিস্তিও দেয়া হয়। তা শুনে আকাশের ফেরেশতারা, রূহ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে ও রূহকে স্বাগত জানান এবং তাঁদের কাছ থেকে রূহকে নিয়ে যান। অতঃপর আকাশের যে পথে বান্দার আমল উপরে উঠে, সেই পথে সূর্যের মতো উদ্ভাসিত হয়ে তাঁরা গন্তব্য পৌছে যান।

কাফিরদের রূহ যখন প্রথম আকাশের নিকট পৌছে, তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন এ-কে? রূহ বহনকারী ফেরেশতারা বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুক, আর সে একজন অসৎ ব্যক্তি। তখন ফেরেশতারা বিরক্ত হয়ে ঐ বদকার রূহকে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন এই রূহকে সর্বনিম্ন স্থানে পৌছে দাও। **তিন.** হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত ঃ সকল নেক রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হয়ে আছে এবং নিজ নিজ দেহে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ না দেয়া পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। **চার.** হযরত ইবনে যুবায়ের (রা)-এর শাহাদাতবরণের পর তাঁর পবিত্র লাশ বাইতুল্লাহ শরীফের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। হযরত ইবনে উমর (রা) তখন সেখানে তাশরীফ আনলেন। আর হযরত ইবনে যুবায়ের (রা)-এর আম্মা হযরত আসমা (রা)-কে এই বলে তিনি সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিলেন যে, আপনি সবর করুন ও পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করুন এই মৃতদেহ এমন কিছুই নয়, রূহই আসল যা আল্লাহর কাছে আছে। হযরত আসমা (রা) তখন বললেন, আমি চরম ধৈর্যধারণ করেছি।

এই প্রসঙ্গে হযরত আসমা (রা) বলেন, আগেকার দিনের জনৈক যালিম বাদশাহ হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর শাহাদাতের পর তাঁর শির মুবারককে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে জনৈকা ইসরাঈলী পতিতাকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলো। যখন আল্লাহর একজন নবীর শির মুবারকের প্রতি ঐরূপ জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো, তখন আমরা আর কোন ছার। **পাঁচ.** হযরত হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি একদিন হযরত কা'ব (রা), রাবী ইবনে খাইসুম (রা), হযরত খালিদ উরউয়াহ (রা) প্রমুখের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। হযরত কা'ব (রা) তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেখানে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, ইনি তোমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। তারপর হযরত কা'ব (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে অতি সসম্মানে বসালেন। তারপর হযরত কা'ব (রা) আরয করলেন, আমি পবিত্র কুরআনের সব অর্থ বুঝতে পেরেছি কিন্তু চারটি জায়গার অর্থ বুঝতে পারিনি। আপনি মেহেরবানী করে সেগুলোর অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিন। **এক.** ইল্লিয়্যীন কি? **দুই.** সিজ্জীন কি? **তিন.** সিদরাতুল মুনতাহা কি? **চার.** "ওয়া রাফায়নাহু মাকানান আলিয়্যা" আয়াতের অর্থ কি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইরশাদ করলেন, ইল্লিয়্যীন হলো– সপ্তম আকাশে একটি স্থানের নাম যেখানে মুমিনদের রূহ অবস্থান করে। আর সিজ্জীন হলো– সপ্তম যমীনের নিচের স্তর যেখানে কাফিরদের রূহ ইবলীস বাহিনীর নিচে অবস্থান করে। সিদরাতুল মুনতাহা হলো– একটি কুলগাছ যা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মাথার উপরে রয়েছে। এটাই সৃষ্টির জ্ঞানের শেষ সীমা। এর উপরের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জ্ঞাত নয়। তাই এই বৃক্ষকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়। "ওয়া রাফায়নাহু মাকানান আলিয়্যা" এই আয়াতের অর্থ হলো– আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট তাঁর ইনতেকাল সম্পর্কে ওহী পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর এক ফেরেশতা বন্ধুকে বলেছিলেন, আযরাঈল (আ)-কে বলে দিতে তিনি যেন তাঁর রূহকে কিছু বিলম্বে কবয করেন, যাতে তিনি আরো কিছু নেক আমল করার সুযোগ পান। এই কথা শোনার পর ঐ ফেরেশতা হযরত ইদরীস (আ)-কে তাঁর পিঠে তুলে চতুর্থ আকাশে চলে গেলেন। সেখানে আযরাঈল (আ)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো। তখন তিনি হযরত ইদরীস (আ)-এর অনুরোধের কথা তাঁকে জানালেন। আযরাঈল (আ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইদরীস (আ) এখন কোথায়? ঐ ফেরেশতা বললেন, তিনি এখন আমার পৃষ্ঠদেশেই আছেন। এটা শুনে আযরাঈল (আ) বললেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর রূহ চতুর্থ আকাশে কবয করি, অতঃপর হযরত ইদরীস (আ)-এর রূহ সেখানেই কবয করা হলো। (জরীর ইবনে মানদাহ)

ছয়. হযরত যাহহাক (র)-এর মতে মুমিনের রূহ কবয করার পর দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। তারপর আকাশের সম্মানিত ফেরেশতারা দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত সেই রূহকে পৌছে দেন। এইভাবে সপ্তম আকাশ অতিক্রম করার পর মুমিনের রূহ সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছে যায়। সিদরাতুল কেন বলা হয়? হযরত যাহহাক (র)-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন– আল্লাহর কোন নির্দেশ এই বৃক্ষকে অতিক্রম করে না। ফেরেশতারা বলেন, হে রব, এ হলো আপনার অমুক বান্দা, যদিও আল্লাহ সবকিছু পরিজ্ঞাত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার নিকট তার

সীলযুক্ত আমলনামা পঠিয়ে দেন, যা ঐ ব্যক্তিকে আযাব থেকে রক্ষা করে। নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে- "হাঁ হাঁ নিশ্চয় সৎলোকদের লিপি অর্থাৎ আমলনামা সবচেয়ে উচ্চস্থান 'ইল্লিয়্যীনে' আছে এবং আপনি জানেন 'ইল্লিয়্যীন' কেমন? ঐ লিপিটা হচ্ছে একটি সীল মোহরযুক্ত লিপি। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তরা (ফেরেশতাগণ) যার রক্ষণাবেক্ষণ করেন।" (সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ১৮-২১)

যাঁরা বলেন, রূহ বেহেশতে থাকে এই অভিমতটি তাঁদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার ও আল্লাহর নিকটে অবস্থিত। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, শহীদগণের রূহ তাঁর কাছেই রয়েছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেসব রূহ জান্নাতে যেখানে খুশি চলাফিরা করে।

মুমিনদের রূহ যে জাবিয়ায় ও কাফিরদের রূহ হাদরামাউতের বারহুত নামক কূপে অবস্থান করে এটা রাফিযীদের অভিমত বলে ইমাম ইবনে হাযম (র) উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর এই বক্তব্য সঠিক নয়। আহলে সুন্নাতের এক শ্রেণীর লোকও এই অভিমত সমর্থন করেন। সাহাবা ও তাবিয়ীনের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, মুমিনদের রূহ জাবিয়াহ নামক স্থানে অবস্থান করে। এছাড়া হযরত ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের রূহ জাবিয়াতে আর কাফিরদের রূহ হাদরামাউতের লোনাভূমিতে বারহুত নামক কূপে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁর কাছে মাসয়ালা-মাসায়েল জানতে চাইছে। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্নকারীকে বললেন, তুমি ইবনে আমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করো, মুমিনদের ও কাফিরদের রূহ কোথায় অবস্থান করে? সেই ব্যক্তি হযরত ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মুমিনদের রূহ জাবিয়াতে ও কাফিরদের রূহ বারহুতে অবস্থান করে। (ইবনে মানদাহ)

এই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীতে উত্তম কূপ হলো যমযম, আর নিকৃষ্ট কূপ হলো বারহুত। এছাড়া পৃথিবীর উত্তম এলাকা হলো পবিত্র মক্কার এলাকা, আর হিন্দুস্তানের ঐ এলাকা যেখানে হযরত আদম (আ) বেহেশত থেকে অবতরণ করেছিলেন। এই দু'টি এলাকা থেকে তোমাদের নিকট সুগন্ধ আসে। পক্ষান্তরে, নিকৃষ্ট এলাকা হলো আহকাফ, যেটা হাদরামাউতে অবস্থিত। এখানেই কাফিরদের রূহকে ফিরিয়ে আনা হয়। (ইবনে মানদাহ)

এই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) আরো বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো- হাদরামাউতের উপত্যকা, যাকে বারহুত বলা হয়, যেখানে কাফিরদের রূহ থাকে।

সেখানে একটি কূপ আছে। সেই কূপের পানি দেখতে পুঁজের মতো কালো রংয়ের, সেখানে পোকা-মাকড় জমে থাকে।

জনৈক ব্যক্তি এক রাত্রিতে বারহুত নামক কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেভাবে একে অন্যকে ডাকাডাকি করে ঠিক ঐরূপ আওয়ায সেখানে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। হে দাওমাহ, হে দাওমাহ, এরূপ শব্দ শুনা যাচ্ছিলো। আহলে কিতাবের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি 'দাওমাহ' শব্দের অর্থ কাফিরদের রূহের তত্ত্বাধানে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে বুঝায় বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি হাদরামাউতের লোকদের নিকট থেকে শুনেছেন, ঐস্থানে রাত্রিকালে কোন লোক থাকতে পারে না। সেটাও কাফিরদের রূহের অবস্থানের একটি জায়গা। (ইবনে মানদাহ) রূপক অর্থে জাবিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে, খোলামেলা জায়গা। এছাড়া জাবিয়াহ শব্দের অর্থ যদি বিশেষ কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়, তাহলে এর সঠিক তত্ত্ব শরীআতের জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করাই সমীচীন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আমি 'যাবূর'-এর মধ্যে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত- ১০৫)

এই পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ 'আরদ' শব্দের অর্থ বেহেশতের যমীন বলে ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) 'আরদ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরো একটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেটা হলো– ঐসব এলাকা যা উম্মতে মুহাম্মদী কর্তৃক বিজিত হয়। 'আরদ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থটি এখানে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। এই অভিমতটি সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা সমর্থিত। "আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদেরকে যাঁরা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছেন এবং সৎকর্ম করেছেন যে, অবশ্যই তাঁদেরকে তিনি পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করবেন যেমনি তাঁদের পূর্ববর্তীদেরকে খিলাফত দান করেছিলেন।" (সূরা নূর ঃ আয়াত -৫৫)

এ প্রসঙ্গে একটি সহীহ হাদীসও এখানে উল্লেখ করা হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "দুনিয়ার মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমার জন্য বরাদ্দ করে দেয়া হয়েছে। অতিসত্বর ঐ সব দেশে আমার উম্মতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এক শ্রেণীর মুফাসসিরে কুরআন বলেন যে, 'আরদ' শব্দের অর্থ বাইতুল মুকাদ্দাস।

আর যে যমীনের ওয়ারিস আল্লাহর নেক বান্দাগণ হবে বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে– বাইতুল মুকাদ্দাস সেই যমীনের অন্তর্ভুক্ত।

মুমিনদের রূহ সপ্তম আকাশে ইল্লিয়্যীনে থাকে, আর কাফিরদের রূহ সপ্তম যমীনের নিচে সিজ্জীনে থাকে। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি পবিত্র বাণী "হে আল্লাহ! উঁচু সাথীদের কাছে আমাদের পৌঁছে দিন।" উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে এ বাণীটি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) ও হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) কর্তৃক হাদীসে এই প্রসঙ্গটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া হযরত হুযাইফা (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা)-এর অভিমতও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহীদগণের রূহ আল্লাহর আরশের নিচে ফানুসের মধ্যে অবস্থান করে। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণিত হাদীসেও সেই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এসব প্রমাণের দ্বারা রূহ যে দেহ থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথে ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে থাকে সেটা প্রমাণিত হয় না। বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, রূহকে রবের সামনে পেশ করা হয় এবং তিনি ফয়সালা করে দেন এরা কোথায় থাকবে। তারপর রূহকে-সওয়াল-জওয়াবের জন্য কবরে ফেরত পাঠানো হয়। এভাবে মুমিনদের রূহ মর্যাদা অনুযায়ী ইল্লিয়্যীনে আর কাফিরদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে।

মুমিনদের রূহ যে যমযম কূপের মধ্যে একত্রিত হয়ে থাকে, সে ধরণা সঠিক নয়। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের অভিমতও নেই। বরং এই অভিমতটি সরাসরি হাদীসের পরিপন্থী। পবিত্র হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মুমিনদের রূহ হলো এক ধরনের পাখি যারা জান্নাতের তরুলতা, ফলফলাদি ভক্ষণ করে। এই অভিমতটি জাবিয়াহ সংক্রান্ত মতের চেয়েও ভ্রান্ত ও বাতিল। কেননা জাবিয়াহ একটি প্রশস্ত জায়গা আর যমযম হলো একেবারেই একটি সংকীর্ণ স্থান।

রূহের অবস্থান সম্পর্কে হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলেছেন, বরযখ হলো আড়াল দেয়া একটি অবস্থান যা দুনিয়া ও আখিরাতকে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ রূহ মুক্ত, রূহ আলমে বরযখে অবস্থান করে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমনাগমন করতে পারে। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত অভিমত। কেননা রূহ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে আর আখিরাতের এখনো অনেক বাকী। তবে মুমিনদের জন্য বরযখ একটি আরামদায়ক স্থান যা অফুরন্ত নিআমতে ভরপুর। অপরপক্ষে কাফিরদের রূহ একটি সংকীর্ণ স্থানে অশান্তি ও আযাবের মধ্যে থাকে। তাই পবিত্র কুরআনে

ইরশাদ হয়েছে, "তাদের সামনে বরযখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" সূরা আল মুমিনুন ঃ আয়াত-১০০)

পবিত্র হাদীসের বর্ণনানুযায়ী হযরত আদম (আ) তাঁর ডানে ও বামে রূহের সমাবেশ লক্ষ্য করেছিলেন। পবিত্র মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসটি এই অভিমত সমর্থ করে। কিন্তু এই হাদীসে এরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই যার দ্বারা রূহ যে সরাসরি হযরত আদম (আ)-এর ডানে বা বামে অবস্থান করছিলো, সেটা বুঝায়। তবে কিছু সংখ্যক রূহকে, তাঁর ডানদিকে উঁচু ও প্রশস্ত স্থানে দেখা গিয়েছিলো, আর কিছু সংখ্যক রূহকে তাঁর বামদিকে এক নিচু, আঁধার ও সংকীর্ণ স্থানে দেখা গিয়েছিলো।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র) বরযখ সম্পর্কে বলেন, এটা হলো প্রথম আকাশের নিকটবর্তী একটি স্থান। যা পার্থিব উপাদান যেমন, পানি, মাটি, আগুন ও বায়ু ইত্যাদি বহির্ভূত, যাঁরা বিনা দলীল প্রমাণে কোন বক্তব্য রাখেন, তাঁদেরকে ইমাম ইবনে হাযম (র) তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, যদিও তিনি নিজের ঝুলির প্রতি কোন লক্ষ্য করেননি। এছাড়া তিনি তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে কুরআন বা হাদীস থেকে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থকার এর আগেও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককারদের রূহ প্রথম আকাশে হযরত আদম (আ)-এর ডানদিকে আর কাফিরদের রূহ তাঁর বামদিকে দেখতে পেয়েছিলেন। পবিত্র হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, শহীদগণের রূহ আরশের ছায়ায় অবস্থান করে, আর আল্লাহর আরশ সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। তাহলে উপরোক্ত এই দুই মতের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়। তবে এই প্রশ্নের একাধিক জবাব রয়েছে। **এক.** এর দ্বারা এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, মুমিনদের রূহ আদম (আ) -এর ডানপাশে উঁচুতে থাকবে না, আর কাফিরদের রূহ তাঁর বামপাশে নিচুতে থাকবে না। **দুই.** প্রথম আকাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রূহকে সাময়িকভাবে পেশ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়, যদিও নেককারদের রূহের আবাসস্থল ইল্লিয়্যীনে আর বদকারদের রূহের অবস্থানস্থল সিজ্জীনে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন অভিমত ব্যক্ত করেননি যে, তিনি প্রথম আকাশে কেবল সৌভাগ্যবানদের রূহ দেখেছিলেন, বরং তিনি বলেছেন, আমি আদম (আ)-এর ডানদিকে কিছু সংখ্যক রূহ দেখেছি, আর বামদিকেও কিছু সংখ্যক রূহ দেখেছি।

তবে এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম (আ) রয়েছেন প্রথম আকাশে, আর হযরত মূসা (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) যথাক্রমে রয়েছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে। রূহ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী ঊর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে, এটাই হলো রফীক আ'লায় রূহের অবস্থান।

ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত অনুযায়ী মানুষের দেহ তৈরির আগে রূহ যেখানে ছিলো, মৃত্যুর পরও সেখানেই থাকবে। তাঁর এই অভিমতের ভিত্তি হলো, মানুষের রূহ তার দেহ সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তবে এ সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন অভিমত রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের মতে, দেহকে সৃষ্টি করার পরই রূহকে সৃষ্টি করা হয়। দেহকে সৃষ্টি করার পূর্বে রূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে যাঁরা দাবী করেন, তাঁদের কাছে কুরআন বা হাদীসের কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। এমনকি তাঁদের কাছে ইজমারও কোন প্রমাণ নেই। তবে তাঁদের এরূপ দাবিকে প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর উপর নির্ভর করেন। এছাড়া কতক দুর্বল হাদীসের সাহায্যও তাঁরা নিয়ে থাকেন। "এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সাক্ষী করেছেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? সবাই বললো, কেন নন, নিশ্চয়ই।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরে নমুনা তৈরি করেছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদাহ করো। ইবলিস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদাহরত হলো। যারা সিজদাহ করলো সে তাদের দলভুক্ত হলো না।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১১)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত রূহ একবারেই সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রূহ হলো একটি সম্মিলিত বাহিনী। যখন আল্লাহ পাক রূহ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের অঙ্গীকার নিলেন, তখন তারা আকার-আকৃতি বিশিষ্ট একটি সৃষ্টি এবং জ্ঞানসম্পন্নও ছিলো। তখন পর্যন্ত ফেরেশতাদেরকে আদম (আ)-কে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং রূহকে তাঁর দেহে প্রবেশও করানো হয়নি। রূহের তখন কোন অবস্থান ছিলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা উপরে উল্লেখিত আয়াতে 'সুম্মা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হলো– বিরতির মাধ্যমে কোন কাজ কিছু বিলম্বে সমাধা করা। অর্থাৎ কোন একটি কাজসম্পন্ন হওয়ার পর কিঞ্চিত বিলম্বে অন্য কাজ সম্পন্ন করা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রূহকে সৃষ্টি করে রেখে দিলেন, মৃত্যুর পর তারা বরযখে ফিরে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো– দেহের আগে রূহের সৃষ্টি হয়েছে নাকি দেহের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর পর রূহ কোথায় অবস্থান করে? এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত হলো– রূহ ঐ বরযখে অবস্থান করে, যেখানে মানুষের দেহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ছিলো। এটা তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস বা আকীদা। এছাড়া তাঁর মতে নেককারদের রূহ হযরত আদম (আ)-এর ডানদিকে ও বদকারদের রূহ তাঁর বামদিকে থাকে। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসও বটে। "রূহের অবস্থান বরযখের ঐ স্থানে যেখানে পার্থিব জড় উপাদানের সমাপ্তি ঘটেছে।" ইমাম হাযম (র)-এর এই অভিমত নির্ভরযোগ্য বা প্রমাণ ভিত্তিক নয়। কুরআন ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। আর মুসলমানদের সত্যিকার আকীদার সাথে এর কোন সাদৃশ্য বা মিল নেই। এছাড়া সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রূহের অবস্থান হলো জড় জগতের উপাদান-উপকরণের উর্ধ্বে জান্নাতে। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারাও এটা প্রমাণিত। ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত অনুযায়ী শহীদগণ জান্নাতে অবস্থান করেন। তবে এটাও সত্য যে, সিদ্দীকদের মর্যাদা একজন শহীদের চেয়ে অধিক। তাহলে মহান সিদ্দীকগণও অবশ্য জান্নাতে অবস্থান করেন। অন্যথায় এটা অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবুদ্দারদা (রা), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের রূহ মুবারক অবস্থান করছে– দুনিয়ার আকাশের নিচে, আর শহীদগণের রূহ জান্নাতে সিদ্দীকগণের রূহের চেয়ে উপরে অবস্থান করে। ইমাম ইবনু হাযম (র) তাঁর এই অভিমতটি হযরত মুহাম্মদ ইবনে নসর মারূযী (র) ও হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া (র) থেকে গ্রহণ করেছেন বলে দাবী করেন। এছাড়া তাঁদের এই অভিমত সমস্ত আলিমগণও সমর্থন করেছেন। ইবনে হাযম (র)-এর এই দাবি ও অভিমত মোটেই সঠিক ও তথ্য নির্ভর নয়। কেননা হযরত মুহাম্মদ ইবনে নসর মারূযী (র) তাঁর "কিতাবুর রদ্দে আলা ইবনে কুতায়বা" শীর্ষক গ্রন্থে– "ওয়া ইয আখাযা রাব্বুকা"– আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, প্রখ্যাত আলিমগণও এ ব্যাপারে একমত যে, অন্য কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বেই হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত রূহ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্ধৃতি দ্বারা ইমাম ইবনু হাযম (র)-এর দাবী– "রূহের অবস্থান ঐস্থানে যেখানে পার্থিব উপাদানের সমাপ্তি ঘটেছে," কোন প্রকারেই প্রমাণিত হয় না। এমনকি এটাও প্রমাণিত হয় না যে, দেহের পূর্বে রূহ বিদ্যমান ছিলো। তবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় রূহকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে তাদের থেকে

নিজ রাবুবিয়াতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর আবার সেগুলোকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও আগেকার ও পরবর্তীকালের আলেমদের এক শ্রেণী এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো এর বিপরীত যা সামনে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ইবনে হাযম (র)-এর জবাবের মধ্যে একথা উল্লেখ নেই যে, রূহ প্রথমে দেহে ছিলো নাকি পরে দেহে সংযুক্ত হয়েছে। আর যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, রূহ প্রথমে দেহে ছিলো না, তাহলে এর দ্বারা এই দাবী প্রমাণিত হয়না যে, রূহের অবস্থান হলো ঐস্থানে, যেখানে আনাসির বা পার্থিব উপাদান শেষ হয়ে যায়। আর মৃত্যুর পূর্বেও ঐ আনাসিরই ছিলো রূহের অবস্থানস্থল।

"দেহের সাথে রূহ ধ্বংস হয়ে যায়" –এটা হলো তাদের আকীদা যারা রূহকে দেহের উপাদান বলে মনে করে। ইমাম বাকিলানী (র) প্রমুখ এই মত পোষণ করতেন। হযরত আবূ হুযায়েল আল্লাফ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তবে তিনি রূহকে দেহের একটি উপাদান মনে করতেন। রূহের অর্থ যে জীবন তিনি এটা স্বীকার করতেন না। অবশ্য হযরত ইমাম বাকিলানী (র) ও হযরত হুযায়েল আল্লাফ (র) প্রমুখের অভিমত এই যে, একজন মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার অন্যান্য উপাদানের ন্যায় রূহও মৃত্যুবরণ করে। তাঁরা আরো বলেন, যে কোন উপাদান দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকেনা। তবে আশআরিয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই এই অভিমত পোষণ ও সমর্থন করেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক পরিবর্তনের পর একটি নতুন রূহের সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য, অর্থাৎ জীবনের ক্ষণস্থায়ী সময়ের মধ্যে অসংখ্য রূহ জন্ম নিতে পারে, তখন তার পূর্বের অবস্থা আর থাকে না। কাজেই রূহের আকাশে উঠা, অবতরণ করা, কবরে ফিরে আসা, মুনকার-নাকীর কর্তৃক কবরে সওয়াল ও জওয়াবের সম্মুখীন হওয়া, তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া এবং কবরের আযাব বা আরাম ইত্যাদি বিষয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই মৃত ব্যক্তির দেহে আযাব বা আরাম হয়ে থাকে। আর ঐসময় মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয়। রূহের নিজস্ব কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। এই অভিমত পোষণকারীদের এক শ্রেণীর মত হলো, মানুষের জীবন শুধু মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তের হাড়ে ফিরিয়ে আনা হয়। আর এতেই মৃত ব্যক্তি আযাব বা আরাম ভোগ করে। এই অভিমত হলো তাঁদের, যাঁদের রূহ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান বা ধারণা নেই। সুতরাং তারা কি করে অন্যদের রূহের সঠিক অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে?

উপরে বর্ণিত অভিমতগুলো কুরআন-হাদীস ও ইজমার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এই সব

অভিমত যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। দেহ থেকে রূহ বের হওয়া, প্রবেশ করা এবং ফিরে আসার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া নির্ভরযোগ্য তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা এটা সঠিকভাবে স্বীকৃত যে, রূহ উপরে উঠে, নিচে নামে, রূহকে আটক করা হয়, মুক্তও করা হয়, রূহের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয়, রূহ আল্লাহকে সিজদাহ করে, অন্য রূহের সঙ্গে কথাও বলে, আর পানির ফোঁটার ন্যায় অতি সহজে দেহ থেকে বেরিয়ে আসে, রূহকে জান্নাতী বা জাহান্নামী পোশাকও দেয়া হয়। আযরাঈল (আ) রূহকে তাঁর হাতে তুলে নেন, এসব রূহ থেকে মৃগনাভির খুশবু অথবা পচাগলা লাশের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধ নির্গত হয়। রূহকে এক আসমান থেকে অন্য আসমানে ফেরেশতারা বিদায় সম্বর্ধনা জানান। তারপর রূহকে ফেরেশতাদের সাথে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং দেহ থেকে রূহ বের করার সময় মৃত ব্যক্তি তা প্রত্যক্ষ করে। পবিত্র কুরআন থেকেও প্রমাণিত যে, রূহ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কণ্ঠনালী স্থলে গিয়ে পৌঁছে। ইতিপূর্বে এই মর্মে অনেক দলীল ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। রূহের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে। এছাড়া রূহ হচ্ছে একটি সম্মিলিত বাহিনী। তাই ইমাম ইবনু হাযম (র) এবং তাঁর অনুসারী আলিমদের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে হযরত আদম (আ)-এর ডানপাশে ও বামপাশে রূহ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, মুমিনের রূহ এক প্রকার পাখির ন্যায়, এরা জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও তরুলতা থেকে ফলফলাদি ভক্ষণ করে। শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখিদের পক্ষপুটে থাকে। আর ফিরআউন গোষ্ঠীর লোকদের রূহকে সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়।

ইমাম বাকিলানী (র) মনে করেন যে, রূহ মানুষের দেহের একটি অন্যতম উপাদান। তিনি আরো মনে করেন যে, একটি দেহ থেকে হাজার হাজার রূহ সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ ধারণা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মৃত্যুর পর একজন মানুষকে তার আমলের আযাব বা আরাম ভোগের জন্য একটি রূহের প্রয়োজন। আসলে, মানুষের দেহে একটি রূহই অবস্থান করে।

মৃত্যুর পর রূহের অবস্থানের জন্য নতুন দেহের প্রয়োজন আছে কি নেই, এটা একটি বিতর্কিত বিষয়, এটাকে পুনর্জন্ম বা অন্য কিছু বলা হোক বা না হোক। দার্শনিকদের দৃষ্টিতে পুনর্জন্ম হলো– এই দুনিয়া ধ্বংস হবে না, আর রূহ বিভিন্ন দেহের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকবে, যা একটি অবান্তর ও অবাস্তব ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, শহীদগণের রূহ আরশের সাথে লটকানো ফানুসের মধ্যে অবস্থান

করে। আর সেই ফানুসগুলো হলো পাখির বাসার মতো। এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা শহীদগণের রূহকে সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে রেখে দেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুমিনের রূহ পাখির মতো বেহেশতের তরুলতা, ফলফলাদি ভক্ষণ করে।" এই হাদীসের দুটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে। হয়তো মানুষের দেহের ন্যায় এই সবুজ পাখি রূহের বাহনের কাজ করে। এটা হলো– এক শ্রেণীর মুমিন ও শহীদদের রূহের জন্য। অন্য ব্যাখ্যা হলো, রূহ পাখির আকৃতি ধারণ করে।

রূহের অবস্থান সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম (র) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, "মুমিনের রূহ হলো পাখির ন্যায় যারা উড়ে ও চরে বেড়ায়।" এই হাদীসটির অর্থ খুবই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। কোন হাদীসের অর্থ কারো অনুমান সাপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়। মুমিনদের রূহ জান্নাতে পাখির মতো উড়ে বেড়ায়। এর অর্থ এ নয় যে, রূহ পাখির আকৃতি ধারণ করে। আরবি 'নাসামাতুন' শব্দটির মধ্যে 'তা' অক্ষরটি এখানে স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরব দেশীয় কোন বক্তা বলে থাকেন– আপনি আমার বক্তব্যের লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ করে দিয়েছেন। উত্তরে লোকটি বলছিলেন- কিতাবের অপর নাম কি সহীফাতুন নয়? এর উত্তরের উপর ভিত্তি করে আরবি 'নাসামাতুন' শব্দটি অনুমান করতে হবে। এই হাদীসে আরো বলা হয়েছে– রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পেটের মধ্যে আছে। এই মর্মে এটাই একমাত্র হাদীস। ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমতটি আক্ষরিক অর্থের দিক দিয়ে ভ্রান্ত। কেননা, "নাসামাতুল মুমিনে তায়েরুন ইউলাকু ফী শাজারিল জান্নাতি" অর্থাৎ মুমিনের রূহ পাখির রূপ ধরে জান্নাতের বৃক্ষসমূহে বিচরণ করে ও ফলফলাদি ভক্ষণ করে। "আরওয়াহুশশুহাদায়ি ফী হাওয়াসিলে তাইরিন খুদরিন।" অর্থাৎ শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে থাকে।

তবে উপরোক্ত হাদীস দু'টি হলো বিতর্কিত। প্রথম হাদীসটিতে হেরফের করার কিছু সুযোগ আছে। দ্বিতীয় হাদীসটিতে হেরফের করার কোনই সুযোগ নেই। দ্বিতীয় হাদীসটির একটি শব্দ 'হাওয়াসেল' এর পরিবর্তে 'আজওয়াফ' উল্লেখ আছে। আর অপর একটি শব্দ 'খুদরিন' এর স্থলে 'বীয' শব্দ উল্লেখ আছে। ইমাম ইবনে হাযম (র) বলেছেন, এই পাখি বেহেশতে বিচরণ করে ও সেখানকার গাছের ফলফলাদি ভক্ষণ করে, আর জান্নাতের নহর থেকে পানি পান করে। তারপর আরশের নিচে ঝাড়গুলোর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করে। ঐ ঝাড়গুলো ওদের জন্য বাসাতুল্য। অতএব ইমাম ইবনে হাযম (র) এর একথা যে, সমস্ত পাখিদের পক্ষপুট ফানুসের বিশেষণ এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণা। বরং এ ঝাড়গুলো হচ্ছে

পাখিগুলোর বিশ্রামাগার। এই হাদীসের মধ্যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথমটি হলো, রূহের সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি হলো, ঝাড়সমূহ যা এসব পাখির বিশ্রামাগার, যেগুলো 'আরশের নিম্নস্থলে রয়েছে এবং কোথাও বিচরণ বা চলাফিরা করেনা। আর পাখিগুলো চলাফিরা ও বিচরণ করে। আর রূহ থাকে পাখিদের পেটের মধ্যে।

যদি বলা হয় যে, পাখিদের রূহের বাহন মনে না করে যদি সরাসরি পাখি বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে অসঙ্গতির কিছু থাকে না। বরং সেটা কুরআন-হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে গঠন করেছেন।" (সূরা আল ইনফিতার ঃ আয়াত-৮)

পবিত্র হাদীসে উল্লেখ আছে– "তাদের অর্থাৎ শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির মতো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীও একথা সমর্থন করে। ইমাম ইবনে হাযম (র)ও এটা সমর্থন করেছেন। উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে দু'টি শব্দই আছে, একটির অর্থ হলো, শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পক্ষপুটে থাকে, অন্যটির অর্থ হলো, রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পেটের মধ্যে থাকে। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে– 'ফী আজওয়াফিন তাইরিন খুদরিন' এর উল্লেখ আছে, রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পেটের মধ্যে থাকে। উহুদের যুদ্ধে শহীদগণ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহকে ঐ সমস্ত সবুজ পাখির পেটে রেখেছিলেন, যারা জান্নাতী নহরের উপর দিয়ে উড়ে জান্নাতের ফল-ফলাদি খায় এবং আরশের ছায়ায় ঝুলানো স্বর্ণের ঝাড়সমূহে বিশ্রাম নেয়।" (ইবনে আবী শাইবা) হযরত কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে : শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির মধ্যে থাকে। (সুনানে আরবায়া, আহমদ)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো যে, শহীদদের রূহের বাহন হলো বেহেশতের সবুজ রংয়ের পাখি। এই অভিমত মেনে নিলে কুরআন ও হাদীসের সাথে কোন বিরোধ থাকে না। শহীদগণ তাঁদের দেহ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেন, এর বিনিময়ে তাঁদেরকে তাঁদের দুনিয়ার দেহ থেকেও উত্তম দেহ প্রদান করা হয়, আর এই দেহ তাঁদের রূহের বাহনের কাজ করে। এইভাবে শহীদগণ জান্নাতের মধ্যে উত্তম নিআমত ও আনন্দ উপভোগ করেন। তবে কিয়ামতের দিন তাঁদের রূহ দুনিয়ার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এই সব আলোচনা থেকে কেউ যেন পুনর্জন্মের ধোঁকা বা ভ্রান্তিতে না পড়েন। এছাড়া কাফির বা বিধর্মীগণ পুনর্জন্ম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, এটা সেরূপ কোন ব্যাপার নয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে যা সঠিক তা সত্য এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেটাকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে হবে। পুনর্জন্মের ধারণার সাথে শহীদদের অবস্থানকে কোনভাবেই তুলনা করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও আসমায়ে হুসনার যেসব তথ্য শরীআতের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেসবকে যারা অস্বীকার করে এবং মনে করে আল্লাহ্ দেহ ধারণ করেন, তাদের এরূপ ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা শরীআতের সুপ্রতিষ্ঠিত হাকীকতকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আল্লাহ্ পাকের যেসব কার্যকারণ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, যেমন ইচ্ছে করলে তিনি কারো সাথে কথা বলেন, রাত্রের শেষ প্রহরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন, কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য আবির্ভূত হবেন, এসবই সঠিক ও সত্য। কেউ যদি এ অবস্থাকে আল্লাহ্ পাকের দেহ ধারণ করা অর্থে গ্রহণ করে তাহলে তা হবে চরম বিভ্রান্তি। এছাড়া শরীআতের বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন, আবার সৃষ্টি থেকে পৃথকও রয়েছেন, আরশের উপর সমাসীন আছেন, ফেরেশতা ও রূহ তাঁর কাছে উঠা নামা করেন, ভালো কথা ও ভালো আমল তাঁর কাছে পেশ করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মি'রাজের রাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন, তাঁর নিকটবর্তী হয়েছিলেন, উভয়ের মধ্যে মাত্র দুই ধনু অথবা তার চেয়েও কম ব্যবধান বিদ্যমান ছিলো। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে জাহমিয়া সম্প্রদায় বলে থাকেন, আল্লাহ্ দেহ ধারণ করেন এবং তাঁর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দিকও আছে। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের এরূপ ধারণার দ্বারা আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীকে অস্বীকার করা যায় না। এই সব বিষয় সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, কোন আপত্তিকারীর আপত্তির কারণে আল্লাহ্ তাআলার কোন গুণাবলীকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিদআতীদের নিয়ম হলো, তারা আহলে সুন্নাত ও তাঁদের বক্তব্যকে এমনিভাবে আখ্যায়িত করে যা শুনলে অজ্ঞ লোকেরাও তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, আল্লাহ্ হলেন, 'তারকীব' অর্থাৎ যৌগিক, 'তাজসীম' বা দেহধারী সত্তা। তারা আল্লাহ্ তা'আলার আরশকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে। এই সব আরবি শব্দের অর্থকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ যে তাঁর মাখলূকের সাথে রয়েছেন এবং আরশের উপরও যে আছেন তা বিদআতীরা অস্বীকার করে। তদ্রূপ রাফিযীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদেরকে 'নাসিবী' বলে থাকে। আর কাদরিয়া

সম্প্রদায় যারা ভাগ্যের ভালো মন্দের বিশ্বাস করে, তাদেরকে 'জাবরিয়া' বলে অভিহিত করে। আসলে, এসব উপাধিসূচক শব্দ এমন কিছু নয়, বাস্তবতার নিরিখে এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। কাজেই এসব হাকীকত যে সত্য তা প্রমাণিত হওয়ার পর শহীদদের রূহ যে, সবুজ পাখির মধ্যে থাকে, কেউ যদি এটাকে পুনর্জন্ম বা দেহান্তর হিসেবে অভিহিত করে তবে এর দ্বারা মূল অর্থ ব্যাহত হয় না।

পুনর্জন্ম হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেটাকে বেদীনরা এবং ঐসব লোকেরা সমর্থন করে যারা নাস্তিক, আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু এবং যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে। এদের ভ্রান্ত ধারণা হলো, রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণী, কীট-পতঙ্গ ও পাখির দেহ ধারণ করে চক্কর দিতে থাকে এবং এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য দেহ ধারণ করে। অতঃপর তারা ঐ দেহ ছেড়ে নিজেদের কর্মফল, স্বভাব ও আচরণের দরুন আযাব ভোগ করে। এই আবর্ত থেকে তারা কখনো মুক্তি পায় না। কেননা তাদের ধারণা দুনিয়ার এই গোলক ধাঁ ধাঁ কখনো শেষ হবে না, মৃত্যুর পরবর্তী সময় বলতে কিছু নেই, আর দুনিয়ার কোন শেষ নেই। এটাই হলো, ঐ বাতিল পুনর্জন্মবাদ। এই পুনর্জন্মবাদ সকল নবী রাসূলগণের আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নবী রাসূলগণের আকীদা হলো, মৃত্যুর পর হাশরের দিন সকল মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে। পুনর্জন্মাবাদে যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না। এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট রূহের অবস্থান হলো স্থূলদেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর যথোপযুক্ত কোন পশু-পক্ষির দেহে সেই রূহ অবস্থান করে। এটা একটি অতিশয় ঘৃণিত ও ভ্রান্ত মতবাদ। এসব ভ্রান্ত ধারণা ঐসব লোকের যারা মনে করে, দেহের ন্যায় রূহও ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলীন হয়ে যায়। আর তারা আযাব বা আরাম পাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না। তবে তাদের দেহে বা দেহের কোন অংশের উপর আযাব বা আরাম হয়ে থাকে, সেটা মেরুদণ্ডের পেছনের হাড় হোক বা অন্য কোন স্থান হোক। এছাড়া বাতিলপন্থীদের মতে রূহকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয় না এবং দেহের সাথে রূহের কোনই সম্পর্ক থাকে না, আযাব বা আরাম শুধুমাত্র রূহের উপরই হয়ে থাকে। ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এই উভয় মত ভ্রান্ত এবং অগ্রহণযোগ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, বরযখের আযাব বা আরাম দেহ ও রূহ উভয়ের উপরই হয়ে থাকে, একত্রে হোক বা পৃথকভাবে হোক।

রূহের অবস্থান কোথায়, এই প্রশ্নের জবাবে অনেক অভিমত, দলীল ও প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসবের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য বা বিশ্বাসযোগ্য তা জানা

দরকার, যাতে করে মুসলিম জনগণ ঐ আকীদায় বিশ্বাসী হতে পারেন। আলমে বরযখে রূহের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের অবস্থান স্থল ও স্তর ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন রূহের অবস্থান হবে উচ্চ স্থানেরও উচ্চে ইল্লিয়্যীনে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে আম্বিয়ায়ে কিয়ামের মর্যাদা ও আবাসস্থল বিভিন্ন রকম দেখেছিলেন। কোন কোন রূহের অবস্থান ছিলো সবুজ পাখির পক্ষপুটে, যারা বেহেশতের যেখানে খুশি উড়ে বেড়ায়। এসব হলো এক শ্রেণীর শহীদদের রূহ, সব শহীদদের রূহ নয়। কেননা কোন কোন শহীদদের রূহকে ঋণগ্রস্ত হওয়া বা অন্যান্য কোন কারণে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। মুসনাদ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তাহলে আমি কি প্রতিদান পাবো? ইরশাদ হলো, "তুমি বেহেশত লাভ করবে।" যখন সেই ব্যক্তি ফিরে যাচ্ছিলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ইরশাদ করলেন, "শহীদের এই মরতবা সম্পর্কে এখনই আমাকে জিবরাইল (আ) এসে জানালেন, এই মরতবা লাভ করবে ঐসব শহীদ যাঁরা ঋণগ্রস্ত নন।" আবার কোন কোন রূহকে বেশেতের দরজায় আটকে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের এক সাথীকে দেখলাম, তাকে জান্নাতের ফটকে আটকে রাখা হয়েছে। আবার কোন কোন রূহ বন্দী থাকে। চাদর চুরি সম্পর্কীয় একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি একটি চাদর চুরি করেছিলো, তারপর সে শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা এই ব্যক্তিকে জান্নাতবাসী বলে মনে করেছিলো। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে ইরশাদ করলেন, "আল্লাহর কসম, সে যে চাদরটি চুরি করেছিলো, সেটি আগুনে পরিণত হয়ে তার কবরে প্রজ্বলিত হচ্ছে।" কোন কোন রূহ বেহেশতের দরজায় অবস্থান করবে। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, শহীদগণ বেহেশতের ফটকের নিকটে নহরের কিনারায় সবুজ গম্বুযে অবস্থান করেন আর জান্নাত থেকে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদের খাবার আসে। (আহমদ) আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উভয় হাতের পরিবর্তে দু'টি ডানা প্রদান করেছিলেন, যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতে যেখানে খুশি উড়ে বেড়ান। আবার কোন কোন রূহ এই পৃথিবীতে আটক থাকে, ঊর্ধ্বলোকে যাওয়ার কোন সুযোগ পায় না। কেননা এসব রূহ হলো নিম্ন স্তরের রূহ। এরা আসমানে

অবস্থিত রূহের সাথে কখনো মিলিত হতে পারে না, যেমনি দুনিয়াতেও এই দুই শ্রেণীর রূহ একত্রিত হতে পারে না।

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার মারিফাত, মুহব্বত, ভালোবাসা, নৈকট্য, অনুরাগ অর্জন করতে পারেনি এবং লোভ-লালসা ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, দেহ থেকে রূহ পৃথক হওয়ার পর সেই রূহ তার সমগোত্রীয় রূহের সাথে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে, যে মহৎ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের ভালোবাসা, নৈকট্য ও গভীর প্রেমে বিভোর থাকেন, তাঁর রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর তাঁর সমশ্রেণীর উচ্চ মাকামের রূহের সাথে মিলিত হয়। আসলে, কিয়ামতের দিন ও আলমে বরযখে একজন মানুষ তার সাথেই অবস্থান করবে যার সাথে দুনিয়ায় তার ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর ছিলো। আল্লাহ তা'আলা বরযখে ও কিয়ামতের দিন সমমর্যাদাসম্পন্ন রূহকে একত্রিত করে দেবেন। অর্থাৎ পবিত্র রূহ পবিত্র রূহের সাথে, আর অপবিত্র রূহ অপবিত্র রূহের সাথে অবস্থান করবে। অনেক যিনাকার নর-নারীর রূহ জ্বলন্ত চুলার মধ্যে থাকবে, অনেকের রূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে এবং তাদের মুখের মধ্যে পাথর ঠেসে দেয়া হবে। মোট কথা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রূহ ইল্লিয়্যিনের উচ্চস্তরে অবস্থান করে, আর নিকৃষ্ট শ্রেণীর রূহ যমীনের নিচে সিজ্জীনে থাকে, এখান থেকে আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কোথাও যেতে পারে না। এই সব আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই সহীহ। এই সব হাদীসের মধ্যে কোন মতবিরোধ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই এবং একটি অপরটির সহায়ক।

রূহের অবস্থাকে দেহের অবস্থার মতো অনুমান করা ঠিক নয়। কারণ নেককারদের রূহ বেহেশতে থাকা অবস্থায়ও আসমানে, কবরের আঙিনায় এবং আপন দেহের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এছাড়া রূহ ঊর্ধ্বে গমনে ও নিম্নে অবতরণে অতিশয় দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার কোন কোন রূহ মুক্ত, কোন কোন রূহ বন্দী, কোন কোন রূহ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং কোন কোন রূহ নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন। দেহ থেকে একটি রূহ পৃথক হওয়ার পর এর সুখ বা দুঃখ, শান্তি বা অশান্তি সবকিছুর প্রতিক্রিয়া রূহের উপর তেমনি বা তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে, যেমনি পড়তো দুনিয়ায় দেহের সাথে তার সংযুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ আত্মার জগতেও রূহের যেমন দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও হাহাকার রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে সুখ, সম্ভোগ, আরাম ও আয়েশ। দেহে থাকাকালীন একটি রূহের অবস্থা, ভ্রূণে থাকাকালীন একটি শিশুর অবস্থা এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রূহের অবস্থার সাথে একটি শিশুর বেশ মিল রয়েছে।

রূহের নিবাস হলো চারটি। একটি নিবাস অন্য একটি নিবাসের চেয়ে আকারে অনেক বড়। প্রথম নিবাসটি হলো, মাতৃগর্ভে, যা সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার ও তিন ধরনের পর্দায় ঘেরা দ্বিতীয় নিবাসটি হলো, দুনিয়া, যেখানে রূহ মানবরূপে জন্মলাভ করে, বর্ধিত হয়, প্রেম-ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পাপপুণ্য, ভালোমন্দ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অর্জন করে। আর তৃতীয় নিবাসটি হলো, বরযখ। এই নিবাসটি দুনিয়া থেকে বিরাট ও বহু প্রশস্ত। চতুর্থ নিবাসটি হলো, আখিরাত, অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম। এরপরে আর কোন মনযিল নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্রমান্বয়ে তাঁর বান্দাকে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানের দিকে নিয়ে যান এবং এইভাবে সর্বশেষে মনযিল আখিরাতে পৌঁছে দেন। মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো, আখিরাতের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লাভ করা। প্রত্যেকটি মনযিলের অবস্থা ও বিধি-বিধান স্বতন্ত্র। তাঁরাই ধন্য ও সৌভাগ্যবান যাঁরা দুনিয়াতে আখিরাতের সম্বল অর্জন করেন আর দুর্ভাগ্যের কণ্টক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহর একত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুসরণ, লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করলে, এই সৌভাগ্য লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, শরীআতের বিধি-বিধানই সত্য ও সঠিক আর এর পরিপন্থী সবকিছুই মিথ্যা, ভুল ও ভ্রান্ত।

ষোড়শ আধ্যায়

মৃতদের রূহ জীবিতদের নেক আমল দ্বারা উপকৃত হয় কিনা বা মৃত ব্যক্তি নিজের নেক আমল দ্বারা উপকৃত হয় কিনা

ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণের মতে জীবিতদের নেক আমল দ্বারা মৃতদের রূহ দু'ভাবে উপকৃত হয়। **এক.** একজন মৃত ব্যক্তি তার জীবনকালের নেক আমলের দ্বারা পরকালের উপকার লাভের পথ সুগম করে যেতে পারেন। **দুই.** যখন কোন মুমিন বান্দা কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দু'আ, ইসতিগফার, সাদকাহ, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করেন, তখন এসবের সওয়াব মৃতদের রূহে পৌঁছে যায়। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, দৈহিক আমলের সওয়াব মৃতদের রূহে পৌঁছে নাকি কেবল ধনসম্পদের বিনিময়ের সওয়াব মৃতদের রূহে পৌঁছে। এক শ্রেণীর আলিমের মতে কেবল দৈহিক আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের পৌঁছে। কোন কোন হানাফী আলিমের মতে আর্থিক দানের সওয়াবও মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে থাকে।

আগেরকার দিনের অধিকাংশ আলিম এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এসব নেক কাজের সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কোন কোন সঙ্গী-সাথীও এই মত সমর্থন করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া কুহহাল (র) বলেন, একবার ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন ব্যক্তি যদি কোন পুণ্যের কাজ করে, যেমন- নামায, রোযা ও সাদকাহ ইত্যাদি এবং এসব আমলের অর্ধেক সওয়াব তার পিতা বা মাতার জন্য বখশিয়ে দেয়, তাহলে সে সওয়াব তাঁরা পাবেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি আশা করি পাবে।" তিনি আরো বলেছেন, "মৃতের কাছে সকল নেক আমলেরই সওয়াব পৌঁছে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, তিনবার আয়াতুল কুরসী ও কুলহুআল্লাহ পড়বে, তারপর বলবে, "হে আল্লাহ, এর সওয়াব মৃত কবরবাসীদেরকে পৌঁছিয়ে দিন।" অবশ্য ইমাম শাফিয়ী (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে এ সমস্ত আমলের সওয়াব মৃতদের কাছে পৌঁছে না।

এক শ্রেণীর ভ্রান্ত যুক্তিবাদীদের মতে মৃতদের কাছে জীবিতদের নেক আমলের সওয়াব পৌঁছে না। তবে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত থাকে, তখন সে যে আমল করে, তার সওয়াব মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌঁছতে থাকে। এ সম্বন্ধে সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার তিন রকমের আমল অবশিষ্ট থাকে। আর তা হলো, এক- সাদকা-ই-জারিয়াহ, দুই- ইলম্, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। তিন- নেক সন্তান, যারা তাদের মাতাপিতার জন্য দু'আ করে। এখানে যে তিনটি আমলের উল্লেখ করা হলো, তা আসলে, মৃত ব্যক্তির অর্জিত নেক আমল, যার দ্বারা সে মৃত্যুর পরও সওয়াব লাভ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুমিন ব্যক্তির মুত্যুর পর যেসব নেক আমলের সওয়াব তার কাছে পৌঁছে, তাহলো এক- ঐসব ইলম যা তিনি অন্যদেরকে শিখিয়েছেন ও তা মানুষের মধ্যে প্রচারও করে গেছেন। দুই- ঐ নেক সন্তান, যাকে তিনি দুনিয়ায় রেখে গেছেন এবং যে তার জন্য দুআ করে। তিন- লোকদের জন্য যিনি কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। চার- যিনি কোন মসজিদ নির্মাণ করে গিয়ে থাকেন। পাঁচ- তিনি যদি কোন মুসাফিরখানা নির্মাণ করে গিয়ে থাকেন। ছয়- তিনি যদি পানির কোন সুব্যবস্থা করে গিয়ে থাকেন। সাত- তাঁর ঐসব সাদকাহ-খয়রাত যা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় করে গেছেন। এই সমস্ত নেক আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও তাঁর কাছে পৌঁছতে থাকে।

সহীহ্ মুসলিমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কেউ ইসলামের মধ্যে সুন্নাতে হাসানাহ অর্থাৎ নেক নিয়মনীতি প্রচলন করে গেছেন, তবে তার সওয়াব তিনি পাবেন। ঐসব লোকের সমপরিমাণ সওয়াবও তিনি পাবেন, যাঁরা ঐসব সুন্নাতের অনুসরণ করেন। এতে আমলকারীদের সওয়াব হ্রাস পাবে না।

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা প্রচলন করবে, সে তার ঐ পাপের বোঝা বহন করবে, আর ঐসব লোকের সমপরিমাণ পাপের বোঝাও বহন করবে যারা এর উপর আমল করবে। কিন্তু এতে আমলকারীদের পাপের বোঝা হ্রাস পাবে না। এরূপ অনেক সহীহ্ ও হাসান হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

মুসনাদ গ্রন্থে হযরত হুযাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে একবার জনৈক ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিলো, প্রথমে তাকে কেউ কিছু দিলো না। পরে একজন লোক তাকে কিছু দিলো, তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও তাকে কিছু কিছু দান করলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কোন সুন্দর প্রথা চালু করে আর অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি নিজের আমলের সওয়াবতো পাবেই, ঐ সমস্ত লোকদের সমপরিমাণ সওয়াবও সে পাবে, যারা তাকে অনুসরণ করে কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের আমলের কোন সওয়াব হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কুপ্রথা চালু করে এবং অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে, সেতার পাপের বোঝা তো বহন করবেই, যারা তাকে অনুসরণ করবে ঐ সমস্ত লোকদের সমপরিমাণ পাপের বোঝাও সে বহন করবে, এতে অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেই হ্রাস পাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ পবিত্র বাণীর দ্বারাও একথা প্রমাণিত, যাতে বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, সে হত্যার পাপের একটি অংশ হযরত আদম (আ)-এর পুত্র কাবীলকেও বহন করতে হবে। কেননা সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যাজনিত পাপের প্রথম প্রচলন করেছিলো। অতএব আযাব ও আরাম সম্পর্কে যে নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য, সওয়াব ও মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে একই নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত ঃ নিজের আমল ছাড়াও অন্যদের আমলের দ্বারা যে মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হন, তার প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও শরীআতের অন্যান্য নীতিমালার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।" (সূরা আল হাশর ঃ আয়াত ১০)

অগ্রগামী মুমিনদের জন্য দু'আ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী মুমিনদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, জীবিতদের মাগফিরাত দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অগ্রগামীরা আগে ঈমান এনে ঈমান আনার সুন্নাত বা নিয়মনীতি পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন। ফলে পরবর্তীরা ঈমান এনেছেন এবং তার সুফলও লাভ করেছেন। অর্থাৎ একজন মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় নেক আমলের কারণেই মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ঐ সওয়াব

পৌঁছেছে। এছাড়া জানাযার নামাযের মাধ্যমেও মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা হয়। মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষযে একমত যে, জানাযার নামাযের দ্বারা মৃতেরা উপকৃত হন। তাই আমরা মৃতদের জন্য দু'আ করে থাকি।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোন মৃতের জন্য দু'আ করো, তখন একনিষ্ঠভাবে দু'আ করবে। (সুনান) সহীহ্ মুসলিম হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার নামাযে মৃতের জন্য যে দু'আ করেছিলেন, তা আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। সেই দু'আয় তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া আওসি মাদখালাহু ওয়া আগসিলহু বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল বারদি ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতাস্ সাওবাল আবইদা মিনাদ্দানাসি ওয়া আবদিলহু দারা খাইরাম মিন দারিহি ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি ও যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ফিহি মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্নার।" অর্থাৎ হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তার কবরকে প্রশস্ত করুন, তার সব গুনাহ পানি ও বরফ দ্বারা ধুয়ে ফেলুন, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন, যেমন শুভ্র বসন ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে এই ঘরের (কবরের) চেয়ে উৎকৃষ্ট ঘর, এই পরিবার পরিজন থেকে উত্তম পরিবার পরিজন, এই সঙ্গী-সাথীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী-সাথী দান করুন, তাকে জান্নাত দান করুন এবং কবরের শাস্তি ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

ওয়াসিলাহ ইবনে আসফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়েন এবং তাতে তিনি এ দু'আ করেন, "আল্লাহুম্মা ইন্না ফালানা ইবনা ফালানি ফী যিম্মাতিকা ও হাব্বাল জাওয়ারিকা ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন্নার ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়ালহাক্কি ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, অমুকের পুত্র অমুক আপনারই হিফাযতে রয়েছে এবং সে আপনার আশ্রয়ের ভরসা রাখে। অতএব আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও পূর্ণ করুন এবং তা সত্যে পরিণত করুন, আপনি তাকে মাফ করুন এবং তার উপর রহম করুন, নিশ্চয়ই আপনি বড় মেহেরবান ও অতিশয় ক্ষমাশীল। (সুনান)

উপরের হাদীসটি ছাড়াও এই মর্মে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। মৃতদের জন্য

জানাযার নামায পড়ার এটাই উদ্দেশ্য যে, জীবিতদের দু'আর দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হন। দাফনের পর মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যও তাই।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও ও দু'আ করো যেন সে (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকতে পারে। কেননা এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।

মৃতদের কবর যিয়ারত করার সময় তাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্য হলো, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। সহীহ মুসলিমে আছে, বুরাইদা ইবনে খাসিব (রা) বলেন, যখন তাঁর কবর যিয়ারতের জন্য বের হতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এই দুআ শিখাতেন, "আসসালামু আলাইকুম আলাদ্দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূনা নাসয়ালুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা।" অর্থাৎ "হে কবরবাসী মুমিন মুসলমান! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর আল্লাহ কৃপা করুন, আল্লাহ চাহেন তো আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো, আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরয করেছিলেন, আমরা কবরবাসীদের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা বলবে, "আসসালামু আলা আহলিদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনিনা ওয়া মুসলিমীনা ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতায়খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।" অর্থাৎ "হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর আল্লাহ কৃপা করুন, আল্লাহ চাহেন তো আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো।"

সহীত মুসলিমে আরো আছে, হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানের নিকট গেলেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মু'মিনীনা ওয়া আতাকুম মা তুআদূনা গাদাম মুয়াজ্জিলুনা ওয়া ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন। আল্লাহুম্মাগফিরলি আহলি বাকীয়িল গারকাদ।" অর্থাৎ "হে কবরবাসী মুমিনগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। কিয়ামত নিকটবর্তী, আল্লাহ চাহেন তো

আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। হে আল্লাহ বাকিউল গারকাদবাসীদের ক্ষমা করুন।"

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মৃতদের জন্য দুআ করেছেন এবং অন্যকে এরূপ দু'আ করতে শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীনও মৃতদের জন্য দু'আ করে গেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণ মৃতদের জন্য সব সময় দু'আ করে থাকেন। মৃতদের জন্য দু'আ করা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। একটি পবিত্র হাদীসে উল্লেখ আছে– আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিলে, সে কি কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো তা জানতে চেয়েছিলো, তাকে বলা হলো, এটা তোমার সন্তানদের দু'আর কারণে করা হয়েছে।

সাদকার সওয়াবও মৃতদের কাছে পৌছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলো যে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা হঠাৎ ইনতেকাল করেছেন। তিনি কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। তবে আমার ধারণা তিনি বলতে পারলে সাদকাহ করার কথা বলে যেতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি এর সওয়াব তাঁর কাছে পৌছবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, পৌছবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর মা যখন ইনতেকাল করলেন, তিনি তখন তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তিনি পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা যখন ইনতেকাল করেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদকাহ করি, তাহলে কি তিনি এতে উপকৃত হবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, হবে।" তখন হযরত সা'দ (রা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, "আমি আমার মিখরাফের বাগানটি তাঁর জন্য সাদকা করে দিলাম।" (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরয করলো, আমার পিতা ধনসম্পদ রেখে ইনতেকাল করেছেন, কিন্তু তিনি কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। এখন আমি যদি তাঁর জন্য কিছু সাদকাহ করি, তাহলে এটা কি তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "হা, হবে।" (মুসলিম)

একবার সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, উম্মে সা'দ ইনতেকাল করেছেন, এখন তাঁর জন্য কোন সাদকাহটি উত্তম হবে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "পানি"। তখন তিনি একটি কূয়া খনন করলেন এবং বললেন এটি আমি উম্মে সা'দের জন্য উৎসর্গ করলাম। (সুনান ও মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ আস ইবনে ওয়ায়িল জাহেলিয়াতের যুগে একবার মানত করেছিলেন, তিনি একশটি উট কুরবানী করবেন। তাঁর পুত্র হিশাম তাঁর পক্ষ থেকে ৫৫টি উট কুরবানী করে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলে তিনি বলেছিলেন, তার পিতা যদি আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে নিতো, আর তার পক্ষ থেকে সে রোযা রাখতো এবং সাদকাহ করতো তাহলে এর ফলে তার পিতা তার ছেলের দ্বারা উপকৃত হতেন। হযরত ইমাম আহমদ (রা) ও এই ঘটনাটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

রোযার সওয়াবও মৃত ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন। হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কারো উপর রোযা ফরয হয়ে থাকে এবং সে তা আদায় না করেই মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার ওলী যেন সেই রোযা রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইনতেকাল করেছেন, কিন্তু তিনি এক মাসের ফরয রোযা রাখতে পারেন নি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ রোযা রাখতে পারি? তিনি বললেন, "হ্যা, পারো আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা অতি উত্তম কাজ। (বুখারী ও মুসলিম)

জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা ইনতেকাল করেছেন, কিন্তু তাঁর উপর মানতের রোযা রয়ে গেছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা রাখবো?

---

* গ্রন্থকার হাদীসের আলোকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, একজন মৃত ব্যক্তির কাযা নামায বা কাযা রোযা কেউ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে, হানাফী ও মালেকী মতাবলম্বী বিজ্ঞ আলিমগণ সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এর বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ জীবিত বা কোন মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা বা নামায অন্য কেউ আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। –অনুবাদক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, “তোমার মায়ের যদি কোন ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করতে তাহলে কি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হতো না? সে উত্তর দিলো, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাজেই তোমার মায়ের পক্ষ থেকে সে রোযা রাখো। (বুখারী)

জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে তাঁর জীবিত অবস্থায় সাদকাহস্বরূপ একজন দাসী দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এখন ইনতেকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার সাদকার পুরস্কার পেয়ে গেছো এবং উত্তরাধিকার সূত্রে দাসীটি পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে এসেছে। তখন সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, তাঁর দায়িত্বে এক মাসের রোযাও ছিলো, এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা রাখো। সে আবার বললো, আমার মা হজ্জও করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করো। (মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় আছে, উক্ত মহিলার মায়ের যিম্মায় দুই মাসের রোযা ছিলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ জনৈকা মহিলা সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়েছিলো। সে তখন মানত করেছিলো, যদি আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন, তা হলে এক মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু সে রোযা রাখার পূর্বেই মারা গেলো। তখন তার মেয়ে অথবা বোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি তার (মৃতের) পক্ষ থেকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। (সুনানে আহমদ)

রোযার বিনিময়ে খানা খাওয়ানোর সওয়াবও মৃত ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়, আর তার যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে প্রতি একদিনের বিনিময়ে যেন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, এই সনদের হাদীসটি মারফূ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযান মাসের রোযা রাখতে না পারে, সে যেন কোন

মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেয়। সেই অবস্থায় তার কাযা রোযার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। আর সে ব্যক্তির কোন রোযার মানত থাকলে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীরা সেই রোযা রাখবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ একবার জুহায়মা গোত্রের জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আরয করলেন, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ করার আগেই তিনি ইনতেকাল করেছেন। আমি কি এখন তাঁর পক্ষ থেকে সেই হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তা করতে পারো। বলতো, তোমার মা যদি কারো কাছে দেনাদার থাকতেন, তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? তিনি আরো বললেন, আল্লাহর ঐ করযও এভাবে তুমি আদায় করো। কেননা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা আরো বেশি জরুরী। এ সম্পর্কে হযরত বুরাইদা (রা)-এর একটি হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসে উল্লেখ আছে, আমার মা কখনো হজ্জ করেননি, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হ্যাঁ, তুমি হজ্জ আদায় করো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একবার হযরত সিনান ইবনে সালমাহ জুহালী (রা)-এর স্ত্রী আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মা ইনতেকাল করেছেন, কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করতে পারেননি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ তোমার মা কারো কাছে দেনাদার থাকলে তুমি তা আদায় করলে তা কি আদায় হতোনা? (নাসায়ী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ জনৈকা মহিলার এক ছেলে হজ্জ আদায় না করে মারা গেলো। উক্ত মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো। অন্য এক ব্যক্তি এই মাসায়ালাটিই নিজের পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার পিতা কারো কাছে দেনাদার থাকতেন, তাহলে তুমি কি তা আদায় করতে না? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে আল্লাহর করয আদায় করাতো আরো বেশি জরুরী।

মুসলিম উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা হয়, তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তি ঋণের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তা কোন অজানা ব্যক্তিও যদি পরিশোধ করে থাকে। হযরত আবু

কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, তিনি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দুইটি দীনারে যামিন হয়েছিলেন। তিনি যখন তা পরিশোধ করে দিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, "এখন ঐ মৃত ব্যক্তি ঋণের দায় থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।"

এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, কারো যদি কোন মৃত ব্যক্তির কাছে কোন পাওনা থাকে, আর জীবিত ব্যক্তি যদি তাকে মাফ করে দেয়, তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ দাবি থেকে মুক্ত হয়ে যান। জীবিতদের হক মাফ করে দিলে যেমন মাফ হয়ে যায়, মৃতদের ক্ষেত্রে অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কোন জীবিত ব্যক্তির ঋণ অন্য কোন জীবিত ব্যক্তি পরিশোধ করলে ঐ ঋণের দায়িত্ব থেকে সে রেহাই পেয়ে যান। ঠিক তেমনি কোন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন তোহফা বা হাদিয়া পেশ করলে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তি যে পেয়ে যাবেন সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ ঋণ পরিশোধ করা ও হাদিয়া পেশ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা কোন নেক আমলের সওয়াব আমলকারীর একটি সহজাত ও স্বাভাবিক অধিকার। অতএব কেউ যদি তার নিজের হক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মাফ করতে পারে, তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য হাদিয়াও পেশ করতে পারে। বিষয়টি কিয়াস ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত। এছাড়া কোন আমলকারী যদি তার কোন নেক আমল কোন মৃত ব্যক্তিকে দান করে দেন, তাহলে ঐ সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছতে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকে না যেমনটি থাকে না ঋণ মাফ করার ক্ষেত্রে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রোযা রাখে, তাহলে সেই রোযার সওয়াবও মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে যায় যদিও রোযা একটি দৈহিক ইবাদত। নিয়ত রোযার একটি অঙ্গ। পানাহার থেকে বিরত থাকা ও নিয়ত করা ছাড়া রোযা হয় না। আর নিয়তের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়। যখন রোযার সওয়াব মৃতদের কাছে পৌছে, তখন কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াবও তাদের কাছে পৌছা অধিক যুক্তি সঙ্গত। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে সওয়াব লাভ করা যায়। এই তিলাওয়াত হলো, জিহ্বার আমল যা তিলাওয়াতকারীর কান শ্রবণ করে ও চোখ দেখে। সেটাও মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌছে। সুতরাং রোযা একটি দৈহিক ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন।

ইবাদত দু'প্রকারের– দৈহিক ইবাদত ও আর্থিক ইবাদত। যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের সওয়াব যেভাবে মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌছে যায়, আর্থিক ইবাদতের

সওয়াবও ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে যায়। এই বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

ঈসালে সওয়াব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তবে যাঁরা ঈসালে সওয়াবকে অস্বীকার করেন, তাঁদের পক্ষের বক্তব্য ও অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। **এক-** আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "মানুষ তাই পায়, যা সে নিজে উপার্জন করে।" **দুই-** "তোমাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।" **তিন-** এও বলা হবে, আজ কারো প্রতি কোন যুলূম করা হবে না এবং তোমরা যা আমল করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" **চার-** মৃত ব্যক্তিরা ঐসব আমলের সওয়াব পেয়ে থাকেন, যা তাঁরা জীবিত অবস্থায় অর্জন করেন। এই অভিমতটি হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারাও সমর্থিত।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, মৃত্যুর পর সাত রকমের আমলের সওয়াব কবরে পাওয়া যায়। (ক) কেউ কাউকে কোন বিদ্যা শিখিয়ে গেলে, (খ) পানির নহর খনন করে গেলে, (গ) কূপ খনন করে গেলে, (ঘ) ফল-ফলাদি ও খেজুরের বাগান লাগিয়ে গেলে, (ঙ) মসজিদ তৈরি করে গেলে, (চ) পবিত্র কুরআনের শিক্ষা চালু করে গেলে, (ছ) এমন নেক সন্তান রেখে গেলে, যারা মৃত্যুর পর তাদের মাতাপিতার মাগফিরাত কামনা করে।

মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের কোন নেক কাজের দ্বারা উপকৃত হন কিনা, এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। হাদিয়া বা সওয়াব রেসানীকে এক ধরনের হাওয়ালা বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। কোন লোক তাঁর কোন সওয়াব অন্যকে অর্পণ করতে পারে কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হাদিয়া এমন একটি বিষয় যেটা অন্যের প্রাপ্তির সাথে সম্পর্কিত। একজন বান্দার কোন নেক আমলের সওয়াব একটি দাবি দাওয়ার বিষয় নয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে আল্লাহর এই অনুগ্রহ বা অনুকম্পা একজন বান্দা কি করে অন্যকে সমর্পণ করতে পারে। একজন গরীব ব্যক্তির পক্ষে একজন ধনী ব্যক্তিকে কোন কিছু দান করা যেমন একটি বিব্রতকর ব্যাপার, ঠিক তেমনি কোন নেক কাজের সওয়াব যা আল্লাহর কাছে থেকে পাওয়া সেটা হাওয়ালা করাও তেমনি বিব্রতকর। একজন বাদশাহর কাছে এমন কোন জিনিস হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা মোটেই সমীচিন নয়, যা তাঁর কাছে প্রচুর রয়েছে। একজন বান্দার পক্ষে মহান আল্লাহর কাছে কোন সওয়াব হাওয়ালা করা ঠিক তেমনি একটি অবস্থা। যাঁরা ঈসালে সওয়াব অস্বীকার করেন তাঁরা মনে করেন, কোন সওয়াবের প্রতিফল অন্যের কাছে সমর্পণ করা উচিত নয়, সওয়াব হচ্ছে আমলের প্রতিদান। সেক্ষেত্রে কোন সওয়াব অন্যকে দান করা

কিভাবে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত হবে? এখন প্রশ্ন এই যে, একজন বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে যে অনুগ্রহ বা সওয়াব লাভ করে থাকে সেটা অন্য কাউকে দেওয়ার জন্য সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারে। এতে আপত্তির কোন কারণ নেই। সওয়াব দান করা যেমন আল্লাহর এক অনুগ্রহ ঠিক তেমনি অন্যকে বখশীয়ে দেওয়াও তারই অনুগ্রহ। এটা কোন দাবি দাওয়ার ব্যাপার নয়। এটা একজন বাদশাহকে কোন কিছু দান করার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। ইমাম আহমদ (র) ও উক্ত মত পোষণ করতেন।

ঈসালে সওয়াবের বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকেন, যদি কোন মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া জায়েয হতো, তাহলে জীবিতদেরকেও ঐরূপ সওয়াব ও হাদিয়া দেয়া আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন হতো। কারো কোন সওয়াবকে এভাবে দান করা জায়েয হলে কোন সওয়াবের অর্ধেক, সওয়াবের তৃতীয়াংশ, সওয়াবের সিকি অংশ এভাবে ভাগ করাও বৈধ এবং যুক্তিযুক্ত হবে। তারা আরও বলেন, কোন নেক আমলের সওয়াব রেসানীর এই প্রক্রিয়া যদি জায়েয হয়, তবে নিজের জন্য কোন আমল করার পর তা হাদিয়া করাও সঠিক হবে।

মৃতের জন্য কোন নেক আমলের সওয়াব রেসানী করতে হলে হাদিয়ার নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে, অন্যথায় মৃত ব্যক্তি সেই সওয়াব পাবে না। কোন আমলের সওয়াব যখন অন্যকে দান করা যায়, তাহলে কোন আমলের আগে ও পরে নিয়ত করার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাছাড়া কোন আমলের হাদিয়ার পেশ করা যদি জায়েয হয়, তাহলে জীবিতদের ফরয ইত্যাদির সওয়াবও হাদিয়া করা জায়েয হবে। যেমন নফল ইবাদতের সওয়াব হাদিয়া পেশ করা জায়েয। এছাড়া দুঃখ-কষ্ট দ্বারা মানুষের এক প্রকার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর দুঃখ-কষ্টের কোন বিনিময় নেই। কেননা শরীআতের আদেশ নিষেধ কার্যকর করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বান্দা নিজেই দায়ী। কাজেই কোন ইবাদতের সওয়াব কারো অনুকূলে দান করার প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষ চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া কোন ফল লাভ করতে পারে না। কাজেই শরীআতে এই মূলনীতি যেমনি কার্যকর, অদৃষ্টের ক্ষেত্রেও তেমনি কার্যকর। কেউ যদি অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও বিবস্ত্র হয়, আর অন্য কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ঔষধ সেবন করে, খানা খায়, পানি পান করে কিংবা কাপড় পরিধান করে, তাহলে কি এর দ্বারা বিবস্ত্র ব্যক্তি ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উপকৃত হবে?

তদূপরি অন্য কোন ব্যক্তির আমল যদি অপর কোন ব্যক্তির উপকার করতে পারে, তবে কারো পক্ষ থেকে যদি কেউ তাওবাহ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি কি উপকৃত

হতে পারে? তাই একজন লোক অন্য একজন লোকের পক্ষ থেকে শরীআতের হুকুম-আহকাম যেমন নামায বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সেক্ষেত্রে গুরুত্বহীন ইবাদতের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আর দু'আ আল্লাহর কাছে আরযী পেশ করা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দ্বারা আশা করা যায় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর তা'আলা দয়া পরবশ হবেন এবং তার পাপ মোচন করে দেবেন, মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিতদের এটাই উৎকৃষ্ট হাদিয়া।

ইবাদত দু'প্রকারের। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার ইবাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করার কোন অবকাশ নেই। যেমন- ঈমান, নামায, রোযা এবং কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। এ ধরনের ইবাদতের সওয়াব শুধু ইবাদতকারীই লাভ করে, এটা অন্য কেউ পায় না। জীবিতাবস্তায় যেমন এগুলো একের পক্ষ থেকে অন্য কেউ সম্পাদন করতে পারে না। তেমনি মৃত্যুর পরও এসবের প্রতিনিধিত্ব অন্য কেউ করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে। যেমন- আমানত ফিরিয়ে দেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, সাদকাহ দেয়া, হজ্জ আদায় করা ইত্যাদি। এসব ইবাদতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। কেননা এসবের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে। যেমন একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন জীবিতাবস্থায় এসব আদায় করতে পারে, তেমনি মৃত্যুর পরেও তা আদায় করতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রাখার ব্যাপারে হাদীসে কয়েক রকমের বর্ণনা আছে। **এক.** ইমাম মালিক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "কেউ যেন কারো পক্ষ থেকে রোযা না রাখে।" তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "এ বিষয়ে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন, এতে কোন মতবিরোধ নেই। দুই ঃ মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)। নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তক বর্ণিত আছে ঃ একজন লোক যেন অপর লোকের পক্ষ থেকে কোন নামায না পড়ে। মৃত ব্যক্তিদের কাযা রোযাও যেন কেউ আদায় না করে। উক্ত হাদীসের সনদে মতবিরোধ আছে। (মুফহাম শরহে মুসলিম) **তিন.** "এবং একজন মানুষ তাই পায়, যে জন্য সে চেষ্টা করে, তার কর্ম প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।" (সূরা নাজম ঃ আয়াত ৩৯-৪১)

চার. এছাড়া নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কেউ যেন কারো পক্ষ থেকে নামায না পড়ে, রোযা না রাখে। তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে এক 'মুদ' (আধা সের) পরিমাণ গম মিসকীনকে দেয়া যেতে পারে। **পাঁচ.** উরে বর্ণিত হাদীসটি

হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির পরিপন্থী। সেই হাদীসে বলা হয়েছে।, কোন মৃত ব্যক্তির যদি রমযান শরীফের রোযা বাকী থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেবে। **ছয়.** উক্ত অভিমতটি কিয়াসেরও পরিপন্থী। যেমন কারো নামায, তাওবাহ ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহকাম অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি উক্ত আমলের কোন সওয়াবও অন্যকে দান করা গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র)-এর অভিমত এই যে, মানতকারী কি সম্পর্কে মানত করেছিলেন সে বিষযে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত উম্মে সা'দ (রা) সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলেননি। হতে পারে, তিনি মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সেই মানত আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। তবে কেউ যদি নামায আদায় কিংবা রোযা রাখার মানত করে, আর তা পূরণ করার আগেই সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে নামাযের কোন কাফফারা দিতে হবে না, নামাযও পড়তে হবে না। তবে রোযার কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু রোযা রাখতে হবে না। যদি বলা হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কি রোযা রাখার কোন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়নি? উত্তরে বলা হবে, হাঁ, হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত আছে। হযরত ইমাম যুহরী (র), হযরত উবাইদুল্লাহ (র) থেকে আর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মানত সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উক্ত রেওয়ায়েতে কিসের মানত তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, যেমন অন্যান্য রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অথচ ইমাম যুহরী (র) এর স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রখর। এছাড়া হযরত উবাইদুল্লাহ (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। হযরত উবাইদুল্লাহ (রা) ছাড়া অন্য কেউ এই হাদীসের পরিপন্থী কোন হাদীস উপস্থাপন করলে, সেটা নির্ভরশীল হাদীস নয় বলা হবে।

হজ্জ পালনে যে অর্থ ব্যয় হয়, মৃতদের কাছে তার সওয়াব পৌঁছে। আর হজ্জ পালনের সওয়াব কেবল হজ্জ পালনকারী লাভ করে, মৃতরা এর কোন সওয়াব পায় না। এসবই হলো ঈসালে সওয়াব বিরোধীদের অভিমত ও আকীদা।

এখন ঈসালে সওয়াব যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি ও প্রমাণাদি খণ্ডনের জন্য পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো উপস্থাপন করা হলো। **এক.** লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সায়া। (সূরা নাজম ঃ আয়াত- ৩৯)

অর্থাৎ "একজন মানুষ তাই পায়, যে জন্য সে চেষ্টা করে।" এই আয়াতটি একাধিক অর্থ জ্ঞাপক। এই পবিত্র আয়াতে কারো কারো মতে 'ইনসান' বলতে কোন কাফির ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা একজন মুমিন বান্দা তার নেক আমলের দ্বারা উপকৃত হন, অন্যদের নেক আমলের দ্বারাও উপকৃত হন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এই আয়াতে 'ইনসান' শব্দের দ্বারা শুধু কাফিরদের কিভাবে নির্দিষ্ট করা হলো? এর উত্তর খুবই সোজা ও প্রমাণ ভিত্তিক। এই আয়াতে 'ইনসান' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে শুধু কাফির নয়, কাফির ও মুসলমান সকলকেই বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত ছাড়া অন্যান্য আয়াতও 'ইনসান' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লা তাযিরু ওয়ারিযরাতুন বিযরা উখরা। অর্থাৎ "কেউ অন্য কারো গুনাহর বোঝা বহন করবে না।" (সূরা নাজম ঃ আয়াত-৩৮)

যেমন, ওয়া ইন্না সাইয়াহু সাওফা ইউরো, সুম্মা ইউজযাহুল জাযায়াল আওফা। অর্থাৎ "মানুষ অতিসত্বর তার চেষ্টার ফল প্রত্যক্ষ করবে। তারপর তাকে তার পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে।" (সূরা নাজম ঃ আয়াত ৪০,৪১)

এই আয়াতে ইনসান বলতে সৎ, অসৎ, মুমিন, কাফির সবাইকে বুঝানো হয়েছে। ফামাইয়াঁমাল মিসকালা যার্রাতিন খাইরাইঁয়া রাহু ওয়া মাইঁয়ামাল মিসকালা যার্রাতিন শার্রাইয়াঁরাহু। অর্থাৎ "সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে, এবং যে অণু পরিমাণ মন্দকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল ঃ আয়াত ৭-৮)

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের প্রতিটি আমল গণনা করে রেখেছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবো। তারপর যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ দেখবে, সে যেন নিজেকেই তিরষ্কার করে।" ইয়া আইউহাল ইনসানু ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদহান ফামুলাকীহ। অর্থাৎ "হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাকে আপন প্রতিপালকের দিকে দৌড়াতে হবে, অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে। (সূরা ইনশিকাক ঃ আয়াত-৬)

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ইনসান' শব্দের অর্থ কোথাও আবূ জাহল, কোথাও উকবা ইবনে আবী মুয়ীত, কোথাও অলীদ ইবনে মুগীরাহকে বুঝানো হয়েছে। তবে এইরূপ অর্থের দ্বারা যেন মুফাসসিরগণ ধোঁকা বা বিভ্রান্তিতে না পড়েন। 'ইনসান' বলতে এখানে অনির্দিষ্টভাবে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। নিম্নোক্ত

আয়াতেও 'ইনসান' শব্দের দ্বারা মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসরিন। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" (সূরা আসর ঃ আয়াত-২)

ইন্নাল ইনসানা লিরাব্বিহি লাকানূদ। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা আদিয়াত ঃ আয়াত-৬)

ইন্নাল ইনসানা খুলিকা হালূয়া। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলচিত্ত রূপে।" (সূরা মায়ারিজ ঃ আয়াত-১৯)

কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লাইয়াতগা আর্রাহুসতাগনা। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষ সীমা লংঘন করে থাকে এজন্য যে, সে নিজেকে নিজে অভাবমুক্ত মনে করে।" (সূরা আলাক ঃ আয়াত ৬-৭)

ইন্নাল ইনসানা লাযালুমুন কাফফার। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষ বড় যালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-৩৪) ওয়া হামালাহাল ইনসানু, ইন্নাহু কানা যালূমান যাহুলা। অর্থাৎ "এবং মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে যালিম ও বড় মূর্খ। (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৭২)

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে ইনসান বা মানুষের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এসব হলো মানুষের স্বভাবগত, জাতিগত ও ধর্মীয় গুণাবলী। মানুষ স্বভাবতই এসব বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে তার রবের তাওফীক ও মেহেরবানী লাভ করে। আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মনে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, তার অন্তরকে এর দ্বারা আলোকিত করেছেন, আর তাকে পাপাচারের প্রতি ঘৃণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনিই আম্বিয়ায়ে কেরামকে দীনের উপর কায়িম রেখেছিলেন। আর তাঁদেরকে মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রেখেছিলেন। আওলিয়ায়ে কেরামকেও আল্লাহ্ দীনের উপর কায়িম রাখেন এবং তাঁরা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সাহাবায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কবিতাটি গুন গুন করে আবৃতি করতেন। "ওয়াল্লাহি লাওলাল্লাহু মাহ তাদাইনা ওয়ালা তাসাদ্দাকনা ওয়ালা সাল্লাইনা" অর্থাৎ "আল্লাহর কসম, আল্লাহ বিদ্যমান না থাকলে আমরা সরল পথ পেতাম না, সাদকাহ করতাম না নামাযও পড়তাম না।" পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "ওয়ামা কানা লিনাফসিন আন তুমিনা ইল্লা বিইযনিল্লাহ" অর্থাৎ "এবং কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া ঈমান নিয়ে আসবে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-১০০)

"ওয়ামা ইয়াযকুরূনা ইল্লা আইঁয়াশায়াল্লাহু" অর্থাৎ "আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ আয়াত-৫৬)

ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আইঁয়াশায়াল্লাহু রাব্বুল আলামীন– অর্থাৎ "আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতোক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা চান।" (সূরা তাকবীর ঃ আয়াত-২৯)

এক শ্রেণীর আলিমের অভিমত হলো– উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা আমাদের পূর্ববর্তী শরীআত সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়েছে। কিন্তু দলীল ও প্রমাণ অনুযায়ী আমাদের শরীআতেও এই হুকুম রয়েছে যে, মানুষ তার নিজের চেষ্টার ফল বা সওয়াব যেভাবে লাভ করে, তেমনি তার জন্য অন্যরা যে নেক আমল করে, তার সওয়াবও সে পেয়ে থাকে। আমলাম ইউনাব্বা' বিমা ফী সুহুফি মূসা, অর্থাৎ "তার নিকট কি খবর আসেনি সে সম্পর্কে, যা মূসার সহীফাসমূহে (কিতাবে) বর্ণিত আছে। (সূরা নাজম ঃ আয়াত-৩৬)

অর্থাৎ আগেকার দিনে শরীআতে যেসব বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, পরবর্তী শরীআতেও তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অপর মত হলো– এখানে 'লা' অক্ষরটি 'আলা' বা উপর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়া লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সায়া, অর্থাৎ 'ইনসান তাই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করে।" মানুষ যে অসৎ কাজ করে তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়, অন্যের কোন আমলের জন্য নয়। 'ওয়া লাহুমুল লায়নাতু' এখানে আরবি 'লাম' অক্ষরটি 'আলা' বা উপর অর্থে নয় বরং এর মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পাপীদের জন্য রয়েছে অভিশাপ। 'লীদিরহামুন' বাক্যে আলাইয়া দিরহামুনে 'আলা' শব্দের অর্থ উপর। তবে আরবি পরিভাষায় এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। এখন কেউ যদি বলে– লীদিরহামুন শব্দদ্বয়ে 'ইয়া' অক্ষরটি বাদ দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ 'মা সায়া' শব্দের পর 'আও সায়ালাহু' অনুল্লেখিত রয়েছে, একথাও ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী বাক্যের সাথে এটার কোন সাযুজ্য নেই। আর এটা আল্লাহর ও তাঁর কিতাবের প্রতি অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে কারো কারো মতে উপরোক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা মনসূখ বা রহিত হয়ে গেছে, আর যারা ঈমানদার তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে একত্রিত করবো।" (সূরা তূর ঃ আয়াত-২১)

এরূপ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তবে এটাও একটি দুর্বল অভিমত ছাড়া আর কিছু নয়, তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বা অন্য কেউ কোন বিষয়কে মনসূখ বা রহিত বললেই তা রহিত বলে গণ্য হবে না।

আখিরাতে দুনিয়ার ন্যায় সন্তান-সন্ততি তাদের পিতামাতার সাথী হবে। আর পিতামাতার প্রতি সন্তানের আনুগত্য হবে তাঁদের সম্মান ও সওয়াবের কারণে, যা তাঁরা তাঁদের আপন চেষ্টায় অর্জন করে গেছেন। কোন নাবালিগ সন্তান কোন নেক আমল ছাড়া কোন মর্যাদা লাভ করতে পারে না। তারা যদি কোন মর্যাদা লাভ করে তাহলে সেটা হবে তাদের পিতামাতার নেক আমলের কারণে। আল্লাহ তাআলা বেহেশতে পিতামাতার নিকট তাদের সন্তনদের পৌছে দিয়ে তাদেরকে শান্তি দান করবেন এবং তাঁদের কারণে সন্তান-সন্ততির প্রতিও এমন অনুগ্রহ করবেন, যেটা তাদের প্রাপ্য ছিলো না।

এখানে নাবালিগ সন্তান-সন্ততির বিষয়টি হুর-গেলমানের সাথে তুলনা করা যায়, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিনা আমলেই বেহেশতের জন্য পয়দা করেছেন। আর তাঁদের প্রতিও মেহেরবানী করেছেন যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কোন নেকআমল না থাকা সত্ত্বেও বেহেশত দান করেন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তা'আলা ঐসব সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের কোনরূপ আমল ব্যতিরেকেই তাঁর অপার করুণায় জান্নাতে দাখিল করবেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না এবং মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু তাই যার জন্য সে চেষ্টা করে।" (সূরা নাজম ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)

এই পবিত্র আয়াত দু'টি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ জ্ঞাপক। আল্লাহ পাকের সুবিচার ও সুমীমাংসা, তাঁর হিকমতপূর্ণ মহিমা ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া এটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির এক অনুপম মীমাংসার সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধি-বিবেচনার শর্ত হলো, একের অপরাধের জন্য অন্য কেউ যেন অভিযুক্ত না হয়। একজন মানুষের সৎ স্বভাবের উদ্দেশ্য হলো, মুক্তি ও নাজাত লাভ। আর এটা কেবল তার নেক আমল ও চেষ্টার মাধ্যমে কার্যকর হয়। প্রথম আয়াতটি মানুষকে এই আশ্বাস দান করেছে যে, একে অপরের কোন অপরাধের জন্য দায়ী হবে না। যেমন দুনিয়াতেও একজনের অপরাধের জন্য অন্য কেউ দায়ী বা অভিযুক্ত হয় না। দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে যে, মানুষের মুক্তি কেবল তার আমলের ভিত্তিতেই হবে বাপ দাদা বা কোন বুযুর্গ বা মাশায়েখের আমলের কারণে কেউ মুক্তি পাবে না, যেটা অনেক অজ্ঞ লোকেরা মনে করে থাকে। পবিত্র কুরআনের এই দু'টি আয়াতের আলোকে এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেটা প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে এখানে পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াতের অর্থ উল্লেখ করা হলো– "যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ লাভ করেছে এর দ্বারা তার নিজের

উপকার হবে। আর যে ব্যক্তি পথহারা হয়েছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না আর আমি কোন রাসূল পাঠাবার আগে কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-১৫)

আল্লাহ্ পাক উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে অমুসলিমদের জন্য এমন চারটি বিধান জারি করেছেন, যেগুলোতে তাঁর ইনসাফ ও হিকমত চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। **এক.** হিদায়াতের দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্তরা উপকৃত হবে, অন্য কেউ নয়। **দুই.** পথভ্রষ্টতার দরুন পথভ্রষ্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অন্য কেউ নয়। **তিন.** একের অপরাধের জন্য অন্য কেউ দায়ী হবে না। **চার.** কোন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়নি।

উপরে উল্লেখিত চারটি বিধানের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অপূর্ব হিকমত, সুবিচার, ফযল ও করম নিহিত রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত ইনসান শব্দের অর্থ কারো কারো মতে জীবিত মানুষকে বুঝানো হয়েছে, মৃত মানুষকে নয়। এই বক্তব্যটিও পূর্বের ধ্যান ধারণার ন্যায় একটি ভ্রান্ত ধারণা। 'ইনসান' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন শব্দের এই ধরনের ব্যবহার এবং মনগড়া অর্থ গ্রহণ করলে শব্দের মূল অর্থই বিকৃত হয়ে যায়। এটা হবে কোন শব্দের মূল অর্থকে বিকৃত করারই শামিল। উপরে বর্ণিত আয়াতের ধারাবাহিকতা, কিয়াস, শরীআতের মূলনীতি, দলীল, প্রমাণ এবং বিধি-বিধান এই অভিমতকে বাতিল হিসেবে গণ্য করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন একটি শব্দের ভুল প্রয়োগ ব্যক্তি বিশেষের আকীদার উপর নির্ভর করে। মানুষ প্রথমত কোন একটি মতবাদে বিশ্বাস করে। এরপর যখন তার আকীদার পরিপন্থী কোন অকাট্য প্রমাণের সম্মুখীন হয়, তখন সে যে কোনভাবেই হোক সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এভাবেই তারা সঠিক আকীদাকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াস অব্যাহত রাখে। আর এভাবেই হক ও বাতিলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আসলে, সঠিক তথ্য ও প্রমাণকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। একজন মানুষ তার ভালো ব্যবহারের দ্বারা অন্যের ভালোবাসা, সুন্দর পারিবারিক জীবন, সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করে থাকে। এছাড়া একজন মানুষ ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে যে কামালিয়াত ও সাফল্য অর্জন করে, এসবই তার পরিশ্রম ও সাধনার ফল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সবচেয়ে উত্তম রুযী হলো সেটা যা মানুষ নিজে উপার্জন করে, আর তা ভোগও করে, আর সন্তান-সন্ততিরা তার সঞ্চয়ের একটি অংশ।" সাদকায়ে জারিয়াহ্ সম্পর্কিত একটি হাদীসও এই ধারণাকে সমর্থন করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে ইমাম শাফিয়ী (র) উল্লেখ করেছেন যে, কেবল নিজ সন্তানেরাই মাতা-পিতার বদলী হজ্জ আদায় করতে পারে, অন্য কেউ নয়, যেহেতু একজন সন্তানের ধনসম্পদ মাতাপিতারই ধনসম্পদ বলে গণ্য। তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের অবকাশ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ঈমান, আমল ও আনুগত্যের দ্বারা একজন মুসলমান যেমন নিজের উপকার করে থাকেন, তেমনি তিনি অন্য মুসলমান ভাইদেরও উপকারে আসেন। সম্মিলিত আমলের দ্বারা মুমিন - মুসলমানগণ উপকৃত হয়ে থাকেন। যেমন জামাআতের নামাযের মাধ্যমে প্রত্যক নামাযী সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পেয়ে থাকেন। একত্রে নামায আদায় করার কারণেই এরূপ সওয়াব লাভ করা যায়। নামাযীদের সংখ্যা যতো বেশি হবে, সওয়াবের পরিমাণও ততো বেশি হবে। সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি সওয়াবের কাজ মিলেমিশে করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক মুমিন অন্য এক মুমিনের জন্য এমন এক ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অন্য অংশকে মযবুত করে। একজনের দ্বারা অন্যজনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তারপর তিনি এক হাতের আংগুলের ভেতরে অন্য হাতের আংগুলি প্রবেশ করিয়ে বললেন, "এভাবে।" এটাতো সর্বজনবিদিত যে, দুনিয়ার ব্যাপারের চেয়ে দীনী ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন অধিক। কাজেই ইসলামের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা পার্থিব জীবনের জন্য যেমন প্রয়োজন, পরকালীন জীবনের জন্যও তেমনি অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ও এর আশেপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়েছেন যে, তাঁর রাসূলগণ যেমন, হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের জন্য দুআ ইসতিগফার করেন। মুমিন বান্দাদের নিজ ঈমান ও আমলের কারণে এবং অন্য মুমিন বান্দা নেক দুআর বরকতে উপকৃত হন। এ সবই তাদের নেক আমলের প্রতিফল। একজন মুসলমানের দু'আ ও আমলের দ্বারা অন্য কোন মুসলমান যাতে উপকৃত হন, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে শর্তসাপেক্ষ করে দিয়েছেন। একজন ঈমানদার ব্যক্তি অন্য একজন ঈমানদার ভাইয়ের নেক আমল ও দু'আ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর যথার্থতা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যখন তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রা)-কে বলেছিলেন, 'তোমার পিতা যদি আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করতেন, তাহলে তোমার এ

আমলের সওয়াব তাঁর কাছে পৌঁছে যেতো। অর্থাৎ তোমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি তাঁর পক্ষ থেকে যে একজন গোলাম মুক্ত করেছো, এর সওয়াব তিনি পেয়ে যেতেন। এটা ছিলো সওয়াব লাভের এটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর উপায়। তবে এরূপ আকীদা বা বিশ্বাসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এখানে এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সায়া। অর্থাৎ, "মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।" (সূরা নাজম ঃ আয়াত-৩৯)

লাহা মাকাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত। অর্থাৎ "মানুষ যা উপার্জন করে, ভোগ করে এবং তার উপর বর্তায় যা সে করে।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ আয়াত-২৮৬)

ওয়ালা তুজযাওনা ইল্লামা কুনতুম তা'মালূন। অর্থাৎ "তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান প্রদান করা হবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-৫৪)

এই পবিত্র আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষকে অন্য কারো আমলের জন্য নয় বরং তার নিজের আমলের জন্য দায়ী করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন– ফালইয়াওমা লা তুযলামু নাফসুন শাইয়াওঁ ওয়ালা তুজযাওনা ইল্লামা কুনতুম তা'মালুন। অর্থাৎ আজকের দিনে কারো প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তোমাদের নিজ আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-৫৪)

অর্থাৎ কারো গুনাহ বা অপরাধকে বৃদ্ধি করা হবে না, আর কারো সওয়াবকে হ্রাস করা হবে না। এছাড়া একজনের অপরাধের জন্য অন্য কাউকে দায়ী করা হবে না। তবে এই কথার অর্থ এই নয় যে, অন্যের নেক আমলের দ্বারা অন্য কেউ উপকৃত হবে না। কেননা জীবিতদের হাদিয়ার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হন তাঁদের নিজের আমলের প্রতিদান হিসেবে নয় বরং আল্লাহ তা'আলার দান ও তাঁর দয়া হিসেবে। কোন বান্দা তাঁর নেক আমলের সওয়াব অন্য কোন বান্দাকে যেভাবে দান করবেন, তিনি তা সেভাবেই পাবেন। অর্থাৎ আংশিকভাবে দান করলে আংশিকভাবে পাবেন আর পুরোপুরিভাবে দান করলে পুরোপুরিটাই পাবেন।

মৃত ব্যক্তিরা যে অন্যের নেক আমলের সওয়াব পেয়ে থাকেন, সাদকায়ে জারিয়াহ সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা সেটার প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মৃত ব্যক্তির যে কোন আমল করার ক্ষমতা থাকে না তিনি সেটাই কেবল সেই হাদীসে উল্লেখ করেছেন। কারো নিজের আমল

সাধারণত তার নিজেরই প্রাপ্য। তবে কোন আমলকারী তার কোন আমলের সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তিকে দান করলে তা সেই মৃত ব্যক্তি পেয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাউকে হাদিয়া পাঠানোর অর্থ হলো, কাউকে কোন সওয়াব দান করা। কিন্তু স্রষ্টার প্রতি কোন কিছু হাওয়ালা করা কোন মানুষকে হাওয়ালা করার মতো নয়। কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দেয়, কিংবা তার অন্য কোন জরুরী হক আদায় করে দেয় অথবা তার উদ্দেশ্যে কোন সাদকাহ প্রদান করে, তার পক্ষে হজ্জ আদায় করে, তাহলে ঐসব নেক আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ ও ইজমায়ে উম্মতকে অগ্রাহ্য করার কোন অবকাশ নেই। এমনি রোযার সওয়াবও মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তাই কোন মনগড়া যুক্তি শরীআতের এই সুস্পষ্ট বিধি-বিধানকে খণ্ডন করতে পারে না।

বিরুদ্ধবাদীরেদ মতে "কোন ইবাদতের সওয়াব কাউকে হাওয়ালা করা বাঞ্ছনীয় নয়।" কারণ ঐ মৃত্যুপথযাত্রী ঈমানের সাথে মারা গেল কিনা তা তখনও জানা যায় না। তবে বিজ্ঞ আলিমগণ এই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, কোন বেঈমান ব্যক্তির জন্য কোন নেক আমলের সওয়াব বখশিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য খণ্ডনে যা বলা হয়ে থাকে তা এখানে উল্লেখ করা হলো। **এক.** একজন লোক ঈমানের দিক থেকে ইসলামের উপরে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইনতিকাল করল কিনা এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। সে যদি ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে তাকে যে সওয়াব হাওয়ালা করা হবে তা সে পাবে। আর যদি বেঈমান হিসেবে মারা যায়, তাহলে ঐ সওয়াব পাবে না। সেই সওয়াব প্রেরণকারীর নিকট ফিরে আসবে। **দুই.** বিরুদ্ধবাদীদের মতে, কারো কোন ইবাদত অন্য কাউকে হাওয়ালা করা যায় না, এতে ইবাদতরে প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতাই প্রকাশ পায়। তবে যে কোন ইবাদতের সওয়াব হাওয়ালা করা যায়। **তিন.** একজন নেকবান্দা সওয়াব লাভের আশায় ইবাদত বন্দেগী যথাযথভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। কোন ইবাদত কাউকে হাওয়ালা করার উদ্দেশ্যে আদায় করা হলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়। এছাড়া ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে ভাব-ভক্তি ও নিষ্ঠা একান্ত কাম্য।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "নিজের রবের মাগফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আকাশ যমীনের সমতুল্য।" (সূরা হাদীদ ঃ আয়াত-২১) পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে– "নেক কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রগামী হও।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত-১৪৮)

তবে কোন ইবাদতের সওয়াব অন্য কাউকে বখশিয়ে দিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের মধ্যে একে অপরের প্রতিযোগিতা করতেন। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর কসম, হযরত আবূবকর (রা) ও আমার মধ্যে যে কোন নেক কাজে প্রতিযোগিতা হতো, তবে তিনি সব সময় জয়ী হতেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) হেরে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমি আর আপনার সাথে কোন নেক কাজে প্রতিযোগিতায় যাবো না।" পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত-২৬)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের আলোকে একজন প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতায় ও একজন ইবাদতকারীকে ইবাদতে অবশ্য অগ্রগামী থাকতে হবে।

বিরুদ্ধবাদীদের অন্য একটি মত এই যে, মৃত ব্যক্তিদেরকে সওয়াব পৌঁছানো যদি জায়েয হয়, তাহলে জীবিতদেরকেও সওয়াব পৌঁছানো জায়েয হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। এক. জীবিতদেরকেও সওয়াব পৌঁছানো জায়েয। ইমাম আহমদ (র)-এর কোন কোন অনুসারীর এটাই অভিমত। এই প্রসঙ্গে কাযী আয়ায (র) বলেছেন, ইমাম আহমদ (র)-এর এরূপ উক্তির দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের নিকট যে সওয়াব পৌঁছে, এটা সুনিশ্চিত নয়। একজন লোকের মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ, ইসতিগফার ও জানাযার নামায ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করার বিধান রয়েছে। একজন মুসলমান কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির কোন বিষয়ে যিম্মাদার হলে, সে ব্যক্তি তার ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। একজন জীবিত ব্যক্তি অপর একজন জীবিত ব্যক্তিকে কোন সৎকাজের সওয়াব বখশিয়ে দিতে পারে। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জীবিতদের গুনাহ্ অপর জীবিতদের তাওবাহ দ্বারা মাফ হয়ে যেতে পারে। একজন জীবিত ব্যক্তির নেক আমলের দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। তবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা ও অপার অনুগ্রহ। একজন জীবিত ব্যক্তিও অন্যের দুআ ও ইসতিগফার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এছাড়া কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষম ও অপারগ জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। কারো কারো অভিমত এই যে, কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যে ঈমান নিয়ে যেতে পারবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য কোন সওয়াব প্রেরণ করা হলে এতে তার কোন উপকার হবে না। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আকীল (র)-এর অভিমত এই

যে, এটাও একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ, সওয়াব প্রেরণকারী ব্যক্তিও বেদীন হয়ে মারা যেতে পারে। আর তার আমলও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, যে আমলের মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য হাদিয়াও রয়েছে। তবে অকাট্য প্রমাণ ও ঐকমত্য দ্বারা ঐরূপ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ও রোযা আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। আর এ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি কোন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দেয়, তাহলে সে ঐ ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে আরো বলা যেতে পারে যে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য যেসব সওয়াব বখশিয়েছেন, সে সবের মালিক এখন মৃত ব্যক্তি। তবে জীবিত ব্যক্তি যদি বেদীন হয়ে যায়, তাহলে তার পূর্বে পৌঁছে দেয়া নেক আমল বাতিল হতে পারে না, যেহেতু তার ঐ নেকআমল তার থেকে দান করা হয়ে গেছে। যেমন কোন ব্যক্তি বেদীন হওয়ার পূর্বে যে দাসকে মুক্ত করেছিলো অথবা যে কাফফারা আদায় করেছিলো, তার ধর্মচ্যুতিতে তার নেক কাজে কোন প্রকার প্রভাব পড়বে না।এমনকি কেউ কোন অক্ষম জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি হজ্জও পালন করে থাকে, তাহলে তার ধর্মচ্যুতির দরুন সেই হজ্জ পালনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, যে জন্য অন্য কাউকে দিয়ে আবার হজ্জ করাতে হবে। এছাড়া জীবিতদের ও মৃতদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু একজন জীবিত ব্যক্তির আমল করার সুযোগ রয়েছে। সে নিজে আমল করতে পারে। কোন মৃত ব্যক্তির সেই সুযোগ নেই। তদুপরি একজন জীবিত ব্যক্তি তার আমল বা তাওবাহর দ্বারা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির উপকার করতে চাইলেও, সমস্যা থেকে যায়। আর তা হলো একজন ধনী ব্যক্তি তার ধনের বিনিময়ে গরীব লোকদের দ্বারা তার জন্য প্রয়োজনীয় ইবাদত করিয়ে নিতে পারে। আর যদি কোন ইবাদত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে, ফরয ও নফল ইত্যাদি ইবাদত বরবাদ করে দেয়া। এছাড়া যেসব ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সহায়ক, সেই ইবাদতের সওয়াব থেকে ধনী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হয়ে যান। কোন ইবাদতকারী অথবা অন্যের দ্বারা ইবাদতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদতের কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, ইবাদতের জন্য কেউ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে সেই ইবাদতের প্রতিদান বা সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। একজন ইবাদতকারী সেই ইবাদতের সওয়াবই পেয়ে থাকেন, যেটা কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়। শরীআতের সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য

তবে কোন ইবাদতের সওয়াব অন্য কাউকে বখশিয়ে দিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের মধ্যে একে অপরের প্রতিযোগিতা করতেন। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর কসম, হযরত আবূবকর (রা) ও আমার মধ্যে যে কোন নেক কাজে প্রতিযোগিতা হতো, তবে তিনি সব সময় জয়ী হতেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) হেরে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমি আর আপনার সাথে কোন নেক কাজে প্রতিযোগিতায় যাবো না।" পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত-২৬)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের আলোকে একজন প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতায় ও একজন ইবাদতকারীকে ইবাদতে অবশ্য অগ্রগামী থাকতে হবে।

বিরুদ্ধবাদীদের অন্য একটি মত এই যে, মৃত ব্যক্তিদেরকে সওয়াব পৌছানো যদি জায়েয হয়, তাহলে জীবিতদেরকেও সওয়াব পৌছানো জায়েয হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। **এক.** জীবিতদেরকেও সওয়াব পৌছানো জায়েয। ইমাম আহমদ (র)-এর কোন কোন অনুসারীর এটাই অভিমত। এই প্রসঙ্গে কাযী আয়ায (র) বলেছেন, ইমাম আহমদ (র)-এর এরূপ উক্তির দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের নিকট যে সওয়াব পৌছে, এটা সুনিশ্চিত নয়। একজন লোকের মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ, ইসতিগফার ও জানাযার নামায ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করার বিধান রয়েছে। একজন মুসলমান কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির কোন বিষয়ে যিম্মাদার হলে, সে ব্যক্তি তার ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। একজন জীবিত ব্যক্তি অপর একজন জীবিত ব্যক্তিকে কোন সৎকাজের সওয়াব বখশিয়ে দিতে পারে। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জীবিতদের গুনাহ্ অপর জীবিতদের তাওবাহ্ দ্বারা মাফ হয়ে যেতে পারে। একজন জীবিত ব্যক্তির নেক আমলের দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের গুনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে। তবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা ও অপার অনুগ্রহ। একজন জীবিত ব্যক্তিও অন্যের দুআ ও ইসতিগফার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এছাড়া কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষম ও অপারগ জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। কারো কারো অভিমত এই যে, কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যে ঈমান নিয়ে যেতে পারবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য কোন সওয়াব প্রেরণ করা হলে এতে তার কোন উপকার হবে না। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আকীল (র)-এর অভিমত এই যে, এটাও একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ, সওয়াব প্রেরণকারী ব্যক্তিও বেদীন হয়ে মারা যেতে পারে। আর তার আমলও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, যে আমলের মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য হাদিয়াও রয়েছে। তবে অকাট্য প্রমাণ ও ঐকমত্য দ্বারা ঐরূপ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত

ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ও রোযা আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। আর এ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি কোন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দেয়, তাহলে সে ঐ ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে আরো বলা যেতে পারে যে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য যেসব সওয়াব বখশিয়েছেন, সে সবের মালিক এখন মৃত ব্যক্তি। তবে জীবিত ব্যক্তি যদি বেদীন হয়ে যায়, তাহলে তার পূর্বে পৌছে দেয়া নেক আমল বাতিল হতে পারে না, যেহেতু তার ঐ নেকআমল তার থেকে দান করা হয়ে গেছে। যেমন কোন ব্যক্তি বেদীন হওয়ার পূর্বে যে দাসকে মুক্ত করেছিলো অথবা যে কাফফারা আদায় করেছিলো, তার ধর্মচ্যুতিতে তার নেক কাজে কোন প্রকার প্রভাব পড়বে না।এমনকি কেউ কোন অক্ষম জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি হজ্জও পালন করে থাকে, তাহলে তার ধর্মচ্যুতির দরুন সেই হজ্জ পালনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, যে জন্য অন্য কাউকে দিয়ে আবার হজ্জ করাতে হবে। এছাড়া জীবিতদের ও মৃতদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু একজন জীবিত ব্যক্তির আমল করার সুযোগ রয়েছে। সে নিজে আমল করতে পারে। কোন মৃত ব্যক্তির সেই সুযোগ নেই। তদুপরি একজন জীবিত ব্যক্তি তার আমল বা তাওবাহর দ্বারা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির উপকার করতে চাইলেও, সমস্যা থেকে যায়। আর তা হলো একজন ধনী ব্যক্তি তার ধনের বিনিময়ে গরীব লোকদের দ্বারা তার জন্য প্রয়োজনীয় ইবাদত করিয়ে নিতে পারে। আর যদি কোন ইবাদত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে, ফরয ও নফল ইত্যাদি ইবাদত বরবাদ করে দেয়া। এছাড়া যেসব ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের সহায়ক, সেই ইবাদতের সওয়াব থেকে ধনী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হয়ে যান। কোন ইবাদতকারী অথবা অন্যের দ্বারা ইবাদতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদতের কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, ইবাদতের জন্য কেউ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে সেই ইবাদতের প্রতিদান বা সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। একজন ইবাদতকারী সেই ইবাদতের সওয়াবই পেয়ে থাকেন, যেটা কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়। শরীআতের সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য এই নয় যে, ইবাদত বন্দেগীকে কোন পার্থিব লেনদেনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কারো কোন ঋণ অথবা কোন কিছুর যামানত সম্পর্কে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। যেহেতু এটা মানুষের জীবনে একটা নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার, যেটা একজনের জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত অবস্থায় হতে পারে।

যে কোন নেক আমলের পুরাপুরি ঈসালে সওয়াব যখন জায়েয, তখন যে কোন নেক আমলের আংশিক ঈসালে সওয়াবও জায়েয। এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোন অবকাশ নেই। যাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত এই যে, কেউ নিজের

কোন জিনিস স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে কাউকে দান করলে সেটা যেমন বৈধ ও জায়েয, তেমনি কোন একটি আমলের সওয়াব একাধিক ব্যক্তিকে দান করলে তারা সকলেই সমভাবে সেই সওয়াব পাবেন।

ঈসালে সওয়াব যখন জায়েয ও বৈধ বলে বিবেচিত, তখন একজন ব্যক্তি তার যে কোন নেক আমল অন্য একজন ব্যক্তিকে বখশিয়ে দিতে পারেন। তবে কেউ কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, ঈসালে সওয়াবের জন্য আমলকারীর পক্ষে ঐ আমলের নিয়ত করা প্রয়োজন। তবে ইমাম আহমদ (র) ঈসালে সওয়াবের জন্য এরূপ নিয়তের কোন শর্ত উল্লেখ করেননি। এছাড়া এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলিমদের কোন অভিমত পাওয়া যায় না। অবশ্য পরবর্তীকালের আলিমদের মধ্যে কাযী আয়ায (র) প্রমুখ এরূপ শর্ত আরোপ করেছেন। কাযী আয়ায (র) আমলের শুরুতে ঈসালে সওয়াবের নিয়তকে শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এরূপ বলার উদ্দেশ্য হলো, কোন নেক আমলের সওয়াব যেন সরাসরি মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যিনি আমল করার পর ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করেন, তিনি প্রথমে নিজে ঐ আমলের সওয়াব পাবেন, তারপরে ঐ সওয়াব তাঁর কাছ থেকে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আবূ আবদুল্লাহ ইবনে হামাদান (র) বলেছেন, কোন আমলকারী ঈসালে সওয়াবের নিয়ত প্রথমে না করলেও আমলকারী যদি কাউকে সেই আমলের সওয়াব বখশিয়ে দেন, তাহলে সেটা তিনি পেয়ে যাবেন। আর যে কোন নেক আমলের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া এভাবেই কার্যকর হয়। তাই কেউ যদি তার কোন দাসকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে ঐ সৎকাজের সওয়াব সে নিজেই পাবে, অন্য কেউ নয়। তবে যদি কেউ কারো পক্ষ থেকে নিয়ত করে তার কোন দাসকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে সেটার সওয়াব ঐ ব্যক্তিই পাবে। কেউ যদি অন্যের কোন ঋণ কোন নিয়ত ছাড়া ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দেয়, আর ঋণ শোধ করার পর ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করে, তাহলে সেটা ঠিক হবে না। এইভাবে যদি কেউ হজ্জ আদায় করে, রোযা রাখে, কিংবা নামায পড়ে তারপর অন্যের জন্য এসব আদায় করার নিয়ত করে, তাহলে সেটাও জায়েয হবে না। যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁরা এটাই জানতে চেয়েছিলেন, "আমরা যে নিজের পক্ষ থেকে সাদকাহ করেছি, এর সওয়াব কি মৃত ব্যক্তিরা পাবে?' এমনিভাবে জনৈকা মহিলা জানতে চেয়েছিলেন, "আমি কি আমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করতে পারি?" অপর একব্যক্তি জানতে চেয়েছিলেন, "আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করতে পারি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব পালন করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তবে প্রশ্ন এই যে, কেউ তার কোন আগের করা নেক আমল বা আমলের সওয়াব অন্য কাউকে বখশিয়ে দিতে পারেন কিনা, এরূপ কোন প্রশ্ন কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে

জিজ্ঞেসই করেননি। এছাড়া কোন সাহাবীও এমন কোন নেক আমল করেননি, যা পরে তিনি ঈসালে সওয়াব হিসেবে দান করেছিলেন। নেক আমলের ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে এটাই হলো একটি সাধারণ নিয়ম। তবে যাঁরা নিয়তের শর্তকে স্বীকার করেন না, তাঁরা কোন নেক আমলের সওয়াব বখশিয়ে দেয়ার কথাও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ইসালে সওয়াব যদি জায়েয হয়, তাহলে জীবিত ব্যক্তিদের ফরয আমলের সওয়াব ও হাদিয়া করা জায়েয হবে, তবে এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

যাঁরা ঈসালে সওয়াবের জন্য শুরু থেকেই নিয়ত করার শর্ত আরোপ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না। কেননা কেউ যদি অন্যের কোন ফরয ইবাদত আদায় করেন, তাহলে এর দ্বারা তার নিজের ফরয আদায় হবেনা। তবে যে ব্যক্তি তার কোন আমলের আগে নিয়ত করা আবশ্যক মনে করে না, তার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ অবশ্যই আনা যেতে পারে। তবে এই অভিযোগের দু'টি জবাব আছে। **এক.** হযরত আবূ আবদুল্লাহ হামাদান (র) বলেছেন, যদি ফরয নামায অথবা রোযা ইত্যাদি আমলের সওয়াব অন্য কাউকে হাদিয়া করা হয়, তাহলে তা জায়েয এবং সওয়াব প্রদানকারীর দায়িত্ব থেকে তার ফরযও আদায় হয়ে যাবে। হযরত আবূ আবদুল্লাহ হামাদান (র)-এর বক্তব্য হলো, এক শ্রেণীর লোকের অভিমত, তারা নিজের ফরয ও নফল আমলের সওয়াব অন্যকে দান করে দেয় এবং বলে, আমরা আল্লাহর সাথে শূন্য হাতে সাক্ষাৎ করবো, শরীআতের এতে কোন বাধা নেই। সওয়াব আমলকারীর হক, সে যদি তা অন্য কাউকে দান করে, তাহলে এতে কোন আপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। **দুই.** অপর এক শ্রেণীর লোক এরূপ সওয়াব দান করা যে নাজায়েয বলেন সেটা ঠিক নয়। শরীআতের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা একজন মুমিন বান্দার জন্য অপরিহার্য ও পরীক্ষা সদৃশ। এটা পরিবর্তন করার এমন কোন সুযোগ নেই। যদি কোন মুসলমান তার নিজ ভাইকে তার কোন আমলের সওয়াব দ্বারা উপকার করে, তাহলে এতে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। বরং এটা আল্লাহর মেহেরবানী ও ইহসানের পরম পরাকাষ্ঠা যে, তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে এমনকি আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকেও মুমিন বান্দাদের জন্য দুআ ও ইসতিগফার করার জন্য নিয়োজিত করে রেখেছেন। ফেরেশতারা সব সময় মুমিন বান্দাদের জন্য দু'আ করছেন, আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে অন্যায় ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়া কিয়ামতের দিন তিনি যেন মাকামে মাহমূদে দাঁড়িয়ে একাত্ববাদীদের জন্য সুপারিশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন নিজের সাহাবাদের জন্য দুনিয়াতে থাকাকালীন ও তাঁদের ইনতেকালের পরেও দুআ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাঁর উম্মতের কবরে

উপস্থিত হয়ে দু'আ করতেন, এটা কুরআন হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। এটাকে ফরযে কিফায়া হিসেবেও গণ্য করা হয়। ফরযে কিফায়া ঐ নেক কাজকে বলা হয়, যা কোন একজন মুসলমান আদায় করলে তা সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। তদুপরি কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কোন ঋণ আদায় করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশের সকল বাধা ও কবরের আযাব দূর করে দেবেন। এটা শরীআতের বিধান মান্যকারীদের জন্য একটি নি'আমতস্বরূপ। এমনিভাবে ইমামের পেছনে একজন মুক্তাদীর নামায সহীহ হওয়ার জন্য মুক্তাদীর ভুলের সাহু সিজদাহ রহিত হয়ে যায় এবং ইমামের কির'আতের দ্বারা মুক্তাদীদের কিরায়াত পড়া রহিত হয়ে যায়। এছাড়া ইমামের সুতরার দ্বারা মুক্তাদীর জন্য সুতরা রহিত হয়ে যায়। নামায পড়ার সময় সম্মুখ ভাগে কোন কিছু রেখে আড়াল করাকে সুতরা বলে। ঈসালে সওয়াব আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ইহসানের একটি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা ইহসানকারীদেরকে পছন্দ করেন। সৃষ্টিকুল আল্লাহ তা'আলার পরিবার সদৃশ। আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয় যিনি তাঁর পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যে তাঁর মাখলূককে এক ঢোক পানি, সামান্য কিছু দুধ অথবা এক টুকরো রুটি দান করেন। আল্লাহ তা'আলার মাখলূককে দুর্বল ও দীনহীন অবস্থায় যখন তাদের আমল করার কোন অবকাশ থাকেনা এবং যখন তারা খুব অভাবগ্রস্ত সে সময় তাদের কোন সাহায্য বা উপকার করলে, সে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ভালোবাসবেন। তাই আগেকার যমানার কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সত্তর বার এই দু'আ করে– রাব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত। অর্থাৎ "হে আমার রব, আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে আর সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলাকে ও সকল মুমিন পুরুষ ও মহিলাকে মাফ করে দিন।" সে ক্ষেত্রে এই দুআ পাঠকারী এই আমলের সওয়াব সব মুসলমানের সওয়াবের সমপরিমাণ পাবেন। যে ব্যক্তি আপন ভাইদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন, তিনি তাঁর ভাইদের জন্য সওয়াবের কাজই করে থাকেন। আর আল্লাহ সদ্ব্যবহারকারীদের প্রতিদানকে বিনষ্ট করেন না। যাঁরা ঈসালে সওয়াব বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মতে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাওবাহ করে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আসলে, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তবে এসব বিভ্রান্তিকর ধারণার সঠিক জবাব এখানে দেয়া হলো। **এক.** এরূপ কোন যুক্তি, অকাট্য প্রমাণ ও ইজমা বা ঐকমত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং তা সংঘাত সৃষ্টি করে। এছাড়া যেটা পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণের পরিপন্থী সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা কোন কোন জিনিসের মধ্যে যে পার্থক্য রেখেছেন, এর দ্বারা সে পার্থক্য দূর হয়ে যায়। **দুই.** কোন একজনের পক্ষ থেকে অন্য কারো ইসলাম গ্রহণ করা

বা তাওবাহ্ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য সাদকাহ দেয়া, হজ্জ করা ও দাসকে মুক্ত করা ইত্যাদি নেককাজের সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন। ঈসালে সওয়াবের বিরোধীরা উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার বিধি-বিধানকে এক রকমের মনে করেন। কোন ব্যক্তির যবেহ্ করা পশু, সুদের ব্যবসা ও সুদমুক্ত ব্যবসাকে একইভাবে তারা বৈধ গণ্য করেন। **তিন.** আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মুসলমানদের জন্য ইহকালে ও পরকালে একে অপরকে উপকার করার এক সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। এই বন্ধন বিদ্যমান না থাকলে অপরের উপকার করা সম্ভব নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আমর ইবনে আস (রা)-কে বলেছিলেন, যদি তোমার পিতা আল্লাহর একত্বকে মেনে নিতেন, আর তুমি তাঁর পক্ষ থেকে রোযা রাখতে বা সাদকাহ্ দিতে, তাহলে তোমার এসব নেক আমল তাঁর উপকারে আসতো। ইসলাম ও তাওহীদে বিশ্বাসী থাকা অবস্থায়ই কেবল নেক আমলের সুফল লাভ করা যায়। ইখলাসের সাথে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ একজন বান্দার নেক আমল কবূল হওয়ার পূর্ব শর্ত, যেমন নামায সহীহ ও কবূল হওয়ার জন্য ওযূ ও অন্যান্য শর্তাবলী যথারীতি পালন করা অত্যাবশ্যক। যে কোন নেক আমলের যাবতীয় কার্যকারণেরও এটাই পূর্ব শর্ত। যে ব্যক্তি কারণে বা অকারণে বৈধ বা অবৈধ বিষয়কে একত্রিত করে ফেলে, সে একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। নাফরমানদের জন্য যদি সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে মুশরিকদের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য হবেনা কেন? আর একাত্ববাদীদেরকে যদি জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়, তাহলে সমস্ত কাফিরদেরকেও বের করে আনা হবে না কেন? এরূপ যুক্তিও অবতারণা করা যেতে পারে। এটা বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব অবান্তর বিষয়ের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। তবে পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের দ্বারা নিজেদের আমল বিনষ্ট করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো– একজন লোকের পক্ষে অন্য একজন লোকের ইবাদত বা অন্য কোন সওয়াবের কাজ ঈসালে সওয়াব স্বরূপ আদায় করা জায়েয কিনা? ইবাদত দুই প্রকারের– প্রথম প্রকার হলো, একজন অন্যজনের পক্ষে যা আদায় করে থাকে। এরূপ ঈসালে সওয়াব জায়েয ও বৈধ। আর অন্য প্রকারের ইবাদত হলো, যেটা কেউ অন্য কারো পক্ষে সম্পাদন করে না। এ ধরনের ইবাদত ঈসালে সওয়াব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ অভিমতের প্রমাণ কি? এর পার্থক্যের ভিত্তি কি? এই অভিমতের সমর্থনে কুরআন হাদীসে কোন প্রমাণ আছে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা আদায় বৈধ করে দিয়েছেন। কিন্তু একজন জীবিত ব্যক্তি অন্য একজন জীবিতের পক্ষে রোযা রাখতে পারে না। এমনিভাবে কেউ যদি ফরযে কিফায়া আদায় করে, তাহলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কোন অবুঝ বালকের পক্ষ থেকে কেউ তার হজ্জ পালন করলে ঐ বালক সওয়াব পাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)

বলেছেন, কোন বেহুঁশ ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার সাথীরা ইহরাম বাঁধতে পারে। যদি কোন অমুসলিম পিতামাতা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁদের নাবালিগ সন্তানগণও ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করে থাকে। লক্ষণীয় যে, একজনের সৎকাজের সুফল অন্যজনের মাধ্যমে এইভাবে সম্প্রসারিত হয় সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীআতের বিধান মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে কিম্বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অথবা অন্যান্য মুসলমানের সাথে তার অতি প্রয়োজনের সময় ঈসালে সওয়াব থেকে তাকে কি বঞ্চিত রাখতে পারে? কখনই নয়। কারো জন্য এটা ঠিক নয় যে, সে কাউকে এমন নেকী থেকে বিরত রাখে যা থেকে শরীআত তাকে বঞ্চিত করেনি। যেমন, হজ্জ পালন করা, সাদকাহ দেয়া, কোন দাসকে মুক্ত করা, রোযা রাখা, নামায পড়া, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং ইতেকাফ করা। কোন ঈসালে সওয়াবকারীর ইহসান বা উপকারকে শরীআতের পক্ষ থেকে কোন বাধা দেয়া হয়নি। বরং শরীআত সর্বাবস্থায় ইহসানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অনেক মুমিন বান্দার স্বপ্নের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিরা তাঁদেরকে জানিয়েছেন, জীবিতদের প্রেরিত হাদিয়া তাঁরা পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এখনকার মুসলমানদের স্বপ্নের অবস্থা আর আগেকার মুসলমানদের স্বপ্নের অবস্থা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হলে, এই গ্রন্থের কলেবর অধিক বৃদ্ধি পাবে তাই সেটা পরিহার করা হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত : তিনি স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করেছেন, শবে কদর রমযান শরীফের শেষ দশকে নিহিত আছে। মহান সাহাবায়ে কেরামও স্বপ্নযোগে এরূপ দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারণা অনুযায়ী শবে কদর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের স্বপ্ন যেমন গ্রহণযোগ্য, তাঁদের রেওয়ায়েত বা স্বপ্নের ঘটনা একত্রিত করা হয়, তখন সেটা সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেননা সবাই মিথ্যাবাদী হতে পারে না, এটাই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল কথা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন ব্যক্তি রোযা বাকী রেখে মৃত্যুবরণ করলে, তার পক্ষ থেকে তার কোন ওলী সে রোযা রেখে দেবে।" যুক্তি বহির্ভূত প্রমাণ খণ্ডন করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এরূপ ধারণা সহীহ ও সুপরিচিত হাদীসের পরিপন্থী। এছাড়া সহীহ ও সঠিক হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, কেউ তা গ্রহণ করুক বা না করুক। একজন মুমিন মুসলমানের নিকট দুনিয়ার মোহমায়া মুখ্য নয়, গৌণ। আল্লাহর রাসূলই তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে এখানে আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করা হলো। **এক.** ইমাম মালিক (র) তাঁর মুয়াত্তা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না।" কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারে।" এখন দেখা যাক, কোন অভিমত গ্রহণযোগ্য, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস না ইমাম

মালিক (র)-এর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখিত অভিমত। তর্কের খাতিরে যদি বলা হয়, ইমাম মালিক (র) মুসলমানদের ইজমা বা ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাহলে তিনি কেবল মদীনাবাসীদের ইজমার উপরই নির্ভর করেছিলেন, সমগ্র মুসলিম জাহানের ঐকমত্যের উপর নয়। এছাড়া এই বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে সে সময় ইমাম মালিক (র) অবহিত ছিলেন না। সুতরাং ইমাম মালিক (র) এ বিষয়ে অবগত না থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীসকে পরিত্যাগ করা যায় না। সমস্ত মদীনাবাসীও যদি কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, আর তা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেহেতু অন্য আর কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নন, তাঁদের সম্মান ও পদমর্যাদার যতোই উঁচুস্তরের হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা অন্য কারো অভিমতকে কোন দলীল প্রমাণের মাপকাঠি বলে গণ্য করেননি যে, এরূপ কোন মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সেটা গ্রহণ করা যাবে। বরং পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে, এটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তোমাদের কল্যাণ। আর পরিণতির দিক থেকে এটাই উত্তম।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-৫৯)

যদিও ইমাম মালিক (র) ও মদীনাবাসীরা অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখার বিরোধিতা করেছেন, তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রমযানের রোযার বিনিময়ে তোমরা গরীব-মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেবে, আর মানতের রোযার জন্য রোযা রাখবে। ইমাম আহমদ (রহ) অধিকাংশ আসহাবে হাদীস এবং হযরত আবূ উবায়েদ (র) এই অভিমত পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ সওর (র) বলেছেন, মানতের রোযা হোক বা মানত ছাড়া অন্য কোন রোযা হোক, এসব রোযাও একে অন্যের পক্ষ থেকে রাখতে পারে। হযরত হাসান ইবনে সালিহ (র)ও মানতের রোযা কারো পক্ষ থেকে তার ওলী রাখতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক উপরে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ হলো– "কেউ কারো পক্ষ থেকে রমযানের রোযা রাখতে পারে না।" কোন সাহাবীর ফতওয়া কোন রেওয়ায়েতের বিপরীত হতে পারে। তবে এরূপ ফতওয়া রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। কারণ রেওয়ায়েত অভিযোগমুক্ত আর ফতওয়া অভিযোগদুষ্ট। এসব ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ফতওয়া দানকারী ফতওয়া দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট হাদীসটি তাঁর মনে নাও থাকতে পারে। অথবা হাদীসটি তাঁর মনে থাকলেও ঘটনাচক্রে তিনি তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এটাও হতে পারে যে, উক্ত হাদীসের বিপরীত অন্য কোন হাদীস রয়েছে যে হাদীসটিকে

অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত ও উপরে বর্ণিত হাদীসটি একটি অপরটির পরিপন্থী নয়। কেননা তিনি তো রোযা সম্পর্কে এ ফতওয়া দিয়েছেন যে, কেউ কারো পক্ষ থেকে রমযানের রোযা রাখবে না। তবে মানতের রোযার ক্ষেত্রে একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন রোযা রাখতে পারবে। এ ফতওয়াটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত অপর হাদীসের বিপরীত নয়। বরং তিনি হাদীসটিকে মানতের রোযার উপর কিয়াস করেছেন। তাছাড়া এ হাদীসটি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর রেওয়ায়েতের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা হযরত ইবনে আববাস (রা)-এর অভিমতকে খণ্ডন করা শ্রেয়। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুই প্রকারের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। কোন রেওয়ায়েতের পরস্পর বিরোধিতার জন্য কোন হাদীসকে প্রত্যাহার করা সমীচীন নয়। হাদীসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ কোন রেওয়ায়েতকে পরিহার করাও যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে। এরূপ ধারণা নিছক অনুমান মাত্র ও অগ্রহণযোগ্য। আসলে, উক্ত হাদীসটি সহীহ ও সুপ্রমাণিত এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) ও এই হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কেউ এই হাদীসের সনদে কোন মতপার্থক্য আছে বলে উল্লেখ করেননি। ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন, এটা হযরত আবদুল বার (র) ও সমর্থন করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র)ও এ হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই ইমাম শাফিয়ী (র) এর অনুসারীরা এই হাদীসটিকে অনুসরণ করে থাকেন।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম বাইহাকী (র) বলেছেন , মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা বৈধ। তাঁর এই অভিমত হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র), হযরত মুজাহিদ (র), হযরত আতা (র) ও হযরত ইকরামা (র) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখও সমর্থন করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, জনৈকা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে আরয করেছিলেন যে, (সম্ভবত এই মহিলা উম্মে সাআদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ হয়ে থাকবেন) তিনি তাঁর মৃত মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবেন কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করেছিলেন, হ্যাঁ, রাখতে পারো।

অনেকের মতে উপরে বর্ণিত হাদীসটি পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াতের সাথে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা মোটেই ঠিক নয়। "লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সায়া" অর্থাৎ "মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে।" এই আয়াতের সাথে আলোচ্য হাদীসের কোন সংঘাত বা সংঘর্ষ নেই, হয়তো এখানে শব্দগত সাযুজ্য রক্ষা করা হয়নি। কোন সহীহ হাদীসই পবিত্র কুরআনের পরিপন্থী নয়। সুতরাং কুরআনের সাথে হাদীসের সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠে না। বরং হাদীস পবিত্র কুরআন বুঝার

পক্ষে সহায়ক। হাদীস সম্পর্কে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায় অনুসরণপ্রীতি মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের মধ্যে মতপার্থক্য লোকের ভুল বুঝাবুঝির হেতু ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে এটা অশোভনীয় যে, পবিত্র আয়াতের বাহ্যিক অর্থের প্রেক্ষাপটে সহীহ্ হাদীসকে রহিত করে দেয়া হয়। হাদীসের সাথে আয়াতের সমন্বয় সাধন করাই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। যিনি পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেন, তিনি হাদীস থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রেক্ষিতে হাদীসকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাই পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন উঠে না।

মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা সম্পর্কিত হাদীসটি নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসের সাথে কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি করে না। এটা একটি পরিতাপের বিষয় যে, নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয় বরং এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি অভিমত মাত্র। কোন একটি সহীহ্ হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বক্তব্য কতোই বা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? কোন অবস্থায়ই হাদীসের উপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া যায় না। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নিজেই রোযা রাখা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয়। মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করেছিলেন, আমার আম্মা ইনতেকাল করেছেন, তাঁর এক মাসের রোযা আদায় করা হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখো।" বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, কেউ যদি রোযা না রেখে ইনতেকাল করে তাহলে তার ওলীকে তার পক্ষ থেকে ঐ রোযা রাখতে হবে। অপরপক্ষে, রোযা রাখা সম্পর্কিত হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত : "কেউ রমযান মুবারকের রোযা বাকী রেখে ইনতেকাল করলে তার পক্ষ থেকে গরীব মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেবে।" এই হাদীসটির সাথে সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু গ্রন্থকারের মতে এই হাদীসটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয়।

ইমাম বাইহাকী (র) বলেছেন, উক্ত হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী নন। এটা হযরত ইবেন উমর (রা) -এর একটি উক্তি মাত্র। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নাফে (র) এবং তাঁর অনুসারীগণ এই অভিমত পোষণ করতেন। এছাড়া এ হাদীসটি যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। গ্রন্থকারের মতে এরূপ কিয়াসকে গুরুত্ব দেয়ার কোনই যুক্তি নেই, যার দ্বারা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ্ ও স্পষ্ট হাদীসকে রহিত করা হয়। এরূপ যুক্তি গ্রহণ করলে এটা সুন্নাতের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন কাফিরের মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ ঈমান আনতে পারে না। তবে একজন মুসলমান মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াব করা যায়। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই, এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। একজন মৃত মুসলমানের ঈসালে সওয়াবের সাথে একজন মৃত কাফিরের পক্ষ থেকে অন্য একজন কাফিরের ঈমান আনার উপর কিয়াস করা ভ্রান্ত কিয়াস ছাড়া আর কি হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র) ও সমালোচনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে উম্মে সাআদের মানত সম্পর্কে উল্লেখ আছে, সেটি হজ্জের মানত, নাকি উমরার মানত, নাকি সাদকাহর মানত ছিলো তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এর জবাব ইমাম শাফিয়ী (র)-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ইমাম বাইহাকী (র) প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে জুবায়ের (রা), হযরত মুজাহিতদ (র), হযরত আতা (র) এবং হযরত ইকরামা (র) আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন নেক আমলের কাযা আদায় করা বৈধ বলে গণ্য হবে। কোন কোন সাহাবীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করেছিলেন, (তিনি উম্মে সাআদ (রা) ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন) আমার মৃত মায়ের পক্ষ থেকে আমি তাঁর কাযা রোযা রাখতে পারি কিনা? ইরশাদ হয়েছিলো, "হ্যাঁ, তুমি তোমার মৃত মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারো।" এই হাদীসের সমর্থনে আরো একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর আম্মার ইনতেকালের আগে তাঁর এক মাসের রোযা কাযা ছিলো। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করেছিলেন, তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে তিনি এই কাযা রোযা রাখতে পারেন কিনা? ইরশাদ হলো, "হ্যাঁ।" (মুসলিম) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হযরত ইবনে শাইবা (রা) এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, একবার জনৈক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলো, তাঁর মা ইনতেকাল করেছেন, কিন্তু তাঁর এক মাসের রোযা কাযা রয়ে গেছে। এখন সে ঐ কাযা রোযা আদায় করতে পারবে কি না? ইরশাদ হলো, তার যদি কোন দেনা-পাওনা থাকতো, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে কিনা? লোকটি উত্তর দিলো, হ্যাঁ, করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আল্লাহর ফরয আদায় করা তোমার পক্ষে আরো বেশি সমীচীন।

এই রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ খায়সুমা (র) ও ইমাম নাসায়ী (র) তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে হযরত উম্মে সাআদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এর

সনদ ও মতন উভয়টিই পৃথক। হাদীসে বর্ণিত মানত আদায় করা কোন শর্ত ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হযরত আ'মাশ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রোযার উল্লেখ আছে। এছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট মানত উল্লেখ না করায় এ বিষয়ে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। অন্যথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মানত রোযার না নামাযের ছিলো তা জিজ্ঞেস করে জবাব দিতেন।

মৃতদের পক্ষ থেকে জীবিতদের রোযা রাখা সম্পর্কে আরো অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, মানতের রোযা রাখতে হবে আর রমযানের কাযা রোযার কাফফারা আদায় করতে হবে। হযরত আবূ সওর (র), হযরত দাউদ ইবনে আলী (র) ও তাঁর অনুসারীরা বলেছেন, "মানতের ও কাযার রোযা রাখতে হবে।" এই প্রসঙ্গে ইমাম আওযায়ী (র) ও হযরত সওরী (র) বলেছেন, "কাযা রোযার কাফফারা দিতে হবে অন্যথায় রোযা রাখতে হবে।" হযরত আবূ উবায়েদ কাসেম ইবনে সালাম (র) বলেছেন, "মানতের রোযা রাখতে হবে আর ফরয রোযার জন্য গরীব মিসকীনকে খানা খাইয়ে দিতে হবে।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, "যদি কোন মৃত ব্যক্তির রমযান মাসের রোযা বাকী থাকে আর তার পক্ষ থেকে একদিনেরই ত্রিশজন লোক রোযা রাখে, তাহলে তার কাযা রোযা আদায় হয়ে যাবে।" উক্ত বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যের দরুন কারো মনে যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য বিজ্ঞ আলিমদের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কেউ হজ্জ আদায় করে তাহলে সেই মৃত ব্যক্তি হজ্জের কোন সওয়াব পাবে না। কেবল হজ্জের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হবে সেটার সওয়াব পাবে– এরূপ অভিমতের কোন ভিত্তি নেই। কেননা এটা হাদীসের পরিপন্থী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো।" এরূপ হাদীসে শুধু বলা হয়েছে, মৃতদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা যায়। ঠিক এমনিভাবে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তুমি আগে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করো, তারপর শিবারমাহ-এর হজ্জ আদায় করবে। এমনিভাবে যখন জনৈকা মহিলা তার সঙ্গে যে ছেলে ছিলো তার পক্ষ থেকেও হজ্জ আদায় করতে হবে কিনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় ইরশাদ হয়েছিলো, হ্যাঁ। সে সময়ে হজ্জ করতে যে খরচ হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। বরং তিনি বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা উচিত। এক্ষেত্রে ঐ ছেলেটি হজ্জের কোন কিছুই নিজে করেনি, সবই তার মাতাপিতাই করেছিলেন। এছাড়া কখনো মৃতদের পক্ষ থেকে হজ্জ পালনকারী হজ্জে প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়া আর কোন খরচ করেন না। কাজেই উপরোক্ত অভিমতটি হাদীস ও কিয়াসের দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নিয়তের সঙ্গে মুখে উচ্চারণ করাও কি জরুরী? ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও বলেননি, হে আল্লাহ! এই সওয়াব অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো, শুধু মাত্র আন্তরিক ইচ্ছা বা নিয়তই যথেষ্ট। তাই নিয়তের সাথে যদি কেউ মুখেও তা উচ্চারণ করে, তাহলে সেটা হবে আরো ভাল। আর কেউ যদি মুখে কোন কিছু উচ্চারণ না করে তবুও সে সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের নিয়তের খবর সম্যক জ্ঞাত। সম্ভবত এজন্যই শর্ত আরোপকারীরা কোন কাজের প্রথমেই নিয়তের শর্ত আরোপ করেছেন। হ্যাঁ, কেউ যদি কোন আমল নিজের জন্য করে থাকে, তারপর এর সওয়াব অন্য কারো জন্য নিয়ত করে নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু পরের নিয়তই যথেষ্ট নয়। কোন ব্যক্তি যদি কারোর জন্য কানো কিছু হেবা করে তার কোন দাসকে মুক্ত করে অথবা কোন কিছু সাদকাহ্ করে এর পরে নিয়ত করে, তাহলে শুধু নিয়তের দ্বারা সওয়াব অর্জিত হবে না। তবে কেউ যদি এ নিয়তে কোন বাড়ি তৈরি করে যে, এটা মসজিদ বা মাদরাসা অথবা মুসাফিরখানা হবে, সেক্ষেত্রে মুখে কোন কিছু উচ্চারণ না করলেও নিয়তের সাথে সাথেই ঐ বাড়িটি ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। মুখে কোন কিছু উচ্চারণ না করলেও যাকাতের নিয়তে কোন ফকীরকে কোন কিছু দান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেউ যদি কারো পক্ষ থেকে সে ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত হোক, তার কোন ঋণ শোধ করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি ঋণ মুক্ত হয়ে যাবে, সেটা মুখে উচ্চারণ করা হোক বা না হোক।

ঈসালে সওয়াব আল্লাহর দরবারে কবুল হবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা আদায় করতে হবে। এখানে এমন কোন শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন নেই এবং মুখেও কোন কিছু উচ্চারণ করতে হবে না। কোন শর্ত আরোপ করা হোক বা না হোক আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তিকে তার সওয়াব পৌঁছিয়ে দেবেন। সুদৃঢ় নিয়তের উপর ভিত্তি করে ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে প্রথমে আমলকারীকে তার আমলের সওয়াব অর্জন করতে হবে, পরে সেই সওয়াব সে অন্যকে দান করতে পারে। আসলে নিয়ত ছাড়া তা হয় না। কোন আমলকারী যদি আমল করার সময় নিয়ত করে যে, এই নেক আমল অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় করছি, তাহলে সেই সওয়াব ঐ ব্যক্তির নিকট সরাসরি পৌঁছে যাবে। কেউ যদি নিজের দাসকে কারো পক্ষ থেকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কেউ বলবে না যে, ঐ দাসের মালিক এই সওয়াব পাবে। অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য নিয়ত করে ঐ দাসকে মুক্ত করা হয়েছে, সে ব্যক্তি এর সওয়াব পাবে। ঈসালে সওয়াবের বিষয়টি তদ্রূপ নিয়তের উপর নির্ভর করে।

মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিরূপ হাদিয়া উত্তম? ঐ হাদিয়াই উত্তম যেটা তাদের অধিক উপকারে আসে ও স্থায়ী হয়, যেমন কোন দাসকে মুক্ত করা বা সাদকাহ আদায় করা। এসব নেক কাজ নফল রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উত্তম সাদকাহ হলো পানি পান করানো

যেখানে পানির প্রচণ্ড অভাব, যেখানে নদ-নদী, হাউজ ও ফোয়ারা বিদ্যমান, সেখানে পানির চেয়ে খানা খাওয়ানো উত্তম। এমনিভাবে দুআ, ইসতিগফার যদি আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে করা হয়, তাহলে সেটা হবে যে কোন সাদকাহ্ আদায় করার চেয়ে উত্তম। জানাযার নামায আদায় করা এবং কবরের নিকট দাঁড়িয়ে দু'আ করা, সাদকাহ্ আদায় করার চেয়ে উত্তম। কোন দাসকে মুক্ত করা, সাদকাহ্ আদায় করা, দুআ-ইসতিগফার করা, হজ্জ আদায় করা সবচেয়ে উত্তম ঈসালে সওয়াব। কোন পারিশ্রমিক ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত করে তার সওয়াব পৌছানোও জায়েয। রোযা ও হজ্জের সওয়াবের ন্যায় কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াবও মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা আগেকার মুমিন মুসলমানদের আমল ছিলো কিনা? বিরোধী মতে লোকেরা বলেন, কোন সালাফ বা প্রাথমিক যুগের লোকদের থেকে এর সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। অথচ তাঁরা প্রত্যেক নেক আমল করার জন্য সচেষ্ট ও সক্রিয় ছিলেন। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু বলেননি যদিও তিনি দুআ-ইসতিগফার, সাদকাহ্, হজ্জ ও রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন। কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব যদি মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছতো, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা বলতেন আর সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই তা আমল করতেন। এসব প্রশ্নের জবাব হলো, যদি কোন আমলের সওয়াব মেনে নেয়া হয়, তাহলে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট না পৌছানোর কারণ কি? যখন কোন নেক আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে, তাহলে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতও একটি বিশেষ নেক আমল। তবে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমলের বিরোধিতা করার হেতু কি? যদি কোন নেক আমলের সওয়াবকে কেউ অস্বীকার করে, তাহলে সেটা হবে সহীহ সুস্পষ্ট হাদীসের বিরোধিতা করার শামিল এবং ইজমা ও কিয়াসের পরিপন্থী।

ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের অভিমত হলো, এই সম্পর্কে আগেকার আলিমদের কোন অভিমত লিপিবদ্ধ নেই। এর কারণ হলো, ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। এছাড়া তাঁরা এখনকার মতো কবরের নিকট গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন না কেন? তাঁরা কুরআন শরীফ শরীফ তিলাওয়াত সম্পর্কে অথবা সাদকাহ্ আদায় করা ও রোযা রাখা সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর রাখতেন না কেন? এছাড়া যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আগেকার লোকদের মধ্যে কেউ কি একথা বলেছেন, "হে আল্লাহ্, আমার এই রোযার সওয়াব অমুক ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করো," তাহলে এর জবাব কি? আগেকার

লোকেরা কি তাঁদের নেক আমলকে গোপন করতেন? যদি তা না হয়, তাহলে তাঁরা ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সাহাবাগণকে যদিও সরাসরি কোন কিছু বলেননি, তবে যিনি যেমন প্রশ্ন করতেন তাঁকে তিনি সেভাবে জবাব দিতেন। আর তাঁরা অন্য যে কোন নেক আমল করতেন, সে বিষয়ে তিনি কোন বাধা দিতেন না। যেমন রোযা রাখা– যা শুধু নিয়ত করা, পানাহার ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা, যিকর-আযকার করা, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত যা একটি নেক আমল ছাড়া আর কিছু নয় এর মধ্যে পার্থক্য কী? রোযা রাখার সওয়াব যখন মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে, তাহলে আল্লাহর যিকর ও কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব তাঁদের কাছে যে পৌঁছে সেটা অধিক সমীচীন, সহজ ও বোধগম্য। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আগেকার দিনের আলিমগণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করেননি, এরূপ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা তাঁদের ঐরূপ ধারণার পক্ষে তাঁরা কোন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে এ বিষয়ে তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এছাড়া যে কোন নেক আমলের নিয়ত বাক্যের দ্বারা যে প্রকাশ করতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই।

আসলে, কোন নেক কাজের সওয়াব হলো আমলকারীর আমলের প্রতিফল বা প্রতিদান। কোন আমলকারী যদি তাঁর কোন সওয়াব অন্য কোন মুসলমানকে দান করে দেন, তাহলে আল্লাহ পাক সেই আমলের সওয়াব ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেন। তবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তির নিকট না পৌঁছার কারণ কি? ঈসালে সওয়াবের নিয়ম সব সময়ই চালু ছিলো, যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন। তবে কোন মুহাক্কিক আলিম ঈসালে সওয়াবকে কোন খারাপ কাজ বলে আখ্যায়িত করেননি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে আমাদের করণীয় কি? আগেকার দিনের ফিকাহবিদদের কেউ কেউ এটাকে মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন। আর কেউ কেউ এটাকে বিদ'আত বলেছেন। কেননা সাহাবায়ে কেরাম এরূপ কোন আমল করেননি। যাঁরা এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন, তাঁদের মতে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তীকালের উম্মতদের আমলের সওয়াব তিনি এমনি পেয়ে যান কিন্তু আমলকারীদের সওয়াব হ্রাস পায় না। যেহেতু তিনি তাঁর সকল উম্মতকে সকল সৎকাজের পথ প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন; এজন্য তাঁর উম্মতের যাবতীয় নেক আমলের সওয়াব তিনি এমনি পেয়ে থাকেন, কেউ তাঁর জন্য কোন হাদিয়া পেশ করুক বা না করুক।

সপ্তদশ অধ্যায়

রূহ নশ্বর, না অবিনশ্বর

রূহকে যদি নশ্বর বলে মেনে নেয়া যায় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলীর অন্যতম একটি নির্দেশ, তাহলে সে নির্দেশ কিভাবে ধ্বংস হয় বা সৃষ্ট হয়? আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আদম (আ)-এর মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তাহলে রূহ যে চিরন্তন সেটা প্রমাণ হয় কিনা? আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে নিজের হাতে তৈরি করেছেন, আর তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এখানে আল্লাহর হাত ও রূহ বলতে আমরা কি বুঝবো?

উপরোক্ত বিষয়গুলো খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এ সম্পর্কে যুগে যুগে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। অনেক সম্প্রদায় এই বিষয়টি নিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের অনুসারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। "রূহ ধ্বংসশীল ও আল্লাহর সৃষ্ট" এ কথার উপর আম্বিয়ায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, আলম বা বিশ্ব ভূ-মণ্ডল ধ্বংসশীল, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিশ্চিত, যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া সবকিছুই সৃষ্ট। এমনিভাবে রূহের ধ্বংস হওয়া ধ্রুব সত্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে রূহ যে ধ্বংসশীল ও মাখলূক, এ বিষয়ে ঐকমত্য ছিলো। তখন কেউ এর বিরোধিতা করেননি। তাবিয়ীনের যামানা যখন শেষ হলো, তখন এমনি এক সম্প্রদায় দেখা দিলো যাদের কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো খুবই কম ও সীমাবদ্ধ। তারা দাবী করলো রূহ চিরন্তন, তা সৃষ্ট নয়, আর প্রমাণ হিসেবে তারা বললো, রূহ আল্লাহর নির্দেশ বৈ কিছু নয় আর আল্লাহর নির্দেশ সৃষ্টি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম, তাঁর কিতাব, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন ও হাতের ন্যায় রূহকেও নিজের বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ যেমনি চিরন্তন ও সৃষ্ট নন, রূহও ঠিক তেমনি চিরন্তন। তবে কেউ কেউ নিরপেক্ষতার খাতিরে বলেছেন, "আমরা রূহকে সৃষ্ট বা চিরন্তন কোনটাই বলি না।"

একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মান্দাহ (র)-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো, আল্লাহ তা'আলা কি রূহকে মাখলুকের প্রাণ ও দেহের ব্যবস্থাপক হিসেবে তৈরি করেছেন? প্রশ্নকারীর অভিমত হলো, কেউ কেউ রূহকে সৃষ্ট নয় বলে দাবী করেন। তাঁরা আরো দাবী করেন, রূহ আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশবিশেষ। নিম্নে আগেকার দিনের উলামায়ে কেরামের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, আর পরে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পক্ষের ও বিপক্ষের অভিমত তুলে ধরা হবে।

রূহ কি এবং নাফসের সাথে এর কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে রূহ হলো সৃষ্ট। আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীস এই মত সমর্থন করেন। তাঁদের প্রমাণ হলো, **এক.** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রূহ হলো একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী, যাদের সাথে একে অন্যের পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মে। আর যাদের সাথে কোন পরিচয় হয় না, তারা অপরিচিত থেকে যায়। এর দ্বারা জানা যায় যে, রূহ সৃষ্ট। কেননা কোন সংঘবদ্ধ বাহিনী সৃষ্টই হয়ে থাকে। **দুই.** অন্য এক শ্রেণীর লোকের অভিমত এই যে, রূহ হলো আল্লাহর নির্দেশের আওতাধীন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে এর হাকীকত ও মা'রেফাত গোপন রেখেছেন। এই শ্রেণীর লোকের প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী– "কুলিররূহু মিন আমরে রাব্বী।" অর্থাৎ আপনি বলে দিন যে, রূহ হলো, আমার রবের একটি হুকুম। **তিন.** আরেক শ্রেণীর লোকেরা বলেন, রূহ হলো, আল্লাহ চিরঞ্জীব নূর থেকে সৃষ্ট যা অমর। আর তাঁদের প্রমাণ হলো এই হাদীস– "আল্লাহ তা'আলা অন্ধকারের মধ্যে তার মাখলূক পয়দা করেছেন, তারপর এর উপর নিজের নূর অর্পণ করেছেন।" রূহ মৃত্যুবরণ করে কি করে না, বরযখ ও আখিরাতে দেহের সাথে রূহকে আযাব দেয়া হয় কি হয় না, রূহই নাফস না কি অন্য কোন কিছু– এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। **চার.** হযরত মুহাম্মদ ইবনে নাসর মরূযী (র) বলেন, বেদীন ও রাফিযীগণ হযরত আদম (আ)-এর রূহ সম্পর্কে ঐ তাবীল বা বিকল্প অর্থ গ্রহণ করেছে, যা খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ) এর রূহ সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন। তা হলো হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ আল্লাহর পবিত্র সত্তা থেকে পৃথক হয়ে হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে এসে গেছে। এরূপ ধারণার ভিত্তিতে খ্রিস্টানদের এক সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মারইয়াম (আ)-এর পূজা আরম্ভ করে। কেননা তাদের ধারণা হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলারই রূহ যা হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলো। এজন্য খ্রিস্টানদের মতে

রূহ সৃষ্ট নয়। **পাঁচ.** বেদীন ও রাফিযীদের এক সম্প্রদায়ের ধারণা যে, হযরত আদম (আ)-এর রূহও এই শ্রেণীর যা সৃষ্ট নয়। তাঁরা এই আয়াতে পাকের দ্বারা তাঁদের প্রমাণ পেশ করে থাকেন– ওয়া নাফখতু ফীহে মির্রূহি। অর্থাৎ "আমি তাঁর মধ্যে নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছি।" সুম্মা সাওওয়াহু ওয়া নুফিখা ফীহে মিররূহি। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঠিক মতো পয়দা করে তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।" বিধর্মী ও রাফিযীরা এ আয়াতের ভুল অর্থ করে থাকে, আর বলে থাকে হযরত আদম (আ)-এর রূহও সৃষ্ট নয়। আর যারা রূহকে নূর বলে, তারা এই অর্থ গ্রহণ করে যে, আল্লাহর নূর সৃষ্ট নয়। তারা আরো বলে থাকে, এই রূহ হযরত আদম (আ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর বংশধরদের মধ্যে এসেছে। তারপর হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসাইন (রা)-এর মধ্যে এসেছে এবং পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে এসেছে। কাজেই ইমামগণ কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া এই নূর পেয়ে আসছেন। এ বিষয়ে তাঁদেরকে কোন কিছুর শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এটাই রাফিযীদের বিশ্বাস। রূহ যে সৃষ্ট এ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সে রূহ নবী রাসূলগণের হোক বা অন্য কোন সাধারণ লোকেরই হোক। আল্লাহ তা'আলা সকল রূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "আল্লাহ তা'আলা আকাশ-যমীনের সমস্ত মাখলূক তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।" (সূরা জাসিয়া ঃ আয়াত-১৩)

ছয়. এই প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ তিনি বলেন, সমস্ত আহলে সুন্নাত, আম্বিয়ায়ে কেরাম, অতীতের সকল উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য এই যে, রূহ সৃষ্ট। অনেক ইমাম এই অভিমতের উপর উলামায়ে কেরামের ইজমা সংকলন করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ইবনে নাসর মরূযী (র) যিনি ছিলেন, তাঁর যুগের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ আলিম। এমনিভাবে হযরত আবূ মুহাম্মদ কুতায়বা (র) রূহ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, 'নাসামা' শব্দের অর্থ রূহ এবং এটা হলো সৃষ্ট। সকল বিজ্ঞ আলিমের এই বিষয় ইজমা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বীজ অঙ্কুরণকারী ও রূহ সৃষ্টিকারী। হযরত আবূ ইসহাক ইবনে সাকিলা (র) এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সত্য অনুসারীদের মতে রূহ যে সৃষ্ট এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া শ্রেষ্ঠ স্থানীয় উলামা ও মাশায়েখগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। যাঁরা মনে করেন যে, রূহ সৃষ্ট নয়, তাঁদের অভিমতকে তাঁরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হযরত আবূ আবদুল্লাহ ইবনে মান্দাহ (র) এই বিষয়ের সমর্থনে একখানা বৃহৎ গ্রন্থও রচনা

করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মরূযী (র) প্রমুখ এবং শাইখ আবূ সায়ীদ খার্রায (র), আবূ ইয়াকূব নহরজুরী (র) এবং কাযী আবুল উলা (র) উক্ত গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেক বড় বড় ইমাম এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সমর্থন করেছেন। যাঁরা হযরত ঈসা (আ) এর রূহ সৃষ্ট নয় বলে থাকেন, তাঁদেরকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। ইমাম আহমদ (র) রূহ সম্পর্কে বেদীন ও জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করেছেন।

জনৈক জাহমী দাবী করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত আছে, যেখানে উল্লেখ আছে– কুরআন সৃষ্ট। আর সে আয়াতটি হলো– ইন্নামাল মাসীহু ঈসা ইবনু মারইয়ামা রাসূলুল্লাহি ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারইয়ামা ওয়া রূহুম মিনহু। অর্থাৎ "ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা যাঁকে আল্লাহ মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর রূহ যেটা তাঁরই কাছ থেকে আগত।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১৭১)

তাই হযরত ঈসা (আ) হলেন মাখলূক বা সৃষ্ট। উত্তরে জাহমীকে বলা হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ তুমি কুরআন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য এমন সব ভাষা প্রয়োগ করা হয় যা কুরআন সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, তাঁকে মৌলূদ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, চালাক চতুর বালক, বুদ্ধিমান নওজোয়ান ও পানাহারকারী বলা হয়।

হযরত ঈসা (আ), হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। তাই হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আমরা যে উক্তি করতে পারি, কুরআন সম্পর্কে সেরূপ উক্তি করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ বা উচিত নয়। একথাটি কি কেউ দাবী করতে পারে যে, আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলেছেন তাই কুরআন সম্পর্কেও বলেছেন। এ আয়াতের অর্থ হলো– 'কালিমা' মানে 'কুন' বা হয়ে যাও। 'কুন' যে আল্লাহর তা'আলার বাণী তাও সৃষ্ট নয়। হযরত ঈসা (আ) 'কালিমায়ে কুন' দ্বারা পয়দা হয়েছেন। আসলে, তিনি 'কালিমায়ে কুন' নন। হযরত ঈসা (আ) এ কালিমার দ্বারা পয়দা হয়েছেন, কাজেই তিনি মাখলূক।

ঈসায়ী ও জাহমীগণ হযরত ঈসা (আ) এর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। জাহমীরা বলে যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালিমা। জানা গেলো যে, কালিমা হলো মাখলূক। তাই হযরত ঈসা (আ) হলেন মাখলূক। ঈসায়ীরা বলে যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালিমা। আর তিনি আল্লাহর সত্তার একটি অংশ। যেমন বলা হয়, এই কাপড়খানা এই

থানের। আমরা বলবো, হযরত ঈসা (আ) কালিমার দ্বারা পয়দা হয়েছেন। তবে তিনি মূল কালিমা নন। কেননা কালিমা তো আল্লাহর বাণী 'কুন'। আর 'রূহুম মিনহু' এর অর্থ হলো– তাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রূহ আগমন করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আকাশ যমীনের সমস্ত মাখলূক তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে।" (সূরা জাসিয়া ঃ আয়াত-১৩)

'রূহুল্লাহ' শব্দের অর্থ হলো– আল্লাহ তা'আলা নিজ কালিমা বা কুন শব্দের দ্বারা যেই রূহ পয়দা করেছেন, সেই রূহ। যেমন, আবদুল্লাহ– আল্লাহর বান্দা, সামাউল্লাহ- আল্লাহর আকাশ, আরদুল্লাহ– আল্লাহর যমীন প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। ইমাম আহমদ (র) এ কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ মাখলূক বা সৃষ্ট। তাহলে অন্যান্য রূহও যে সৃষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে ঐ রূহকে সম্বোধন করেছেন, যে রূহকে হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো। কাজেই ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এর দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, রূহ হবে চিরন্তন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ফাআরসালনা ইলাইহা রূহানা ফাতামাসসালা লাহা বাশারান সাবিইয়া। কালাত ইন্নী আউযু বিররাহমানি মিনকা ইন কুনতা তাকিয়া। কালা ইন্নামা আনা রাসূলু রাব্বিকে লিআহাবা লাকে গুলামান যাকিইয়া। অর্থাৎ "তারপর আমি মারইয়াম (আ)-এর প্রতি স্বীয় রূহ প্রেরণ করেছি। আর তাঁর সামনে সেই রূহ ইনসানী আকৃতিতে প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন, আমি তোমার থেকে রাহমানের আশ্রয় চাই, যদি তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে। সে বললো, আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র প্রদান করবো।" (সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত-১৭-১৯)

এই রূহ ছিল আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত, আর তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে এরূপ বস্তুসমূহের রকমারি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এখানে আরো বর্ণনা করা হবে কখন আল্লাহর সম্বোধন করা বস্তু তাঁর চিরন্তন গুণে গুণান্বিত হয়, আর কখন তা মাখলূক হিসেবে গণ্য হয় আর এর ফরমূলাই বা কী?

এক. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহু খালিকু কুল্লে শাইয়িন। অর্থাৎ "আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৬২)

এখানে স্রষ্টা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ যে স্রষ্টা, এর মধ্যে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর সাথে কোন

কিছু মিশতে বা প্রবেশ করতে পারে না, কেননা আল্লাহ তা'আলা হলেন মা'বূদ এবং তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞান, কুদরত, স্থিতিশীলতা, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন এবং অন্যান্য গুণাবলী তাঁর পবিত্র নামের মধ্যে বিদ্যমান আছে, এই সব গুণ তাঁর সৃষ্টির সাথে সম্যক যুক্ত নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তা ও গুণসহ স্রষ্টা। আর অন্য সিফাত বা গুণাবলীর সাথে রূহের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি আল্লাহর কর্মকুশলতার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। ফেরেশতা, জিন ও মানুষের ন্যায় রূহও একটি সৃষ্টি।

দুই. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ওয়াকাদ খালাকতুকা মিন কাবলু ওয়ালামতাকু শাইয়া, অর্থাৎ "(হে যাকারিয়া) আমি তো এর পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমিই কিছুই ছিলে না।" (সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত-৯)

উল্লেখ্য যে, এখানে এই সম্বোধনটি যাকারিয়া (আ)-এর রূহ ও দেহ উভয়কেই করা হয়েছে। শুধু তাঁর দেহকে সম্বোধন করা হয়নি। যেহেতু দেহের মধ্যে কোন বোধশক্তি, জ্ঞান, অনুভূতির যোগ্যতা নেই। এই যোগ্যতা আছে কেবল রূহের। তাই জানা গেলো– রূহ মাখলূক বা সৃষ্ট। **তিন.** আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাহু খালাকাকুম ওয়াতা তা'মালূন। অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসমূহকে।" (সূরা আসসাফফাত ঃ আয়াত-৯৬)

চার. আল্লাহ তা'আলা পাক কালামে ইরশাদ করেছেন, ওয়া লাকাদ খালাকনাকুম সুম্মা সাওয়ারনাকুম সুম্মা কুলনা লিলমালায়িকাতিস জুদূ লিআদামা। অর্থাৎ "আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদাহ করো।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১১)

এখানেও রূহ এবং দেহ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে কারো কারো মতে এখানে কেবল রূহকে বুঝানো হয়েছে। উভয় অর্থেই রূহ যে সৃষ্ট সেটাই প্রমাণ করে।

পাঁচ. কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও অন্য সব সৃষ্টির রব। কাজেই তাঁর রাবুবিয়াত আমাদের দেহ ও রূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেহের ন্যায় রূহও আল্লাহর অধীন। যতো কিছু আল্লাহর অধীন সবই তার সৃষ্ট। সুতরাং রূহও আল্লাহর সৃষ্ট।

ছয়. কুরআনুল হাকীমের প্রথম সূরা– সূরায়ে ফাতিহা থেকে একাধিকভাবে জানা যায় যে, রূহ আল্লাহর মাখলূক বা সৃষ্ট। (ক) এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেছেন, তিনি রাব্বুল আলামীন। যেহেতু আলম বা জগতের মধ্যে রূহ বিদ্যমান আছে, সেহেতু রূহেরও রব আছেন। (খ) এই সূরায় আরো উল্লেখ আছে, আমরা তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। সুতরাং রূহ সৃষ্ট। (গ) রূহ আপন স্রষ্টার নিকট হিদায়াতের মুখাপেক্ষী এবং সরল পথের প্রার্থী। (ঘ) রূহের প্রতি আল্লাহর দয়া ও পুরস্কার বর্ষিত হয়, পক্ষান্তরে, কোন কোন রূহের উপর শাস্তি ও অভিশাপ নেমে আসে। এই অবস্থা কেবল মাখলূক বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যা চিরন্তন ও সৃষ্ট নয়, তাদের ক্ষেত্রে এটা হয় না। **সাত.** এসব প্রমাণ দ্বারা এটাই জানা যায় যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত রূহকে ছাড়া শুধু দেহের দ্বারা হতে পারে না। আসলে, ইবাদত-বন্দেগী রূহ ও দেহ উভয়ের যেমন দেহের যাবতীয় বিধি-বিধান রূহের অধীন। রূহ দেহের মধ্যে গতি সঞ্চার করে ও কাজ করিয়ে নেয়। **আট.** আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, হাল আতা 'আলাল ইনসানে হীনুম মিনাদ্দাহারে লাম ইয়াকুন শাইয়াম মাযকূরা। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষের উপর এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন কোথাও তার কোন নাম নিশানাও ছিলো না।" (সূরা দাহর ঃ আয়াত-১-৩)

রূহ যদি চিরন্তন হতো তাহলে তার নাম নিশানা সবসময় বিদ্যমান থাকতো। আসলে মানব জীবনের যাত্রা শুরু হয় রূহের দ্বারা, দেহের দ্বারা নয়। এ প্রসঙ্গে আরবি কবিতার একটি পঙ্ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ ইয়া খাদিমাল জিসমে কাম তাশাক্কা বিখিদমাহিহি, ফা আনতা বিরূহি লা বিল জিসমি ইনসানু। অর্থাৎ "হে দেহের সেবক, দেহের সেবা করে আর কত কষ্ট পাবে, তুমি তো দেহের দ্বারা নও, রূহের দ্বারাই ইনসান।" **নয়.** আল্লাহ তা'আলা সবসময় বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। প্রথমে তিনি ছাড়া অন্য আর কোন কিছু ছিলো না। একদল ইয়ামানবাসী একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দীন ইসলামের জ্ঞান লাভ করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলুন, দুনিয়ার সূচনা কিভাবে হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, তিনি ব্যতীত অন্য আর কেউ বা কিছু ছিলো না। তাঁর 'আরশ পানির উপর ছিলো। তারপর তিনি সকল বস্তুর নাম লিখে নিলেন। (বুখারী) এর দ্বারা জানা গেলো, আল্লাহ চিরন্তন, রূহ বা নাফস চিরন্তন নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা অনাদি ও অনন্ত। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। **দশ.** আল্লাহর ফেরেশতারাও মাখলূক বা সৃষ্ট। এছাড়া ফেরেশতারা এমনি ধরনের রূহ যারা দেহ থেকে মুক্ত। এদেরকে মানুষ ও মানুষের রূহের অনেক আগেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তারপর ফেরেশতারা যখন মানুষের দেহে রূহ ফুঁকে দেন তখন সেটা

মাখলূক বা সৃষ্ট হয়ে যায়। যে রূহ ফেরেশতার মাধ্যমে মানবদেহে ফুঁকে দেয়া হয়, তা কি করে চিরন্তন হয়? যারা ভ্রান্তিতে নিপতিত তাদের ধারণা এই যে, ফেরেশতাদেরকে চিরন্তন ও অনাদি রূহসহ পাঠানো হয়। আর তাঁরা ঐ রূহকে মানবদেহে প্রবিষ্ট করে দেন। যেমন পোশাক সহকারে একজন মানুষকে অন্য কোন ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়ে থাকে যেন তিনি, তার কাছে গিয়ে এই পোশাকটি তাকে পরিয়ে দেন। কিন্তু এটা চরম পথভ্রষ্টতা ও প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়। আসলে, ফেরেশতারা রূহকে মানবদেহে ফুঁকে দেন এবং এভাবেই রূহের সৃষ্টি হয়। আর দেহ জরায়ুতে শুক্রের দ্বারা তৈরি হয়, তাই রূহের উপাদান হলো আসমানী, আর দেহের উপাদান হলো যমীনি। কোন কোন রূহে আসমানী উপাদান প্রাধান্য লাভ করে। আর সে রূহ উর্ধ্বলোকের পবিত্র ফেরেশতাদের সাথে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। অপরপক্ষে, কোন কোন রূহে যমীনি উপাদান প্রাধান্য লাভ করে। আর সেই রূহ নিম্নস্তরের ও নিম্নমানের রূহদের সাথে থাকার যোগ্য হয়। সুতরাং ফেরেশতা হলো রূহের সৃষ্টির বাহন আর মাটি হলো দেহের উপাদান। **এগারো.** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রূহ হলো একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী।" তাই এরা সৃষ্ট। হযরত আবূ হুরাইরা (রা), হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা), হযরত সালমান ফারেসী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) প্রমুখ থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত। **বার.** মৃত্যুজনিত কারণে অথবা আটকে রাখা বা ছেড়ে দেয়ার কারণে রূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি হলো মাখলূকের একটি অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর মাধ্যমে রূহকে তুলে নেন। আর যেসব রূহ জীবিত থাকে, তাদেরকেও নিদ্রার সময়ে উঠিয়ে নেন। তারপর ঐসব রূহকে আটক করে নেন যেগুলোর মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বাকী সব রূহকে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেন।" (সূরা আয যুমার ঃ আয়াত-৪২)

এই আয়াতে 'আনফুসু' শব্দের দ্বারা রূহকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ আমরা একবার এক রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে বিরতির জন্য তাঁর খিদমতে আবেদন জানানো হলো। তিনি বললেন, তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমাদেরকে নামাযের জন্য কে জাগাবে? হযরত বিলাল (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাদেরকে জাগাবো। সুতরাং সেখানে অবস্থান করার ব্যবস্থা হলো। আর সবাই

ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত বিলাল (রা) নিজ সওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর সূর্যের কিছু অংশ দেখা দেয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভাঙলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিহে বিলাল, তুমি তো বেশ আমাদেরকে জাগিয়েছো। হযরত বেলাল (রা) আরয করলেন, আল্লাহর কসম, এরূপ ঘুম আমার আর কখনো হয়নি যেমন আজ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যতোক্ষণ ইচ্ছা তোমাদের রূহকে আটক রেখে দেন, আর যখন ইচ্ছা ছেড়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম) সুতরাং আটক রূহ বলতে ঐ রূহকে বুঝায় যে রূহকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু ও নিদ্রার সময় তুলে নেন। তারপর মৃত্যুর সময় তুলে নেয়া রূহকে আর ফিরিয়ে দেয়া হয় না। মৃত্যুর ফেরেশতা মৃত্যুপথ যাত্রী ব্যক্তির শিয়রে এসে বসেন, আর তার দেহ থেকে রূহ কবয করেন আর জান্নাতে অথবা জাহান্নামের কাফন তাকে পরিয়ে দেন। তারপর আসমানে নিয়ে যান। পথিমধ্যে যেসব ফেরেশতাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়, তাঁরা মৃত ব্যক্তি সৎ হলে তাঁর প্রশংসা করেন আর অসৎ হলে তাঁর নিন্দা করেন। এভাবে ঐ মৃত ব্যক্তির রূহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে হাযির করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে ফয়সালা করে দেন। তারপর রূহকে যমীনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর মৃত ব্যক্তির রূহকে তার কাফনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কবরের মধ্যে মুনকার-নাকীর মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন এবং অবশেষে মৃত ব্যক্তিকে আযাব বা আরাম দেয়া হয়। নেকাকরদের রূহকে সবুজ রংয়ের পাখির মধ্যে রাখা হয় আর তারা বেহেশতী নি'আমত ভোগ করেন। পক্ষান্তরে, বদকারদের রূহ সকাল সন্ধ্যা আগুনে রাখা হয়। এটাই হলো সত্যকে স্বীকার করার ও মেনে নেয়ার শুভ ফল, আর অস্বীকার ও অবাধ্যতার পরিণতি।

মানুষের এই যে রূহ এটাই হলো ভালো কাজ ও মন্দ কাজের চালিকা শক্তি। এই রূহই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে এবং ক্ষেত্র বিশেষ আল্লাহর হুকুম আহকামের বিরোধিতাও করে। মানুষের রূহই সকল সৎকাজ বা অসৎকাজের জন্য দায়ী, পুরস্কার বা তিরস্কার রূহই লাভ করে। রূহের আবার তিনটি শ্রেণী রয়েছে ঃ **এক–** আম্মারাহ অর্থাৎ অসৎকাজের নির্দেশ দানকারী রূহ। **দুই–** মুতমায়িন্নাহ অর্থাৎ প্রশান্ত আত্মা। যে আত্মা আল্লাহর যিকর ও বন্দেগীর মাধ্যমে অপার পরিতৃপ্তি লাভ করে। **তিন–** লাউয়ামাহ অর্থাৎ রূহের দ্বিমুখী অবস্থা। ভালো কাজ না করলে একদিকে রূহ যেমন তিরস্কার করে অন্যদিকে তেমনি খারাপ কাজ করলে ক্ষুব্ধ হয় ও ভর্ৎসনা করে। রূহের এই যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রূপ এটাই

প্রমাণ করে যে, রূহ সৃষ্ট, চিরন্তন নয়। আর রূহকেই আরাম বা আযাব দেয়া হয়। রূহের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই রূহকে আটক করা হয় বা ছেড়ে দেয়া হয়। রূহই সুখ ভোগ করে বা ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। রূহের ঐসব গুণ মাখলূকেরই বৈশিষ্ট্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা যাওয়ার আগে এ দু'আ পাঠ করতেন– আল্লাহুম্মা খালাকতা নাফসী ওয়া আনতা তাতাওয়াফফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা, ফাইন আমসাকতাহা ফারহামহা ওয়া ইন আর সালতাহা ফাহফিযহা বিমা তাহফিযু বিহি ইবাদাকাস সালিহীন। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমার রূহ সৃষ্টি করেছো এবং তুমিই তাকে তুলে নেবে, আর এ রূহের জীবন ও মরণ তোমারই হাতে। তারপর তুমি যখন একে আটক করবে তখন তাকে রহম করবে। আর তুমি যদি এ রূহ মুক্ত করে দাও, তাহলে নেক বান্দাদের ন্যায় তার হিফাজত করো।"

ওয়া হুয়া তা'আলা বারিউন্নুফুসি কামা হুয়া বারিউল আজসাদ। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা দেহের ন্যায় রূহেরও স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, মা আসাবা মিম মুসিবাতিন ফিল আরদে ওয়ালা ফী আনফুসিকুম ইল্লা ফী কিতাবিন মিন কাবলি আন নাবরায়াহা। অর্থাৎ "তোমাদের জীবনের উপর দুনিয়ার যেসব বিপদাপদ আসে, সেসব আসার পূর্বেই একটি কিতাবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে।" (সূরা আলহাদীদ ঃ আয়াত-২২)

এক শ্রেণীর লোকের মতে এই আয়াতে উল্লেখিত 'নাবরায়াহ' শব্দের সর্বনাম যমীনের সাথে যুক্ত। আর অন্য এক শ্রেণীর লোকের মতে 'আনফুসুকুম' এর সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য যে, 'আনফুসুকুম' শব্দটি সর্বনামের কাছাকাছি হওয়ায় এটা জীবনের দিকে ফিরাটা সমীচীন। রূহ চিরন্তন স্রষ্টা থেকে কি করে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন হতে পারে, যখন সকল প্রয়োজনের জন্য তাকে তার স্রষ্টার নিকট মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। রূহ শুধু একটি সত্তাই নয়, বরং এর সকল কার্যকরণ ও গুণাবলী আল্লাহর দেয়া। রূহের সত্তার চাহিদা হলো নাস্তি অর্থাৎ রূহ থাকলে সবকিছুই আছে, আর রূহ না থাকলে কিছুই নেই। রূহ ততোটুকু নেকী অর্জন করে যতোটুকু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। রূহ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা রূহকে যতোটুকু সৎকাজের তাওফীক দান করেন, ততোটুকু সে অর্জন করে। আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। আর আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোন জ্ঞান সে লাভ করতে পারে না। এতেই প্রমাণিত হয়, রূহ একটি সৃষ্ট সত্তা। আল্লাহ মানুষের আকৃতি ও গঠন

তৈরি করেছেন এবং ভালো মন্দ সম্পর্কে তার অন্তরে ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সকল রূহের স্রষ্টা এবং রূহের ভালো মন্দ সকল কাজেরও নিয়ন্তা। কোন রূহ অবিনশ্বর নয়, যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, রূহ কোন কাজ কর্মের নিয়ন্ত্রকও নয়, যেমন কোন কোন নির্বোধ লোকেরা মনে করে। যদি রূহ চিরন্তন হতো, তাহলে নিজের অস্তিত্ব ও গুণাবলী ও পরিপূর্ণতায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হতো। অথচ রূহ একান্তভাবেই মুখাপেক্ষী, আর এই যে নির্ভরশীলতা এটা তার সত্তাগত, অন্য কোন কারণে নয়। আল্লাহ তা'আলা অনাদি অনন্ত এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনি পূত পবিত্র– এসব গুণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। রূহ দেহের মতো নশ্বর ও সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট যাঞ্চাকারী আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও সকল প্রশংসার মালিক।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-১৫)

এই যে সম্বোধন, এটা কেবল দেহকে করা হয়নি, দেহের সাথে রূহকেও করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে কেউ শরীক নেই। "অতঃপর, যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, আর তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো, এবং আমি তার অধিক নিকটে থাকি তোমাদের চেয়েও, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াটাই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত-৮৩-৮৭)

রূহ যে সৃষ্ট, এই আয়াতে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

রূহ সম্পর্কে যে নিয়ম-কানুন ও অবস্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং মৃত্যুর পর রূহের যে বরযখী অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে এর থেকে জানা যায় রূহ মাখলূক আর সেটা দিবালোকের মতো সমুজ্জ্বল এটা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ভণ্ড ও পথভ্রষ্ট সুফী ও বিদ'আতী এবং কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাদানকারী যদি না থাকতো তাহলে এসব প্রমাণের কোন প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক ভ্রান্তির মধ্যে থাকায় রূহ সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য রেখেছে যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি কোন সঠিক বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। কেবল আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীই নয়, বরং আসমান যমীন ও অন্য সকল সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই মাখলূক ও সবকিছুই সৃষ্ট।

রূহকে যারা চিরন্তন বলে দাবী করেন, তাঁদের যুক্তি ও প্রমাণের উৎস হলো কুরআনুল হাকীমের ঐসব আয়াত যেসবের অর্থ সুস্পষ্ট নয়, তাঁরা রূহ সম্পর্কে

যেসব সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে সেগুলো চতুরতার সাথে এড়িয়ে যান। এটাই সকল পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতী ফিরকার অনুসারীদের কলা-কৌশল। কুরআন পাকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সুস্পষ্ট আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, রূহের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আপনি বলে দিন যে, রূহ হলো আপনার পালনকর্তার আদেশে সৃষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮৫)

ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা এই আয়াতের দ্বারা রূহ যে চিরন্তন তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তবে এখানে এই পবিত্র আয়াতে 'আমর' শব্দের অর্থ হবে 'মা'মূর' অর্থাৎ নির্দেশপ্রাপ্ত। আরবি ভাষায় 'আমর' শব্দটি মা'মূর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গায় 'আমর' শব্দটি মা'মূর অর্থে বহুল ব্যবহৃত। যথা– আতা আমরুল্লাহি। অর্থাৎ "আল্লাহর নির্ধারিত আযাব এসে গেছে।" লাম্মা জায়া আমরু রাব্বিকা। অর্থাৎ "যখন আপনার রবের নির্ধারিত আযাব আসলো।" ওয়ামা আমরুস সা'আতি ইল্লা কালামহিল বাছার। অর্থাৎ "কিয়ামতের নির্ধারিত সময় চোখের পলকে এসে যাবে। এমনিভাবে 'খালক' শব্দটি মাখলূক শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। রূহ যে চিরন্তন এই আয়াতগুলো সেটাই প্রমাণ করে। আগেকার দিনের এক শ্রেণীর আলিম এ আয়াতগুলোর তাফসীর করেছেন যে, রূহ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মাখলূকের দেহে এসেছে। আর তাঁর মহিমায় মানব দেহে অবস্থান করছে। এই ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন রূহ সম্পর্কীয় আয়াতে রূহ বলতে মানুষের রূহকেই বুঝাবে। তবে এখানেও মতানৈক্য রয়েছে যে রূহ বলতে মানুষের রূহ না অন্য কোন বিশেষ রূহকে বুঝানো হয়েছে। আগেকার প্রায় সকল বিজ্ঞ আলিম একমত যে, এখানে রূহ বলতে ঐ রূহকে বুঝাবে, যে রূহ কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের সাথে দাঁড়াবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ইয়াওমা ইয়াকূমুর্রূহু ওয়াল মালাইকাতু সাফফান। অর্থাৎ "যেদিন রূহ ও সব ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।" (সূরা নাবা ঃ আয়াত-৩৮)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনা মুওনাওয়ারার কালোপাথরের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে পথ চলছিলেন। পথে কয়েকজন ইয়াহুদীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তারা তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, চলো আমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। একজন বললো, না, দরকার নেই। তিনি হয়তো এমন কথা বলবেন যা তোমাদের মনঃপূত হবে না। তবুও একজন ইয়াহুদী বললো আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবোই। সুতরাং সে দাঁড়িয়ে বললো,

আবুল কাসেম! রূহ কি? তিনি চুপ রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর নিকট ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। ওহী আসা শেষ হলে তিনি "কুলির রূহ মিন আমরি রাব্বী" এই আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। (বুখারী) এখানে ইয়াহুদীরা মানুষের রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বরং ঐ রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো, যা ওহী ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঐ রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যা আল্লাহর নিকট আছে এবং সে সম্পর্কে মানুষ অবহিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছিলেন যে, একবার মক্কার কুরাইশরা উকবা ইবনে মুয়ীতকে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে মদীনার ইয়াহুদীদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলো। তারা এসে ইয়াহুদীদেরকে বললো, আমাদের মধ্যে একব্যক্তি নবুয়তের দাবী করেছেন। তিনি আমাদের ধর্মে নেই এবং তোমাদের ধর্মেও নেই। ইয়াহুদীরা জিজ্ঞেস করলো, তাঁকে কারা মান্য করে? এরা বললো, গোলাম, দুর্বল, নীচ ও হীন শ্রেণীর লোকেরা তাঁকে মানে ও অনুসরণ করে। উচ্চ শ্রেণীর কোন ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি তাঁকে মানে না। ইয়াহুদীরা বললো, নবীর আবির্ভাবের সময় তো এসে গেছে। আর তোমরা যাঁর বর্ণনা দিচ্ছো, তিনি ঐসব অবস্থার সম্মুখীন হবেন। আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছি। তোমরা তাঁকে গিয়ে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করো। যদি তিনি ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাহলে তিনি সত্য নবী, অন্যথায় মিথ্যাবাদী। তাঁকে গিয়ে ঐ রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যে রূহকে আদম (আ)-এর মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। তিনি যদি বলেন, রূহ আল্লাহর নিকট থেকে আগত, তাহলে বলবে, আল্লাহ এমন জিনিসকে কি করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যা তাঁর কাছ থেকে এসেছে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ প্রশ্ন করলে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে "কুলির রূহু মিন আমরে রাব্বী" আয়াতটি নাযিল করেছিলেন। যার অর্থ হলো- "রূহ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বৈ কিছু নয়।" এছাড়া রূহ আল্লাহ তা'আলার কোন অংশ নয়। এর দ্বারা জানা গেলো, রূহ বলতে এখানে মানুষের রূহকে বুঝানো হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেলো, এখানে রূহ বলতে মানুষের রূহকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা এই রেওয়ায়েতটি ইমাম সুদ্দীর তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক কর্তৃক বর্ণিত আছে। তবে সকল সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থে এবং মুসনাদসমূহে এই রেওয়ায়েতের ধারা বর্ণনা ইমাম সুদ্দীর রেওয়ায়েতের পরিপন্থী।

হযরত আ'মাশ (রা), মুগীরা ইবনে ইবরাহীম (রা) থেকে তিনি আলকামা (রা) থেকে আর তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের একটি জামাআতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর সাথী ছিলেন। তখন ইয়াহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি একটু চুপ থাকলেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, যেন ওহী নাযিল হচ্ছে। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হলো– "এবং তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ বৈ আর কিছু নয়। এই বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮৫)

এটাই হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মূল বর্ণনা। সে সময় ইয়াহুদীরা বলেছিলো, তাওরাতে এরূপ কথাই লিপিবদ্ধ রয়েছে। (জারীর ইবনে আবদুল হামীদ প্রমুখ) এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি এই অর্থই ব্যক্ত করে। এসব হাদীসের দ্বারা সুদ্দী বর্ণিত হাদীসটি যে দুর্বল তা প্রমাণিত হলো। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনাটি মদীনা শরীফের, মক্কা শরীফের নয়। এই হাদীসে এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এই প্রশ্ন মদীনা শরীফে করা হয়েছিলো, মক্কা শরীফে নয়।

এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এই সংঘাত হয়তো বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকবে, অথবা স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমতগুলোর মধ্যে সংঘাত হয়ে থাকবে। এখন সংঘাতযুক্ত রেওয়ায়েতগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি দাউদ ইবনে আবী হিন্দ ইকরামা (র) থেকে আর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যেই রেওয়ায়েত করেছেন এটা তার বিরোধী। স্বয়ং দাউদের এই রেওয়ায়েতে সংঘাত বিদ্যমান। সুতরাং হযরত মাসরূক (র) ও ইবরাহীম (র) ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (র) থেকে আর তিনি দাউদ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারুযী (র) এমনিভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া, দাউদ, ইকরামা (র) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার কুরাইশরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বলেছিলো যে, তোমরা আমাদেরকে এমন একটি প্রশ্ন বলে দাও, যেটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করবো। তিনি সেটার সঠিক উত্তর দিতে পারেন কিনা সেটা আমরা পরীক্ষা করে নেবো। ইয়াহুদীরা তখন রূহ কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য বলে দিয়েছিলো। এটাই হলো এই পবিত্র আয়াতের শানে নুযূল। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর প্রথম রেওয়ায়েত ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতের মধ্যে অনৈক্য রয়েছে।

রূহ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, হযরত হায়শুম, আবুল বাশার, মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন– হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলে দিন যে, রূহ আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে একটি নির্দেশ আর আল্লাহর মাখলূকের মধ্যে একটি মাখলূক। এই রূহ মানুষের আকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। আকাশ থেকে যখন কোন ফেরেশতা পৃথিবীতে আসেন, তাঁর সাথে একটি রূহ অবশ্যই থাকে। এই বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো যে, এই রূহ ইনসানী রূহ নয় বরং অন্য আর কিছু।

রূহ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর চতুর্থ রেওয়ায়েতটি আবদুস সালাম ইবনে হারব, খাসীফ, মুজাহিদ (র) উল্লেখ করে বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন– উক্ত আয়াতের তাফসীর কুরআনে বর্ণিত রূহ 'কুন' শব্দের সমার্থক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ হে রাসূল আপনি বলে দিন যা আপনার রব আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে খাসীফ (রা) থেকে ইকরামা (রা), ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইকরামা উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) চারটি জিনিসের তাফসীর বর্ণনা করতেন না। সে চারটি জিনিস হলো– রাকীম, গিসলীন, রূহ এবং এই আয়াত "ওয়া সাখখারা লাকুম মা ফিসসামাওয়াতি ওয়ামাফিল আরদে জামীয়ামমিনহু।" অর্থাৎ এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে, স্বীয় নির্দেশে।" (সূরা আল জাসিয়াহ ঃ আয়াত-১৩)

রূহ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর পঞ্চম রেওয়ায়েত এই যে, হযরত জুবায়ের (র) এবং যাহহাক (র), ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন– ইয়াহুদীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "কুলির রূহু মিন আমরি রাব্বী ওয়া মা উতীতুম মিনাল ইলমে ইল্লা কালীলা।"

অর্থাৎ "আপনি বলুন রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ বৈ কিছু নয় এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮৫)

যদি তোমাদের কাছে তোমাদের সত্তার সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তোমাদের খাদ্য ও পানীয় এবং গমনা-গমন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তোমরা এসবের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। রূহের বিষয়টি ঠিক এই রকম।

রূহ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ষষ্ঠ রেওয়ায়েত হযরত আবদুল গনী ইবনে সায়ীদ, মূসা ইবনে আবদুর রহমান, ইবনে জরীজ আতা, ইবনে আব্বাস এবং মুকাতীল যাহহাক (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, একবার কুরাইশরা মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসত্য কথা বলেন না, আর তিনি আমাদের মধ্যে সততা বিশ্বস্তার সাথে জীবন-যাপন করছেন, তাই কুরাইশরা ইয়াহুদীদের নিকট প্রতিনিধি পাঠালো যাতে তাঁর সম্পর্কে তারা খোঁজ-খবর ও চিন্তা ভাবনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইয়াহুদীরা তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ জানতে পেরেছিলো এবং প্রায়ই তারা তাঁর আলোচনা করতো। তিনি যে নবী হিসেবে আসবেন সেটা প্রকাশ করতো। আর তাঁকে সাহায্য করার আশাও পোষণ করতো। এছাড়া তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তিনি তাদের নিকট হিজরত করে আসবেন। আর তারা তাঁর সাহায্যকারী হবে। মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ইয়াহুদীদের নিকট তাঁর কাছে কি জিজ্ঞেস করা যায়, জানতে চাইলো। ইয়াহুদীরা বললো, তোমরা তাঁকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করবে।* এখানে মাত্র একটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করবে রূহ সম্পর্কে অর্থাৎ রূহ কী? কেননা তাওরাতে শুধু 'রূহ' শব্দটি উল্লেখ আছে, এর কোন তাফসীর বা ব্যাখ্যা নেই। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন– "কুলির রূহু মিন আমরি রাব্বী।"

---

* প্রশ্ন তিনটি হলো ঃ এক. আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি কী? দুই. যুলকারনাঈনের ঘটনাটি কী? তিন. রূহের অবস্থা কী?

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে আসহাবে কাহাফের ও যুলকারনাঈনের ঘটনা তাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু রূহের অবস্থা বা রহস্য অস্পষ্ট রেখেছিলেন ঠিক যেভাবে বিষয়টি পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল। ইয়াহুদীরা কুরাইশদেরকে আরো বলেছিলো তিনি যদি এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দুইটির উত্তর দিতে পারেন, তাহলে তিনি যে সত্য নবী সেটা প্রমাণিত হবে। সুতরাং কুরাইশগণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তর শুনে হতাশাগ্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে পড়েছিলো। –অনুবাদক

পবিত্র কুরআনে 'রূহ' শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। **এক.** রূহের অর্থ ওহী। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, "ওয়া কাযালিকা আওহাইনা ইলাইকা রূহাম মিন আমরিনা।" অর্থাৎ "আর এমনিভাবে আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি। আমার আদেশক্রমে।" (সূরা শূরা ঃ আয়াত-৫২)

আরো ইরশাদ হয়েছে– ইউলকির রূহা মিন আমরিহি আলা মাঁইয়াশাউ মিন ইবাদিহি। অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ।" (সূরা মুমিন ঃ আয়াত-১৫)

ওহীকে রূহ বলা হয়, কেননা এর দ্বারা রূহ ও কালব জীবনীশক্তি লাভ করে।

দুই. রূহের অর্থ শক্তি, স্থায়িত্ব ও সহায়তা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, উলায়িকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহিম মিনহু। অর্থাৎ "তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহের দ্বারা।" (সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত-২২)

তিন. রূহের অর্থ জিরাঈল (আ)। যেমন ইরশাদ হয়েছে, নাযালা বিহির রূহুল আমীনু আলা কালবিকা। অর্থাৎ "বিশ্বস্ত ফেরেশতা অর্থাৎ জিবরাঈল এটাকে নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার কালবে।" (সূরা শুআরা ঃ আয়াত-১৯৩-১৯৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে– মান কানা আদুওয়াল লি জিবরীলা ফাইন্নাহু নাযযালাহু আলা কালবিকা বিইযনিল্লাহ। অর্থাৎ "আপনি বলে দিন, জিবরাঈলের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে তার জেনে রাখা দরকার, জিবরাঈল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এই কুরআন আপনার কালবে নাযিল করেছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-৯৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে– কুল নাযযালাহু রূহুল কুদুসি মিররাব্বিকা। অর্থাৎ "আপনি বলুন, আপনার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবেই রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন নিয়ে এসেছেন।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-১০২)

চার. ঐ রূহ যার সম্পর্কে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলো। উত্তরে বলা হয়েছিলো– এটি হলো আমার রবের আদেশ থেকে একটি মাখলূক। এটি ঐ রূহ যার সম্পর্কে নিম্নের দু'টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াওমা ইয়াকূমুর রূহু ওয়াল মালায়িকাতু সাফফান। অর্থাৎ "যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।" (সূরা নাবা ঃ আয়াত-৩৮)

তানাযযালুলল মালায়িকাতু ওয়ার রূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম। অর্থাৎ "ফেরেশতাগণ ও রূহ এ রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।" (সূরা কদর ঃ আয়াত-৪)

পাঁচ. রূহের অর্থ হযরত ঈসা (আ)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– ইন্নামাল মাসীহু ঈসা ইবনু মারইয়ামা রাসূলুল্লাহি ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারইয়ামা ওয়া রূহুম মিনহু। অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ ছিলেন আল্লাহর এক রাসূল এবং তাঁর একটি কালিমাহ, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই (আল্লাহর) নিকট থেকে আগত একটি রূহ।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১৭১)

পবিত্র কুরআনে মানুষের রূহের অর্থে 'নাফস' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– ইয়া আইউহাতুন্নাফসুল মুতমায়িন্নাহ। অর্থাৎ "হে প্রশান্ত আত্মা।" (সূরা আল ফাজর ঃ আয়াত-২৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে– ওয়া লা উকসিমু বিন্নাফাসিল্লাউয়ামাহ। অর্থাৎ "আরো শপথ করছি সেই মনের, যে নিজেকে খুব তিরস্কার করে।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-২)

ইরশাদ হয়েছে– ইন্নান্নাফসা লা আম্মারাতুম বিসসুয়ি। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩)

ইরশাদ হয়েছে– আখরিজূ আনফুসাকুম। অর্থাৎ "বের করো স্বীয় আত্মা।" (সূরা আল আনআম ঃ আয়াত-৯৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে– ওয়া নাফসিওঁ ওয়ামা সাওয়াহা, ফা আলহামাহা ফুজূরাহা ওয়া তাকওয়াহা। অর্থাৎ "শপথ আত্মার এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (সূরা আশ শামস ঃ আয়াত ৭-৮)

কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। অর্থাৎ "প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮৫)

হাদীস শরীফে মানুষের রূহ সম্পর্কে 'নাফস' শব্দটির উল্লেখ আছে। এছাড়া রূহের অর্থ বুঝানোর জন্য রূহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রূহ আল্লাহ তা'আলার আমর বা নির্দেশ হওয়ার কারণে এটা যে চিরন্তন বা অবিনশ্বর তা প্রমাণিত হয় না।

রূহের সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক সে বিষয়ে এখানে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো। আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুর তুলনা করতে হলে তা দু'রকমভাবে করা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের স্থায়ী গুণাবলী। যেমন– ইলম, কুদরত, কালাম, দর্শন, শ্রবণ, ইরাদাহ, জীবনী শক্তি এগুলো হলো আল্লাহর বিশেষ বিশেষ গুণের বিভিন্ন বিকাশ। আল্লাহ তা'আলার এসব গুণাবলী তিনি যে চিরন্তন তার

অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তাঁর হাত ও চেহারা বলতে তাঁর কুদরতী হাত ও কুদরতী চেহারাকে বুঝায়।

দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্ক হলো– জওয়াহের বা মৌলিক পদার্থ যা আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, বাইত (ঘর), নাকা (উটনী), আবদুন (বান্দা), রাসূল (প্রেরিত) এবং রূহ বা আত্মা। এসব হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের সম্পর্ক যা তাশরীফী নিসবত বা সম্মানসূচক সম্বোধন। যেমন কোন জিনিস প্রস্তুতকারীর সাথে এর স্থায়িত্ব বা উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে সম্বোধন করা হয়। আর এরূপ সম্বোধন দ্বারা উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পায়, যেমন বলা হয়, বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, কিম্বা নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উষ্ট্রী। অথচ প্রত্যেক ঘর ও প্রত্যেক উষ্ট্রীই আল্লাহর। এরূপ সম্বোধন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– ওয়া রাব্বুকা ইয়াখলুকু মাইঁয়াশাউ ওয়া ইয়াখতার। অর্থাৎ "আপনার রব যা ইচ্ছা পয়দা করেন এবং তাকে সেভাবেই মনোনীত করেন।" (সূরা কাসাস ঃ আয়াত-৬৮)

আল্লাহ তা'আলার সাথে রূহের যে সম্পর্ক তা একটি বিশেষ ও মৌলিক সম্পর্ক তা কোন সাধারণ বা অস্থায়ী সম্পর্ক নয়। বিষয়টি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বহু পথভ্রষ্টতা থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : ওয়া নাফাখতু ফীহি মির রূহি। অর্থাৎ "আর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।" (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৭২)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে রূহকে আদম (আ)-এর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন সেটাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : খালাকতু বিইয়াদাইয়া অর্থাৎ "আমি নিজ হাত দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৭৫)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক যে নিজে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন সেই কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সহীহ হাদীসে এই সব বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে– মানবমণ্ডলী হাশরের ময়দানে হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে আরয করবে, "আপনি মানব জাতির আদি পিতা! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের হাতে পয়দা করেছেন। আর আপনার দেহে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এছাড়া আপনাকে তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদাহ করিয়েছেন। আপনাকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।" উপরোক্ত হাদীসে মানব জাতির আদি পিতা

হযরত আদম (আ)-এর চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। ফেরেশতারা যদি আদম (আ)-এর পবিত্র রূহকে ফুঁকে দিতেন, তাহলে তাঁর মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতো না। আর হযরত আদম (আ) ও হযরত ঈসা (আ) সাধারণ মানুষের পর্যায়ে হতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা মানুষের মধ্যে রূহকে ফুঁকে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ রূহকে চিরন্তন বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। উভয় দলই কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আল্লাহর সাথে রূহের যে সম্পর্ক তা এখানে উল্লেখ করা হলো। রূহকে ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রূহ হলো চিরন্তন, আর কেউ কেউ মনে করেন রূহ চিরন্তন নয়। গ্রন্থকারের মতে এই উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। কেননা তাঁরা কুরআনের মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। রূহের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এটা একটি সম্মানসূচক সম্পর্ক। কোন একজন সম্মানিত ব্যক্তি একটি বাড়ি তৈরি করার পর যদি বলেন, আমি এই বাড়িটি তৈরি করেছি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি নিজ হাতে কাজ করে বাড়িটি তৈরি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- "আমি আমার পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।" (সূরা তাহরীম ঃ আয়াত-১২)

অর্থাৎ ফেরেশতাগণকে রূহ ফুঁকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, তাঁর (মারইয়াম আ.) নিকট ফেরেশতা পাঠিয়েছি। আর সে ফেরেশতা তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। অর্থাৎ ফেরেশতা আমার নির্দেশে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।

যখন এই কথা সাব্যস্ত হলো যে রূহ ফুঁকে দেয়ার জন্য ফেরেশতা মুতায়েন রয়েছেন, তাহলে হযরত ঈসা (আ)-কে রূহুল্লাহ বলা হয় কেন? আর আদম (আ)-এর মধ্যেও কি ফেরেশতারা তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন নাকি আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ফুঁকে দিয়েছেন। এর উত্তর হলো– আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ মুবারককে তাঁর নিজের রূহ হিসেবে সম্বোধন করেছেন। এর দ্বারা জানা গেলো, হযরত ঈসা (আ)-এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত রূহের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-এর রূহকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আর এই বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ প্রক্রিয়াকে ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত করেননি। কাজেই হযরত ঈসা (আ)-এর রূহের সাথে অন্য কোন রূহের তুলনা করা যায় না। তাঁর পবিত্র রূহ পিতার মাধ্যম ছাড়াই মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র রূহকে নিজেই ফুঁকে দিয়েছিলেন। হযরত

আদম (আ) ঈসা (আ)-এর ন্যায় শুধু মায়ের দ্বারা পয়দা হননি। এছাড়া অন্যান্য মানুষের মতো মাতা পিতার মাধ্যমেও পয়দা হননি, বরং পিতা ছাড়াই তিনি পয়দা হয়েছিলেন। এটাই আদম (আ)-এর রূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর মধ্যে যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র দেহ আল্লাহর কুদরতী হাতে সৃষ্টি হয়েছিলো। আর সেই দেহে তাঁর রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছিলো। আমাদের সহজ উপলব্ধির জন্য রূপকের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রূহ ফুঁকে দেয়ার যে প্রক্রিয়া এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্য কারো সাথে যে সংশ্লিষ্ট নন, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। গ্রন্থকারের মতে রূহকে ফুঁকে দেয়ার যে প্রক্রিয়া আল্লাহর পবিত্র যাত বা সত্তা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার যে প্রক্রিয়া, এটা হলো সৃষ্ট। আর সৃষ্ট রূহই হযরত আদম (আ)-এর রূহের মূল উপাদান। কাজেই তাঁর এই রূহ সৃষ্ট ও ধ্বংসশীল।

অবশ্য হযরত মারইয়াম (আ)-এর রূহকে ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি ছিলো আল্লাহর একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এই অলৌকিক ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলার এক অনন্য কুদরত। এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার একটি ব্যতিক্রমধর্মী অভিব্যক্তি। হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া আল্লাহর কোন প্রক্রিয়া হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায়ই রূহ সৃষ্ট, যা চিরন্তন নয়। রূহ হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র রূহেরই অন্যতম উপাদান বৈ আর কিছু নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথমে রূহ না দেহের সৃষ্টি হয়েছে

এ বিষয় সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। শাইখুল ইসলামের বক্তব্য হলো– হযরত মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারুযী (র) ও হযরত আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত অনুযায়ী রূহের সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে। ইবনে হাযম (র) আরো দাবী করেছেন যে, তাঁদের এই অভিমত সম্পর্কে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূহ সম্পর্কে এ দু'টি অভিমতের আনুষঙ্গিক তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলো।

এক. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি। এরপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি– আদমকে সিজদা করো তখন সবাই সিজদাহ করেছে।" (সূরা আরাফ ঃ আয়াত-১১)

আরবি ভাষায় 'সুম্মা' শব্দটি কোন বিষয়ে ধারাবাহিকতা অথবা বিরতিকে বুঝায়। আর 'খালক' শব্দের অর্থ হলো সৃষ্টি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র দেহ সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর পবিত্র রূহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর তাঁর দেহে পবিত্র রূহ ফুঁকে দেয়ার পরই ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশে তাঁকে সিজদাহ করেছিলেন। এক্ষেত্রে 'খালক' শব্দের দ্বারা খালকে আরওয়াহ বা রূহের সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে।

দুই. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : ওয়া ইয আখাযা রাব্বুকা মিম বানী আদামা মিন যুহুরিহিম যুররিইয়াতা হুম। ওয়া আশহাদাহুম আলা আনফুসিহিম। অর্থাৎ "আর যখন আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করালেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

এই যে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি এটা রূহের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছিলো, দেহের সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক ছিলো না। একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই আয়াত সম্পর্কে একই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। ইরশাদ হয়েছিলো, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করে তাঁর পিঠের উপর নিজের কুদরতী ডান হাত রেখেছিলেন। এতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হয়ে এসেছিলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন– এদের অর্ধেক হবে জাহান্নামী আর এরা সেরূপ আমলও করবে। সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে আমলের প্রয়োজন কী? ইরশাদ হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য পয়দা করেন তখন সে বান্দাকে জান্নাতীদের আমলের ন্যায় আমল করান। এমনিভাবে তার অন্তিমকালেও উত্তম আমলের উপরই হয়ে থাকে। আর তাঁকে ঐ আমলের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ কাউকে জাহান্নামের জন্য পয়দা করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের আমলের ন্যায় আমল করান। এমনকি তার অন্তিমকালও খারাপ আমলের উপর হয়ে থাকে। আর তাকে এই জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র))

উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকিম (র) বলেছেন, এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তের অনুকূল। ইমাম হাকিম (র)-এর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সেই মারফূ' রেওয়ায়েতটি হলো এই, "আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করে যখন তাঁর পিঠে (কুদরতী) হাত বুলিয়েছিলেন, তখন তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে সমস্ত রূহ যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আসবে, তারা পিপীলিকার মতো বের হয়ে আসলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা এদের সবার ললাটে নূরের চমক রেখে দিলেন। এরপর এদের আদম (আ)-এর নিকট পেশ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন এরা কারা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরা তোমার সন্তান। এই অবস্থায় হযরত আদম (আ) এদের মধ্যে একজনের কপালে নূর দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, হে রব ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইনি তোমার সন্তান দাউদ। তিনি দুনিয়ার শেষভাগে কোন এক কাওমের নিকট প্রেরিত হবেন। আদম (আ) আবার জানতে চাইলেন, তাঁর আয়ু কত বছর হবে? ইরশাদ হলো, ষাট বছর। আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর তাঁকে দান করে দিন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তাহলে বিষয়টি সীল-মোহর করে দিতে হবে এবং এর আর কোন পরিবর্তন হবে না। যখন হযরত আদম (আ)-এর জীবনকাল পূর্ণ হয়ে গেলো তখন মালাকুল মাউত তাঁর নিকট আসলেন, আদম (আ) বললেন, এখানো তো আমার আয়ু চল্লিশ বছর বাকী

আছে। আযরাঈল (আ) বললেন, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে তা দান করে দেননি? এই ঘটনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম (আ) তা অস্বীকার করলেন। এই কারণেই আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যেও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা চলে আসছে। (তিরমিযী, হাসান ও সহীহ্ হাদীস)

ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন আদম (আ)-এর বয়স সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, সবার আগে বয়স সম্পর্কে আদম (আ) অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ) তাঁর নির্দিষ্ট আয়ু থেকে যে ৪০ বছর হযরত দাউদ (আ)-কে দিয়েছিলেন, সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় ভুলে গিয়েছিলেন। হযরত আযরাঈল (আ) তাঁর এই ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে সা'আদ (রা) ও এই হাদীস সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য যোগ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর বয়স পুরোপুরি এক হাজার বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, আর হযরত দাউদ (আ)-এর বয়স একশ বছর পূর্ণ করে দিলেন। ইমাম হাকিমের আবী ওয়ালী হাদীসের মধ্যে এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে যেসব রূহকে বের করেছিলেন, তারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আসতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, রূহের সৃষ্টি হয়েছে আগে দেহের সৃষ্টি হয়েছে পরে। আল্লাহ্ তা'আলা রূহের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তিনিই একমাত্র প্রভু, আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছিলেন, তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি, স্বীকৃতির সম্পর্কে সাত আসমান ও সাত যমীন সাক্ষী রাখলাম এবং মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কেও সাক্ষী হিসেবে রাখা হলো, যেন কিয়ামতের দিন এই প্রতিশ্রুতির কথা কোন রূহ অস্বীকার করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আরো বলা হলো, তোমরা তোমাদের মা'বূদের সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আমি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাবো যাঁরা এই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। এছাড়া তোমাদের নিকট তাঁদের মাধ্যমে কিতাবও প্রেরণ করা হবে। তখন সকল রূহ ঘোষণা করলো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আমাদের রব এবং আমাদের মা'বূদ। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন রব নেই। সে সময় হযরত আদম (আ)-কে সেখানে উপস্থিত করা হলো। হযরত আদম (আ) সকল রূহের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং আল্লাহর নিকট আরয করলেন, হে আমার রব! ভালো-মন্দ, ধনী-দরিদ্র, সুন্দর-অসুন্দর আমার সকল

সন্তানকে যদি আপনি সমান মর্যাদায় সৃষ্টি করতেন, তাহলে কতোই না ভালো হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর তরফ থেকে বলা হলো, কৃতজ্ঞতা ও শোকরগোযারী তাঁর নিকট খুবই পছন্দনীয়। আর এই কারণেই সকল বনী আদমকে সমান মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়নি। সে সময় হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামকে উজ্জ্বল প্রদীপের মতো দেখতে পেলেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "আমি যখন নবীদের কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম তনয় ঈসা-এর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৭)

এই আয়াতের দ্বারা জানা গেলো যে, আম্বিয়ায়ে কেরামও আল্লাহর রাবুবিয়াতের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ মুবারকও ছিলো। আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র রূহকে হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাঁর পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব দিকের কোন একস্থানে চলে গিয়েছিলেন তখন সেই রূহ তাঁর ভেতর প্রবেশ করলো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-এর পবিত্র রূহকে হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত হিশাম ইবনে হাযম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মানুষের আমল প্রথম কার্যকর হয় নাকি তার অদৃষ্ট। ইরশাদ হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেছিলেন, তখন তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার কুদরতী মুষ্টি দ্বারা রূহগুলোকে নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, এদের এক অংশ হবে জান্নাতী আর অপর অংশ হবে জাহান্নামী। জান্নাতীদের নিকট জান্নাতে যাওয়ার আমল সহজ হবে, আর দোযখীদের নিকট দোযখে যাওয়ার আমলও তদ্রূপ হবে। (হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া (র) কর্তৃক এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত : আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাঁর রূহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি আমার কোন হাত পছন্দ করো যার দ্বারা আমি তোমার সন্তানকে তোমাকে দেখাবো। হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র রূহ আরয করেছিলো, আমি আমার রবের ডান হাত পছন্দ করি, আর আমার রবের উভয় হাতই (কুদরতী) ডান হাত।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর ডান হাত প্রসারিত করেছিলেন। যার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আগমনকারী আদম (আ)-এর সকল সন্তান ছিলেন। এদের মধ্যে সুস্থ, অসুস্থ উভয় প্রকার আদম সন্তান ছিলেন এমনকি তাঁদের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামও ছিলেন। আদম (আ) আরয করেছিলেন হে আমার রব! আপনি সবাইকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেননি কেন? ইরশাদ হলো, আমি চাই যে তারা আমার শোকরগোযার বান্দা হোক। (হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া র.)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত : আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করেছিলেন। তারপর নিজের (কুদরতী) হাত দ্বারা ইশারা করে মুষ্টি বদ্ধ করে বলেছিলেন, হে আদম! আমার দুটি হাত থেকে কোন একটি বেছে নাও। আদম (আ) বললেন, আমি আমার রবের (কুদরতী) ডান হাত বেছে নিলাম এবং তাঁর উভয় হাতই (কুদরতী) ডান হাত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত খুললেন, সেখানে আদম (আ)-এর সব সন্তানই ছিলো। তখন আদম (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ! এরা কারা? ইরশাদ হলো, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আগমন করবে এরা হলো তোমার সে সব জান্নাতী আওলাদ। এদের ব্যাপারে জান্নাতের ফয়সালা হয়ে গেছে। (মুহাম্মদ ইবনে নাসর মরূযী)

এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করলেন আর তাঁর পৃষ্ঠদেশে (কুদরতী) হাত বুলালেন, তখন কিয়ামত পর্যন্ত যতো রূহ দুনিয়ায় আগমন করবে তারা সকলে সেখান থেকে বের হয়ে আসলো। (ইসহাক ইবনে রাহবিয়া)

হযরত ইবনে আমর (রা)-এর তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, চিরুনী দ্বারা যেমন চুলের ভেতরের ময়লা বের হয়ে আসে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করে এনেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর ডান কাঁধে তাঁর কুদরতী হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করলে সব শুভ্র ও স্বচ্ছ রূহ বের হয়ে এসেছিলো, এরাই হলো জান্নাতী রূহ। তাঁর বাম কাঁধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী বাম হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করলে কালো রংয়ের রূহ বেরিয়ে এসেছিলো। ইরশাদ হলো– এরাই হলো দোযখী রূহ। অতঃপর জান্নাতী রূহ থেকে ঈমান ও মা'রেফাতের প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছিলো। এই আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে বের করেছিলেন, তখন আসমান থেকে তাঁর অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর

পৃষ্ঠদেশে তাঁর কুদরতী ডান হাত ফিরিয়েছিলেন। সে সময় হযরত আদম (আ) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানাদির রূহ শুভ্র ও স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় অথবা ক্ষুদ্র পিঁপীলিকার মতো বের হয়ে এসেছিলো। ইরশাদ হয়েছিলো, তোমরা জান্নাতে চলে যাও। পবিত্র কুরআনে আসহাবে ইয়ামীন (ডানপন্থী) ও আসহাবে শিমাল (বামপন্থী) বলতে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারপর আল্লাহ পাক উভয় প্রকার রূহ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছিলো, আমি কি তোমাদের রব নই? সব রূহ একযোগে বলেছিলো, হ্যাঁ কেন নয়? অতঃপর উভয় শ্রেণীর রূহকে হযরত আদম (আ)-এর হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদম (আ) ও ফেরেশতারা ঘোষণা করেছিলেন যে, আমরা রূহের এই অঙ্গীকারের সাক্ষী রইলাম। যাতে কিয়ামতের দিন তারা বলতে না পারে যে, রূহের এই অঙ্গীকার সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলো না। অথবা তারা যেন এটাও বলার কোন সুযোগ না পায় প্রথম থেকেই তাদের পূর্বপুরুষেরা শিরকে লিপ্ত ছিলো। আর তারা তাদেরকেই অনুসরণ করেছিলো। অতএব আল্লাহ তা'আলা যে তাদের রব, এটা কারো অজানা থাকার কথা নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের পেয়েছি এক পথের পথিক।" (সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত-২৩)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে কায়াব কারযী (র) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত রূহ তাদের দেহ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ঈমান ও মা'রেফাতের অঙ্গীকার করেছিলো।

এই প্রসঙ্গে হযরত আতা (র) বলেছেন, রূহ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়ার সময় তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে আনা হয়েছিলো। তাদেরকে আবার সেখানে ফেরত পাঠানো হয়েছিলো। প্রসিদ্ধ রাবী হযরত যাহহাক (র)ও এই সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ দিনই তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব রূহ দুনিয়ায় আগমন করবে পিঁপড়ার মতো বের করে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে তাঁর রাবুবিয়াত বা প্রভুত্বের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। আর ফেরেশতারা সে বিষয়ে সাক্ষী ছিলেন। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর (কুদরতী) ডান হাতের মুষ্টিতে রূহগুলোকে ধারণ করে বলেছিলেন, এরা হলো জান্নাতী এবং (কুদরতী) বাম হাতের মুষ্টিতে রূহগুলোকে ধারণ করে বলেছিলেন, এরা হলো জাহান্নামী।

এখানে আযল বা আদিকাল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কে কিছু অভিমত ব্যক্ত করা হলো। হযরত ইয়াহইয়া (র) বলেছেন যে, তিনি

হযরত ইবনে মুসাইয়িব (র)-কে আযল বা আদিকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। হাদীসটি হলো এই– আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করে তাঁকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখিয়েছিলেন, যা অন্য কোন মাখলূককে দেখানো হয়নি। এর মধ্যে দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব রূহ আগমন করবে তাদেরকেও দেখিয়েছিলেন। এই হাদীসটিকে কমবেশ করার কোন অবকাশ নেই। তবুও যদি কেউ কোন হেরফের করার চেষ্টা করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। এমনকি সত্তরজন লোকও যদি এই সম্পর্কে একমত পোষণ করে তবুও তা গ্রাহ্য হবে না।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "আসমান ও যমীনের সবাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কেবল আল্লাহরই জন্য সিজদাহ করে থাকে।" (সূরা রা'দ ঃ আয়াত-১৫)

হযরত আবুল আলিয়া (র) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, সকল রূহ যে আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলো সে কথার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইসহাক বলেছেন, ঐ সময় যে সকল রূহ তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, এই আয়াতে সে কথাই আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ঐসব রূহের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন যারা এর অর্থ বুঝতে পারে ও উত্তর দিতে পারে। রূহেরা আল্লাহর প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলো তা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা সেটা বুঝেই আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিলো।

হাদীস : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহ সৃষ্টির বহু আগে তাদের রূহ পয়দা করেছিলেন। যেসব রূহের মধ্যে সে সময় পরিচয় ঘটেছিলো, দুনিয়ায় তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে, যেসব রূহের সঙ্গে সে সময় কোন যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটেনি, তাদের মধ্যে দুনিয়াতে কোন ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেনা। (ইবনে মানদা) যাঁরা মনে করেন দেহের আগে রূহ পয়দা হয়নি, তাঁদের দু'রকম বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

এক. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে পয়দা করেছি।" (সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত-১৩)

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে নর-নারী হিসেবে পয়দা করেছি। এছাড়া মানুষ তাদের

মাতাপিতার মাধ্যমে পয়দা হয়ে থাকে। আর মানুষ বলতে তাদের দেহ ও রূহ উভয়কেই বুঝায়।

দুই. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন এবং তাঁর থেকেই তাঁর সঙ্গিনীকে পয়দা করেছেন এবং তাদের থেকে অসংখ্য নর-নারীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১)

এই আয়াতের আলোকে জানা যায়, মানব গোষ্ঠির সৃষ্টি আদম-হাওয়া সৃষ্টির পরেই হয়েছে।

উপরের আলেচানার প্রেক্ষাপটে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, দেহের সৃষ্টির আগে রূহের সৃষ্টি হতে পারে, এতে কোন প্রতিবন্ধকতা বা আপত্তি নেই। তবে এটা মেনে নিতে হবে যে, হযরত আদম (আ)-এর পরে সমস্ত মানুষ পয়দা হয়েছে। কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর দেহ সৃষ্টি হয়েছিল রূহের সৃষ্টির আগে। উপরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, দেহের আগে রূহের সৃষ্টি হয়েছিলো। যদি ঐসব বিষয় সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা জানা যায় যে, আসলে, রূহের স্রষ্টা স্বয়ং রূহের আকৃতি তৈরি করেছেন। রূহের সৃষ্টি, রূহের আয়ু, রূহের আমল ইত্যাদি বিষয়ও তিনি ঠিক করেছেন। রূহের আকৃতি রূহের উপাদান থেকে বের করেছেন। তারপর ঐ রূহকে রূহের উপাদানের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া প্রত্যেক রূহকে তার সৃষ্টি হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তবে এটা জানা যায় না যে, রূহের সৃষ্টি কোন স্বতন্ত্র সৃষ্টি ছিলো কিনা। রূহের সৃষ্টির পর রূহ জীবিত থেকে জ্ঞানী ও বাকসম্পন্ন হয় এবং কোন বিশেষ মহলে অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ দেহে প্রেরিত হয়। ইমাম ইবনে হাযম (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেউ তার ক্ষমতার চেয়ে অধিক কোন বোঝা উঠাতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে সময় মতো নিয়মিত বিধান অনুযায়ী পয়দা করে থাকেন। সকল সৃষ্টির নিয়ম হলো– আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিমাণ, সময়, গুণাবলী ও বৈষম্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তারপর সেই অনুযায়ী এদের বাহ্যিক অস্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন হয় না। তাই উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো অদৃষ্ট বা নিয়মিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ঘটে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির আকৃতি উদ্ভাবন করেছেন। আর নেককার ও বদকার পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। কিন্তু রূহকে সম্বোধন করা, রূহ থেকে রাবুবিয়াত বা প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করা এবং রূহের দ্বারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাক্ষ্য প্রদান এসব বিষয় আগেকার দিনের

আলিমগণ মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা পবিত্র কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে, এই আয়াতটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।

হযরত আবূ উমর (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি বলে মনে করেন। হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা)-এর সাথে হযরত উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিলো এমন কোন প্রমাণ নেই। এরই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে নায়ীম ইবনে রাবীয়াহ নামক আর একজন রাবী রয়েছেন, যিনি এই সনদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। তদুপরি মুসলিম ইবনে ইয়াসার একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন মদীনার অধিবাসী, বসরার লোক নন। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আবী খায়সুমাহ (র) বলেন, আমি হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন (র) থেকে ইমাম মালিক (র)-এর গ্রন্থে হাদীসটি পড়েছি। তিনি স্বহস্তে লিখেছেন যে, মুসলিম ইবনে ইয়াসার এমন কোন পরিচিতি ব্যক্তি নন। তারপর এই রেওয়ায়েতটি আবূ আমর নাসায়ীর ধারা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন, যেখানে মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও হযরত উমর (রা)-এর মাঝখানে নায়ীম ইবনে রাবীয়াহ রয়েছেন। আবার তিনি সাখবারাহ এর ধারাবাহিকতা অনুযায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে উভয় বর্ণনাকারীর মধ্যে নায়ীমও রয়েছেন। আবূ আমর (রা) আরো বলেন, নায়ীমের নাম বর্ণনাকারী হিসেবে যিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি প্রমাণযোগ্য নয়। আর যিনি এটা উল্লেখ করেননি তিনি একজন স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই তাঁকে একজন রাবী বলে গণ্য করা যায়। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস ও চরিত অভিধানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। হাদীসটির সনদ বা সূত্র ঠিক নয়। মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও নায়ীম এরা কেউই হাদীস বর্ণনায় সুপরিচিত ব্যক্তি নন। তবুও এই বিষয়টি হাদীসের অনেক সনদের দ্বারা এবং হযরত উমর (রা) ও সাহাবাদের একটি দল দ্বারা সমর্থিত।

আবূ আমর (র)-এর বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হলো, তাকদীর বা অদৃষ্ট। এ বিষয়ে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর বর্ণিত তাকদীর সম্পর্কিত হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যদি তাকদীরে সবকিছু থাকে, তাহলে আমলের প্রয়োজন কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বেহেশতীদের বেহেশতে যাওয়ার আমল সহজ হবে, আর দোযখীদের দোযখের আমল সহজ হবে।

হযরত আবূ সালিহ এবং আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আদম (আ) এর সন্তানাদি তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে পিঁপড়ার আকৃতির ন্যায়

তাই। তিনি বলেন যে, এই আয়াতটির তাফসীর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া (র) আরো বলেন, আলিমদের ইজমা বা ঐকমত্য হয়েছে যে, দেহের আগেই রূহের দ্বারা রাবুবিয়াতের অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছিলো। হযরত ইমাম জুরজানী বলেন, এদের দলীল হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত– "যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদেরকে মৃত মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯)

অথচ এঁদের দেহ মাটিতে মিশে গেছে এবং তাঁদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। আর সে রূহকে রিযক দেয়া হয় এবং সে সন্তুষ্ট থাকে। আসলে, রূহই সুখ-শান্তি, দুঃখ-বেদনা অনুভব করে। কাউকে চেনা না চেনার অনুভূতিও রূহের আছে। এর নমুনা স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায়। স্বপ্ন দেখার পর মানুষ যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, তখন তার মনে আনন্দ বা নিরানন্দের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, যার সাথে শুধু রূহেরই সম্পর্ক থাকে, দেহের নয়। এই অঙ্গীকারের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা রাবুবিয়াতের প্রমাণকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, চাই দ্বীনের দাওয়াত কারো কাছে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক। অবশ্য যাদের মধ্যে রাসূল এসেছেন, তাঁরা তাদের প্রচারের দ্বারা এই প্রতিশ্রুতিকে আরো অধিক নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা কারো নিকট ততোটুকু আনুগত্য চান যতোটুকু প্রমাণ তার কাছে কার্যকর হয়েছে, আর যে পরিমাণ যোগ্যতা তার রয়েছে এবং যতোটুকু প্রমাণাদি আল্লাহ তাকে দান করেছেন। বালিগ হওয়ার পর কে কি আমল করবে আর নাবালিগদের কি অবস্থা হবে, আল্লাহ সেটা আমাদের থেকে গোপন রেখেছেন কেননা আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা সুবিচারক, তিনি কারো প্রতি কোন যুলূম করেন না। আর তাঁর কাজে ও ব্যবহারে কোন প্রকার বৈষম্য নেই। আর তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

উপরে বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে কোন কোন আলিম ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার দিক থেকে যখন আদম সন্তান নিজ নিজ পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রে পরিণত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পয়দা করেন, তখন এদেরকে বুদ্ধি বিবেচনা দান করে, তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি এদের থেকে আদায় করেন। কেননা রূহের সামনে এমনি ধরনের খোলাখুলি চিহ্ন এবং প্রমাণাদি আছে যে জন্য এরা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে মানতে বাধ্য হয়। সুতরাং এমন কেউ নেই যার মধ্যে নিজ রবের এসব কোন কর্মকাণ্ড বিদ্যমান নেই, যা সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ তা'আলা তার স্রষ্টা, আর আল্লাহর বিধি-বিধান তার মধ্যে কার্যকর। তারপর ঐ রূহ যখন সেসব প্রমাণাদির

পরিচয় লাভ করে, তখন সে সাক্ষীর মর্যাদা লাভ করে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "নিজের উপর কুফরির সাক্ষী আছে।" অর্থাৎ তারা সাক্ষীদের সমমর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ নিজেও তাঁর একত্বের সাক্ষী। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছে– "তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর একত্বের কথা বলে দিয়েছেন ও ঘোষণা করেছেন। এভাবে বলে দেয়াও সাক্ষ্যের সমতুল্য। (ইবনে আম্বারী) প্রকৃতপক্ষে, ইমাম জুরজানী (র)-এর বক্তব্যের উপর আম্বারী এতোটুকু যোগ করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলুক সৃষ্টি করেন আর তাদেরকে ভবিষ্যতের জ্ঞান দান করেন। যেটা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে, সেটা যেন ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার ইলম বা জ্ঞান সবসময় একই রকম। আর যে বিষয়ের অপেক্ষা করা হয়, আরবি ভাষায় তাকে রূপক হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতে যা হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

রূপকের ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– "দোযখীরা ডেকেছে" অর্থাৎ ডাকবে। "বেহেশতীরা ডেকেছে" অর্থাৎ ডাকবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৫০)

"আরাফবাসীরা ডেকেছে" অর্থাৎ ডাকবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৪৮)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হলো, তোমাদের রব আদম (আ)-এর আওলাদকে তাঁদের পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করবেন, আর জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করে তাদের নাফসের উপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তি যে নিজের ভালোমন্দ বুঝে এবং সওয়াব, আযাব, অঙ্গীকার ও ভয়-ভীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তার কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহদানিয়াতের বা একত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। রূহ এভাবে বাস্তবতা লাভ করেছে। রূহ যে ধ্বংসশীল ও নশ্বর সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। রূহ বুঝতে পেরেছে যে, সে নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি, বরং কেউ না কেউ তার স্রষ্টা আছেন যাঁর সমতুল্য কেউ নেই। কোন কিছু সৃষ্টি করার যোগ্যতা কোন মাখলূকের নেই। আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। মানুষ সুখের সময় সেটা চিন্তা না করলেও দুঃখের সময় অবশ্যই করে। যখন সে কোন বিপদে পড়ে, তখন সে আকাশের দিকে মাথা তুলে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তার বিশ্বাস যে, আল্লাহ আকাশেই আছেন। আসল জ্ঞান সেই জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহকে চেনা ও জানা যায়। তাই বালিগ

ব্যক্তি তার বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতে পারলে বুঝতে হবে যে তার থেকে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এভাবেই ধরে নিতে হবে যে, সে আল্লাহর একত্ব ও ওয়াদাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং মুসলমান হয়ে গেছে। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহকে সিজদাহ করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।" (সূরা রাদ ঃ আয়াত-১৫)

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, তিন ব্যক্তিকে জবাবদিহি থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে– শিশু বালিগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, পাগল সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত, আর ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার আগ পর্যন্ত। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "আমি আসমান-যমীন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং ভীত হলো। আর মানুষ তা বহন করলো।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৭২)

এখানে আমানত বলতে উপরে বর্ণিত অঙ্গীকারকে বুঝায়। যেহেত আসমান-যমীন এবং পাহাড় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, সেহেতু এদের মধ্যে আমানতের বোঝা উঠাবার কোন যোগ্যতাই ছিলো না। আর মানুষের মধ্যে জ্ঞান আছে বলে সে এই বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। কোন কোন আরবি পদ্যেও রূপক অর্থে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, "কিনান পাহাড় ফাকআসের নিরাপত্তার জন্য যামিন হয়ে গেছে। পাহাড়ের যামানত এই ছিলো যে, ফাকআস গোত্রের লোকেরা দুর্যোগের সময় তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতো।

এখানে কবি নাবিগার একটি কবিতার অংশবিশেষের অর্থও উল্লেখযোগ্য– "জাওরান ময়দানে অবস্থিত পাহাড়গুলো তাদের রবের তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব পাহাড়ের মধ্যে কোনটি আছে অবনত, আর কোনটি আছে ভীত সন্ত্রস্ত।" পবিত্র কুরআনের আয়াতও এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিলো না অথবা বলতে শুরু করো যে, অংশীদারিত্বের প্রথাতো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিলো আমাদের পূর্বেই।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত১৭২-১৭৩)

তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, যেন কিয়ামতের দিন তারা কোন অজুহাতের আশ্রয় না নিতে পারে। এখানে অজ্ঞতা বলতে কিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অজ্ঞতাকে বুঝায়। কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ

তা'আলা পবিত্র কুরআনে কোথাও বলেননি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিকট থেকে হিসেব ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তবে এসবের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা বলেছেন। আর এর অর্থ যদি প্রতিশ্রুতি হয়, তাহলে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী শিশু এবং অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ শিশুদের থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অঙ্গীকারের পর ঐ বয়স পর্যন্ত যে পৌঁছেনি এর দ্বারা তার অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, আর যদি এটা অস্বীকার করা হয়, তাহলে সে কি করে সেই অজ্ঞতার কৈফিয়ত দেবে যা তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি, তার জন্য সে কি করে অভিযুক্ত হবে। আর তা নিয়ে কোন আলোচনারও প্রশ্ন উঠে না। পরে তাদের বাপ-দাদার শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এই শিরক বলতে যদি তাদের নিজের শিরকে বুঝায়, তাহলে সেটা হবে বালিগ হওয়ার পর ও দলীল লাভের পর। শিশুরা নিষ্পাপ বিধায় তাদের কোন জবাবদিহির প্রশ্ন উঠে না। আর এটাকে যদি পিতা-মাতার শিরককে বুঝায়, তাহলে আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, একে অন্যের জন্য ধৃত বা দায়ী হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-১৮)

এখানে এই বক্তব্যের সাথে রূহের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত হাদীসের কোন বিরোধ নেই। এখানে অতীত কালের ক্রিয়ার অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি হলো আম্বিয়াদের প্রতিশ্রুতির ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আর যখন আল্লাহ্ নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, আমি যা কিছু তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করেছি, অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন তোমরা অবশ্যই সেই রাসূলের প্রতি ঈমান এনো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-৮১)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়াদের উপর যে কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন, সেটাকে অঙ্গীকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যে অঙ্গীকার পরবর্তীকালের উম্মত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী কিতাবসমূহকে কাওমের জন্য প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রমাণ পেশ করেছেন আর কিতাবের মারেফাত বা পরিচিতিকে তাদের অঙ্গীকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এরই সমার্থক আরেকটি আয়াতের অর্থ এখানে উল্লেখ করা হলো : "এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা।" (সূরা রা'দ ঃ আয়াত-২০)

এই প্রতিশ্রুতি হলো রাসূলদের জন্য ঈমান ও সত্য স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি। এর উদাহরণ হলো কুরআনের এসব আয়াত যেখানে ইরশাদ হয়েছে, "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৬০-৬১)

প্রকাশ থাকে যে, এই অঙ্গীকার রাসূলদের মাধ্যমে তাঁদের কাওম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-৪০)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন, "আর যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা এই কিতাবের মর্মবাণী মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮৭)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "আর আমি যখন নবীদের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা এবং মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা-র কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৭)

এসব প্রতিশ্রুতি আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে তাঁদের আবির্ভাবের পরে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের উম্মতদের থেকেও এভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের নিন্দা করেছেন এবং এদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুন তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছি এবং তাদের অন্তঃকরণকে কঠিন করে দিয়েছি।" (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত-১৩)

এই শাস্তি হলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুন যে প্রতিশ্রুতি কাওমের পক্ষ থেকে রাসূলদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিলো।" নিম্নের আয়াত দ্বারা এটা আরো স্পষ্টভাবে জানা যায়। "আর আমি যখন তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আর তোমাদের মাথার উপর কূহে তূরকে তুলে ধরলাম যে, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি, তা মযবূত করে ধরো। আর যা কিছু এর মধ্যে আছে তা স্মরণ করো। তাহলে তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-৬৩)

যেহেতু এই আয়াত ও উদাহরণসমূহ মদীনা শরীফের, সেহেতু এই প্রতিশ্রুতির

কথা স্মরণ করিয়ে আহলে কিতাবদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এসব আহলে কিতাব থেকে এই অঙ্গীকার করা হয়েছিলো যে, আল্লাহর উপর ও আল্লাহর রাসূলগণের উপর তোমরা ঈমান আনো।

পবিত্র কুরআনে আ'রাফ সম্পর্কীয় আয়াতে ও সূরাসমূহে সাধারণ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এইসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রাবুবিয়াতকে স্বীকার করা এবং শিরক যে হারাম সে বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এটা এমন একটি প্রতিশ্রুতি যার দ্বারা আহলে কিতাবদের জন্য প্রমাণাদি কার্যকর হয়। আর তাদের কোন কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এর বিরোধিতা শাস্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে। কাজেই এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যাতে বান্দা স্বীকার করে যে, কেবল আল্লাহ তার স্রষ্টা ও অভিভাবক, আর মাখলূক তাঁর নবী ও রাসূলগণকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া একই উদ্দেশ্য শরীআতও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত আয়াতের দ্বারা আমরা যেসব দিক নির্দেশনা পাই তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো– এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, "তিনি আদম সন্তান থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

তিনি একথা বলেননি যে, হযরত আদম (আ) থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। আসলে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর আওলাদ এক কথা নয়। দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যাঁদেরকে তিনি তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

এটা বলেননি যে, যাঁদেরকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন। অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণ অনুসারে এখানে আদম থেকে বদলে বা'য অথবা বদলে ইশতিমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'বদলে ইশতেমাল' হওয়াই বেশি সমীচীন। তিন. এখানে আল্লাহ পাক আদম (আ)-এর বংশধর থেকে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর বংশধর থেকে একথা বলেননি। চার. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছেন। কাজেই এটা একান্ত প্রয়োজন যে, সাক্ষীদেরকে তাদের সাক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ সাক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কিত, আখিরাত সম্পর্কিত নয়। পাঁচ. এই সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি যেন কিয়ামত সম্পর্কে কেউ কোন অজ্ঞতা প্রকাশ না করে। মানুষ রাসূলগণের মাধ্যমে অঙ্গীকার সম্পর্কে অবহিত ও তাদের সহজাত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা বুঝতে পারে যে তারা আল্লাহর সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে

আমি প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১৬৫)

ছয়. এই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করানো এই জন্য প্রয়োজন যে, যেন কিয়ামতের দিন কেউ না জানার কোন অজুহাত পেশ করতে না পারে। যদি এর দ্বারা আগেকার প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়, তাহলে তারা সেটা ভুলে যেতে পারে। সাত. আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণীর গূঢ় রহস্য হলো এই যে, তারা যেন তাদের বাপ-দাদার বা পিতৃপুরুষের শিরকের কোন কারণ উপস্থাপন করতে না পারে। অর্থাৎ না জানার বা অজ্ঞতার কোন ভান করতে না পারে। আট. মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর আপনি কি আমাদের বাতিল পূজারীদের অপকর্মের কারণে ধ্বংস করবেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি এদের শিরক ও অস্বীকৃতির দরুন তাদেরকে আটকাতেন, তবে তারা একথাই বলতো। তবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের বিরোধিতার কারণে ও মিথ্যাচারের জন্য এদেরকে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ যদি এই মুশরিকদের সাবধান নাকরে তাদেরকে শাস্তি দিতেন, তাহলে তাদের বাতিল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করা যেতো না। আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে, কোন লোকালয়কে অন্যায়ভাবে তাদের অজান্তে শাস্তি প্রদান করবেন। কোন অপরাধের জন্য শাস্তি তো সাবধান করার পরই কার্যকর করা হয়।

নয়. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বান্দাকে সাক্ষী রেখেছেন। কুরআন শরীফের কয়েকস্থানে এর প্রমাণ উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "যদি আপনি এদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা বলবে, আল্লাহ্। তবুও এই স্বীকৃতি থেকে ও আল্লাহর একত্ব থেকে তারা কেন বিমুখ হয়ে যায়।" (সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত-৮৭)

এটাই ঐ প্রমাণ, যে বিষয়ের উপর লোকদেরকে সাক্ষী বানানো হয়েছে। আর এই প্রমাণই আল্লাহর রাসূলগণ লোকদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহের কোন অবকাশ আছে যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-১০)

তাই এটা সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, আল্লাহ্ লোকদেরকে তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করার আগে নয়। এ সম্পর্কে কোন প্রমাণও উল্লেখ করা হয়নি্। দশ. আল্লাহ তা'আলা রূহের এই অঙ্গীকারকে একটি নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। কোন বিষয়ের কোন

নিদর্শন সঠিক ও অকাট্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনকে কোন অবস্থায় অস্বীকার করা যায়না। এছাড়া যে কোন বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকা খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহের বিশদ বর্ণনা করে থাকি।" অর্থাৎ আমি আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করে থাকি যেন মানুষ শিরক ও কুফরী থেকে বিরত থাকে আর তাওহীদকে মেনে নিয়ে ঈমানদার হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা রকমারি সৃষ্টির কথা নানাভাবে কুরআনুল হাকীমে উল্লেখ করেছেন যাতে মানুষ আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহ সহজে উপলব্ধি করতে পারে। সেসব নিদর্শন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হলো, প্রাকৃতিক নিদর্শন অপরটি হলো আল্লাহর যাত সম্পর্কিত নিদর্শন। আল্লাহর কিছু কিছু নিদর্শন মানুষের মধ্যে রয়েছে, আর কিছু নিদর্শন পরিবেশের সঙ্গে মিশে আছে। যেমন উপরে আকাশ, নিচে যমীন, চারদিকে আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত সৃষ্টি বিরাজমান। এসব নিদর্শনকে আয়াতে আফাকিয়া বলা হয়। আর মানুষের দেহের মধ্যে নানাবিধ ইন্দ্রিয় রয়েছে। মানব দেহের এসব নিদর্শনকে আয়াতে নাফসিয়া বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শন বলা হয়। এসব পবিত্র আয়াত বা নিদর্শন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তাওহীদ, রাসূলগণের সত্যতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং কিয়ামতের সত্যতা প্রকাশ করে। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ হলো মানুষের অস্তিত্ব বা জীবন। মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো, তার কোন সাহায্যকারী, অভিভাবক বা স্রষ্টা অবশ্যই থাকতে হবে, যিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কোন নশ্বর বস্তু তার স্রষ্টা ব্যতিরেকে নিজেই তাঁর সত্তার ধ্বংসকারী হতে পারে না। তাই এক অনন্য স্রষ্টার প্রয়োজন। এটাই মানুষের মূল অঙ্গীকার ও স্বভাবজাত দর্শন। এই দর্শনের উপরেই নির্ভর করে মানুষের সৃষ্টির রহস্য। এটা কোন অর্জিত বস্তু নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যখন তোমাদের রব আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন। (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

এই আয়াতের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মিল রয়েছে– "প্রতিটি মানব শিশু সহজাত স্বভাবের উপর জন্ম গ্রহণ করে।" আর উক্ত আয়াতের সাথে নিম্নোক্ত আয়াতেরও মিল রয়েছে। "একাগ্রচিত্তে নিজেকে দীনের উপর কায়িম বা দৃঢ় রাখো। এটা হলো আল্লাহর দীন, যার উপরে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দীন অপরিবর্তনীয়, এটা হলো সহজ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।" (সূরা রূম ঃ আয়াত-৩০)

এক শ্রেণীর মুফাসসির এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছেন আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ। আরো এক শ্রেণীর মুফাসসির আছেন তাঁরা প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। এছাড়া ইবনে জওযী, ওয়াহেদী ও মাওয়ারদী প্রমুখ মুফাসসির উভয় ব্যাখ্যাকেই মেনে নিয়েছেন।

রূহের অঙ্গীকার প্রসঙ্গে ইমাম হাসান ইবনে ইয়াহইয়া জুরজানী (র) এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে উপরোক্ত হাদীসটিতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে রূহ বের করে এদের থেকে তাঁর একত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর আবার আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে রূহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যদি এখানে বালিগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতিশ্রুতির কথা মনে করা হয়, তাহলে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে রূহকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এই প্রশ্নের জবাব হলো, গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অতীতের প্রতিশ্রুতির অর্থ এখানে বর্তমান বা ভবিষ্যতকে মনে করতে হবে। অর্থাৎ রূহকে আদম (আ) এর পৃষ্ঠদেশে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ আবার সেই মাটিতে মিশে যায় যে মাটি থেকে তার সৃষ্টি। যেহেতু হযরত আদম (আ) মাটির সৃষ্টি, সেহেতু তাঁকে মাটিতেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন আদম (আ)-এর আওলাদকে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশেই তাদেরকে যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনের সাথে এই বিষয়ে সংঘাত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর যখন আপনার রব হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের থেকে অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের আওলাদকে বের করেছেন। (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৭২)

এই পবিত্র আয়াতে হযরত আদম (আ)-এর কোন উল্লেখ নেই, উল্লেখ রয়েছে তাঁর আওলাদের। অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর পিঠে হাত ফিরিয়ে তাঁর সমস্ত আওলাদকে বের করেছেন। এই অবস্থায় উভয় দলীলের সমন্বয়ের একটি উপায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম জুরজানী (র) আরো উল্লেখ করেছেন, তাঁর মতে এই আয়াতের তাফসীর যা কিছু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য ও সহীহ। এছাড়া কোন কোন সুন্নী আলিমও এই বক্তব্য সমর্থনকারীদের অভিমত খণ্ডন করতে গিয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। রূহের অঙ্গীকার সম্পর্কে যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। এছাড়া নিরপেক্ষভাবে রূপকের সাহায্যে এই অর্থ

গ্রহণের সুযোগ আছে। আর সেটা হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সংবাদ দিয়েছেন। আরবি 'ইয' শব্দের অর্থ হলো, "যখন" তাই এখানে, "যখন" শব্দটির সাথে "তখন" শব্দটির ব্যবহার প্রযোজ্য। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র বাণী- "রূহেরা বললো, হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব।" আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবে 'শাহিদনা' অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই সাক্ষ্য রদ করে বলবেন, তোমরা কিয়ামতের দিন অবশ্য বলবে যে, আমরা ঐসব হিসাব-নিকাশ, শিরক ও কুফুরীর জন্য আবদ্ধ থেকে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। তারা আরো বলবে, আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করেছে। আর আমরা তাদের পরবর্তীকালে তাদের আওলাদ ছিলাম। অর্থাৎ তারা শিরকে জড়িত ছিলো আর তারা আমাদের শৈশব থেকেই এই শিরকের জন্য প্রস্তুত করেছিলো। কাজেই আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম মাত্র অতএব আমরা নির্দোষ। আর গুনাহ্ যা হয়েছে তাতো তাদেরই হয়েছে। তারা আরো বলবে, 'আমরা বাপদাদাকে একই অবস্থায় পেয়েছি। আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি।" আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেছেন- মুশরিকরা বলবে, "তুমি কি বাতিল পূজারীদের কার্যের দরুন আমাদেরকে দায়ী করছো।" তারা আমাদেরকেও শিরকের জন্য তৈরি করেছে। এই অবস্থায় প্রথম ঘটনাটি সকল মাখলূকের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়ার বিষয়। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো কিয়ামতের দিন মুশরিকদের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত।

ভিন্ন মতাবলম্বীরা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যে সংঘর্ষের দাবী করেছিলো, এর জবাবে ইমাম জুরজানী (র) বলেছেন, কুরআন শরীফে এ সম্পর্কে সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। আর হাদীস শরীফে ততোটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যতোটুকু কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় বর্ণনা করতেন, তাহলে উভয় বক্তব্যের মধ্যে মত পার্থক্যের কোন অবকাশ থাকতো না। যদি কোন শব্দের অর্থ পরস্পর বিরোধী হয়, কিন্তু পরিণাম ফল একই হয়, তাহলে এর দ্বারা কোন সংঘাত সৃষ্টি হয় না। পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে কোথাও বলা হয়েছে- মাটির দ্বারা, কোথাও বলা হয়েছে- সে গলানো কাদা দ্বারা, কোথাও বলা হয়েছে- আঠালো কাদা দ্বারা, কোথাও বলা হয়েছে- চাড়ার মতো মাটি দ্বারা তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এসব শব্দাবলী বিবিধ ধরনের এবং এগুলোর অর্থও বিভিন্ন রকমের। কিন্তু ঐ সকল শব্দের মূল অর্থ একই। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মাটি এবং মাটির বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

মানব সৃষ্টির উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এ দু'টি বিষয় একই অর্থ প্রকাশ করে। তবে এই হাদীসটিতে হযরত আদম (আ)-এর পিঠে হাত ফিরানো আর তাঁর আওলাদ বের হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। হযরত আদম (আ)-এর সমস্ত আওলাদ তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়নি, কেবল প্রথম শ্রেণীর আওলাদ তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়েছিলো, তারপর একের পর এক ক্রমান্বয়ে বের হয়ে এসেছে। এই অর্থ হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে এসেছে এটাই সঠিক। সব আওলাদই আদম (আ)-এর শাখা প্রশাখা আর তিনি হলেন সবার মূল।

হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে রূহ বের করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যে সম্বোধন করেছেন এর দু'টি অর্থ হতে পারে, আদম সন্তান অথবা আদম (আ) নিজে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ফাযাল্লাত আনাকুহুম লাহা খাদিয়ীন। অর্থাৎ "অতঃপর এদের ঘাড়সমূহ তাঁর সম্মুখে নুয়ে পড়েছে।" (সূরা শুআরা ঃ আয়াত-৪)

এর মধ্যে 'আনাক' শব্দের অর্থ হলো ঘাড়সমূহ। এর সম্বন্ধ সর্বনামের দিকে করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে নুয়ে পড়ার খবর ঘাড়সমূহের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, ঘাড়ের মালিকের পক্ষ থেকে নয়। কিন্তু "খাদিয়ীন" শব্দটি "আ'নাকের" জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেননা এর জন্য "খাদিয়াত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে এই পঙ্ক্তির "কামা শারাকাত সদরুল কানাতি মিনাদ্দামি।" অর্থাৎ "রক্তের দ্বারা বল্লমের উপরের অংশ ঝলমল করে উঠেছে।" এখানে "সদর" শব্দটি পুংলিঙ্গের আর শারকাত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের। কেননা "সদর" শব্দটি সম্বন্ধ "কানাত" শব্দের দিকে করা হয়েছে। সুতরাং কোন একটি অংশের উল্লেখ করে সবটুকু এবং সবটুকুর উল্লেখ করে কোন অংশের অর্থ গ্রহণ করা যায়।

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে রূহ যে সৃষ্ট সেটাই বুঝায়। অধিক কিছু বলতে গেলে বলতে হয় যে, রূহের আকৃতি পিঁপড়ার আকৃতিতে পয়দা করা হয়েছে। আর তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তারপর এগুলোকে মূলের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসটি যদি সহীহ হয়, তাহলে এর দ্বারা মূল তাকদীর, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের আকার অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা করো। (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১১)

এই আয়াতের দ্বারা আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র) কর্তৃক বর্ণিত : "দেহের আগে যে রূহের সৃষ্টি, সেরূপ প্রমাণ দাঁড় করানো একেবারেই ভুল। কেননা এর মধ্যে আদম সন্তানের আকৃতির উপর হযরত আদম (আ) কে সিজদাহর নির্দেশ সুশৃঙ্খলিত করা হয়েছে। আর এই সমষ্টিগত বিষয় হচ্ছে হযরত আদম (আ)-এর জন্মের পরের অবস্থা। এই কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রথম 'কুম' শব্দের অর্থ হযরত আদম (আ) আর দ্বিতীয় 'কুম' শব্দের অর্থ হযরত আদম (আ)-এর আওলাদ বলে তাফসীর করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রা)ও তাই বলেন যে, প্রথম 'কুম' এর অর্থ হযরত আদম (আ) আর 'সুম্মা বিহি' শব্দের অর্থ অতঃপর। আর 'সাওয়ারানাকুম' শব্দের অর্থ, আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ। এখানে আরবি 'খালাকনাকুম' শব্দটি 'কুম' শব্দের অর্থ আদম (আ)। হযরত আবু উবায়েদ (র), হযরত মুজাহিদ (র)-এর উপরোক্ত অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। কেননা পরে হযরত আদম (আ)-কে সিজদাহর হুকুম হযরত আদম (আ)-এর আওলাদের পয়দায়েশের পূর্বের ঘটনা। আর 'সুম্মা' শব্দটি বিরতি ও ধারাবাহিকতা বুঝায়। কাজেই যিনি খালক ও তাসবীর শব্দ দু'টির দ্বারা জরায়ুতে হযরত আদম (আ)-এর আওলাদের পয়দায়েশ অর্থ গ্রহণ করেছেন, তিনি ধারাবাহিকতার মধ্যে 'সুম্মা'র হুকুমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য আখফাশের বক্তব্য অনুযায়ী এখানে 'সুম্মা' এর অর্থ 'ওয়াও' গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যাজ্জাজ বলেন যে, এটা ভুল। খলীল, সিওয়াইয়া এবং বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটা অনুমোদন করেননি। হযরত আবূ উবায়েদ (র) বলেন যে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর আওলাদকে তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে পয়দা করেছিলেন। তারপর তাদেরকে সিজদাহ করার হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাদেরকে পিঁপড়ার ন্যায় হযরত আদম (আ)-এর পিঠ থেকে বের করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ একটি অপরটির পরিপূরক। ইরশাদ হয়েছে, "হে মানবমণ্ডলী, যদি মৃত্যুর পরবর্তী কালের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা পয়দা করেছি, তারপর শুক্র দ্বারা পয়দা করেছি।" (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৫)

এখানে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি হওয়া বুঝায়। কেননা মাটিই তাঁর দেহের উপাদান। কিন্তু সম্বোধন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ালো যে, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এ প্রসঙ্গে আরো দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়, ওয়া ইয কুলতুম বি মূসা। আর যখন তোমরা অর্থাৎ তোমাদের বুযুর্গগণ মূসা (আ) কে বলেছিলেন, ওয়া ইয

কাতালতুম নাফসান। আর যখন তোমরা অর্থাৎ তোমাদের বুযুর্গগণ এক ব্যক্তিকে মেরে ফেললো। ওয়া ইয আখাযা মীসাকাকুম। অর্থাৎ "আর যখন তোমাদের থেকে অর্থাৎ তোমাদের বুযুর্গদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।" কুরআনুল হাকীমে এরূপ ব্যবহারের দ্বারা আধিক্য বিদ্যমান যে, উপস্থিতজনকে সম্বোধন করে বুযুর্গদেরকে বুঝানো হয়েছে। এর উপর এ আয়াতকে কিয়াস বা অনুমান করা যেতে পারে, ওয়া লাকাদ খালাকনা কুম, অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে পয়দা করেছি, অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করেছি। কখনো ব্যক্তির উল্লেখ করে সমষ্টির অর্থ গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি ইনসানকে (হযরত আদমকে আ.) মাটির পিণ্ড দ্বারা পয়দা করেছি। তারপর তাদেরকে (মানব জাতিকে) শুক্র দ্বারা যা একটি জায়গায় সংরক্ষিত থাকে তা দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

রূহের সৃষ্টি দেহ সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে হয়েছে। এই হাদীসের সনদ বা সূত্র সহীহ নয়। কেননা এর মধ্যে উৎবা ইবনে সাকান আছেন, যিনি ইমাম দারু কুতনীর নিকট পরিত্যাজ্য। আর ইরতাৎ ইবনে মুনযির আছেন, যাঁর সম্পর্কে ইবনে আদী বলেন, এঁর বর্ণিত কোন কোন হাদীস মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত আযরাঈল (আ) যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি আনলেন। তারপর এর দ্বারা পিণ্ড তৈরি করা হলো এবং তা কাদার মতো হলো। তারপর এর দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর দেহ তৈরি হলো। তারপর এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হলো। যখন রূহ আদমের দেহে প্রবেশ করলো, তখন মাংস, চামড়া এবং রক্ত ইত্যাদি তৈরি হলো। আর হযরত আদম (আ) জীবন লাভ করলেন এভাবে শক্তি লাভ করলেন। সাহাবাদের এক দলের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টিসম্পন্ন করলেন, তখন তিনি আরশের উপর সমাসীন হলেন। ইবলীসকে প্রথম আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে শামিল করা হলো। এর আগে ঐ ফেরেশতাদের, যাদের জিন বলা হতো সে তাদের সর্দার ছিলো। এদেরকে জিন বলার কারণ হলো, এরা ছিলো জান্নাতের রক্ষক। ইবলীস নিজের অধীনস্থ ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে মুহাফিয ছিলো। তার মনে এ কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে ফেরেশতাদের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, এর কারণ নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোন গুণ নিহিত আছে। তার এ অহঙ্কারের কথা আল্লাহ তা'আলা জানতে পারলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাবো।

ফেরেশতারা আরয করলেন, হে রব, এই প্রতিনিধি কি ধরনের হবে আর পৃথিবীতে সে কি করবে? তার সন্তানরাতো দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করবে। হে রব! আপনি কি দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারী সৃষ্টি করবেন। আমরা আপনার হামদ, তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। অর্থাৎ ইবলীসের অবস্থা আমার যেমন জানা আছে তা তোমরা জানো না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে পৃথিবী থেকে মাটি আনতে বললেন। যমীন বললো, আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাই যে তুমি আমার মাটি নিয়ে যাবে। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) শূন্য হাতে ফিরে এলেন এবং আরয করলেন, হে রব, যমীন মাটি আনতে আপনার আশ্রয় কামনা করছে। আমি আপনার নাম শুনে মাটি আনিনি। তারপর হযরত মীকাঈল (আ)-কে পাঠালেন। তিনি যমীনের আশ্রয়ের কথা শুনে শূন্য হাতে ফিরে এলেন। তারপর মালাকুল মউতকে পাঠালেন। যমীন তাঁকে তাই বললো। কিন্তু জবাব দিলেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাই যে তাঁর নির্দেশ পালন না করে ফিরে যাবো। সুতরাং তিনি বিভিন্ন স্থানের কিছু কিছু মাটি নিয়ে সবগুলো একত্রিত করে রবের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। যেহেতু বিভিন্ন রংয়ের মাটি- লাল, সাদা এবং কালো আযরাঈল (আ) সংগ্রহ করেছিলেন, এজন্য হযরত (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে রংয়ের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ মাটি দিয়ে আঠাযুক্ত চকচকে নরম মাটির পিণ্ড তৈরি করলেন। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলা হলো, আমি এ কাদা মাটি দিয়ে ইনসান সৃষ্টি করবো। তারপর আমি যখন একে সুবিন্যস্ত করবো, তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তার সামনে তোমরা সিজদাহরত হবে। তারপর আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে হযরত আদম (আ)-এর পুতুল তৈরি কররেন যেন ইবলীস যখন অহংকার করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলতে পারেন, আমি তো তাকে স্বহস্তে তৈরি করেছি, তাহলে তুমি কেন অহঙ্কার করছো।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার পুতুল তৈরি করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রেখে দিলেন। ফেরেশতারা এ পুতুল দেখতে পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য ইবলিসের মধ্যে পরিলক্ষিত হল। যখনই সে পুতুলের কাছে যেতো তখনই সে তা বাজিয়ে দেখতো, ঘন ঘন শব্দকারী মাটির ন্যায় তার থেকে শব্দ বের হতো, আর ইবলিস পুতুলকে লক্ষ্য করে বলতো, তোমাকে পয়দা করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রকমের মঙ্গল নিহিত আছে। আর সে পুতুলের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আসতো। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলতো এ পুতুল দেখে

তোমরা কেন ভীত হচ্ছো। তোমাদের রব তো অভাবহীন আর এই সৃষ্টিটা তো ফাঁপা। আমি যদি এর উপর বিজয়ী হই, তাহলে একে ধ্বংস না করে ছাড়ছি না। তারপর ঐ সময় উপস্থিত হলো, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিতে চাইলেন। তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, যখন আমি এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা একে সিজদাহ্ করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে যখন রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন তাঁর মাথার মধ্যে রূহ্ পৌঁছার সাথে সাথেই হযরত আদম (আ) হাঁচি দিলেন। ফেরেশতারা তখন তাঁকে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়তে বললেন। হযরত আদম (আ) বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাব দিলেন, 'ইয়ারহামুকা রাব্বুকা'। অর্থাৎ তোমার রব তোমার উপর রহম করুক। চোখের মধ্যে রূহ প্রবেশ করলে জান্নাতের ফলসমূহ দেখলেন, পেটে পৌঁছলে ক্ষুধা অনুভব করলেন, এর মধ্যে রূহ পদদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছলো। হযরত আদম (আ) তাড়াতাড়ি বেহেশতের দিকে যাবার চেষ্টা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বললেন, ইনসানকে তাড়াহুড়ার মধ্যে পয়দা করা হয়েছে। (তাফসীরে আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্ ইবনে আব্বাস (র) থেকে এবং তাফসীরে মুররা ইবনে মাসউদ (র) থেকে তিনি একদল সাহাবা থেকে) হযরত ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আগুন পয়দা করলেন, সেটা দেখে ফেরেশতাদের মধ্যে ভয়ানক ভয়-ভীতি দেখা দিলো এবং তারা আরয করতে লাগলেন, হে আমাদের রব! এ আগুন আপনি কেন পয়দা করেছেন এবং কার জন্য পয়দা করেছেন। তিনি বললেন, 'নাফরমান ও অবাধ্য মাখলূকের জন্য।' সে সময় ফেরেশতারা ছাড়া দুনিয়ার বুকে অন্য কোন মাখলূক বিদ্যমান ছিলো না। পরে আদম (আ)-কে পয়দা করা হযেছে। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী ঃ "নিশ্চয়ই ইনসানের উপর এক যামানা অতিবাহিত হয়েছে যে, তখন এর নাম নিশানও ছিলো না।" এই প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসোস, যদি ঐ যামানাই বিদ্যমান থাকতো। ফেরেশতারা আরয করলেন, আমাদের উপরও কি এমন সময় আসবে যে, আমরা আপনার নাফরমানী করবো? কেননা ফেরেশতারা ব্যতীত অন্য কোন মাখলূক তখন ছিলো না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, 'না' আমি দুনিয়ায় অন্য এক কাওম সৃষ্টি করবো এবং আমার এক প্রতিনিধি সমাসীন করবো।"

এই সম্পর্কে ইবনে ইসহাক (র) বলেছেন, কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর পুতুল তৈরি করে চল্লিশ বছর রেখে দিলেন। সেই পুতুল শব্দযুক্ত চাড়ার মতো হয়ে গেলো। যখন রূহ আদম (আ)-এর শির মুবারকে প্রবেশ করলো, তখন তার হাঁচি এলো, সেই সময় তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'।

দেহ সৃষ্টির পর যে রূহের সৃষ্টি হয়েছিলো এ সম্পর্কে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম প্রমাণ– কুরআন ও হাদীস এবং সাহাবাদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর দেহ সৃষ্টি করার পর তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন। এভাবে ফুঁকার দরুন রূহের সৃষ্টি হয়েছিলো। দেহ সৃষ্টির পূর্বে যদি রূহের সৃষ্টি হতো, তাহলে তজ্জন্য ফেরেশতারা অবাক হতো না। এটাও জিজ্ঞেস করতেননা যে, এই আগুন কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা ইনসানের রূহ দেখতেন, আর এটাও তারা জানতেন যে, তাঁদের মধ্যে মুমিন ও কাফিরের রূহ রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ– সমস্ত কাফিরের রূহ ইবলীসের অধীন। তাই যাঁরা মনে করেন দেহের আগে রূহের সৃষ্টি হয়েছিলো, এটা তাদের ভুল ধারণা। সমস্ত কাফিরের রূহ ইবলীসের কুফুরীর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের প্রতি কুফরের হুকুম হযরত আদম (আ)-এর দেহ ও রূহ সৃষ্টি হওয়ার পরে কার্যকর করেছিলেন। এর পূর্বে সে কাফির ছিলো না। তাহলে সে সময় রূহ কী করে কাফির বা মুমিন হতে পারে। অথচ ইবলীস সে সময় কাফির ছিলো না। পরবর্তীতে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় তার মধ্যে কুফরী সৃষ্টি হয়েছিলো। যদি একথা বলা হয় যে, প্রথমে সমস্ত রূহ মুমিন ছিলো, তারপর ইবলীসের কারণে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে, তাহলে সেটা অন্য কথা। কিন্তু রূহের প্রথম সৃষ্টির প্রমাণ এই ধারণার পরিপন্থী।

তৃতীয় প্রমাণ– হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি বিষয় হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত আদম (আ)-কে জুমুআর দিনে পয়দা করা হয়েছিলো। যদি রূহ দেহের পূর্বে পয়দা হয়ে থাকতো, তাহলে রূহ ঐসব মাখলুকের মধ্যে গণ্য হতো, যেগুলো ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো, তার মধ্যে রূহের সৃষ্টির কোন উল্লেখ নেই। এর দ্বারা জানা গেলো যে, রূহের সৃষ্টি হযরত আদম (আ)-এর আওলাদের সৃষ্টির অধীন। উক্ত ছয়দিনে শুধু হযরত আদম (আ)-এর জন্ম হয়েছিলো, আর তাঁর আওলাদের জন্ম প্রত্যেক যামানায় হচ্ছে। যদি রূহ দেহের পূর্বে বিদ্যমান থাকতো এবং জীবন্ত, জ্ঞান, অনুভূতিসম্পন্ন ও বাকসম্পন্ন হতো, তাহলে এরা দুনিয়ায় আসার পর ঐ জগতের কথা যেখানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে সেটা তাদের মনে থাকতো। রূহের মধ্যে জীবনী শক্তি, ইলম, বাকশক্তি এবং রূহের জামাআতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা সত্ত্বেও দেহে স্থানান্ত রিত হওয়ার পর অতীতের কোন সামান্যতম অবস্থা তার মনে না থাকা সম্ভবপর

নয়। রূহ দেহ থেকে পৃথক হলেও তার অনেক কিছু জানা থাকার কথা। অথচ রূহ দেহে আসার পর তার পরিপূর্ণতার জন্য অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ঐসময়ের অবস্থা তার জানা থাকা অধিক সমীচীন যখন কোনই বাধা-বিঘ্ন ছিলো না।

এ সম্পর্কে এখানে একটি সন্দেহের নিরসন করা হলো। যদি ধরে নেয়া হয় যে, দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক ও কর্মতৎপরতা অতীতের অবস্থা অবগত হওয়া একটি বাধাস্বরূপ, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে, ছোটখাটো অবস্থা সম্পর্কে হয়তো কোনো বাধাবিঘ্ন ছিলো। তবে এটা কি করে সম্ভব যে, রূহের আগেকার কিছুই মনে থাকবে না। দেহের সাথে রূহের প্রাথমিক অবস্থা জানা সম্পর্কে যদি কোন বাধা না থাকে, তাহলে পূর্বের অবস্থা জানা সম্পর্কে কি করে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে?

চতুর্থ প্রমাণ– রূহ যদি দেহের পূর্বে বিদ্যমান থাকতো তাহলে রূহ জ্ঞান, জীবনী শক্তি, বাকশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হতো। যখন রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক গড়ে উঠতো, তখন তার ঐসব গুণ লোপ পেয়ে যেতো। এর মধ্যে বুদ্ধি ও জ্ঞান ধীরে ধীরে আসতো। যদি একথা মেনে নেয়া হয়, এটা হবে একটি আশ্চর্যের বিষয়। প্রথমত রূহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়, তারপর জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করে। এর যুক্তিসঙ্গত, শরীআভিত্তিক ও ইন্দ্রিয়গত কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ প্রদান করেছেন, যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-৭৮)

জানা গেলো, যে অবস্থায় আমাদেরকে পয়দা করা হয়েছে, সেটাই আমাদের বাস্তব অবস্থা। আর জ্ঞানবুদ্ধি, অনুভূতি, শক্তি ও ক্ষমতা সবই পরে এসেছে। এর পূর্বে আমরা কিছুই জানতাম না। কেননা তখন আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলো না যে কারণে আমাদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি থাকবে।

৫ম প্রমাণ– রূহ যদি দেহের পূর্বেই সৃষ্টি হতো, আর রূহের ভালোমন্দও তখন ঠিক হয়ে যেতো, তাহলে সে রূহের আমল ভালো কি মন্দ তা নির্ধারিত হয়ে যেতো। প্রকৃতপক্ষে, রূহ দেহের মধ্যে আসার পরেই তার আমল ভালো কি মন্দ তা ঠিক হয়।

আমরা আমাদের ভাগ্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করি না। তবে এমন যদি কোন নিদর্শন থাকে যে, সব রূহ একই সময় সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়া হয়েছিলো, আর তাদেরকে জীবনী শক্তি ও বাকশক্তি দান করা হয়েছিলো, পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় রূহকে তাদের দেহে প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে বাস্তবতাকে স্বীকার না করার কোন উপায় ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। রূহের সৃষ্টি সম্পর্কে শরীআতের বিধানই গ্রহণযোগ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষ তার মায়ের জরায়ুতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রাকারে থাকে, তারপর চল্লিশ দিন জমাট রক্ত আকারে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন থাকে গোশতের পিণ্ডাকারে। অবশেষে আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা এসে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন।" এভাবে মানুষের সৃষ্টি হয়। অতএব দেখা যায়, ফেরেশতারা মানুষের দেহে রূহ ফুঁকে দিতে থাকেন। এটা বলা হয়নি যে, রূহসহ ফেরেশতাকে পাঠানো হয় আর ফেরেশতা সেই রূহ ভ্রূণে প্রবেশ করিয়ে দেন।

ঊনিশতম অধ্যায়

নাফস কি, নাফসের মূল রহস্য কি

নাফস কি? এর মূল রহস্য কি? নাফস কি দেহের একটি অংশ, না কোন একটি বাহ্যিক লক্ষণ, না নাফসই দেহ যা দেহের সাথে মিশে থাকে, নাকি নাফসকে দেহের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে, না নাফস নিজেই একটি মৌলিক পদার্থ, নাফস কি নিজেই রূহ না কি রূহ থেকে একটি পৃথক সত্তা? নাফসে আম্মারাহ, নাফসে লাউয়ামাহ ও নাফসে মুতমায়িন্নাহ কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সত্তা? এসব বিষয় সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন এবং অনেকে মারাত্মক ভুলও করেছেন । এছাড়া তাঁদের সব বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলগণের অনুসরণকারীদেরকে এসব ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহর রাসূলগণের পবিত্র বাণী, তাদের আদেশ-নির্দেশ সবই নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল। এখানে নাফস সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গের অভিমত তুলে ধরা হলো ঃ

প্রথমেই ইমাম আবুল হাসান আশআরী (র)-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেছেন, রূহের জীবনী শক্তি আছে কি নেই সে বিষয় মতবিরোধ রয়েছে। এ নিয়েও মত বিরোধ আছে যে, রূহ কি একটি জীবনী শক্তি না অন্য কোন কিছু। রূহের কি দেহ আছে, না দেহ নেই।

দার্শনিক নাযযামের অভিমত হলো, রূহ আসলে দেহেরই নাম। আর সেটাই নাফস। তিনি আরো বলেন রূহ একটি জীবন সত্তা। তিনি বলেন, হায়াত ও কুওয়তের অর্থ- হাইউন, কাবিউন অর্থাৎ জীবিত ও শক্তিশালী। রূহ সম্পর্কে আরো একটি অভিমত রয়েছে যে, এটা একটি দেহধারী পদার্থ।

জাফর ইবনে হারাব প্রমুখের অভিমত এই যে, আমরা জানিনা রূহ কি একটি মৌলিক পদার্থ নাকি আরায বা পরমূর্ত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তারা আপনাকে 'রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮৫)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেননি, রূহ কি জাওহার বা মৌলিক পদার্থ না আরায বা পরমূর্ত। তবে গ্রন্থকারের মতে জা'ফর ইবনে হারাব এটা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, রূহ এবং জীবনী শক্তি একই পদার্থ নয়, এরা হলো পৃথক ও ভিন্ন সত্তা।

ইমাম জুববাই এর মতে- রূহ হলো দেহ ও জীবনী শক্তি থেকে মুক্ত, আর জীবনী শক্তি হলো আরায বা পরমূর্ত। আভিধানিক অর্থে "ইনসানের রূহ বের হয়ে গিয়েছে বলা হয়।" ইমাম জুববাই-এর দৃষ্টিতে রূহ আরাযের বা পরমূর্তের অধীন নয়।

অপর এক শ্রেণীর দার্শনিকের মতে রূহকে দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা হয়। তাঁদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সমস্ত জিনিস চারটি উপাদানে ঘটিত যথা– আগুন, বায়ু, পানি ও মাটি। এসবের মধ্যে উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা লক্ষ্য করা যায়।

অপর একশ্রেণীর দার্শনিকের দৃষ্টিতে রূহ হলো চারটি প্রাকৃতিক উপাদানের বহির্ভূত। দুনিয়ার মধ্যে এই চারটি উপাদান ও রূহ অবস্থান করছে। রূহের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। কারো কারো মতে এ অবস্থা হলো স্বাভাবিক, আবার কারো মতে স্বাভাবিক নয়।

কোন কোন চিকিৎসাবিদেরা বলেন, রূহ হলো একটি শক্তি। তাঁরা আরো বলেন, এটা হলো এক ধরনের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার রক্ত যার মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু নেই। অন্য একশ্রেণীর চিকিৎসাবিদের মতে, রূহ জৈবিক উত্তাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আরও একশ্রেণীর চিকিৎসাবিদ আছেন যাদের মতে রূহের অপর নাম জীবন। তবে প্রকৃতিবাদীদের মতে জীবনী শক্তির অপর নামই রূহ।

রূহ সম্পর্কে ইমাম আসিম (র)-এর অভিমত হলো– জীবনী শক্তি বা রূহের জন্য দেহ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, একজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা আছে সেটাই তার দেহ। তিনি আরো বলেন, নাফস বলতে দেহকেই বুঝায়, অন্য কিছুকে নয়।

দার্শনিক এরিস্টটলের দৃষ্টিতে নাফসকে কোনভাবেই প্রভাবান্বিত করা যায় না, এটা একটি স্বাধীন সত্তা। এর কোন ধ্বংস নেই। জীব জগতের সাথে এই নাফসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নাফস এবং দেহ সহঅবস্থান করে। নাফসকে দেহ থেকে পৃথক করা যায় না। এটা তার সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত। যেসব গুণ অন্য প্রাণীর সাথে যুক্ত হয় না, ঐসব শক্তি সম্পর্কে তিনি ঐকমত্য পোষণ করেন।

অর্থাৎ নাফসের ঐসব গুণ অন্য কারো ক্ষেত্রে পৃথক করা যায় না। দুনিয়ার প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এ সম্পর্ক একইভাবে তা বিদ্যমান।

সানবিয়াহ নামক জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত অনুযায়ী নাফস একটি বাস্তব সত্তা। যার নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা আছে। পার্থিব জগতের নাফসের এই পরিধি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বীকৃত। নাফস হলো একটি মৌলিক শক্তির অধিকারী।

দীসানিয়া নামক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে নাফস হলো ঐসব গুণের অধিকারী, যেসব গুণ সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফসের ঐসব গুণ অন্য কারো ক্ষেত্রে পৃথক করা যায় না।

জা'ফর ইবনে মুবাশ্বির এর মতে নাফস হলো জাওহার বা একটি মৌলিক পদার্থ। নাফসের নিজস্ব কোন দেহ নেই। কিন্তু জাওহার বা মৌলিক পদার্থ দেহে অবস্থান করে।

চিন্তাবিদ আবুল হোযায়েলের মতে নাফস হলো রূহ থেকে মুক্ত আর রূহের কোন জীবনী শক্তি নেই। আর জীবনী শক্তি হলো বিমূর্ত পদার্থ। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ স্বপ্নের মধ্যে নাফস ও রূহ উভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু জীবনী শক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এর সমর্থনে কুরআন শরীফের পবিত্র আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো, "আল্লাহ মানুষের রূহ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার রূহকে ছাড়েন না, তবে অন্যান্যদের (রূহকে) ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

জা'ফর ইবনে হারাযের মতে নাফস হলো একটি বিমূর্ত পদার্থ। এটা মানুষের কার্যনির্বাহের একটি সহায়ক শক্তি। আর জাওহার হলো একটি মৌলিক পদার্থ, এটি দেহের কোন গুণে গুণান্বিত নয়।

হযরত আবূ বকর বাকিলানী (র) বলেন, এক শ্রেণীর চিন্তাবিদের মতে নাফস হলো ঐ বায়ু যা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আসা যাওয়া করে। রূহ হলো এটি বিমূর্ত পদার্থ। রূহ হলো নাফস থেকে পৃথক একটি জীবনী শক্তি মাত্র। আবূ বকর বাকিলানী (র) ও তাঁর অনুসারীরা এই মত পোষণ করেন।

মাশশাইঈন সম্প্রদায়ের মতে নাফস কোন দেহ নয়, বিমূর্ত পদার্থও নয়। নাফস কোন জায়গায় আবদ্ধ নয়। সেজন্য এর কোন অবস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, রং বা ভগ্নাংশ নেই। পার্থিব জগতের সাথে এটা যুক্ত বা পৃথক নয়। আর আশআরী সম্প্রদায় এবং এরিস্টটল এই অভিমতই পোষণ করেন।

নাফস সম্পর্কে দার্শনিক ইবনে সীনার অভিমত হলো, কিছু চিন্তাশীল লোকের ধারণা এই যে, দেহ হলো নাফসের একটি সহায়ক শক্তি, এটা কোন প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক নয়, স্থায়ী বা সংকুচিত হওয়ার কারণও নয়। ইবনে সীনা প্রমুখের এই অভিমত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নাফস সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম (র)-এর অভিমত হলো, যাঁরা ইসলাম ও মাযহাবে বিশ্বাসী, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন, নাফস একটি দেহ বা বস্তু যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা রয়েছে, যেটা কোন এক স্থানে অবস্থান করে এবং দেহকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। আসলে নাফস ও রূহ একই জিনিস।

আবূ আবদুল্লাহ ইবনে খতীব নাফস সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমরা যখন কথা বলি, তখন আমরা আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করে থাকি। সেটা হবে হয়তো দেহ নতুবা বিমূর্ত পদার্থ। নাফস দেহ বিশিষ্ট হতে পারে অথবা দেহের সাথে যুক্ত হতে পারে। কিংবা দেহ থেকে পৃথকও হতে পারে। নাফস যে দেহবিশিষ্ট এটা একটি সর্বসম্মত অভিমত। আর অধিকাংশ দার্শনিক এই অভিমত সমর্থন করেন।

নাফস সম্পর্কে যাদের অভিমত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রন্থকারের মতে এরা ছিলেন বিদআতী ও পথভ্রষ্ট। ইমাম রাযী (র) ঐসব বিদ'আতীদের অভিমতগুলো একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে গ্রন্থকারের মতে ইমাম রাযী (র) এ বিষয় কুরআন, হাদীস, মহান সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং আহলে হাদীসের বক্তব্য সম্পর্কে ততোটা অবহিত ছিলেন না। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে উপরোক্ত কোন অভিমতই ঠিক নয়। কেননা ইমাম রাযী (র)-এর অভিমত "মানুষ কেবল দেহবিশিষ্ট মানুষই" এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাবিদের মতে মানুষ দেহ এবং রূহ উভয়ের দ্বারা গঠিত। কোন সময় বিশেষ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে শুধু দেহকেও মানুষ বলা হয়, আবার কোন সময় শুধু রূহকেই মানুষ বলা হয়। মানুষ বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় সে সম্পর্কে চারটি অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। এক. ইনসান শুধু রূহকে বলা হয়। দুই. ইনসান কেবল দেহকে বলা হয়। তিন. দেহ ও রূহ উভয়ের সমষ্টিকে ইনসান বলা হয়। চার. উপরোক্ত তিনটির মধ্যে একটিও ঠিক নয়। তবে নাফসের যে বাকশক্তি আছে, এই বিষয়েও ভিন্নমত রয়েছে।

রূহ সম্পর্কে ইমাম রাযী (র)-এর ছয়টি অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, মানুষ যদি কোন বিশেষ ধরনের দেহ বিশিষ্ট হয়, যা এই প্রকাশ্য দেহের ভেতরে লুকায়িত আছে, তাহলে এই অভিমত সমর্থনকারীগণ এই দেহ নিয়েও বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। এক. এক শ্রেণীর লোকের মতে দেহ বলতে

এর চারটি উপাদানের সংমিশ্রণকে বুঝায়। দুই. অন্য এক শ্রেণীর লোকের মতে এই দেহ হলো রক্ত। তিন. অন্য এক শ্রেণীর লোকের মতে এই দেহ হলো, একটি সূক্ষ্ম রূহ যেটা হৃৎপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়ে ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চার. অন্য একটি মতে এই দেহ হলো রূহ যা হৃৎপিণ্ডে সৃষ্টি হয়ে মস্তকে পৌঁছে যায়। এটাই মানুষের স্মৃতিশক্তি, এরই সাহায্যে মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা করে থাকে। পাঁচ. আরেকটি মত হলো, এই দেহ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডিত অংশ। ছয়. অপর আরেকটির মতে নাফস এটি সত্তা যা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গত দেহ থেকে পৃথক এবং একটি ঊর্ধ্বলোকের নূরানী সূক্ষ্ম দেহ যেটা জীবন্ত ও সচল। এছাড়া একটি মৌলিক পদার্থ যা লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যেমন, গোলাপের মধ্যে নির্যাস, জলপাইয়ের মধ্যে তৈল আর কয়লার মধ্যে আগুন মিশে থাকে, সে পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম সত্তা দেহের মধ্যে সচল ও সক্রিয় থাকে। আর এভাবেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও কল্যাণ কার্যকর হয়ে থাকে। তবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে রূহ কলুষিত হয়ে যায়, তখন রূহের ঐসব শক্তি গ্রহণ করার যোগ্যতা লোপ পেয়ে যায়। রূহ তখনই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূহানী জগতে চলে যায়।

গ্রন্থকারের মতে ইমাম রাযী (র)-এর এই ষষ্ঠ অভিমতটিই কেবল গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল। এছাড়া অন্য কোন অভিমত তাঁর মতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম রাযী (র)-এর এই অভিমতের সমর্থনে কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের ইজমা বা ঐকমত্য, যুক্তি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকার এই অভিমতের স্বপক্ষে শতাধিক প্রমাণ এখানে উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ মানুষের রূহ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার রূহকে ছাড়েন না, তবে অন্যান্যদের (রূহকে) ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪২)

এই আয়াতের মধ্যে ষষ্ঠ অভিমতের পক্ষে তিনটি প্রমাণ রয়েছে। তাহলো- ১. রূহকে উপরে উঠানো, ২. রূহকে আটক করা হয়, ৩. এক পর্যায়ে রূহকে ছেড়ে দেয়া হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আফসোস, যদি আপনি প্রত্যক্ষ করতেন, যখন যালিম মৃত্যুর কষ্টের মধ্যে থাকে, আর ফেরেশতারা তাদের

হাত প্রসারিত করে বলেন, নিজের প্রাণ বের করো। আজকে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।" (সূরা আনআম ঃ আয়াত-৯৩)

এখানে রূহের চারটি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ১. রূহকে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের আগমন, ২. রূহকে দেহ থেকে বের করা, ৩. রূহের বের হয়ে আসা, ৪. ঐসময় রূহের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হওয়া এবং মহান রবের সামনে রূহের উপস্থিত হওয়া।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "তিনিই রাতে তোমাদের রূহ কবয করেন, আর তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর। তারপর তিনি তোমাদেরকে (দ্বিতীয়) দিনে সেই কর্মজগতে ফিরিয়ে পাঠান, যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে।"

"এমনকি যখন তোমাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তার প্রতি প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেন। আর তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন না।" (সূরা আল আনআম ঃ আয়াত ৬০-৬১)

এই আয়াতগুলোর মধ্যে রূহের অবস্থা সম্পর্কে তিনটি প্রমাণ রয়েছে ঃ (৮) রূহকে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়ে নেয়া হয়। (৯) রূহকে আবার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, (১০) মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা রূহকে কবয করেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "হে প্রশান্ত চিত্ত, তোমার রবের দিকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাও এ অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমার রবের নিকট প্রিয়পাত্র। আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা আল ফাজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

এই পবিত্র আয়াতগুলোতে রূহের তিনটি প্রমাণ রয়েছে– ১১. রূহের ফিরে আসা, ১২. রূহের প্রবেশ করা, ১৩. রূহের সন্তুষ্ট হওয়া।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, "আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" আগেকার দিনের মনীষীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ ছিলো, এসব কথা মৃত্যুর সময়, কেয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশের সময়, না এ উভয় স্থানেই বলা হবে। একটি মারফূ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে একবার বলেছিলেন, "এসব কথা ফেরেশতারা তোমাকে তোমার ইনতেকালের সময় বলবেন।" হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেছেন, রূহকে তিনটি স্থানে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হবে। মৃত্যুর সময়, হাশরের দিন ও কেয়ামতের দিন। হযরত আবূ সালিহ (রা) বলেছেন, "একজন নেককার বান্দাকে তাঁর ইনতেকালের

সময় আমার বান্দাদের সাথে মিলিত হও" এই শুভ সংবাদ দেয়া হয়। আর বেহেশতে প্রবেশের শুভ সংবাদ দেয়া হবে কেয়ামতের দিন।"

হাদীস ঃ রূহ যখন কবয করা হয় এবং উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী রূহকে দেখতে পায়। এই হাদীসে রূহের দু'টি প্রমাণ রয়েছে– ১৪. রূহের কবয হওয়া, ১৫. রূহকে দেখতে পাওয়া, ১৬. হযরত খোযায়মা (রা) বলেছেন যে, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কপালে আমার মাথা রেখেছি। আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই স্বপ্নের কথা আরয করলে তিনি বললেন, এক রূহ অন্য রূহের সাথে স্বপ্নের মধ্যে সাক্ষাৎ করে থাকে। তারপর তিনি শির মুবারক উপরে উঠালেন, তখন আমি আমার কপাল তাঁর পবিত্র কপালের উপর স্থাপন করলাম।" (নাসায়ী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রূহ স্বপ্নের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ করে।" এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মতে স্বপ্নের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের রূহের সাথে জীবিত ব্যক্তিদের রূহের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হয়। অতঃপর আল্লাহ যাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তাদের রূহ আটকে রাখেন।

হযরত বিলাল (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের রূহ কবয করা হয়েছিলো, আর তিনি (আল্লাহ) যখন ইচ্ছা করলেন রূহ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এই হাদীসের মধ্যে রূহের দু'টি প্রমাণ আছে– ১৭. রূহকে কবয করা হয়, ১৮. আর রূহকে ফিরিয়েও দেয়া হয়।

হাদীস ঃ মুমিনের রূহ হলো পাখির ন্যায়, যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজি থেকে ফলফলাদি আহার করে। এখানে রূহের দু'টি প্রমাণ রয়েছে– ১৯. রূহ হলো পাখির ন্যায়, ২০. রূহ জান্নাতের বৃক্ষরাজিতে চড়ে, উঠা বসা করে ও সেসবের ফলফলাদি ভক্ষণ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখিদের পক্ষপুটে থাকে। বেহেশতের যেখানে খুশি উড়ে বেড়ায়। আর আরশের মধ্যে ফানুসের মধ্যে অবস্থান করে। তারপর তোমাদের রব তাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি?" এই হাদীসে রূহের ছয়টি প্রমাণ আছে– ২১. রূহ পাখির পক্ষপুটে থাকে, ২২. রূহ জান্নাতে বিচরণ করে, ২৩. রূহ জান্নাতী ফল খায় ও জান্নাতের নহরের পানি পান করে,

২৪. ফানুসে গিয়ে অবস্থান করে, ২৫. আল্লাহ তা'আলা রূহের সাথে কথাবার্তা বলেন, জবাব দেন, ২৬. রূহ দুনিয়ার ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে। এর দ্বারা জানা গেলো রূহ দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে।

রূহ সম্পর্কে এখানে একটি সন্দেহের নিরসন করা হলো। যদি বলা হয়, এইসব গুণ পাখির, রূহের নয়। তাহলে এর জবাব হবে, ঐসব রূহ পাখির মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। আর হযরত আবূ আমর (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে এটা জানা যায়, "আরওয়াহুশ শুহাদায়ে কা তাইরিন" অর্থাৎ "শহীদগণের রূহ পাখির ন্যায়।" কাজেই জানা গেল রূহ পাখির ন্যায়।

হযরত তালহা (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, একদা তিনি কোন এক জঙ্গলের মধ্যে নিজের কৃষি খামার দেখতে গিয়েছিলেন। রাত হয়ে গেলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা)-এর কবরের নিকট অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর কবর থেকে কুরআন শরীফ পাঠের সুমিষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলে ইরশাদ হলো, সে হলো আবদুল্লাহ! তোমরা কি জানো না যে, যাঁর রূহকে কবয করার পর আল্লাহ তা'আলা যমরুদ ও ইয়াকূতের ফানুসে রেখে দিয়েছেন। তারপর ফানুসটিকে জান্নাতের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। রাতের বেলায় এ রূহকে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তারপর সকাল বেলায় সে রূহ আবার ঐখানে ফিরে আসে। এই হাদীস থেকে রূহ সম্বন্ধে চারটি প্রমাণ পাওয়া যায়– ২৭. রূহ বেহেশতের মধ্যে ফানুসে অবস্থান করে, ২৮. রূহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা যাওয়া করে, ২৯. নেককারের রূহ তাদের কবরে কথাবার্তা বলে ও কুরআন তিলাওয়াত করে, ৩০. এছাড়া রূহ একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রূহ সম্পর্কে কুড়িটি প্রমাণ আছে। ৩১. মৃত্যুর সময় মানুষের রূহকে মালাকুল মাউত তাঁর রবের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন রূহকেই এরূপ করা হয়, ৩২. নেক রূহকে আরো বলা হয়, তোমার রবের প্রতিদান ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো, ৩৩. মশকের মুখ দিয়ে পানির ফোঁটার ন্যায় বেরিয়ে এসো, ৩৪. রূহকে মালাকুল মাউতের হাত থেকে অন্য ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। তাঁরা রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান, ৩৫. নেক রূহকে জান্নাতের কাফনের কাপড় পরিয়ে দেয়া হয়, ৩৬. তারপর ফেরেশতারা রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে চলে যান, ৩৭. রূহকে জান্নাতী সুগন্ধিও দেয়া হয়। রূহ থেকে মেশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ৩৮. রূহকে আকাশে তুলে

নেয়া হয়, ৩৯. রূহের জন্য আকাশের সব দরজা খুলে দেয়া হয়। রূহকে আকাশের সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা কর্তৃক বিদায় দেয়া হয়, ৪০. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রূহকে যমীনে ফিরিয়ে আনা হয়, ৪১. রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনা হয়, ৪২. কাফিরদের রূহ কবয করার সময়ে তাকে ভীষণ আযাবের সম্মুখীন হতে হয়, ৪৩. কাফিরদের দেহ থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ৪৪. সেসব রূহকে আকাশ থেকে যমীনে ছুঁড়ে দেয়া হয়। আর তারা যমীনে এসে পড়ে, ৪৫. ফেরেশতারা নেক রূহকে মুবারকবাদ জানান। আর খারাপ রূহের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, ৪৬. কবরের মধ্যে মুনকার-নাকীর মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসান ও সওয়াল-জওয়াব করেন। রূহকে যদি সরাসরি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সেটা হবে অতি সাধারণ ব্যাপার। সেই মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে ঐ রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনা হয়, ৪৭. রূহকে তার রবের নিকট নিয়ে গিয়ে বলা হয়, হে রব! এ হলো আপনার অমুক বান্দা, ৪৮. তখন রবের আদেশ হয়, এর জন্য যেসব নি'আমতের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে, সেগুলো তাকে দেখিয়ে দাও। এছাড়া রূহকে তার জান্নাতী বা জাহান্নামী ঠিকানাও দেখিয়ে দেয়া হয়, ৪৯. ফেরেশতাগণ নেককার রূহের নামাযে জানাযা আদায় করেন, যেমনি দুনিয়ায় মুসলমান মৃত ব্যক্তিদের নামাযে জানাযা আদায় করা হয়, ৫০. রূহ তার জান্নাতী বা জাহান্নামী আবাসস্থল কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে থাকে যদিও তখন দেহের কোন চিহ্ন বা অস্তিত্ব থাকে না।

হাদীস ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যখন একজন মুমিন বান্দার রূহ বের হয়ে আসে, তখন তার থেকে মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হন, আর আসমানের নিচের ফেরেশতাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। আর তাঁরা তার উত্তম আমলসমূহের সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার নামও উল্লেখ করেন। এসব ফেরেশতা রূহ বহনকারী ফেরেশতাগণকে এবং ঐ রূহকে মুবারকবাদ দেন। তারপর তাঁরা রূহকে নিয়ে এর আমল যেসব দরজা দিয়ে ফেরেশতারা আকাশে নিয়ে যান ঐসব দরজা দিয়ে উপরে উঠেন। আর নেক রূহ সূর্যের মতো ঝলমল করতে থাকে, এমনিভাবে তাঁরা পবিত্র আরশ পর্যন্ত পৌছে যান। ফেরেশতারা যখন কাফিরদের রূহ নিয়ে উপরে উঠেন তখন আকাশের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, এই রূহটি কার? ফেরেশতারা তার মন্দ আমলের কথা উল্লেখ করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের। তখন ফেরেশতারা বিরক্ত হয়ে বলেন, এ রূহকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাই ঐ রূহকে সবচেয়ে নিচের যমীনে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই হাদীসে রূহ সম্পর্কে দশটি প্রমাণ আছে– ৫১. রূহে বের হওয়া, ৫২. নেক রূহ থেকে খুশবু

ছড়িয়ে পড়া, ৫৩. ফেরেশতাগণ কর্তৃক রূহকে নিয়ে যাওয়া, ৫৪. অভ্যর্থনাকারী ফেরেশতাগণ কর্তৃক রূহকে মুবারকবাদ জানানো, ৫৫. রূহকে কবয করা, ৫৬. রূহকে নিয়ে উপরে উঠা, ৫৭. নেকরূহের রওশনীতে আকাশসমূহ উদ্ভাসিত হওয়া, ৫৮. রূহের পবিত্র আরশ পর্যন্ত পৌছা, ৫৯. ফেরেশতা কর্তৃক রূহকে প্রশ্ন করা। আসলে রূহকে এ ধরনের প্রশ্ন একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবেই করা হয়, ৬০. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বদ রূহকে সবচেয়ে নিচের যমীনে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যখন কোন মুমিন ব্যক্তির রূহকে বের করা হয়, তখন সেই রূহকে নিয়ে দু'জন ফেরেশতা আকাশের দিকে উঠেন, তখন আকাশবাসী ফেরেশতাদেরকে তাঁরা বলেন, এটি একটি পবিত্র রূহ যা যমীন থেকে এসেছে। তখন আকাশবাসী ফেরেশতারা বলেন, হে রূহ! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আর ঐ দেহের উপরও যেটা তোমার আবাসস্থল ছিলো। তারপর সুগন্ধিসহ তাকে তার রবের নিকট ফেরেশতারা নিয়ে পৌছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, একে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দাও। এই হাদীসে রূহ সম্পর্কে ছয়টি প্রমাণ রয়েছে- ৬১. দু'জন ফেরেশতার রূহের সাথে সাক্ষাৎ করা, ৬২. দু'জন ফেরেশতা কর্তৃক রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠা, ৬৩. ফেরেশতাদের একথা বলা যে, এই পবিত্র রূহ যমীন থেকে এসেছে, ৬৪. ফেরেশতা কর্তৃক রূহের জন্য দু'আ করা, ৬৫. রূহের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়া, ৬৬. রূহকে নিয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়া।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রূহ সম্পর্কে দশটি প্রমাণ আছে- ৬৭. রূহের পবিত্র দেহে অপবিত্র দেতে অবস্থান করা, ৬৮. ফেরেশতাদের নেক রূহকে একথা বলা যে, হে নেক রূহ! বের হয়ে এসো, তুমি প্রশংসারযোগ্য, ৬৯. রূহকে শান্তি ও নিআমতের শুভ সংবাদ দেয়া, রূহ দেহ থেকে বের হয়ে যে স্থানে যাবে সেখানকার শুভ সংবাদ দান, ৭০. আকাশ পর্যন্ত এই শুভ সংবাদ পৌছে যাওয়া, ৭১. রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া, ৭২. নেক রূহকে একথা বলা যে, প্রসন্নচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করো, ৭৩. রূহের ঐ আকাশ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া যেখানে আল্লাহ তা'আলা সমাসীন আছেন, ৭৪. বদকার ও কাফিরের রূহের প্রতি একথা বলা যে, লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে যাও, ৭৫. কাফিরের রূহের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ রাখা, ৭৬. কাফিরের রূহকে যমীনের দিকে ছুঁড়ে দেয়া, তারপর কবরে ফিরে আসা।

৭৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রূহ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনীর ন্যায়। সেখানে যেসব রূহের মধ্যে পরিচয় হয়েছিলো, এখানেও তাদের মধ্যে সখ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর যাদের মধ্যে তা হয় না, তারা অপরিচিত থেকে যায়। এখানে সমস্ত রূহকে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৭৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রূহের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়। রূহের মধ্যে ভালো ও মন্দ আছে।

৭৯. হযরত ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রূহ বহু দূরদূরান্ত থেকেও পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে, যদিও এর আগে এদের কোন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

৮০. ঐসব আসার বা হাদীস যা আদম (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যখন রূহ হযরত আদম (আ)-এর মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো, তখন তাঁর হাঁচি এলো এবং তিনি "আলহামদুলিল্লাহ" বলেছিলেন। তাঁর রূহ যখন চোখে পৌছালো, তখন তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদি দেখতে পেলেন। এরপর সেই রূহ যখন তাঁর পেটের মধ্যে পৌছালো, তখন তিনি ক্ষুধা অনুভব করলেন। যখন তাঁর কদম মুবারকে রূহ পৌছালো, এই অবস্থায় তিনি দাঁড়ালেন। তবে এটা সত্য যে, রূহ দেহে প্রবেশ করার সময়েও কষ্ট হয়, আবার বের হওয়ার সময়ও কষ্ট হয়।

৮১. রূহের মধ্যে ভালো ও মন্দ আছে। রূহকে বের করানোর এবং প্রবেশ করানোর বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রূহকে বের করার, রূহের আলো ও অন্ধকারের যে অবস্থা উল্লেখ আছে, তা সবই সত্য। আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহ থেকে প্রদীপের ন্যায় যে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়, সেটাও রূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

৮২. হযরত তামীমুদদারী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মুমিনদের রূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয় ও তাঁকে সিজদাহ করে। আর ফেরেশতারা তাদেরকে শুভ সংবাদ দান করেন। আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মাউতকে বলেন, আমার এই নেক বান্দার রূহকে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দাও।

৮৩. রূহের অবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত আসার বা হাদীস বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, মৃত্যুর পর রূহের

অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। তবে সেসব স্থান কোথায় সে সম্পর্কে কোন ঐকমত্য নেই।*

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "মানুষের দেহ আবার কবরে গঠিত হবে। তারপর যখন ইসরাফীল (আ) তাঁর শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, তখন সকল রূহ তাদের দেহে প্রবেশ করবে। তখন যমীন ফেটে যাবে, আর সকল মানুষ তাদের কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে।"

শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, "হযরত ইসরাফীল (আ) সব রূহকে আহবান করবেন, তখন সমস্ত রূহ সেখানে সমবেত হবে। মুমিনদের রূহ হবে উজ্জ্বল, আর কাফিরদের রূহ হবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হযরত ইসরাফীল (আ) সব রূহকে তাঁর শিঙ্গায় রেখে দেবেন, তারপর এর মধ্যে ফুঁ দেবেন। সেই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ হবে, আমার ইযযতের কসম, প্রত্যেকটি রূহ নিজেদের দেহে চলে যাও। অবশেষে সব রূহ শিঙ্গা থেকে মৌমাছির মতো বেরিয়ে আসবে। এভাবে আকাশ এবং পাতালের সব জায়গা রূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং প্রতিটি রূহ নিজের দেহে প্রবেশ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে যমীনে ফেটে যাবে। আর সমস্ত মানুষ কবর থেকে বের হয়ে তাদের রবের দিকে দৌড়াতে থাকবে। অবশেষে আহবানকারী ফেরেশতার নিকট ছুটে এসে দাঁড়াবে। আর প্রত্যেকেই আহ্বানকারীর সেই আওয়াজ শুনতে পাবে। তারপর সবাই দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে।" আল্লাহর রাসূল যে সংবাদ দিয়েছেন, তা একেবারেই সত্য ও সঠিক। আল্লাহ তা'আলা সেই অবস্থায় মানুষের নতুন কোন রূহ পয়দা করবেন না। বরং ঐসব রূহেই সমাবেশ হবে, যারা দুনিয়ায় ভালো বা মন্দ কাজ করে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দেহ পয়দা করে তাদেরকে তার মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।

---

* মানুষের দেহের সাথে রূহের তিন প্রকার সম্পর্ক রয়েছে ঃ

প্রথমটি হলো– 'রূহে মুকিম' বা স্থায়ী রূহ। এটাই আসল রূহ। এই রূহ দেহ থেকে বিদায় নিলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিশক্তি ও অনুভব শক্তি চিরতরে রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার রূহ হলো– 'রূহে জার' বা প্রতিবেশীসুলভ রূহ। এর অপর নাম 'রওয়া'। এই রূহ দেহ থেকে চলে গেলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ফিরে আসলে জেগে উঠে। এই রূহ মানুষের দু'চোখের মাঝখানে অবস্থান করে।

তৃতীয় প্রকার রূহ হলো– 'রূহে আমীন'। এটা সব সময় মানব দেহে অবস্থান করে। এমনকি মৃত্যুর পরেও এই রূহ দেহে বা কবরে থেকে যায়। কারো কারো মতে, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল-জওয়াব এই রূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। (তথ্যসূত্র ঃ তাহযীবুস সালাত) –অনুবাদক

৮৪. কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে রূহ ও দেহ্ উভয়ে ঝগড়া করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হবে। এমনকি রূহ্ দেহের সাথে ঝগড়া করবে। রূহ্ বলবে, হে রব! আমি আপনার সৃষ্ট রূহ্ ছিলাম। আপনি আমাকে দেহের মধ্যে অর্পণ করেছিলেন। আমার কোন অপরাধ নেই। দেহ্ বলবে, হে রব! আমি একটি দেহ্ ছিলাম, যাকে আপনি পয়দা করেছিলেন। আর অগ্নিসম এই রূহ্ আমার ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। এর দরুন আমি উঠা বসা করতাম, দাঁড়াতাম এবং চলাফিরা করতাম। আমি কোন অন্যায় করিনি, আমার কোন অপরাধ নেই। তখন ইরশাদ হবে, আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিচ্ছি। ইরশাদ হলো– একবার এক অন্ধ ও এক খঞ্জ কোন এক বাগানে গেলো। খঞ্জ অন্ধ ব্যক্তিকে বললো, আমি ফলফলাদি দেখতে পাচ্ছি, যদি আমার পা সুস্থ্ থাকতো তবে এগুলো পেড়ে আনতাম। অন্ধ ব্যক্তি বললো, আমি তোমাকে আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি। অন্ধ ব্যক্তি খঞ্জকে তার কাঁধে তুলে নিলো, তারপর খঞ্জ ব্যক্তি ফল পেড়ে আনলো এবং উভয়ে খেলো। এখন বলো, তোমরা কে অপরাধী? তারা উত্তর দিলো, আমরা উভয়েই অপরাধী। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফয়সালা করেছো।

৮৫. কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে যেসব হাদীস ও সাহাবাদের বর্ণনা রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির দেহ্ মাটির সাথে মিশে গেলে তার কোন নাম-নিশানা থাকে না। কিন্তু তার আযাব বা আরাম কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকে। আরো জানা গেলো, বরযখের আযাব বা আরামের সাথে একজন মৃত ব্যক্তি সরাসরি জড়িত।

৮৬. যখন শহীদগণের রূহকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের ইচ্ছা কী? তখন তাঁরা বলেন, আমাদের রূহকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যেন আবারও আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। লক্ষণীয় যে, এই ধরনের সওয়াল ও জওয়াব এমন সত্তাকে করা হয়, যারা বুদ্ধিমান ও বাকশক্তিসম্পন্ন। যাদের মধ্যে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার এবং স্ব স্ব দেহে প্রবেশ করার যোগ্যতা বিদ্যমান। আর ঐসব রূহকে যাঁরা জান্নাতে চলাফিরা করে তাঁদেরকেই এই প্রশ্ন করা হয়। অথচ এসব মৃত ব্যক্তির দেহ অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

৮৭. হযরত সালমান ফারেসী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের রূহ বরযখে তাঁদের ইচ্ছা মতো চলাফিরা করে। আর কাফিরদের রূহ সিজ্জীন নামক স্থানে বন্দী থাকে।

৮৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে হযরত আদম

(আ)-এর ডানে ও বামে সকল রূহকে দেখেছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানও প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

৮৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে আকাশমণ্ডলীতে মর্যাদা অনুযায়ী আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ দেখেছিলেন। তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করেছিলেন। তাঁদের দেহ মুবারক ছিলো সে সময় যমীনে।

৯০. হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের রূহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর আশেপাশে দেখতে পেয়েছিলেন।

৯১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বরযখে রূহের বিভিন্ন ধরনের আযাব হতে দেখেছিলেন। বুখারী শরীফে হযরত সামুরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এদের দেহ অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।

৯২. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "শহীদগণ তাঁদের রবের কাছে জীবিত আছেন, তাঁরা পানাহার করেন তাঁরা আনন্দিত এবং আপন ভাইদের আনন্দদায়ক অবস্থার কথা শুনে সন্তুষ্ট হন।" শহীদগণের রূহেরই এই বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। শহীদগণের দেহ কেয়ামতের দিন আবার সৃষ্টি হবে।

৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা বেদীন ও বিদআতীদের অনেক ভ্রান্ত মতবাদ বাতিল হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, একদিন কোন এক জায়গায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময়ে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। "তুমি যদি যালিমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলতে থাকেন, দাও, বের করো তোমাদের জানপ্রাণ, আজ তোমাদেরকে সেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।" তারপর ইরশাদ করলেন, আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন রয়েছে, কোন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে সে জান্নাতী কি জাহান্নামী এটা দেখে বিদায় গ্রহণ করে। তার অন্তিম সময়ে ফেরেশতাদের দু'টি দল যমীন থেকে আকাশ পর্যন্ত তার নিকট উপস্থিত থাকেন। ফেরেশতাদের চেহারা সূর্যের মতো চমকাতে থাকে। আর অন্তিম যাত্রীই কেবল ওদেরকে দেখতে পায়, যদিও তোমরা দেখতে পাও সে ব্যক্তি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ ফেরেশতাদের হাতে কাফন ও খুশবু থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী যদি মুমিন হন, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন। আর বলেন,

৮৪. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে রূহ ও দেহ উভয়ে ঝগড়া করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হবে। এমনকি রূহ দেহের সাথে ঝগড়া করবে। রূহ বলবে, হে রব! আমি আপনার সৃষ্ট রূহ ছিলাম। আপনি আমাকে দেহের মধ্যে অর্পণ করেছিলেন। আমার কোন অপরাধ নেই। দেহ বলবে, হে রব! আমি একটি দেহ ছিলাম, যাকে আপনি পয়দা করেছিলেন। আর অগ্নিসম এই রূহ আমার ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। এর দরুন আমি উঠা বসা করতাম, দাঁড়াতাম এবং চলাফিরা করতাম। আমি কোন অন্যায় করিনি, আমার কোন অপরাধ নেই। তখন ইরশাদ হবে, আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিচ্ছি। ইরশাদ হলো– একবার এক অন্ধ ও এক খঞ্জ কোন এক বাগানে গেলো। খঞ্জ অন্ধ ব্যক্তিকে বললো, আমি ফলফলাদি দেখতে পাচ্ছি, যদি আমার পা সুস্থ থাকতো তবে এগুলো পেড়ে আনতাম। অন্ধ ব্যক্তি বললো, আমি তোমাকে আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি। অন্ধ ব্যক্তি খঞ্জকে তার কাঁধে তুলে নিলো, তারপর খঞ্জ ব্যক্তি ফল পেড়ে আনলো এবং উভয়ে খেলো। এখন বলো, তোমরা কে অপরাধী? তারা উত্তর দিলো, আমরা উভয়েই অপরাধী। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফয়সালা করেছো।

৮৫. কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে যেসব হাদীস ও সাহাবাদের বর্ণনা রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির দেহ মাটির সাথে মিশে গেলে তার কোন নাম-নিশানা থাকে না। কিন্তু তার আযাব বা আরাম কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকে। আরো জানা গেলো, বরযখের আযাব বা আরামের সাথে একজন মৃত ব্যক্তি সরাসরি জড়িত।

৮৬. যখন শহীদগণের রূহকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের ইচ্ছা কী? তখন তাঁরা বলেন, আমাদের রূহকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যেন আবারও আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। লক্ষণীয় যে, এই ধরনের সওয়াল ও জওয়াব এমন সত্তাকে করা হয়, যারা বুদ্ধিমান ও বাকশক্তিসম্পন্ন। যাদের মধ্যে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার এবং স্ব স্ব দেহে প্রবেশ করার যোগ্যতা বিদ্যমান। আর ঐসব রূহকে যাঁরা জান্নাতে চলাফিরা করে তাঁদেরকেই এই প্রশ্ন করা হয়। অথচ এসব মৃত ব্যক্তির দেহ অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

৮৭. হযরত সালমান ফারেসী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের রূহ বরযখে তাঁদের ইচ্ছা মতো চলাফিরা করে। আর কাফিরদের রূহ সিজ্জীন নামক স্থানে বন্দী থাকে।

৮৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে হযরত আদম (আ)-এর ডানে ও বামে সকল রূহকে দেখেছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানও প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

৮৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফে আকাশমণ্ডলীতে মর্যাদা অনুযায়ী আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ দেখেছিলেন। তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করেছিলেন। তাঁদের দেহ মুবারক ছিলো সে সময় যমীনে।

৯০. হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের রূহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর আশেপাশে দেখতে পেয়েছিলেন।

৯১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বরযখে রূহের বিভিন্ন ধরনের আযাব হতে দেখেছিলেন। বুখারী শরীফে হযরত সামুরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এদের দেহ অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।

৯২. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "শহীদগণ তাঁদের রবের কাছে জীবিত আছেন, তাঁরা পানাহার করেন তাঁরা আনন্দিত এবং আপন ভাইদের আনন্দদায়ক অবস্থার কথা শুনে সন্তুষ্ট হন।" শহীদগণের রূহেরই এই বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। শহীদগণের দেহ কেয়ামতের দিন আবার সৃষ্টি হবে।

৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা বেদীন ও বিদআতীদের অনেক ভ্রান্ত মতবাদ বাতিল হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, একদিন কোন এক জায়গায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময়ে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। "তুমি যদি যালিমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলতে থাকেন, দাও, বের করো তোমাদের জানপ্রাণ, আজ তোমাদেরকে সেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।" তারপর ইরশাদ করলেন, আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন রয়েছে, কোন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে সে জান্নাতী কি জাহান্নামী এটা দেখে বিদায় গ্রহণ করে। তার অন্তিম সময়ে ফেরেশতাদের দু'টি দল যমীন থেকে আকাশ পর্যন্ত তার নিকট উপস্থিত থাকেন। ফেরেশতাদের চেহারা সূর্যের মতো চমকাতে থাকে। আর অন্তিম যাত্রীই কেবল ওদেরকে দেখতে পায়, যদিও তোমরা দেখতে পাও সে ব্যক্তি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ ফেরেশতাদের হাতে কাফন ও খুশবু থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী যদি মুমিন হন, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন। আর বলেন, হে প্রশান্ত আত্মা! আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে বের হয়ে এসো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সম্মানিত নিআমত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সবকিছুর চেয়ে উত্তম। ফেরেশতারা বার বার তাকে ঐ শুভ

সংবাদ দিতে থাকেন এবং তার জন্য তারা মায়ের চেয়েও অধিক স্নেহপরায়ণ দয়ালু হয়ে থাকেন। তারপর তাঁরা তার রূহকে শরীরের প্রত্যেক অংশ থেকে টেনে বের করেন। যে অঙ্গ থেকে রূহকে টেনে বের করা হয়, সে অঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। ফেরেশতাদের জন্য এ কাজটি খুবই সহজ যদিও তোমাদের জন্য তা খুব কঠিন। অবশেষে রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর শিশু যেমনিভাবে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার সময় হকচকিয়ে যায়, এর চেয়েও অনেক বেশি হকচকিত অবস্থায় রূহ দেহ থেকে বের হয়ে আসে। এই অবস্থায় উপস্থিত সকল ফেরেশতাই ঐ রূহকে কবয করতে চান। কিন্তু রূহ কবয করার ব্যাপারে মালাকুল মাউত এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মালাকুল মাউত এভাবে সে লোকটির জান কবয করেন। তারপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বক্তব্য শেষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, "তাদেরকে বলুন, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি নিজের মুষ্টির মধ্যে ধারণ করে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।" (সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত-১১)

"তারপর মালাকুল মাউত ঐ ব্যক্তির রূহকে সাদা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে নেন, তারপর একে বুকের সাথে লাগান এবং মায়ের চেয়েও বেশি আদর করেন। এর থেকে মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতাগণ এই পবিত্র খুশবু গ্রহণ করেন এবং তার নিকট এসে বলেন, এই পবিত্র খুশবু ও পবিত্র রূহের প্রতি মারহাবা। হে আল্লাহ! এ রূহের প্রতি আপনি রহমত বর্ষণ করুন। আর ঐ দেহের উপরও যেখান থেকে এ রূহ বের হয়ে এসেছে। তারপর তারা রূহকে নিয়ে উপরে চলে যান। তখনও এর থেকে মেশকের চেয়ে অধিক প্রিয় খুশবু ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফেরেশতাগণ ঐ রূহের সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায পড়েন এবং তার সাথে সাথে থাকেন। তার জন্য আকাশের সব ফটক খুলে দেয়া হয়। তারপর এ রূহ যে আকাশ অতিক্রম করে, ওখানকার ফেরেশতারা ঐ রূহের প্রতি স্বাগত জানান। ফেরেশতারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ঐ রূহকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছান। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে পবিত্র রূহ, তোমাকে মুবারকবাদ। হে ফেরেশতাগণ! একে জান্নাতে নিয়ে গিয়ে এর জান্নাতী স্থান আর সম্মানের যাবতীয় উপকরণ দেখিয়ে দাও, যা আমি এর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। তারপর একে পৃথিবীতে নিয়ে যাও। আমি ফয়সালা করেছি যে, আমি মানুষকে মাটি দিয়ে পয়দা করেছি, এর মধ্যে একে ফিরিয়ে আনবো, আর পুনরায় মাটি দিয়েই পয়দা করবো। তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান রয়েছে, জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় রূহ দেহ থেকে বের হওয়ার চেয়েও বেশি হকচকিয়ে যায়। সে বলে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাও, ঐ দেহের মধ্যে যেখানে

আমি আগে ছিলাম? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা তো আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অধীন। আর তোমাদেরও সে হুকুম না মেনে উপায় নেই। এভাবে ফেরেশতাগণ তাকে নামিয়ে আনেন। এই সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তার গোসল ও কাফনের কাজ সেরে ফেলেন। তারপর ফেরেশতারা রূহকে দেহ ও কাফনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন।" এই হাদীসের প্রতিটি শব্দকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে যাবতীয় ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটবে।

৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, মুমিনের মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তাদের হাতে জান্নাতী ফল ও কাফন থাকে। ঐ কাফনে রূহ কবয করা হয়। তার থেকে এমন সুগন্ধ বের হয় যে, এমন সুগন্ধ কেউ কখনো গ্রহণ করেনি। এমনকি তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদাহ করেন, তারপর রূহ আল্লাহকে সিজদাহ করে। তারপর হযরত মীকাঈল (আ)-কে ডেকে বলা হয়, এই রূহকে নিয়ে মুমিনদের রূহের সাথে রেখে দাও যে পর্যন্ত না আমি কিয়ামতের দিন আবার এ ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি।

সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনের রূহ আরশের সম্মুখে নিদ্রাজনিত মৃত্যু ও স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে সিজদাহ করে। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে গিয়ে রূহের উত্তম সালাম হলো– "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি শান্তিদাতা, তোমার কাছে রয়েছে শান্তি। তুমি সকল প্রতাপ, ইযযাত এবং বরকতের অধিকারী।"

রূহ সম্পর্কে প্রখ্যাত কাযী নুরুদ্দীন (র) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি তাঁর খালার মৃত্যুর সময় তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁর খালা একজন খুবই নেককার ও ইবাদতকারিণী ছিলেন। একবার খালা আমার নিকট জানতে চাইলেন, একটি রূহ যখন দেহ থেকে বের হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট হাযির হয় তখন কিভাবে সেই রূহ আল্লাহকে সালাম পেশ করে। এটা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম" বলে আল্লাহর কাছে সালাম পেশ করে। এরপর তিনি ইনতেকাল করলেন। একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, স্বপ্নে তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমাকে আল্লাহর সামনে হাযির করলে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কি বলবো তা বুঝে উঠতে পারিনি। হঠাৎ তোমার কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তা মনে পড়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলার সমীপে সেটাই বলে দিলাম।

৯৫. এটা সকলেই জানেন যে, জীবিতদের রূহ মৃতদের রূহের সাথে স্বপ্নযোগে মিলিত হয় এবং তাদের থেকে কিছু কিছু বিষয় জেনে নেয়। এছাড়া অনেক অজানা বিষয়ও রূহেরা জানিয়ে দেয়। সেসব বিষয় জাগ্রত অবস্থায়ও বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটতে শুনা যায়।

একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহকে স্বপ্নযোগে অনেক নিদর্শন দেখানো হয়, এটা হলো এক রূহের সাথে অন্য রূহের সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ আগেকার দিনের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত ঃ তাঁর এক প্রতিবেশী হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে গালিগালাজ করতো। একদিন সে তাঁদেরকে খুব বেশি গালিগালাজ করলো, যার ফলে আমার ও তার মধ্যে হাতাহাতিও হয়ে গেলো। অবশেষে আমি গভীর দুঃখ ও মনোবেদনায় বাড়িতে পৌঁছলাম। আমি ঐদিন মনের দুঃখে খানা পর্যন্ত খেলাম না এবং এই অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, আমি তাঁর খিদমতে অভিযোগ পেশ করলাম যে, অমুক ব্যক্তি আপনার সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাকে গালমন্ধ করে? তখন আমি বললাম, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে। তখন তিনি আমাকে একটি ছুরি দিলেন।... সুতরাং আমি স্বপ্নের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিকে জবাই করে দিলাম, আমার হাত রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। আমি ছুরিটি মাটিতে ফেলে দিলাম এবং মাটিতে হাত মুছতে লাগলাম। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং আমি শুনতে পেলাম ঐ ব্যক্তির ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। আমি জানতে চাইলাম, এটা কিসের চিৎকার? লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি হঠাৎ মারা গেছে। সকাল বেলা আমি গিয়ে দেখলাম তার গলায় জবাই এর চিহ্ন বিদ্যমান। (আল কিরওয়ানীর কিতাবুল বুস্তান)

জনৈক কুরাইশ বংশীয় শাইখ থেকে বর্ণিত ঃ তিনি একবার সিরিয়ায় কোন এক ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, যার অর্ধেক চেহারা ছিলো কালো রংয়ের। সেই ব্যক্তি তার চোহারার কালো অংশটুকু ঢেকে রাখতো। তিনি তাকে এর কারণ কি জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিলো, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, এ সম্পর্কে যে কেই জানতে চাইবে আমি অবশ্যই তাকে তা জানাবো। আমি হযরত আলী (রা)-কে অনেক গালমন্দ দিতাম। এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কোন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, তুমিই কি আমাকে গালমন্দ দেও? তখন সে ব্যক্তি আমাকে একটি চড় মারলো। সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে দেখলাম লোকটি যে জায়গায় চড় মেরেছিলো সে স্থানটি কালো হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত তা কালোই আছে। (কিতাবুল মানামাত)

হযরত সুফিয়া বিনতে শাইবাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা

হলো। তিনি একদিন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একজন মহিলা আসলেন যাঁর একটি হাত ছিলো পট্টি বাঁধা। মহিলাটি বললেন, "এই হাতের ব্যাপারে আমি আপনার নিকট এসেছি।" আমার পিতা ছিলেন একজন দানশীল ব্যক্তি। একবার আমি স্বপ্নে একটি হাউজ দেখলাম। সেখানে লোকের ভিড় ছিলো, তাদের প্রত্যেকের হাতে গ্লাস ছিলো। যে কেউ তাদের কাছে যায়, তাকে তারা পানি পান করায়। আমি সেখানে আমার পিতাকেও দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার আম্মা কোথায়? আমার পিতা বললেন, ঐ যে তোমার আম্মা। আমি দেখলাম আমার মায়ের পরিধানে ছোট একটি কাপড়ের টুকরো আর হাতে এক টুকরো চর্বি। আমার মাকে সারা জীবনে শুধু ঐ ছোট এক টুকরো কাপড় এবং গরুর গোশত থেকে এক টুকরো চর্বি দান করতে দেখেছি। আমি দেখলাম আমার মা সেই চর্বির টুকরো চাটছেন আর পানির পিপাসায় পানি পানি করে চিৎকার করছেন। আমি তখন তাঁকে এক গ্লাস পানি পান করালাম। এর পরপরই আমি শুনতে পেলাম, "একে কে পানি পান করিয়েছে, এর হাত বেকার হয়ে যাক।" একথাগুলো আমি উপর দিক থেকে শুনতে পেলাম। আর ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখি আমার হাত পঙ্গু হয়ে গেছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসলিমাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসব কথার উপর বাইআত করেছি যে, আমি শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা করা, কারো প্রতি অপবাদ দেয়া এবং প্রভৃতি গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করবো। উক্ত অঙ্গীকারের উপর আমি এখানো টিকে আছি। আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলাও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন, আর আমাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তারপর উক্ত মহিলা একবার একজন ফেরেশতাকে স্বপ্নে দেখলেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "তুমি তো তোমার সৌন্দর্য প্রদর্শন করো আর তা প্রকাশ করো, আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করো না, প্রতিবেশীকে কষ্ট দাও আর তোমার স্বামীর সাথে অবাধ্য আচরণ করো। তারপর ফেরেশতা তার চেহারার উপর পাঁচটি অঙুলী রেখে বললেন, উক্ত পাঁচটি গুনাহের পরিবর্তে এই পাঁচটি আঙুল রাখলাম যদি তুমি আরো গুনাহ করো তাহলে তোমাকে আরো আঙুলের চাপ দেয়া হবে।" সকাল বেলা মহিলা ঘুম থেকে উঠলে পাঁচটি আঙুলীর চিহ্ন তার চেহারার মধ্যে দেখা গেলো।

আবদুর রহমান ইবনে কাসেম, মালিক নামক জনৈক লোক থেকে শুনেছিলেন যে, ইয়াকূব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশাজ একজন সৎলোক ছিলেন। যেদিন তিনি শাহাদাতবরণ করেন ঐদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন- তিনি যেন জান্নাতে প্রবেশ করছেন, আর তাঁকে সেখানে দুধ পান করানো হচ্ছে। কেউ যেন তাকে বললো,

আচ্ছা আপনি বমি করেন তো। তিনি বমি করলেন। এতে দুধই বের হয়ে আসলো। ঐ লোকটি পরের দিন শহীদ হয়ে গেলেন। আবদুর রহমান ইবনে কাসেম বলেন, ঐ লোকটি সামরিক জাহাজে এমন জায়গায় ছিলেন যেখানে দুধ পাওয়া যেতো না। এমনকি দুধ দেয়ার মতো কোন প্রাণীও ছিলো না।

হযরত নাফে (রা) একজন প্রখ্যাত ক্বারী ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে মেশকের সুগন্ধ বের হতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে আপনি কি সুগন্ধি মেখে আসেন? তিনি বললেন, না, আমি সুগন্ধির নিকটেও যাইনি। তবে একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, তিনি আমার মুখের কাছে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আমার মুখ থেকে খুশবু বের হয়।

হযরত রাবী ইবনে রাক্কাসী (র) থেকে বর্ণিত ঃ এক সময় তার নিকট দু'জন লোক এসে বসলো এবং জনৈক ব্যক্তির গীবত করতে লাগলো। আমি তাদেরকে থামিয়ে দিলাম। তারপর কিছুদিন পর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক হাবশী আমার নিকট একটি প্লেট নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে শুকরের মাংসের একটি বড় টুকরো ছিলো। সে আমাকে বলতে লাগলো, "খাও"। আমি বললাম, আমি কি করে শুকরের মাংস খাবো। সে আমাকে ধমক দিলো। অবশেষে আমি তা খেতে বাধ্য হলাম। তিনি বললেন, সকালে ঘুম থেকে উঠলে আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসতে লাগলো। আর এ দুর্গন্ধ দু'মাস পর্যন্ত ছিলো। (কিতাবুর রুইয়া)

হযরত আলা ইবনে যিয়াদের একটি স্বপ্নের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত আলা ইবনে যিয়াদ একরাত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন। একরাতে তিনি ঘরের লোকদেরকে বললেন, আমি আজ খুবই ক্লান্ত, তোমরা আমাকে তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ে জাগিয়ে দিও। কিন্তু তাঁরা কেউ তাঁকে জাগাননি। এই অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেনো তাঁর মাথার চুল ধরে বলছে, "হে আলা! আপনি উঠুন ও আল্লাহকে স্মরণ করুন। তাহলে আল্লাহও আপনাকে স্মরণ করবেন।" ঐ চুলগুলো আলা ইবনে যিয়াদের ইনতেকালের পরও খাড়া ছিলো। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে বিসতাম (র) আলা ইবনে যিয়াদের ইনতেকালের পরে তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সে সময় পর্যন্ত তাঁর মাথার ঐ চুলগুলো খাড়াই ছিলো।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত ঃ আমরা একদিন মক্কা শরীফে মসজিদে হারামে বসা ছিলাম। ঐ সময়ে একব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলো। লোকটির মুখের অর্ধেক ছিলো কালো ও বাকী অর্ধেক ছিলো সাদা। সে বললো, "হে

লোকসকল! আমার থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। আমি শাইখাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে গালমন্দ করতাম। একরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন এসে আমার গালে চড় মারলো আর আমাকে বললো, হে আল্লাহর শত্রু, হে ফাসিক, তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা)-কে গালমন্দ করো? ঘুম ভাঙ্গার পর দেখা গেলো, আমার মুখের রং অর্ধেক কালো হয়ে গেছে, যা আজ পর্যন্ত কালোই রয়ে গেছে।

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহলিবী (র)-এর একটি স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, আমি একরাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক ব্যক্তির ঘরের বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। সে সময় দেখতে পেলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি টিলার উপর বসে আছেন। আর তাঁর সামনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে ও হযরত আবূ বকর (রা)কে গাল-মন্দ করে। ইরশাদ হলো, লোকটিকে এখানে নিয়ে এসো। তাকে সেখানে নিয়ে আসা হলো, দেখা গেলো, সে আম্মানের একজন অধিবাসী। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে গালি দেওয়ার ব্যাপারে সে খুবই পরিচিত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, একে এখানে শোয়াও। তাঁরা তাকে শোয়ালেন।... হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, অবশেষে চিৎকার শুনে আমি জেগে গেলাম। আমি মনে করলাম, তাকে গিয়ে এই স্বপ্নের কথা জানাবো। হয়তো সে তাওবাহ করে নিজেকে সংশোধন করে নেবে। যখন আমি তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কান্নার আওয়ায শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? লোকজন আমাকে বললো, কাল রাতে কোন ব্যক্তি আম্মানবাসী লোকটিকে তার বিছানায় যবাই করে ফেলেছে। তারপর আমি তার নিকট গিয়ে তার ঘাড়টি প্রত্যক্ষ করলাম। দেখতে পেলাম, তার এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত জমাট রক্ত লেগে আছে।

মসজিদে নববীর এক সময়ের ইমাম হযরত আবুল হাসান মুত্তালেবী (র) থেকে বর্ণিত ঃ একদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে গালিগালাজ করতো। একদিন ফজরের নামাযের পর একজন লোক আমাদের কাছে আসলো, তার চোখ দুটি বের হয়ে গালের উপর লটকানো ছিলো। তার থেকে আমরা এর কারণ জানতে চাইলাম। সে বললো, গতরাত্রে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। হযরত আলী (রা) তাঁর সম্মুখে আছেন আর হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)ও সেখানে আছেন।

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই ব্যক্তি আমাদেরকে কষ্ট দেয় এবং গাল-মন্দ করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবুল কায়েস, তোমাকে কে এসব গালি শিখিয়েছে? সে হযরত আলী (রা)-কে দেখিয়ে বললো, উনি। একথা শুনে হযরত আলী (রা) নিজের দু'টি আঙুল দ্বারা আমার চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, তুমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার চোখ দু'টি উঠিয়ে দেন। এই অবস্থায় হযরত আলী (রা)-এর আঙুল দুটি আমার চোখে ঢুকে পড়লো। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে সময় আমার চোখ দু'টো বের হয়ে এসে গালের উপর লটকিয়ে গেলো। লোকটি তখন কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করেছিলো।

জনৈক বিশিষ্ট আলিম কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, তাঁদের নিকট এমন একজন লোক ছিলেন যিনি সবসময় রোযা রাখতেন। কিন্তু বিলম্বে রোযা খুলতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, দু'জন কালো রংয়ের লোক তাঁর হাত ধরে তাঁকে একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। ঐ লোকটি ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমাকে ওখানে নিক্ষেপ করছেন কেন? তাঁরা বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উল্টো কাজ করো। তিনি তো তাড়াতাড়ি রোযা খোলার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তুমি সেই আদেশ অমান্য করে দেরীতে রোযা খোলো। এই ঘটনার পর থেকে লোকটি আগুনের তাপে কালো হয়ে গিয়েছিলো। এই জন্য সে তার মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতো।

কোন একজন লোক স্বপ্নের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা ও ব্যথা অনুভব করলো। এই অবস্থায় কেউ যেন তাকে খানা খাওয়ালো, পানি পান করালো ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করলো। ঘুম ভাঙ্গার পর সে দেখতে পেলো তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অসুখ সেরে গেছে। অনেকেই এরূপ ঘটনা স্বপ্নে দেখে থাকেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ এক দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। এই অবস্থায় একজন সিন্দীর অধিবাসী তাঁকে বললো, আপনাকে যাদু করা হয়েছে। তিনি বললেন, কে যাদু করেছে? সে বললো, একজন দাসী যার কোলে একটি বাচ্চা ছিলো। আর ঐ বাচ্চাটি তার উপর পেশাব করে দিয়েছিলো। মা আয়িশা (রা) ঐ দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে যাদু করেছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি জানতে চাইলেন, কেন? সে উত্তর দিলো, আপনি যাতে বিলম্ব না করে আমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দেন। তারপর হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর ভাইকে ডেকে এনে যার থেকে সে মুক্ত হতে চায় তার থেকে ঐ দাসীকে মুক্ত করে দেন। তারপর হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেন

তাঁকে বলছেন, "তিন কূপের পানি মিশিয়ে ঐ পানি দিয়ে আপনি গোসল করুন।" তিনি তাই করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে যাদুর প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পেলেন।

স্বপ্নযোগে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর পবিত্র হাত বুলানীতে এক ব্যক্তির চোখের জ্যোতি ফিরে পাওয়ার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত সাম্মাক ইবনে হারাব (র)-এর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর চোখের উপর হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন, "ফোরাত নদীতে তিন দিন গোসল করে নাও।" তিনি তাই করলেন এবং তাঁর চোখের স্বাভাবিক জ্যোতি ফিরে পেলেন।

হযরত ইসমাঈল ইবনে বিলাল হাযরামী (র) এক সময় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্নযোগে তাঁকে কোন বুযুর্গ বলে দিয়েছিলেন, ইয়া কারীবু, ইয়া মুজীবু, ইয়া সামীয়াদ্দুআয়ী, ইয়া লাতীফু, বি মাইঁয়াশাউ রুদ্দা আলাইয়া বাসারী। এই দু'আটি পড়ে তুমি তোমার চোখে ফুঁকে দাও। তিনি তাই করলেন এবং আল্লাহর মেহেরবাণীতে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী জাফর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এই অবস্থায় তিনি আয়াতুল কুরসী পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছেন এবং একে অপরকে বলছেন, ইনি এমন একটি বরকতময় আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে তিনশ ষাটটি রহমত নিহিত আছে। এই বেচারা কি এতোসব রহমত থেকে একটি রহমতও পাবে না। এরপর তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আর ঐদিন থেকেই তাঁর অসুখ কমতে লাগলো।

জনৈকা নেককার মহিলা পেটের ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাঁকে বলছেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি অভাবমুক্ত। আপনি গোলাপ নির্যাস ব্যবহার করুন।" তিনি তাই করলেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁর পেটের ব্যথা সেরে গেলো।

উপরোক্ত নেককার মহিলা এরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে বলছেন, "সানায়ে মক্কীর পাতা, খাঁটি মধু আর কালো ছোলার পানি হাঁটুর ব্যথাগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার করতে দিন। জনৈক মহিলা আমার নিকট তাঁর হাঁটুর ব্যথার অভিযোগ করলে, আমি তাঁকে আমার স্বপ্নে দেখা ঔষুধ ব্যবহার করতে বললাম। তিনি তাই করলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

প্রখ্যাত হাকীম জালীনুস থেকে বর্ণিত, স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে শিঙ্গায় চিকিৎসার

নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অল্প বয়সেই তিনি এই সম্পর্কে দু'বার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা জানেন, যিনি তাঁর এই চিকিৎসার দ্বারা পাঁজরের ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। আরও অনেকেই ঐ চিকিৎসার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।

বিশিষ্ট হাকীম ইবনে খাররায থেকে বর্ণিত ঃ জনৈক ব্যক্তি পেটের অসুখে আক্রান্ত হন এবং তিনি তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন। রোগীটি তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। আমি তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম, তখন তিনি বললেন, আমি হাকীম জালীনুসকে স্বপ্নে দেখলাম, তাঁকে একজন হাজীর মতো দেখাচ্ছিলো এবং তাঁর হাতে একটি লাঠিও ছিলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পেটের অসুখে ভুগছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে বললেন, "গুলকান্দ ও মুসতালিগী ব্যবহার করো।" আমি এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করলাম, তাতে আমার রোগ সেরে গেলো। স্বপ্নে এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা পদ্ধিতি দু'ভাবে প্রসার লাভ করেছে। একটি হলো স্বপ্নযোগে, অন্যটি হলো প্রযুক্তি, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া এমনকিছু চিকিৎসা আছে যা কামিল ব্যক্তিদের অন্তরে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন। এই বিষয়ে তথ্য জানতে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা তারীখুল আতিব্বা এবং কীরাওয়ানী কর্তৃক লিখিত কিতাবুল বুস্তান পড়ে দেখতে পারেন।

রূহের অস্তিত্ব সম্পর্কে এ গ্রন্থে যেসব আলোচনা করা হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

৯৬. পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অস্বীকার করেছে, আর তা থেকে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৪০)

অর্থাৎ মৃত্যুর পর কাফিরদের রূহ উপরে উঠার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় না। এই প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক হাদীস আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহের জন্য আকাশের ফটক খুলে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে, কাফিরদের রূহের জন্য আকাশের ফটক খোলা হয় না।

৯৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে উদ্দেশ্য করে একবার ইরশাদ করেছেন, "হে বিলাল! বেহেশতে আমার সামনে আমি তোমার পায়ের চলার শব্দ শুনেছিলাম। তুমি এমন কি আমল করো? হযরত বিলাল (রা) আরয করলেন, যখন আমার ওযূ ভেঙ্গে যায় তখনই আমি আবার ওযূ করে নেই এবং দু'রাকাত নামায আদায় করি। ইরশাদ হলো, এটা তোমার নামাযের প্রতিদান। আসলে, তিনি হযরত বিলাল (রা)-এর রূহের আওয়ায শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁর দেহতো দুনিয়াতেই ছিলো, আর তখন তিনি জীবিতই ছিলেন।

৯৮. মহান সাহাবাগণের বর্ণনা ও হাদীস শরীফ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো যে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ বিষয়গুলো হলো, কবর যিয়ারত, কবরবাসী যে তাদের সালামকারীদেরকে চিনতে পারে, কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে যে সালাম করা হয় এবং কবরবাসীরা তাদের সালামের জবাব দেয়।

৯৯. অনেক সময় মৃত ব্যক্তির রূহ তাদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন যে, তাদের খারাপ আমলের দরুন তাদের কষ্ট হয়। সুতরাং জীবিত আত্মীয়-স্বজনের উচিত তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সেগুলো সংশোধন করা।

১০০. রূহ যদি বিমূর্ত বা জড় পদার্থ হতো, যা দেহের ভেতরের জিনিস নয়, তাহলে আমরা বের হয়ে গেছি, দাঁড়িয়েছি, বসেছি, এসেছি, চলাফেরা করেছি, প্রবেশ করেছি, ফিরে এসেছি ইত্যাদি কথা বলা অবান্তর হতো। কেননা বিমূর্ত বা জড়পদার্থ সম্পর্কে এগুলো নেতিবাচক। অথচ সবারই একথা জানা যে, এসব বিষয় সঠিক ও সত্য।

এই ধরনের প্রমাণ মানুষের বাক্য ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে হাকীকত ও মাজায অর্থাৎ বাস্তব ও রূপক এ দু'টির সম্ভাবনা থাকে। হতে পারে এখানে এটা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের প্রমাণের ভিত্তি, বুদ্ধিবিবেচনা ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। যখন বলা হয় আসলাম, গেলাম, তখন মূলত রূহের আসা যাওয়াকেই বুঝায়। আর সেটা হয় দেহের অধীন।

১০১. দেহ হলো রূহের বাহন বা মহল। তাই দেহের পরিচর্যা রূহই করে থাকে। কাজেই দেহের আসা যাওয়া এবং স্থানান্তরিত হওয়া এসব রূহের বাহনেরই কাজ। যদি রূহের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের ক্ষমতা না থাকতো, তাহলে এটা এমন হতো যেমন কারো সওয়ারী আসা-যাওয়া করে কিন্তু সে নিজে সওয়ার নয়। অথচ এটা একটি ভুল ধারণা। এছাড়া সকলেই জানেন যে, রূহ প্রবেশও করে, বেরও হয়। আর দেহ রূহের অধীন থেকে প্রবেশ করে ও বের হয়ে আসে। মানুষের জ্ঞান চক্ষু রূহকে আসতে ও যেতে দেখতে পায়।

১০২. রূহ যদি বিমূর্ত হতো, তাহলে একই সময়ে একজন মানুষ হাজার হাজার রূহে পরিবর্তিত হতো। আসলে, মানুষ শুধু রূহের কারণে মানুষ, দেহের কারণে নয়। রূহকে এভাবে বিমূর্ত স্বীকার করলে, এই মানুষই অন্য মানুষ হিসেবে গণ্য হতো। মোট কথা, একই মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারতো। অথচ মানুষ একজনই। যদি রূহ একটি স্বতন্ত্র সত্তা হতো আর দেহের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকতো, রূহ যদি কোন দেহে অবস্থান করতো, তাহলে

এটা সম্ভব হতো। এই অবস্থায় একটি রূহের সম্পর্ক এক দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে অন্য দেহে যুক্ত হয়, যেমন কোন একজন প্রশাসক এক এলাকা থেকে বদলী হয়ে অন্য এলাকায় চলে যান, তখন সেখানকার লোকজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়, এই রূহটি কি প্রথম রূহ নাকি দ্বিতীয় রূহ। এই ব্যক্তি কি প্রথম ব্যক্তি নাকি অন্য কেউ। জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত। রূহ যদি বিমূর্ত হতো বা স্বতন্ত্র জিনিস হতো, তাহলে উক্ত প্রশ্ন দেখা দিতো।

১০৩. মানুষ এটা বিশ্বাস করে যে তার রূহ, জ্ঞান, চিন্তাধারা, ভালোবাসা, শত্রুতা, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি ইত্যাদি মানবিক গুণে ভূষিত। আর এটাও একজন মানুষ জানে যে এসব গুণে গুণান্বিত রূহ বিমূর্ত নয় এবং মৌলিক পদার্থও নয় যা তার দেহ থেকে পৃথক হয়, আর দেহের প্রতিবেশীও নয়। এটাও মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে এসব অনুভূতি এমন একটি জিনিসের যা তার দেহের ভেতরে রয়েছে। শ্রবণ করা, দর্শন করা, ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ গ্রহণ করা, বাছাই করা, নড়াচড়া করা বা না করা বা এসবের দ্বারাই রূহ প্রভাবিত ও কার্যকর হয়। কাজেই রূহ কোন মৌলিক বা বিমূর্ত পদার্থ নয়। যেহেতু বিমূর্ত ও মৌলিক পদার্থের দ্বারা এসব কার্যকর হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং এমন স্থান গ্রহণকারী পদার্থের দ্বারা সম্ভব যা জগতে বিদ্যমান এবং যা স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এই গুণ ঐ দেহের যার মধ্যে রূহ রয়েছে। সেই রূহ বের হয়ে গেলে দেহ প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

১০৪. রূহ যদি কোন মৌলিক স্বতন্ত্র পদার্থ হতো আর দেহের সাথে তার কর্তৃত্বের সম্পর্ক থাকতো যেমন থাকে মাঝির তাঁর নৌকার সাথে, উষ্ট্র চালকের তার উটের সাথে; তাহলে রূহের এক দেহের সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হতো। সেই ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দেহ থেকে অন্য কোন নির্দিষ্ট দেহে রূহের স্থানান্তর বা গমনের নিয়ম চালু হতো, যেটা মোটেই সম্ভব নয়।

এখন কেউ যদি বলে যে, রূহ ও দেহের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক রয়েছে অথবা নিজের দেহের সাথে রূহের সহজাত অনুরাগ রয়েছে, অথবা সত্তাগত ভালোবাসা বিরাজমান আছে, তাহলে রূহের অন্য দেহে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব। এর উত্তরে বলা যায়, একটি স্থান বিশিষ্ট ও একটি স্থানহীন জিনিসের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সম্ভব নয়। তবুও যদি রূহ দেহের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে দেহের অবসানের সাথে সাথে রূহও ধ্বংস হয়ে যেতো। এছাড়াও দেহের এবং রূহের ঐক্যের পরে উভয়ের মধ্যে স্থায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ঠিক নয়। আর যদি এরা উভয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তৃতীয় আরেকটি সত্তা জন্ম নেবে। এতে দেহ এবং রূহের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি একটি স্থায়ী হয় আর অপরটি ধ্বংস হয়,

তাহলেও এদের মধ্যে কোন ঐক্য থাকতো না। তাই রূহের সাথে দেহের স্বাভাবিক ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, যেজন্য রূহ আনন্দ উপভোগ করে। আর দেহ যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনে রূহের সমতুল্য হয়, তখন দেহ আর রূহের সম্পর্ক সমান হয়ে যায়। তাহলে এ ধারণা সঠিক নয় যে, বিশেষ রূহ বিশেষ দেহের জন্য আকৃষ্ট। যেমন কোন পিপাসিত ব্যক্তি গ্লাস ভর্তি পানি দেখে যে কোন একটি বেছে নেয়। ঠিক তেমনি ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট একটি গ্লাসের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে না।

১০৫. রূহ যদি একটি স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ হতো, আর বিশ্বজগতের ভেতরে বাহির না হতো বরং মধ্যপন্থী হতো, তাহলে সেটা দুনিয়ার সংশ্লিষ্ট, পৃথক কিংবা নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতী হতো না। তাহলে স্পষ্টভাবে জানা যেতো যে, রূহের এই সব গুণের সাথে সম্পর্ক আছে। কেননা মানুষের নিজের রূহ ও তার গুণাবলী সংক্রান্ত জ্ঞান অন্য যে কোন জানা জিনিসের চেয়ে স্পষ্ট ও প্রবল। মানুষের অন্যান্য জানা বিষয় নিজের রূহ সংক্রান্ত জ্ঞানের আওতাধীন। কিন্তু এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। সবাই জানে যে এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে রূহের যুক্ত থাকা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে এই ধরনের ধ্যান-ধরণা পোষণ করে সে নিজের রূহকে চিনতে পারেনি, আর তার রবের পরিচয়ও লাভ করতে পারেনি।

১০৬. এখানে রূহ ও দেহের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রূহ দেহের মধ্যে অবস্থান করে এবং রূহের যাবতীয় গুণাবলী এই দেহকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পায় ও কার্যকর হয়। দৃশ্যত আমরা আমাদের দেহকে ভিত্তি করে আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকি। আসলে রূহই হচ্ছে সকল শক্তির আধার। যদিও রূহকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

১০৭. দেহ একটি দৃশ্যমান বস্তু। রূহের যাবতীয় গুণাবলী ও অনুভূতি এই দেহই ধারণ করে আছে। এই অনুভূতি বা গুণাবলী সাময়িক হোক অথবা স্থায়ী হোক এতে কিছু যায় আসে না। রূহের অনুভূতি ও গুণাবলী রূহেরই অধীন। রূহের ধারক যে জাওহারে মুজাররাদ অর্থাৎ স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ, এই ধারণা ঠিক নয়।

১০৮. রূহ যদি দেহের সাথে সম্পর্ক বিহীন হয়, আর দেহের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির দেহের কর্মকাণ্ডের সাথে রূহ সম্পৃক্ত হতে পারবে না। কেননা যে জিনিস অধীনতা স্বীকার করে না সেটা সেই শক্তির সাথে সংশ্লিষ্টও হয় না। যদি এটা ঠিক হতো, তাহলে রূহের কর্মকাণ্ড অন্য রকম হতো। আর দেহের সাথে তার কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনই হতো না। আসলে রূহের কর্মচাঞ্চল্য ছাড়া দেহ কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না। সুতরাং রূহকেই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, দেহকে নয়। রূহ এবং দেহ উভয় মিলেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

কারো কারো ধারণা এই যে, রূহ মানুষের দেহকে প্রভাবিত না করেই তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নয়। আসলে রূহই দেহকে গতিশীল করার ক্ষমতা রাখে। বস্তুত প্রত্যেকটি জিনিস যা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বা দেহের সাথে যুক্ত আছে, সেগুলো দেহের সাথেই মিশে আছে, সেটাই দেহ।

রূহের সাথে দেহের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা কতোটুকু কার্যকর তা নির্ভর করে দেহের সাথে রূহের সম্পৃক্ততার উপর। রূহ এবং দেহ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দেহকে ছেড়ে রূহ তার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করতে পারে না। তাই রূহ ও দেহের মধ্যে সমঝোতার ও সংশ্লিষ্টতার সম্পর্ক অপরিহার্য। দেহ এবং রূহ কেউ কারো অধীন নয়। তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে। সুতরাং রূহ এবং দেহ উভয়কে একযোগে কাজ করে যেতে হবে, ভিন্নভাবে নয়।

১০৯. সকল জ্ঞানী ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ সচেতন, বাকসম্পন্ন, পানাহারকারী, লালন-পালনযোগ্য, অনুভূতিশীল এবং স্বেচ্ছায় চলাফিরা করতে সমর্থ। এসব গুণ দু'প্রকারের– কতেক দেহ সম্পর্কিত ও কতেক রূহ সম্পার্কিত। রূহ যদি স্বতন্ত্র একটি মৌলিক পদার্থ হয়, যা জগৎ সংসারের ভেতরে নয় বা বাইরেও নয়; বা তাদের সাথে জড়িত বা পৃথকও নয়, তাহলে মানুষও সেই প্রকৃতিরই হতো। জ্ঞানী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে এসব ধারণা সঠিক নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে একজন মানুষ রূহ ও দেহ সহকারে জগৎ সংসারে বিদ্যমান আছে। কেউ যদি মনে করে যে, নাফস হলো আদিম, অনাদি ও চিরন্তন, তাহলে সে ধারণা হবে ভুল ও অবান্তর। কেননা এই অবস্থায় একজন মানুষের দেহের অর্ধেক হতো সৃষ্ট ও বাকী অর্ধেক হতো চিরন্তন।

মানুষ কি? মানুষ হলো স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ। আর সেটাই মানুষের তত্ত্বাবধায়ক শক্তি। তাই জিজ্ঞাসা যে, এই স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ কি মানুষ নাকি অন্য কিছু, না এটাই মানুষের প্রকৃতস্বরূপ। তবে দু'টোর মধ্যে একটা হতেই হবে। এখানে প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মানুষের নাফসকে গণ্য করা হয়। আসলে, মানুষের হাকীকত বা বাস্তবতা তত্ত্বাবধায়ক নয়। কেননা সমস্ত মানুষের ও সৃষ্টি জগতের তত্ত্বাবধায়ক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করে, মানুষ কি? তখন তিনি মানুষের দেহের দিকেই ইঙ্গিত করেন। মানুষের দেহের মধ্যে যে স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ আছে সে দিকে ইঙ্গিত করেন না। এটা একটি স্পষ্ট বিষয়, যার মধ্যে সন্দেহের বা ভুলভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।

১১০. প্রকৃতজ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন যে, মানুষকে যখন সম্বোধন করা হয়, তখন

মানুষের দেহ ও রূহ উভয়কেই করা হয়। ভালো-মন্দ, শান্তি ও অশান্তি, উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের কেন্দ্রস্থল হলো, এই দেহ ও রূহ। তবে যদি কেউ বলে, এসব বিষয়ের কেন্দ্র হলো স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ, তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা শুনে অবাক হবেন। ঐ ব্যক্তিকে সর্বসম্মতিক্রমে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করবেন।

যাঁরা রূহকে দেহ থেকে পৃথক মনে করেন তাঁদের কিছু বক্তব্য ও প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম প্রমাণ– জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকলেই দেহ ও রূহ বা নাফস ও দেহ এভাবে উল্লেখ করে থাকেন। এতে বুঝা যায় যে, রূহ হলো দেহ থেকে পৃথক অন্য কিছু। যদি রূহই দেহ হতো তাহলে তাঁদের এরূপ কথার কোন অর্থ হতো না।

দ্বিতীয় প্রমাণ– তাঁদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এই যে, এমন কোন কিছু কোথাও নেই যা অবিভাজ্য, যেমন বিন্দু বা কোন মৌলিক পদার্থ। কাজেই এটা অত্যাবশ্যক যে, এমন সব জিনিসের জ্ঞানও অবিভাজ্য হওয়ার যোগ্য। তাই জানা গেলো যে, নাফস ও অবিভাজ্য। নাফস যদি দেহ হতো তাহলে এটা দেহের মতো বিভক্তির যোগ্য হতো। আরো বলা যেতে পারে, উলূমে কুল্লিয়া বা সামগ্রিক জ্ঞানের প্রভাব যদি দৈহিক হতো, তাহলে ঐ জ্ঞান বিভক্ত হয়ে যেতো। কোন জিনিসকে যদি ভাগাভাগি করা হয়, তাহলে সেটা তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়ে থাকে। তাই জ্ঞানের কোন বিভক্তি সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় প্রমাণ– এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কাল্পনিক ভাবমূর্তিগুলো স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এই ভাবমূর্তিগুলো সংগ্রহের কারণে অথবা সংগ্রহ করার কারণে তা হয়ে থাকে। কেননা এই ভাবমূর্তিগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন পন্থায় একত্রিত করা হয়। অন্য কারণ হলো যৌগিক শক্তি যাকে নাফস বলা হয়।

চতুর্থ প্রমাণ– যৌগিক শক্তি সীমাহীন কার্যাবলীর উপর ক্ষমতাশীল। কেননা এটা সীমাহীন অনুভূতির উপর নির্ভর করে। আর দৈহিক শক্তি সীমাহীন কার্যাবলীর উপর ক্ষমতাশীল নয়। কেননা দৈহিক শক্তি ক্ষেত্র বিশেষে ভাগাভাগি হতে পারে। যে জিনিস কতেক কার্যাবলীর উপর ক্ষমতাশীল হয়, অনিবার্য কারণে তার পরিমাণ কম হতে বাধ্য। অপরপক্ষে যে জিনিস বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর ক্ষমতাশীল, অবশ্যই এর শক্তি হবে অধিক। আমাদের দেহের মধ্যে যে শক্তি কাজ করে, সেটা সক্রিয় হতে পারে বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে। এটা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। দৈহিক শক্তি বা বুদ্ধিদীপ্ত শক্তি দেহের অস্তিত্ব হতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণ– বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি যদি দেহের মধ্যে সক্রিয় হয়, তাহলে তাকে সেই দেহের অনুধাবণকারী হতে হবে, না হয় একেবারেই অনুভূতিহীন হতে হবে। উভয় অভিমতই ভ্রান্ত ও বাতিল। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির দৈহিক অনুভূতি যদি অবিকল

দেহের অস্তিত্ব হয়, তাহলে এটা হবে এক অসম্ভব ব্যাপার। আর যদি এর অস্তিত্বের কোন সমতুল্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হয় বা দেহে ক্রিয়াশীল শক্তির ধারক হয়, তাহলে দু'টির অবস্থা একইভাবে একত্রিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। তবে এরকম হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। জানা গেলো, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি যদি যাবতীয় জ্ঞানের অনুভূতি লাভ করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নাফস জ্ঞান অর্জন করেছে। কাজেই এই জ্ঞান সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকা জরুরী। যদি এতোটুকু জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট হয় বা না হয়, তাহলে কোন সময়ই জ্ঞান অর্জিত হবে না। যদি কোন সময় জ্ঞান অর্জিত হয় আর কোন সময় না হয়, তাহলে সেটা হবে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ব্যাপার।

ষষ্ঠ প্রমাণ– প্রত্যেক ব্যক্তি তার রূহকে উপলব্ধি করে থাকে। এই অনুভব করার অর্থ হলো রূহের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসের প্রকৃত রূপ কি তা জানা। এভাবে যখন রূহ সম্পর্কে আমাদের জানা হয়ে যায়, তখন আমাদের দেহ সম্পর্কেও আমরা সঠিক ধারণা করতে পারি। কাজেই প্রথম অবস্থায় প্রমাণিত হলো যে, আমাদের সত্তা আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এই অবস্থা তখনই সম্ভব, যখন একটি রূহ তার স্বতন্ত্র সত্তাসহ কোন কিছুকে ধারণ করে মুক্ত হয়। কেননা রূহ যদি বিশেষ কোন স্থানের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে রূহ ঐখানেই থেকে যাবে।

সপ্তম প্রমাণ– হযরত আবুল বারাকাত বাগদাদী (র)-এর অভিমত এই যে, পদ্মফুল ভর্তি সমুদ্র, ইয়াকূতের পাহাড় এবং বহু সংখ্যক সূর্য ও চাঁদের কল্পনা করা সম্ভবপর। এই সব জিনিসের কাল্পনিক আকৃতি অস্তিত্বহীন নয়। কেননা কল্পনা শক্তির মাধ্যমেই এই সব জিনিসের আকৃতি আমরা দেখতে পাই, যদিও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এসব কল্পনা সময় সময় এমন বাস্তব ও জীবন্ত রূপ ধারণ করে যে, যেন সেগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়। এসব কল্পনার বস্তু একেবারেই অস্তিত্বহীন হলে এমনটি হতো না। প্রকৃতপক্ষে, এসব কল্পনার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে মনের দিক দিয়ে এদের অস্তিত্ব আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এসব কল্পনার ক্ষেত্র হবে দেহ কিম্বা দেহের অভ্যন্তর। অন্যথায় কোনটাই হবেনা। এই দু'টোর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। সমুদ্র ও পাহাড়ের আকৃতি অনেক বড়, আর মানুষের অন্তর ও মেধাশক্তি সে তুলনায় ক্ষুদ্র। কোন বৃহৎ কাল্পনিক জিনিস দেহের মধ্যে ধারণ করা সম্ভবপর নয়। তাই জানা গেলো যে, এসব কাল্পনিক ছবির ক্ষেত্র দেহ নয়, দৈহিকও নয়।

অষ্টম প্রমাণ– যদি বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি দৈহিক হতো, তাহলে একজন লোক বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে যেতো, যদিও তা হচ্ছে না।

নবম প্রমাণ– বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য দেহের মুখাপেক্ষী নয়। আর

যে জিনিস দেহের উপর নির্ভরশীল নয় সেসব তার দেহ থেকে নিরপেক্ষ হওয়া জরুরী। দেহ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি মুক্তি লাভের কারণ এই যে, সে নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। আর বুদ্ধিবৃত্তি ও নাফসের মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই মাধ্যম ছাড়াই রূহ সক্রিয় এবং সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে। উপরন্তু, দেহের বাহন হলো বুদ্ধিবৃত্তি। এছাড়া বুদ্ধিমত্তা ও দেহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা পঞ্চইন্দ্রিয় বলতে, দর্শন ও শ্রবণশক্তি, ধ্যান-ধারণা ও অনুমান শক্তিকে বুঝায়। যেহেতু এগুলো দৈহিক এজন্য এদের সত্তা অনুধাবন করা তাদের উপরই নির্ভর করে। যদি বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি দৈহিক হতো তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল কাজ কঠিন হতো। আর এসব কাজের উৎপত্তিস্থল হলো নাফস। নাফস যদি তার অস্তিত্বের জন্য দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো, তাহলে ঐসব কার্য দেহের অংশ গ্রহণ ছাড়া সম্পন্ন হতো না। কিন্তু এরূপ হতে দেখা যায় না। জানা গেল বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি দেহের মুখাপেক্ষী নয়।

দশম প্রমাণ– দৈহিক শক্তি অধিক পরিশ্রমের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই দুর্বলতার দরুন কোন কঠিন কাজ সে সমাধা করতে পারে না। এর কারণ সুস্পষ্ট। অধিক পরিশ্রমের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়, যে জন্য এগুলোতে দুর্বলতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, অধিক পরিশ্রমের দরুন বুদ্ধিমত্তার কোন প্রকার দুর্বলতা আসে না। কাজেই জানা গেলো, এটা দৈহিক শক্তি নয়।

একাদশ প্রমাণ– একথা সর্বজনবিদিত, কালো রং হলো সাদা রংয়ের বিপরীত। উভয়ের স্বরূপও আমাদের জানা আছে। উল্লেখ্য যে, কালো ও সাদা রংয়ের সংমিশ্রণ, উষ্ণতা ও শীতলতার সংমিশ্রণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এরূপ সংমিশ্রণ বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে অসম্ভব কিছু নয়। যেহেতু এটা দৈহিক শক্তি নয়।

দ্বাদশ প্রমাণ– যদি অনুধাবনের ক্ষেত্র দেহ হতো, তাহলে দেহের কোন কোন অংশের ব্যাপারে সে অজ্ঞ থাকতো এবং কোন কোন অংশের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকতো। তাহলে মানুষের একই সময় জ্ঞানী হওয়া, অজ্ঞ থাকা অনিবার্য হতো, অথচ এটা সম্ভবপর নয়।

ত্রয়োদশ প্রমাণ– যখন কোন দৈহিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ ধরনের নকশা বা আকৃতি গড়ে উঠে, তখন ঐ নকশা বিদ্যমান থাকার কারণে অন্য কোন নকশা সৃষ্টি হতে পারে না। তবে জ্ঞানগত নকশা হলো এর বিপরীত। রূহ যখন যাবতীয় জ্ঞান ও অনুভূতি থেকে শূন্য হয়, তখন এর পক্ষে কোন বিদ্যাচর্চা করা কঠিন হয়। তারপর যখন রূহ কিছু শিখে নেয় তখন ঐ জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই জানা গেলো, দৈহিক নকশা হলো নমুনার বিপরীত ও উল্টো, আর মানসিক নকশা হলো নমুনার সহায়ক ও সহযোগিতাকারী।

চতুর্দশ প্রমাণ- কোন রূহ যদি দেহ হতো, তাহলে কারো পা নাড়ানোর ইচ্ছা বা পা নাড়ানোর মাঝে কিছু না কিছু সময়ের ব্যবধান হতো। নাফসই দেহের সঞ্চালন শক্তি এবং তাকে গতিশীল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। দেহ যদি পায়ের সঞ্চালনকারী শক্তি হতো, তাহলে ঐ সঞ্চালনের মধ্যে দেহ সক্রিয় থাকতো, অথবা ঐ শক্তি অন্য কোথাও থেকে আসতো। সেই ক্ষেত্রে ঐ সঞ্চালন শক্তির জন্য সময়ের প্রয়োজন। তাই জানা গেলো, পায়ের নড়াচড়ার শক্তি অন্য কোথাও থেকে এসেছিলো।

পঞ্চদশ প্রমাণ- নাফস যদি দেহ হতো, তাহলে তা খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার যোগ্য হতো। সেই অবস্থায় মানুষ কতেক অঙ্গের অনুধাবন করতো আর কতেক অঙ্গের অনুধাবন করতে পারতো না, কিন্তু এটা সম্ভবপর নয়।

ষোড়শ প্রমাণ- রূহ যদি দেহ হতো তাহলে দেহের মধ্যে এর প্রবেশের কারণে দেহের ওযন বেড়ে যেতো। কারণ একটি শূন্য দেহের বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তার মধ্যে কোন জিনিস প্রবেশ করে, তখন তার ওযন বেড়ে যায়। একটি খালি মশকের ওযন হালকা হয়, আর যখন এর মধ্যে পানি ভরা হয়, তখন এর ওযন ভারী হয়ে যায়। কিন্তু রূহের ব্যাপার এর বিপরীত। যখন একজন মানুষের রূহ তার দেহে বিদ্যমান থাকে তখন তা হালকা হয়। রূহ যখন বের হয়ে যায় তখন দেহের ওযন বেড়ে যায়।

সপ্তদশ প্রমাণ- রূহ যদি দেহবিশিষ্ট হতো তাহলে এটাও অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায় দৈহিক গুণে গুণান্বিত হতো। তাই রূহ দেহধারী নয়।

অষ্টাদশ প্রমাণ- রূহ যদি দেহবিশিষ্ট হতো তাহলে যাবতীয় অনুভূতি শক্তির কোন একটির দ্বারা প্রভাবিত হতো। এটা দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন দেহকে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিনতে হতো। আবার কোন কোন দেহকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিনতে পারা যায়। অথচ রূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিনতে পারা যায়না। এটা হলো ঐ প্রমাণ যেটা দার্শনিক জাহাম যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করেছিলো তার সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী ঐ ব্যক্তি বলেছিলো, "আল্লাহ যদি সত্যি বিদ্যমান থাকতেন, তাহলে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁর পরিচয় লাভ করা যেতো।" সে প্রসঙ্গে দার্শনিক জাহাম রূহের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর তখনই সঠিক হতে পারে, যখন রূহ দেহ বিশিষ্ট না হয়। অন্যথায় রূহের পরিচয় কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করা যেতো।

উনিশতম প্রমাণ- রূহ যদি দেহ বিশিষ্ট হতো, তাহলে তার মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিদ্যমান থাকতো, যেগুলো জড় পদার্থে বা তার অন্য কোন আধারের মধ্যে থাকে। একটি রূহের উপাদান বা আধার যদি অন্য রূহ হয়, তাহলে রূহের

আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে একজন মানুষকে দু'জন মানুষ হিসেবে গণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যেটা মোটেই সম্ভবপর নয়।

বিশতম প্রমাণ– কোন একটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো এটাকে বিভক্ত হয়ে যায়। দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ বৃহৎ অংশের মতো নয়। রূহ যদি বিভক্ত করা যায় আর তার প্রত্যেক অংশই যদি রূহ হয়, তাহলে একজন মানুষের একাধিক রূহ থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষের প্রত্যেক অংশ যদি রূহ না হয় তাহলে গোটা মানুষটিও রূহ বলে গণ্য হবে না। যেমন পানির একটি ফোঁটা যদি পানি না হয়, তাহলে এর সমষ্টিও পানি হবে না।

একুশতম প্রমাণ– যে কোন দেহ নিজের হিফাযত ও স্থায়িত্বের জন্য রূহের উপর নির্ভরশীল। তাই রূহ দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর দেহ বিলীন হয়ে যায়। একটি রূহ যদি দেহ বিশিষ্ট হয়, তাহলে সেই রূহ অন্য রূহের মুখাপেক্ষী হতো। এর দ্বারা, 'তাসালসুল' অর্থাৎ বিবর্তন বা সীমাহীন ক্রমবিকাশ আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বাইশতম প্রমাণ– রূহ যদি দেহ বিশিষ্ট হয়, আর ঐ দেহের সঙ্গে সম্পর্ক যদি অনুপ্রবেশজনিত হয়, তাহলে রূহের দেহে অনুপ্রবেশ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এছাড়া রূহের দেহে অনুপ্রবেশ যদি প্রতিবেশীসুলভ হয়, তাহলে একই ব্যক্তিকে দু'টি দেহের অধিকারী হতে হয়। সেই ক্ষেত্রে একটি দেহ দৃষ্টিগোচর হবে, অন্যটি হবে না।

গ্রন্থকারের মতে উপরে বর্ণিত সকল যুক্তি ও প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাই এসব ভ্রান্ত ধারণা ও প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রথম প্রমাণের খণ্ডন হলো এই যে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা রূহ ও দেহ, নাফস ও দেহ এ শব্দগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রবিদগণের মতে দেহের সাধারণ অর্থ আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের চেয়ে ব্যাপক। কেননা, দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেহ ঐ জিনিসকে বলা হয়, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা আছে, সেটা হালকা হোক বা ভারী হোক, দৃষ্টিগোচর হোক বা না হোক। যেমন- বায়ু, আগুন, পানি, ধোঁয়া, বাষ্প, নক্ষত্র ইত্যাদি। কিন্তু আরবি অভিধানে এসবের কোনটাকেই বস্তু বলে স্বীকার করা হয় না। আরবি অভিধানে ও সাহিত্যে অনুসন্ধান করলে জিসিমের বা বস্তুর এই অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষাবিদ জাওহারী বলেন, আবূ যায়েদের বক্তব্যে জিসিমকে দেহ বলা হয়েছে। এছাড়া জিসিমকে জুসমান ও জাসমানও বলা হয়। আরবি সাহিত্যিক আসমায়ী বলেন, জিসম- জাসমান, জাসাদ এবং জুসমান কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। জাসীম, জাসমানের অর্থ মহান। যদি নাফসকে জিসম বলা হয়, তবে সেটা

দার্শনিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে, অভিধান অনুযায়ী নয়। এখানে রূহকে জিসম বলার উদ্দেশ্য হলো, আমরা রূহের জন্য ঐসবগুণ, কার্যাবলী ও নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেগুলো শরীআত, বুদ্ধিমত্তা ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন- নড়াচড়া করা, স্থান পরিবর্তন করা, চড়া, অবতরণ করা, নিআমত ও আনন্দ উপভোগ করা, আযাব ও কষ্টে পতিত হওয়া, বন্দী হওয়া, মুক্ত হওয়া, কবয করা, প্রবেশ করা, বের হওয়া, মোটকথা এই সব বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য রূহকে জিসম বলা হয়। তবে কোন আভিধানিক রূহকে জিসম হিসেবে অভিহিত করেননি। কাজেই এই বাতিল ফিরকার সঙ্গে রূহ ও জিসমের পার্থক্য হবে অর্থগতভাবে, শব্দগতভাবে নয়। তাই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই অর্থে রূহকেও জিসম বা দেহ বলে থাকেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন– এই প্রমাণটি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা খুবই সোচ্চার ও গর্বিত। এটি চারটি উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু জিনিসও আছে, যাকে বিভক্ত করা যায় না। (খ) এগুলো এমন জিনিস যে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। (গ) জ্ঞান হলো অবিভাজ্য। (ঘ) জ্ঞানের আধারও অভিবাজ্য। রূহ যদি দেহ বিশিষ্ট হতো তাহলে সেটা ভাগাভাগি করা যেতো, অথচ অবস্থা সে রকম নয়। অধিকাংশ বিজ্ঞজন প্রথম যুক্তিকে স্বীকার করেন না এবং বলে থাকেন এটা একটি অযৌক্তিক বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়, যার কোন বাস্তবতা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ যে ওয়াজিবুল অজুদ অর্থাৎ যাঁর সত্তা বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য, এই যুক্তিটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা রবের স্বরূপ ও গুণাবলীকে স্বীকার করে না। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাস শরীআত, যুক্তি ও ইজমার পরিপন্থী। বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছাকে, তাঁর ইলম ও অনুধাবনের ক্ষমতাকে, তাঁর শ্রবণ ও দর্শনের শক্তিকে এবং তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। তারা এটাও অস্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আকাশ ও যমীন তৈরি করেছেন, আর এর নাম রাখা হয়েছে তাওহীদ বা একত্ব। অথচ তাদের এই ভ্রান্ত যুক্তি হলো যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার মূল। এছাড়া বিন্দুর উদাহরণ দিয়ে তাদের যুক্তিকেই তারা খণ্ডন করেছে। কেননা, বিন্দু হলো অবিভাজ্য। অথচ সেটা বিভাজ্য দেহে প্রবেশ করে আছে। তাই দেখা গেলো বিভাজ্য জিনিস অবিভাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যুক্তিবাদীরাও এ মূলনীতিকে স্বীকার করে না। তাঁদের মতে মৌলিক পদার্থ দেহের ভেতরে প্রবেশ করে আছে। এমনকি যে কোন দেহ মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত। এখানেও বিভাজ্যের মধ্যে অবিভাজ্য যুক্ত হয়ে আছে। মৌলিক পদার্থকে অস্বীকার না করলে এর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদি বলা হয়, বিন্দু সরল রেখার সমাপ্তি ও বিলীন হওয়াকে এবং এর

অস্তিত্বহীনতাকে বলা হয়, তাহলে এটা হবে একটি অস্তিত্বহীন বিষয়। কাজেই এই প্রমাণও বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, যদি সেটা কোন অস্তিত্ব সম্পন্ন জিনিস হয়, তাহলে সেটা হবে অবিভাজ্যের মধ্যে বিভাজ্যের অনুপ্রবেশ। মোটকথা উভয় অবস্থায় তাদের যুক্তি প্রমাণ বাতিল। এছাড়া যুক্তিবাদীদের মতে ইলম নিজ আধারে প্রবেশ করে আছে, কেননা নিজের শ্রেণী বা প্রকার অনুযায়ী কার্যকর হয়। প্রত্যেক জিনিস তার আধারের আনুপাতিকভাবে প্রবেশ করে। যেমন- ঘরে জীবজন্তুর প্রবেশ করা এক ধরনের প্রবেশ, বহিরাগত জিনিসের পরমূর্ত দেহের মধ্যে প্রবেশ করা দ্বিতীয় প্রকারের প্রবেশ, পুস্তক বা মসৃণ কিছুর ভেতরে রেখার প্রবেশ তৃতীয় প্রকারের প্রবেশ, তিলের মধ্যে তৈলের প্রবেশ চতুর্থ প্রকারের প্রবেশ, বিমূর্ত বা বহিরাগত জিনিসের দেহের মধ্যে প্রবেশ করা পঞ্চম প্রকারের প্রবেশ, রূহের দেহের মধ্যে প্রবেশ করা ষষ্ঠ প্রকারের প্রবেশ, আর ইলম ও মা'রেফাত রূহের মধ্যে প্রবেশ করা সপ্তম প্রকারের প্রবেশ। এছাড়া ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ আল্লাহর অনিবার্য অস্তিত্বের একত্ব যদি অবিভাজ্য মৌলিক পদার্থ হয়, তাহলে জাওহারে ফর্দ বা মৌলিক পদার্থ বলে তা প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা জানা গেলো যে, এটাকে জাওহারে ফর্দ বা মৌলিক পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা যায় না। যদি আল্লাহ একটি বহিরাগত পদার্থ হন, তাহলে তার জন্য একটি আধার অপরিহার্য। যদি কোন আধারকে বিভক্ত করা হয়, তাহলে অবিভক্তের অস্তিত্ব বিভক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেটিই মৌলিক পদার্থ। তাই বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত প্রত্যাখ্যাত হলো।

এই প্রসঙ্গে আরো বলা হয় যে, অনিবার্য সত্তা তথা স্রষ্টার একত্ব একটি অস্তিত্বহীন জিনিস। বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। তাহলে যার দ্বারা অবিভাজ্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেটাতো সবই অস্তিত্বহীন, বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। তাই অনিবার্য সত্তা আল্লাহ তা'আলা যে এক ও অদ্বিতীয় তা প্রমাণিত হলো।

যদি বলা হয়, কোন জিনিসের সঙ্গে অন্য কোন জিনিসের যে সম্বন্ধ সেটা বহিরাগত বা অবিভাজ্য জিনিস হতে পারে, যেমন- কোন জিনিসের উপরে হওয়া, নিচে হওয়া, মালিক হওয়া, অধীন হওয়া ইত্যাদি বুঝায়। যদি কোন আধারের বিভক্তির দরুন প্রবেশকারীর বিভক্তি অত্যাবশ্যক হয়, তাহলে তাদের সম্পর্কের বিভক্তিও প্রয়োজন হয়। যেমন, উঁচু-নিচু হওয়ার জন্য চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ ইত্যাদি হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু, যুক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে সীনার দৃষ্টিতে কুওয়তে ওহাহমিয়া ও কুওয়তে ফিকরিয়া অর্থাৎ ধারণা শক্তি ও চিন্তা শক্তি হলো দৈহিক। তাহলে তাদের বিভক্তির প্রয়োজন হয়, যদিও এটা সম্ভব নয়। এসবের বিভক্তি যদি সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যেকটি

ধারণা শক্তি ও চিন্তা শক্তির অংশ সমান হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। আর যদি তা না হয় তাহলে ঐ অংশ সমান হয় না।

অমুককে বন্ধু, অমুককে শত্রু মনে করা ছাড়া এরূপ ধারণা করার কোন সার্থকতা নেই। কেননা এটাকে বিভক্ত করা যায় না।

কোন একটি জিনিসের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন গুণ থাকতে পারে। যদি কোন আধারের বিভক্তির দরুন কোন বস্তুর বিভক্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে ঐ মূল বস্তুর বিভক্তিরও প্রয়োজন হবে। কেউ যদি কোন বস্তুকে সে বস্তুর অতিরিক্ত একটি বস্তু বলে মনে করে, তাহলে তার সেই অভিমতের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

কোন একটি সংখ্যার গুণাবলী বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, 'দশ' সংখ্যাটি দশ এর একটি অর্থজ্ঞাপক সংখ্যা। কোন একটি সংখ্যার বিভক্তির দরুন সেটা বিভক্ত হয়ে যায়। দশ সংখ্যাটির দশ হওয়ার বিষয়টি বিভাজ্য নয়। তবে এরূপ বিভাজ্য সম্ভব নয়। অবশ্য সংখ্যাটি বিভাজ্য। সুতরাং একটি অবিভাজ্য সংখ্যা অন্য কোন বিভাজ্য সংখ্যার সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

কোন জিনিসের বিশেষ অবস্থা বা আকৃতি দার্শনিকদের কাছে একটি আরায বা পরমূর্ত বস্তু। যেমন– গোল আকৃতি ও বিবিধ ধরনের নকশা। যদি এসব বস্তু আরায বা বিমূর্ত হয়, তাহলে সেটা সে সবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে অথবা প্রত্যেক বস্তুর অংশের সাথে যুক্ত থাকবে। তবে সেটা কোন অবস্থায় সম্ভবপর নয়। অপরদিকে কোন বস্তুর বিভক্তির দরুন সেই বস্তুর আরায বা বিমূর্তও বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে যে কোন একটি রেখার প্রত্যেক অংশের বিমূর্ত বস্তুর সাথে সম্পর্ক রয়েছে, এটাও সম্ভব নয়। কোন রেখার যদি কোন অংশ গোল আকৃতির না হয়, তাহলে সব অংশ একত্রিত হওয়ার সময় যদি কোন অতিরিক্ত কারণ দেখা দেয়, তবে সে বস্তুটির আকৃতি গোল হবে না। আর যদি অতিরিক্ত কোন কারণ দেখা দেয় আর সেটা বিভক্তি যোগ্য হয়, তাহলে তা বিভক্ত হতে পারে, অন্যথায় কোন প্রবিষ্ট বস্তু অবিভক্ত হতে বাধ্য। তাহলে ঐ বস্তুর প্রবেশস্থল বা আধার হবে বিভক্ত। ভিন্ন মতাদর্শের মূলনীতি অনুযায়ী এটা অত্যাবশ্যক নয়। বলা যেতে পারে কোন প্রবিষ্ট বস্তু তার প্রবেশস্থলের বিভক্তির দরুন স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি বিমূর্ত বস্তুর অবস্থা তার ঠিক বিপরীত যা কোন মহল বা স্থানের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, যেমন– সাদা বা কালো রং ইত্যাদি। যে বস্তু অবিভাজ্য সেটা লাভ করার শর্ত হলো, তার সব অংশ একত্রিত হয়ে যাওয়া। কারণ, কোন বিষয় শর্ত সাপেক্ষ হলে, সে শর্ত পূরণ না হলে তা কার্যকর হয় না।

যে কোন বস্তু সত্তাবিশিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তবে কোন বিষয় সম্ভব হওয়া একটি অস্থায়ী গুণ যা এর স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক। এ গুণটি যদি কোন আধারের বিভক্তির

দরুন বিভক্ত না হয়, তাহলে এর দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয় না। আর যদি সে বস্তুটি বিভক্ত হয়, তাহলে তার যে কোন অংশ সমষ্টির সমতুল্য হলে ধারাবাহিকতার ও ক্রমবিকাশের জটিলতা দেখা দেয়। এছাড়া এটাও জরুরী নয় যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতার সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে হবে। আর এই যে গ্রহণ করা এটা ঐ বস্তুর স্বকীয় প্রয়োজনীয়তারই একটি অংশবিশেষ, এটা ঐ বস্তুর কোন সাময়িক গুণ নয়। কিন্তু একজন মানুষের মন-মানসিকতা এ গ্রহণযোগ্যতাকে অগ্রাহ্য করে। কাজেই ঐ বস্তুর স্বভাব ধর্মের সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া মানসিক শূন্যতার পরিচায়ক। এখন বাকী রইলো অংশ ও মূল্যের অংশীদারিত্বের প্রশ্ন। এই বিষয়ে কোন বাধা নেই, যেমন– যাবতীয় স্বভাব ধর্মী বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। বাইরের পরিচিতি আর বাস্তবতায় যে কোন বস্তুর অংশ তাঁর সমষ্টির সমতুল্য হয়ে থাকে, যেমন– পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি। কোন কিছুর অংশ ও সমষ্টির পরিমাণ কমবেশি হলেও বাস্তবতার ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া কোন রূহের মধ্যে ইলম অনুপ্রবেশ করে না। আসলে জ্ঞান ও জ্ঞানীর মধ্যে এক ধরনের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে মাত্র। মানুষ যখন কোন কিছু দেখে,তখন দেখার জন্য চোখের মধ্যে কোন প্রতিচ্ছবির ছাপ পড়ে না। ঐ প্রতিচ্ছবি হলো ঐ সম্বন্ধ যা দর্শন শক্তি ও দর্শনকারীর মধ্যে যুক্ত হয়। তবে এখানে যেসব সন্দেহের অবতারণা করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অবিভক্ত কোন কিছুর মধ্যে বিভক্তি সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় প্রমাণ খণ্ডন ঃ বিরুদ্ধবাদীদের দাবী অনুযায়ী জ্ঞানের আধার যদি দেহ বা দৈহিক হয়, তাহলে জ্ঞান ও বিভক্ত হয়ে যাবে। কেননা বিভক্তজনিত দেহে অনুপবেশকারী বস্তুর বিভক্ত হওয়া অপরিহার্য। অবশ্য তাঁরা এর কোন প্রমাণ পেশ করেননি, কেবল কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। এই দাবীটি এমন যে, এর প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। কোন জিনিসের জ্ঞান লাভের অর্থ হলো, জ্ঞাত জিনিসের স্বভাব ধর্মের সমান যে ছবি জ্ঞানলাভকারীর মনে বিদ্যমান থাকে, তা। এই অভিমত যে গ্রহণযোগ্য নয়, সেসব প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

যখন কোন একটি দৃশ্যমান জিনিসের ছবি নাফসের সত্তার সাথে যুক্ত হয়, তখন সেটি হবে আংশিক অনুপ্রবেশ। এই আংশিক অনুপ্রবেশ তার আনুসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যখন যুক্ত হয়, তখন সেটা হবে সমষ্টির সাথে যুক্ত হওয়ার পরিপন্থী।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, যদি বলা হয় নাফসের সামগ্রিক প্রবেশের অর্থ হলো যখন তার থেকে উপসর্গগুলো পৃথক করা হয়, আর সেটাকে সত্তা হিসেবে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে এটা বৈধ হলে সেটা বৈধ হবে না কেন? সেক্ষেত্রে বলা হবে, এরূপ অবস্থা একটি নির্দিষ্ট উপাদানে সামগ্রিকভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু যখন সেটাকে তার থেকে পৃথক করে নেয়া হয়, তখন সেটাকে পৃথক সত্তা হিসেবেই

মেনে নেয়া হয়। এভাবেই একটি অনির্দিষ্ট আধার অপর একটি অনির্দিষ্ট আধারের মুখাপেক্ষী। ঠিক একইভাবে, একটি অনির্দিষ্ট আধার অপর একটি অনির্দিষ্ট আধারের সাথে সহবস্থান করে। এটা একটি যুক্তিসঙ্গত বিষয় বটে। তাই জানা গেলো, এই সন্দেহটি অধিক ভ্রান্ত। মানুষ যে এই বিষয়ে সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করে নিয়েছে তা তাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছে, যার অস্তিত্ব বাইরের জগতে বিদ্যমান নেই। অথচ তারা এগুলোকে বিদ্যমান বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এছাড়া ঐগুলোকে বিদ্যমান বস্তুর জন্য মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেউ যদি কোন বস্তুর নির্দিষ্ট কোন অংশকে গ্রহণ করে তাহলে তার আধারও আংশিক হবে। কাজেই সমষ্টির মুকাবিলায় সমষ্টি, আর আংশিকের মুকাবিলায় আংশিক হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মানুষ তার চিন্তাধারায় কোন সার্বিক নীতিতে স্থিত থাকেনা। শুধু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ছবি থাকে, যা পৃথক পৃথক ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে এটাকে কেউ সামগ্রিক অবস্থা জ্ঞান করলে আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। নাফসের এই যে অবস্থা, এটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে, বা আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে।

চতুর্থ প্রমাণ খণ্ডন ঃ সূরতে আকলিয়া তথা বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবমূর্তি সীমাহীন কার্যকলাপ চালানোর ক্ষমতা যোগায়। তবে এখানে এমন কোন দৈহিক শক্তি নেই যা সীমাহীন কার্যকলাপের ক্ষমতা রাখে। এর উত্তর হলো, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবমূর্ত্তি সীমাহীন কার্যকলাপের ক্ষমতা যোগায়। তবে এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

একথা যদি বলা হয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবমূর্তি সীমাহীন অনুভূতির ক্ষমতা যোগায়, আর এই অনুভূতি বা উপলব্ধিও এক ধরনের কর্মকাণ্ড। তাহলে বলা হবে, এই দু'টি যুক্তিও অসার ও অচল। কেননা একজন মানুষের অনুভূতি বা উপলব্ধির ক্ষমতা যতোই থাকুক না কেন, তা সীমাবদ্ধ। প্রতিটি মনের যদি হাজার হাজার উপলব্ধি বা অনুভূতির ক্ষমতাও থাকে তবু সেটা সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুভূতি বা জ্ঞানের একটা না একটা সীমা থাকেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরেও একজন জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন।" এভাবে জ্ঞানের শেষ সীমা গিয়ে পৌঁছে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত। আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই এবং তাঁর সমান জ্ঞানও কারো নেই।

এখন যদি বলা হয় যে, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির অনুভূতি ও উপলব্ধি যদি সীমাবদ্ধই হয়, তাহলে কোন বস্তুর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাহলে বলা হবে, এই বক্তব্য যদি হুবহু সত্য হয় তবে প্রমাণিত হবে যে, দৈহিক শক্তি সীমাহীন কাজের ক্ষমতা রাখে। আর এভাবেই উল্লেখিত সন্দেহ ভঞ্জন হয়। আরো উল্লেখ্য যে, সীমাহীন কল্পনা শক্তি, চিন্তা শক্তি ও স্মৃতি শক্তি মানুষের মনে সৃষ্টি হয়, এগুলো বিরুদ্ধবাদীদের মতো দৈহিক শক্তি মাত্র।

তবুও যদি বলা হয়, কল্পনা শক্তি, চিন্তা শক্তি ও স্মৃতি শক্তি সীমাহীন ক্ষমতা যোগায় না, তাহলে বলা হবে, বিরুদ্ধবাদীরা এভাবেই বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি সম্পর্কে এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করে।

দ্বিতীয় যুক্তিটি অর্থাৎ উপলব্ধি ও অনুভূতিকে কোন কাজ হিসেবে গণ্য করা একটি ভুল ধারণা। কারণ এটা আসলে কোন কাজ নয়। তাই কোন কাজের সীমাবদ্ধতার জন্য অনুভূতির সীমাবদ্ধতা জরুরী নয়। বুদ্ধিবৃত্তি কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভাবমূর্তি ধারণ করলেও এতে কোন কাজ হয় না। যদি বলা হয়, একই জিনিস ধারক ও বাহক হয় না, তাহলে দেহের পক্ষে সীমাহীন কাজ করা সম্ভব নয়। তবে দেহের পক্ষে সমূহ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা সম্ভব।

এই বক্তব্যের উপর যুক্তির আলোকে একথা মেনে নেয়া যায়, মানবাত্মা তার সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পরিপূর্ণতা ও শক্তিলাভ করে। কাজেই দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও সীমাহীন কাজের ক্ষমতা রাখে। এ কথা মেনে নেয়া বুদ্ধিবৃত্তির দাবী ও রাসূলদের দাবী মেনে নেয়ার সমার্থক এবং এটা মেনে নিলেই খাঁটি মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় এবং বাতিলপন্থীদের থেকে দূরে ও নিরাপদ থাকা যায়।

পঞ্চম প্রমাণ খণ্ডন ঃ বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি যদি একটি দৈহিক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে ঐ দেহ কাঠামোকে কোন কোন সময় উপলব্ধি করবে, আর কোন কোন সময় উপলব্ধি করবে না। এরূপ যুক্তির মূলে রয়েছে একটি ভ্রান্ত ধারণা যেটা কেবল হৃদয়েই উপলব্ধি করা যায়, কোন বস্তুর ভাবমূর্তির কল্পনা করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে ঐ ভাবমূর্তি অর্জিত হওয়ার উপরই কোন কিছু উপলব্ধি করা নির্ভর করে। আর একথা মেনে নিলে বলতে হয় যে, ঐ ভাবমূর্তির হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হওয়ার নামই উপলব্ধি। কিন্তু এ কথা কোন সুস্থ বুদ্ধিমানসম্পন্ন লোক স্বীকার করবেন না। কাজেই একথা বলায় ক্ষতি নেই যে, কুওয়াতে আকলিয়া বা বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি একটি নির্দিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট ও ক্রিয়াশীল। বাকশক্তি কখনো কখনো একটা আপেক্ষিক অবস্থার অধিকারী হয়ে থাকে, যাকে বোধ শক্তি বা উপলব্ধি শক্তি বলা হয়। এই বোধশক্তি যখন অর্জিত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি সেই দেহ কাঠামোকে কোন সময় উপলব্ধি করে আর কোন সময় উপলব্ধি করে না। এই অবস্থা যখন সম্ভব হয়, তখন ঐ সন্দেহ বা সংশয় আর থাকে না।

আমরা যখন কোন কিছু উপলব্ধি করি, তখন আমাদের বোধশক্তিতে যে প্রতিচ্ছবি বা ভাবমূর্তি দৃষ্ট হয়, তখন ঐ উপলব্ধিকৃত বস্তুটি হয়তো সর্বতোভাবে সমকক্ষ বা সমতুল্য কোনটাই হবে না। প্রথমোক্ত অভিমতটি কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না, যেহেতু এটি একটি মারাত্মক ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। এখন এটা

যখন জানা গেলো, তখন কোন বস্তুর সবদিক দিয়ে সমান হওয়া মোটেই জরুরী নয়। সে অবস্থায় হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে একটি ভিন্ন প্রতিচ্ছবি উপস্থিত হওয়ার একই রকম দু'টো জিনিসের এক হওয়া অনিবার্য হয় না।

সুতরাং বোধশক্তি হৃদয় ও মস্তিষ্কের সারবস্তুতে প্রবিষ্ট ও ক্রিয়াশীল, আর নবাগত ছবিটি বোধশক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট ও ক্রিয়াশীল। কাজেই দু'টি ছবির একটি বোধশক্তির আধার ও অন্যটি আধার নয়। তাছাড়া আমরা যখন দূর থেকে তাকাই, তখন দর্শনার্থীর চোখে দর্শিত বস্তুর ছবি অঙ্কিত হওয়ার উপর কি দর্শন নির্ভরশীল? যদি নির্ভরশীল হয়, তবে এই রকম দু'টো জিনিস একই সময় একই স্থানে একত্রিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা মানুষের দৃষ্টি শক্তি, দৈহিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং তা এমন একটি আধারে বিদ্যমান, যার আকার ও আয়তন আছে। কাজেই তাতে যখন দৃশ্যমান বস্তুর আকৃতি প্রতিভাত হয়, তখন একই সমান দু'টি বস্তুর একত্র সমাবেশ অনিবার্য হয়ে উঠে। আর এটা যদি ঐখানে দেখা সম্ভব হয়, তাহলে এখানে সম্ভব হবে না কেন? যদি কোন বস্তুর উপলব্ধি সেই বস্তুর প্রতিচ্ছবির উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে একথা বলার কোনই অবকাশ নেই যে, মন ও মগজের দ্বারা কোন বস্তুকে উপলব্ধি করা সেই বস্তুর বোধশক্তির উপর নির্ভর করে।

একথাও বলা হয়ে থাকে যে, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি যদি দেহের ভেতরে অবস্থিত ও ক্রিয়াশীল হতো, তাহলে তা প্রতি মুহূর্তে সেই দেহকে অনুভব ও উপলব্ধি করতো। কিন্তু আমরা আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে প্রতি মুহূর্তে অনুভব ও উপলব্ধি করি না। অবশ্য প্রতি মুহূর্তে মন ও মস্তিষ্ককে উপলব্ধি করা অনিবার্য তখনই হতো, যখন তা মন ও মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকতো। তবে বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি একটি বিশেষ দেহে অবস্থিত অর্থাৎ হৃদয়ে, যা দেহেরই সদৃশ। একথা মেনে নিলে বুদ্ধিবৃত্তির উপস্থিতি সর্বক্ষণ উপলব্ধি করা অনিবার্য হয় না। মানুষ এটা জানে যে, হৃদয়ও একটি বিশেষ ধরনের দেহ এবং শুধুমাত্র ভুলে থাকার সময়টুকু ছাড়া এ জ্ঞান তার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান। তাই উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হলো।

ষষ্ঠ প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয় যে, প্রত্যেক মানুষ নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে থাকে। জ্ঞাত বা পরিচিত জিনিসের নিগূঢ় রহস্য নামই উপলব্ধি। এটা তখনই সম্ভব যখন কারো হৃদয় কোন আবাসস্থল বা আধারের উপর নির্ভরশীল থাকে না।

এর জবাব এই যে, এ বিষয়টা একটি প্রাচীন মূলনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মূলনীতি এই যে, পরিচয় লাভকারীর মনে পরিচিত বস্তুর সমান একটা ছবি প্রতিভাত হওয়াকে ইলম বা জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, সেই সংজ্ঞা একাধিক কারণে ভুল। এমনকি যদি সংজ্ঞাটি সঠিক হিসেবে মেনে

নেয়া হয়, তাহলেও উল্লিখিত ছবিটি প্রতিভাত হওয়া জ্ঞানার্জনের শর্ত, তবে সেটাই জ্ঞান নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, ভাষাগত জটিলতা এবং যুক্তি হিসেবে অচল হওয়া ছাড়াও, এ সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। কেননা আমরা যখন একটি পাথর বা কাঠ হাতে নেই, তখন বলি যে, এটি একটি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র পদার্থ। অনুরূপভাবে উক্ত বস্তুর নিকটে যে জিনিস উপস্থিত, তাও তদ্রূপ। সুতরাং সকল জড় পদার্থ তাদের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ কথাও বলা হয় যে, সকল প্রাণী নিজ নিজ সত্তা সম্পর্কে সচেতন। এখন কোন জিনিসের তার নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ এই হয় যে, তাকে জড় পদার্থ হতেই হবে, তাহলে সকল প্রাণীকে জড় পদার্থ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, অথচ কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা বলতে পারে না।

সপ্তম প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয়ে থাকে, অনেকে পদ্মফুল ভর্তি সমুদ্র এবং ইয়াকুত ভর্তি পাহাড় কল্পনা করতে পারেন, এটা হলো আবুল বারাকাত বাগদাদীর অভিমত, যদিও এটি একটি বাতিল বক্তব্য। উল্লেখিত কাল্পনিক বিষয়গুলোকে বাস্তবে বিদ্যমান ধরে নিয়েই এবং এগুলোকে বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী অর্থাৎ মানুষের যে কোন অস্তিত্বই নেই তা সর্বজনবিদিত। এটা শুধু মনের আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। আপেক্ষিক অস্তিত্বহীনতার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা আপত্তিকর কিছু নয়, যেমন শ্রবণশক্তিহীনতা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা ও ঘ্রাণশক্তিহীনতা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এই পার্থক্য নির্ণয়ের দ্বারা এসব অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব মেনে নেয়া অনিবার্য হয়না, এমনকি সেসব রকমারি অসম্ভব জিনিসের মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করা চলে, যার অস্তিত্ব একেবারেই দুর্লভ।

যেসব জিনিস সর্বতোভাবে আকার ও আয়তনহীন, সেসব জিনিসের ভেতরেও যখন আকৃতি ও পরিমাণের অবস্থান বোধগম্য, তখন ক্ষুদ্রাকৃতির দেহের মধ্যে বিপুল পরিমাণের ও বিরাট আকৃতির জ্ঞানের অবস্থান বোধগম্য নয় কি? অনুরূপ, সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যহীন হওয়া সত্ত্বেও যখন জড় পদার্থের মধ্যে ছবি ও আকৃতির অবস্থান বাধাগ্রস্ত হয় না, তখন ছোট জিনিসের সাথে বড় জিনিসের সামঞ্জস্যহীনতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র আধারে বৃহৎ ছবির অবস্থান যে বাধাগ্রস্ত হবে না, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেকে নিরেট পদার্থের মধ্যে অবস্থানকারী ছবির স্বাভাবিক চাপ পড়া অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও তারা উপস্থাপন করেছেন।

অষ্টম প্রমাণ খণ্ডন ঃ আরো বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি যদি দৈহিক বিষয় হতো, তাহলে বার্ধক্যে তা দুর্বল হতো। কিন্তু আসলে তা হয় না, এর জবাব কয়েকভাবে দেয়া যায়।

প্রথমত একথা বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির পরিপূর্ণতার জন্য যেটুকু দৈহিক সুস্থতার প্রয়োজন, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির পূর্ণতার জন্য দৈহিক সুস্থতার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রয়োজনীয় দৈহিক সুস্থতা বার্ধক্যের শেষ অবধি অবশিষ্ট থাকতে পারে। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিরও শেষ অবধি টিকে থাকা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত হয়তো একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির উপলব্ধি অব্যাহত ও অটুট রাখতে সক্ষম এবং তার বিবেক হয়তো এমন কয়েকটি অঙ্গের সাথে টিকে থাকে, যার কাছে জরাগ্রস্ততা বিলম্বে আসে। এই অবস্থা যখন এসে যায়, তখন তার বুদ্ধি ও উপলব্ধি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয়ত কিছু কিছু শক্তির সাথে কারো কারো স্বভাব অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। হয়তো তাই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা বুদ্ধিবৃত্তি শক্তির সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা সেই অবস্থায়ও তার বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি অটুট থাকে।

চতুর্থত একজন মানুষের দেহ যখন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, তখন তার সকল বুদ্ধিবৃত্তি শক্তিও অটুট থাকে। তবে বার্ধক্যবশত এগুলো দুর্বল হয়ে যায়।

পঞ্চমত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়। এতে তার চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে তার দৈহিক শক্তির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয়।

ষষ্ঠত কাজের আধিক্যহেতু মেধা ও দক্ষতা বাড়ে। এই বৃদ্ধি শারীরিক বৈকল্যজনিত ক্ষতি পূরণে সহায়ক হয়।

সপ্তমত সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তান যতো বৃদ্ধ হয়, ততোই তার ভেতরে লোভ-লালসা বৃদ্ধি পায়।" এর বাস্তবতা এ হাদীসের যথার্থতা প্রমাণ করে। অথচ দৈহিক শক্তিও কল্পনা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। দেহের দুর্বলতা, লোভ ও উচ্চাভিলাষকে শক্তিহীন করে না। সুতরাং জানা গেলো যে, দেহের বৈকল্য ও দুর্বলতা হেতু দৈহিক শক্তিগুলোকে দুর্বল হতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অষ্টমত আমরা বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধ লোকের মধ্যে বুদ্ধির বৈকল্য ও দুর্বলতার প্রাধান্য দেখতে পাই। সত্যি বলতে গেলে অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকের অবস্থাই এরূপ। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিও এর সত্যতা প্রমাণ ও সমর্থন করে। "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যাকে জীবনের নিকৃষ্টতম স্তরে নিক্ষেপ করা হয়, ফলে সে জানা জিনিসও জানে না।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-৭০)

সুতরাং কোন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি যখন বার্ধক্যের সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে, তখন সে শিশুর মতো বা তার চেয়েও অসহায় অবস্থার শিকার হয়। বার্ধক্যের এই অবস্থা যার জীবনে আসেনা, সে এই পরিস্থিতির শিকার হয় না।

নবমত শরীর ও মনের সবলতা এবং শরীর ও মনের দুর্বলতা একে অপরের জন্য অপরিহার্য। শারীরিকভাবে সবল হয়েও মানসিকভাবে দুর্বল ও ভীরু কাপুরুষ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আবার শারীরিকভাবে হীনবল হওয়া সত্ত্বেও মানসিক তেজস্বিতা ও দীপ্ততার কারণে অনেকে বীরপুরুষ বা দুঃসাহসী হতে পারে।

দশমত উপরোক্ত যুক্তি যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে, আত্মা একটি নিরেট জড় পদার্থ। জগতের অভ্যন্তরেও নয়, বাইরেও নয়। তা দেহের ভেতরেও নয়, বাইরেও নয়। কেননা রূহ বা আত্মা যখন এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও ঐশী দেহযুক্ত হবে যা পার্থিব দেহের বিপরীত, তখন কোন দেহে তার অবস্থান ও স্থানান্তর ঘটে না যেমনটি ঘটে পার্থিব দেহের ক্ষেত্রে। কাজেই মানুষের দেহের অবস্থানও স্থানান্তর দ্বারা আত্মার জন্যও তা অপরিহার্য হয় না।

নবম প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি তার তৎপরতা চালাতে দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, আর যে জিনিস স্বীয় তৎপরতার জন্য দেহের উপর নির্ভরশীল হয় না, সে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ব্যাপারে বা অন্য কোন ব্যাপারেও তার উপর নির্ভরশীল নয়। এর জবাব এই যে, কোন একটি শারীরিক শক্তি সম্পর্কে কোন বিধি-বিধান কার্যকর হলে, অনুরূপ বিধি-বিধান সকল শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এরূপ কোন দাবী করা অযৌক্তিক দাবী করারই শামিল।

এখানে আরো একটা কথা উল্লেখযোগ্য, কোন কিছুর ছবি এবং উপসর্গ একটা আধার বা অবস্থান স্থলের মুখাপেক্ষী। কিন্তু এই নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে ঐ আধারের মুখাপেক্ষিতা বা নির্ভরশীলতা শুধুমাত্র তাদের স্বতন্ত্র সত্তার জন্যই। ঐসব ছবি ও উপসর্গের সংশ্লিষ্টতার জন্য ঐগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন আধারের মুখাপেক্ষী যে থাকবে না, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং মোদ্দা কথা এই যে, কোন জিনিস যদি কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে এককভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, সে জন্য তার আধারের মুখাপেক্ষিতা বা নির্ভরশীলতা বিলুপ্ত হয় না।

দশম প্রমাণ খণ্ডন ঃ এটা বলা হয়ে থাকে যে, অতিরিক্ত কাজের দরুন দেহ ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। দেহ দুর্বল হয়ে পড়ার পর আর কাউকে সে শক্তি যোগাতে পারে না। এর জবাব এই যে, সে চিন্তা ও কল্পনাশক্তি একটা দৈহিক শক্তি বিশেষ। এরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস কল্পনা করার পাশাপাশি বড় বড় জিনিসও কল্পনা করা যায়। সূর্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করার পাশাপাশি একই সময় একজন লোক একটা ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাকেও কল্পনা করতে পারে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষুদ্র জিনিস দেখতে পায় না। ঠিক তেমনি কোন একজন উঁচু মানের বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি দুর্বল বোধগম্য বস্তু বুঝতে সমর্থ হয় না। কোন

একজন লোক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, মহান আল্লাহর নাম ও গুণ নিয়ে ধ্যানে মগ্ন, এরূপ ব্যক্তি একই সঙ্গে জাওহারে ফর্দ অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ ও তার প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটনের বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না।

একাদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয় যে, কালো সাদার বিপরীত। তখন চিত্তপটে সাদা ও কালো উভয়ের প্রকৃত রূপ একসাথে ভেসে উঠে। অথচ কোন দেহে এই দু'টো জিনিসের একত্র সমাবেশ সম্ভব নয়।

এর জবাব এই যে, এর ভিত্তি হলো এই ধারণা, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের অনুভূতি লাভ করে তার সত্তায় উক্ত অনুভূতি জিনিসটির সমান একটা ছবির ছাপ পড়ে। কিন্তু তার এই ধারণা ভুল। যদি আয়নায় ছবির ছাপ পড়ার যুক্তি দেয়া হয়, তবে সে যুক্তিও ধোপে টিকবে না। কেননা আয়নায় কোন ছবির ছাপ মোটেই পড়ে না। এটাই অধিকাংশ দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির বক্তব্য। ছাপ পড়ার যুক্তি যে বাতিল, তার বহু কারণ রয়েছে। এখানে আরও বলা যেতে পারে যে, সাদা ও কালোকে উপলব্ধি করার সময় চিত্তপটে যে জিনিসটির ছাপ পড়ে, তা আসলে সাদা ও কালো নয় বরং সেটা তার নমুনা ও রূপরেখা। তাহলে এসব জিনিসের নমুনা দেহে সংগৃহীত হতে পারবে না কেন?

দ্বাদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয়েছে যে, সকল অনুভূতি ও উপলব্ধির আধার বা কর্মক্ষেত্র যদি দেহ হয়, আর দেহ যে বিভাজ্য, তাতো সবারই জানা। তাহলে এটা বিচিত্র নয় যে, দেহের কোন অংশে কোন বিষয়ের জ্ঞান নিহিত থাকবে এবং অপর অংশে থাকবে অজ্ঞতা। এভাবে একই সময় একজন মানুষ একটি জিনিস সম্পর্কে অবহিত থাকবে আবার অনবহিতও থাকবে।

এর জবাব এই যে, এই যুক্তি ভ্রান্ত। কেননা কাম ও ক্রোধ এইগুলো দৈহিক অবস্থা। এগুলোর আধার বিভাজ্য। এমতাবস্থায় কাম ও ক্রোধ শরীরের একাংশে এবং এগুলোর উল্টো জিনিস অপরাংশে থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির একই সময়ে কোন একটি জিনিসের প্রতি ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক এবং কোন একজনের প্রতি ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয় যে, কোন দেহ বিশিষ্ট পদার্থে যদি বিতর্কিত ছবি থাকে, তবে তাতে তার অনুরূপ জিনিস অঙ্কিত থাকতে পারে না। অথচ মানুষের হৃদয়ে তা থাকতে পারে।

এর জবাব এই যে, এতে একটা অসম্পূর্ণ ও অযৌক্তিক কিয়াস বা তুলনা নিহিত এবং এর দ্বারা কোন নিশ্চিত তথ্য জানাতো দূরের কথা, কোন ধারণাও জন্মে না। কোন কিছুর বুদ্ধিবৃত্তি ছবি হচ্ছে এর জ্ঞান ও উপলব্ধি, পক্ষান্তরে, কোন দৈহিক ছবি নিছক ছবি ও রেখাচিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। আর একথা সন্দেহাতীত যে, জ্ঞান

ও বিদ্যা তার রকমারি তত্ত্ব ও তথ্য সহকারে ছবি ও রেখাচিত্রের বিপরীত। আর কোন বিশেষ ধরনের মাহিয়াত বা নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কোন বিশেষ নিয়মবিধি কার্যকর হলেই যে তা বিপরীত ধরনের হবে এমন কোন কথা নেই।

চতুর্দশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ রূহ যদি দেহ তথা একটি জড় পদার্থ হতো, তাহলে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পা সঞ্চালনের ইচ্ছা করা ও সঞ্চালন করার মাঝখানে কিছু সময় লাগতো।

এর জবাব এই যে, দেহের সাথে রূহের অবস্থানকালে রূহ তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে পারে না। হয় রূহ পোশাকের মতো গোটা শরীরকে ঢেকে রাখবে, না হয় তা শরীরের কোন অংশে অবস্থান করবে, নতুবা সমগ্র দেহে সঞ্চলিত হবে। এ তিন অবস্থার যেটাই ঘটুক না কেন, সে শরীরের যেটুকু নাড়াতে চায় বা যে তৎপরতা চালাতে চায়, তা তার ইচ্ছাক্রমেই চালায়, এর মাঝখানে সময়ের কোন ব্যবধান হয় না, যেমন চোখ, কান, নাক ও জিহ্বার কাজ। আর যখন কোন অঙ্গ কেটে দেয়া হয়, তখন রূহের যেটুকু ঐ অঙ্গের ভেতরে বিরাজ করছিলো, তা বিচ্ছিন্ন হয় না, তা বাহির থেকে তাকে আটকিয়ে রাখা হোক বা ভেতর থেকে আটকিয়ে রাখা হোক। বরং রূহ সেই সময়ে অনুভূতিহীন অঙ্গটিকে ছেড়ে চলে যায় এবং তা থেকে সময়ের কোন ব্যবধান ছাড়াই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। রূহের এই অঙ্গটিকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক একটি পাত্রে পানি রাখলে তা থেকে যেমন বাতাস সরে যায়, ঠিক সে রকম। তবে যদি রূহ শরীরের একাংশে অবস্থান করে তাহলে কর্তন করা অঙ্গ থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়া জরুরী হয় না। আর যদি সে বাহির থেকে দেহকে জড়িয়ে থাকে, তাহলে অঙ্গ সঞ্চালনের কাজটি হবে লোহার ভেতরে চুম্বকের প্রতিক্রিয়ার মতো, যদিও সে লোহাকে স্পর্শ করে না।

এখানে বলা যেতে পারে যে, কেউ কোন অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে সেটা হবে সময় নষ্ট মাত্র, যেটার দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। কারণ তাদের মতে নাফস বা রূহ দেহের সাথে সংযুক্ত নয়, বা বিচ্ছিন্নও নয়। শরীরের মধ্যে তা প্রবিষ্টও নয়, শরীর থেকে বাইরেও নয়। সুতরাং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে অর্থহীন ও অসংলগ্ন কথা বলার কারণে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

পঞ্চদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ বলা হয়, রূহ যদি দেহ হতো তা বিভাজ্য হতো এবং মানুষের পক্ষে তার কিছু অংশ জানা ও কিছু অংশ না জানার অবকাশ থাকতো। মানুষ তার নিজের সম্পর্কেই খানিকটা জানতে পারতো।

এর জবাব এই যে, এই আপত্তির উল্লেখিত অংশ দু'টো গ্রহণযোগ্য নয়। রূহ দেহ হলে তার একাংশ জ্ঞাত ও অপরাংশ অজ্ঞাত থাকার অবকাশ থাকতো। কেননা রূহ একটা একক ও অবিভাজ্য সত্তা। তাকে জানলে বা অনুভব করলে পুরোটাই জানা ও অনুভব করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এটাও স্বীকার করা যায় না যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে খানিকটা জানবে আর খানিকটা জানবে না। এ সম্পর্কে কোন প্রমাণই দেয়া হয়নি। অবশ্য এটা সবাই জানে যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু জানে, তবে সবটা নয়। অবশ্য এদিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে। কোন একজন মানুষের জ্ঞান অন্যের তুলনায় বহুগুণে বেশি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদেরকে ভুলে গেছে, তারপর আল্লাহও তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন।" (সূরা আলহাশর ঃ আয়াত-১৯)

এসব লোক নিজেদেরকে সব দিক দিয়ে ভোলেনি, বরং কিসে তাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, পূর্ণতা এবং সৌভাগ্য অর্জিত হবে, শুধুমাত্র সেই দিক দিয়ে ভুলেছে। কিসে তাদের পার্থিব কামনা বাসনা চরিতার্থ হবে, পার্থিব ইচ্ছা পূর্ণ হবে ও পার্থিব সৌভাগ্য অর্জিত হবে, সেদিক দিয়ে তারা নিজেদেরকে ভোলেনি। আর এর ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রকৃত কল্যাণ, পূর্ণতা এবং সাফল্য লাভের চেষ্টার গুরুত্ব ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে দোষত্রুটি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনের কথাও ভুলিয়ে দিয়েছেন। এসব দিক দিয়ে তারা নিজেদের সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন, যদিও তারা অন্যান্য দিক দিয়ে যথেষ্ট আত্মসচেতন।

ষোড়শ প্রমাণ খণ্ডন ঃ এই অভিযোগটি এক মোটা বুদ্ধির পরিচায়ক। যে ব্যক্তি এ অভিযোগটি উত্থাপন করেছে সে একজন হীন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। কোন বস্তুর মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে, তার সাথে অপর বস্তুর সংমিশ্রণে তার ওযন বেড়ে যেতে পারে। যেমন– কাঠের ওযন ভারী, তার মধ্যে আগুন ধরালে কাঠ পুড়ে গিয়ে হালকা হয়ে যায়। এমনি কোন পাত্র যদি ওযনে ভারী হয়, তাহলে তার মধ্যে বাতাসের সংযোজন ঘটলে সেটা হালকা হয়ে যায়। এই মূলনীতি ঐসব ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে কার্যকর, যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্র ও মধ্যমণি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর এর স্বাভাবিক গতিও অব্যাহত থাকে। কিন্তু যে বস্তু স্বভাবত উপরের দিকে গতিশীল, সেগুলোর মধ্যে এ নীতি কার্যকর হয় না। বরং ঐসব হলো ভারী বস্তু যা বিপরীত অন্য ভারী দেহের মিশ্রিত হয়ে সেটাকে হালকা করে দেয়। এমনিভাবে রূহের সংমিশ্রণে দেহ হালকা হয়ে যায়।

সপ্তদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ এটা হলো একটি অমূলক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা। কেননা যাবতীয় অবস্থায় ও গুণাবলীতে কোন বস্তুর সংমিশ্রণ অত্যাবশ্যক নয়। আল্লাহ তা'আলা বস্তুসমূহের গুণাবলী ও স্বভাবে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রেখেছেন। কোন কোন বস্তু সহজভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কোন কোন বস্তুকে অনুসন্ধান করে জানতে হয়। কোন বস্তু রঙ্গীন আবার কোন কোন বস্তু রংহীন, কোন কোন বস্তু তাপ ও ঠাণ্ডা গ্রহণ করে, কোন কোন বস্তু তা গ্রহণ করে না। এছাড়া রূহের বিশেষ ধরনের অবস্থাদি রয়েছে, যার সাথে দেহ শরীক থাকে না। এর মধ্যে হালকা হওয়া, ভারী

হওয়া, উষ্ণ হওয়া, শীতল হওয়া, কঠিন ও নম্র হওয়া ইত্যাদি অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে অত্যন্ত ভারী মনে হয়, অথচ তার দেহ ওযনে অত্যন্ত হালকা। আবার এক ব্যক্তিকে দেখতে খুব হালকা মনে হয়, কিন্তু তার দেহ অত্যন্ত ভারী। কারো হৃদয়ে নম্রতা ও দয়া বিদ্যমান, আবার কারো হৃদয় পাষাণের মতো কঠিন। যে ব্যক্তি সুস্থ অনুভূতির অধিকারী তিনি কোন কোন নাফস থেকে পচা ও গলিত লাশের দুর্গন্ধ অনুভব করেন। আর কোন কোন নাফসের খুশবু মেশকের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পথ অতিক্রম করলে সে পথ সুগন্ধিতে ভরে যেতো এবং পরক্ষণে কোন আগমনকারী বুঝতে পারতো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ দিয়ে তাশরীফ নিয়েছেন। এটা ছিলো তাঁর পবিত্র রূহ ও কালবের খুশবু। তাঁর পবিত্র ঘামের খুশবুও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ছিলো, যা তাঁর পবিত্র শরীর ও রূহের অধীন ছিলো। তিনি ইরশাদ করেছেন, "নেক রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর তা থেকে প্রিয় খুশবু বের হয়, যার কাছে মেশকও হার মানে। আর বদ রূহ থেকে পচা পুঁতিগন্ধময় লাশের চেয়েও দুর্গন্ধ বের হয়।" সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকল উপস্থিত ব্যক্তিরা সে দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারে। এসব যে সত্য তা নবী করীম স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন, "মুমিনদের রূহ উজ্জ্বল ও কাফিরদের রূহ কালো রংয়ের হয়ে থাকে।" প্রকৃতপক্ষে, রূহের বিভিন্ন ধরনের অবস্থার পরিবর্তনের কথা নিরেট মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

অষ্টাদশ প্রমাণ খণ্ডন ঃ রূহ যদি দেহ বিশিষ্ট হতো তাহলে কোন না কোন ইদ্রিয়ের দ্বারা তার পরিচয় জানা যেতো। এ প্রসঙ্গে প্রমাণ তো দূরের কথা কোন প্রকার সন্দেহও কেউ উত্থাপন করেনি। যদি এরূপ অপরিহার্যতাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে অপরিহার্যহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। তবে রূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়, অনুসন্ধানও করা যায়। এমনিভাবে রূহকে দেখতে পায়, খুশবু ও ঘ্রাণ নেয়, যদিও এসব আমাদের উপলব্ধিযোগ্য নয়। ফেরেশতারা দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। এমনিভাবে জিন ও শয়তানকে সূক্ষ্মদেহধারী হওয়ার কারণে আমরা দেখতে পাই না। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তরেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বস্তুর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। কোন কোন বস্তু বেশিরভাগ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। আবার কোন কোন বস্তু বেশিভাগ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অনুভব করা যায় না। কোন কোন বস্তু শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় আবার কোনগুলোর অবস্থা এই যে, সেগুলোর বেশিরভাগই উপলব্ধি করা যায়না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য উপলব্ধি করা যায়। যেসব বস্তুর রং বা আকার নেই, সেগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন, বায়ু। এটা ঘ্রাণ শক্তির

দ্বারাও অনুভব করা যায় না। আর যেগুলো অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়না, সেগুলো ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অনুভব করা যায় না, যেমন– স্থির বায়ু। আসল উপলব্ধিকারী হলো রূহ। সে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে করা যায় না। তবে কোন বস্তু বা পরমূর্তকে অনুভব করা যায়। কিন্তু রূহ এগুলোকেও উপলব্ধি করতে পারে এবং বিভিন্নভাবে আগত পরমূর্তকে গ্রহণ করতে পারে, যেমন– দোষ, গুণ, সন্দেহ ইত্যাদি। মানব দেহও তেমনি এসব উপসর্গ বা পরমূর্তকে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। তবে রূহ স্বভাবতই গতিশীল এবং সে-ই দেহকে পরিচালিত করে। রূহ দেহে প্রভাব বিস্তার করে এবং দেহের দ্বারা প্রভাবান্বিতও হয়। দেহের মাধ্যেমে রূহ সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-ভালোবাসা, ক্ষমা, ঘৃণা, স্মরণ করা ইত্যাদি বিষয় অনুভব করে ও জানে। এছাড়া ভালো ও মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, ভুল করা উঠানামা এসব অবস্থা রূহের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যেমন স্রষ্টার পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে পাওয়া যায়। মানুষ যখন কর্মচাঞ্চল্য থেকে বিরত থাকে এবং নিঃসঙ্গতা তাকে পেয়ে বসে, যখন সে লোভ-লালসা বর্জন করে, সুউচ্চ সদাচার, সৎগুণ, বীরত্ব ও বদান্যতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহবোধ করে এবং মন্দ স্বভাব বর্জন করে, সে অবস্থার রূহের প্রতিক্রিয়া, গুরুত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, যে কারণে দেহ ও দেহের উপসর্গগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন– রূহ কোন কোন সময় বড় পাথরকেও এক দৃষ্টিতে ফাঁক বা টুকরো করে দিতে পারে। আর কোন প্রাণী বা কোন নিআমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মোটকথা, যেসব রূহ আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান, সেসব রূহ অনেক অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে পারে।

রূহের বদনযর ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য

বদনযর লাগার গূঢ় রহস্য

একজন মানুষের নযর লাগার রহস্য কি? সাধারণত বদ নযরের আছর বা ক্রিয়ার জন্য চোখকে দায়ী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তা চোখের ক্রিয়া নয়, বরং এটা রূহের ক্রিয়া। ঐ রূহের ক্রিয়া যেটা বিষাক্ত এবং মন্দ স্বভাবে দুষ্ট। অন্যের উপর রূহের ও ক্রিয়া কখনো চোখের মাধ্যমে হয়ে থাকে, কখনো সরাসরি রূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন– কারো সম্মুখে অন্য কোন ব্যক্তির কোন নিআমতের প্রশংসা করা হলে সেটার প্রভাবে প্রশংসাকারীর নাফস প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তার ঐসব নিআমত নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন সময় দেহের মধ্যে রূহের ক্রিয়া প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যেমন– রূহ শুধু কোন কোন দেহের কাছে এলে সে দেহের মধ্যে কম্পন অথবা লাল রং বা হলুদ রং সৃষ্টি করে দেয়। এর চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ঐ ক্রিয়া যা দেহের তাছীর বা ক্রিয়া এবং পরমূর্ত থেকে আলাদা। ঐসব

জিনিসে বিশেষ ধরনের ক্রিয়া কার্যকর করে যা তার সামনে বিদ্যমান থাকে অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। একশ্রেণীর মানুষ সবসময় এ জগতে ক্রিয়াশীল রূহের কার্যকারিতার কথা বিশ্বাস করে এবং এসবের সাহায্যও কামনা করে। আবার এই ক্রিয়াশীলতাকে অনেকে ভয়ও করে। একশ্রেণীর মুশরিক ক্রিয়াশীল রূহের সাহায্যও কামনা করে থাকে।

বদনযরের প্রতিক্রিয়া দূর করার উপায়

কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, আল্লাহর হিকমতের মধ্যে এটিও একটি সহজাত নিয়ম যে, একজন খারাপ লোকের সাথে নাফসে আম্মারাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন কোন ব্যক্তির বদনযরের কারণে অপর কেউ আক্রান্ত হলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির গোসলের সংরক্ষিত পানি আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলে তার বদ নযরের বিষক্রিয়া দূর হয়ে যাবে। যেমনিভাবে লোহা ভিজানো পানি একাধিক ব্যাধি ও ব্যথার জন্য একটি অব্যর্থ প্রতিষেধক।

স্বপ্নের মধ্যে রূহ এক ধরনের নিঃসঙ্গতা লাভ করে। এ অবস্থায়ও রূহের ক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা আছে এবং অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সেসব ঘটনা এখানে উল্লেখ করার কোন অবকাশ নেই। কিছু স্বপ্নের ঘটনা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগত, আলমে আজসাম বা জড় জগতের চেয়ে অনেক প্রশস্ত এবং ভিন্ন। এ দুনিয়া থেকে সেটি একটি আলাদা জগত। সেখানকার কর্মকাণ্ড ও নিদর্শনসমূহ বস্তু জগতের চেয়ে আলাদা ও আশ্চর্যজনক। দুনিয়ায় যতো রকম মানবিক নিদর্শন আছে, সেসব হলো দেহের মাধ্যমে রূহের প্রতীক বা চিহ্ন। সেসব কর্মকাণ্ড রূহ ও দেহ উভয়ে মিলেই সম্পন্ন করে। আবার রূহ থেকে এমন ধরনের ক্রিয়াও সংঘটিত হয়ে থাকে, যেটার সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দেহ দ্বারা এমন কোন ক্রিয়া সংঘটিত হয় না, যার মধ্যে রূহের অংশীদারিত্ব নেই।

উনিশতম প্রমাণ খণ্ডন ঃ এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা যে কোন বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রূহের সৃষ্টির ব্যাপারে বস্তুরও অবদান রয়েছে। আর রূহের একটি নির্দিষ্ট আকৃতিও আছে। যদি বলা হয় যে, রূহের মূলধাতু হলো নাফস, তাহলে দু'টি নাফসের একত্রিত হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সেটা যদি নাফস না হয়, তাহলে রূহ ও দেহ একই আকৃতিতে মিলিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে, যেটা একটি ভুল ধারণা। আসলে, রূহের মূলধাতু রূহ নয়, যেমন– মানুষের মূলধাতু মানুষ নয়, জিনের মূলধাতু জিন নয় এবং প্রাণীর মূলধাতু প্রাণী নয়। কেউ যদি বলে যে, রূহের মূলধাতু যদি নাফস না হয়, তাহলে রূহ ও দেহ একই আকৃতিতে মিলিত হয়ে পড়ে। এটা একটি ভুল ধারণা। কেননা এ অবস্থায় এটা

অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে যে, রূহ মূলধাতু থেকে সৃষ্ট, আর রূহের নির্দিষ্ট আকৃতি রয়েছে। কেউ এই কথাকে খণ্ডন করার জন্য কোন অকাট্য অথবা সাধারণ বা সন্দেহযুক্ত প্রমাণ ও পেশ করতে পারেনি।

বিশতম প্রমাণ খণ্ডন ঃ যদি বলা হয় যে, প্রত্যেক দেহ বাইরের জগতে বিভাজ্য, তাহলে এটা একটি ভুল ধারণা। কেননা চাঁদ, সুরুজ, তারা, নক্ষত্র এসব বাহির জগতের হওয়া সত্ত্বেও সেসবের কোন ভাগাভাগি হয় না। যিনি জাওহারে ফর্দ বা একক জড় পদার্থকে স্বীকার করেন না, তাঁর কাছে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার, আর যিনি স্বীকার করেন, তাঁর দৃষ্টিতে সেটা পরিমাপযোগ্য বা বিভাজ্য নয়। যদি সে বস্তুর বণ্টন হওয়াকে মেনেও নেয়া হয়, তাহলে অসুবিধা কি? যদি বলা হয়, রূহের প্রতিটি অংশ রূহ, তাহলে একজন মানুষের মধ্যে একাধিক রূহের সমাবেশ হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আসলে এটা ঐ সময় অত্যাবশ্যক হবে যখন রূহ কার্যকারীভাবে বিভক্ত হবে, আর এটা হওয়া সম্ভবপর নয়। যদি বলা হয়, রূহের প্রত্যেকটি অংশকে যদি রূহ হিসেবে স্বীকার না করা হয়, তাহলে ঐক্যবদ্ধ রূহও রূহ বলে স্বীকৃতি পাবে না। তাই এই যুক্তিটাই ভুল। অনেক মৌলিক পদার্থ এমনি ধরনের আছে যে, এগুলোর অংশ একত্রিত হলেই সেগুলোর পরিচিতি প্রকাশ পায়, যেমন- ঘর, মানুষ, দেশ ইত্যাদি।

একুশতম প্রমাণ খণ্ডন ঃ দেহ তার হিফাযতের জন্য রূহের মুখাপেক্ষী। তবে একটি রূহের স্থায়িত্বের জন্য সেটা অন্য রূহের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একটি ভ্রান্ত যুক্তিহীন ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু কোন বস্তুর হিফাযত ও স্থায়িত্বের জন্য রূহের প্রয়োজন নেই, যেমন- খনিজ সম্পদ, বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং যাবতীয় জড় বস্তুসমূহ। যেহেতু এগুলো জীবন্ত বা বাকসম্পন্ন নয়। সেক্ষেত্রে অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক জীবন্ত বাকসম্পন্ন দেহের হিফাযত ও স্থায়িত্বের জন্য রূহের বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ধারণাটাই ভুল জিন ও ফেরেশতা জীবন্ত ও বাকসম্পন্ন। তারা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য কোন রূহের মুখাপেক্ষী নয়। এখানে এই বক্তব্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু জিনও ফেরেশতা নয়। যেহেতু এদের দেহ মুতাহাইয়েযাহ বা পরিমাপযোগ্য নয়। আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি যাঁদের ঈমান আছে, তাঁদের সাথেই উপরোক্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাঁরা এসব বিষয় বিশ্বাস করে না তাঁদের সাথে রূহ সম্পর্কে আলোচনা করা অর্থহীন। কেননা তারা রূহের স্রষ্টার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর শরীআতের প্রতি, যে শরীআত তাঁর রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন সে সবের প্রতি ঈমান রাখে না। অথচ সে সবের

উপর দলীল-ভিত্তিক মুশাহাদাহ্ বা দর্শনের ন্যায় বিশ্বাস রাখার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, যেসবকে তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। এই দুনিয়ায় জিন ও ফেরেশতাদের বিদ্যমান থাকার যেসব নিদর্শন ও প্রমাণ রাব্বুল আলামীন পেশ করেছেন, সেগুলোকে এবং তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর ইনসানী শক্তি যে অনেক ক্ষেত্রে জিন ও ফেরেশতাদের উপর ক্ষমতাশীল নয়, তাও অস্বীকার করা যায় না।

বাইশতম প্রমাণ খণ্ডন ঃ উল্লেখ্য যে, দু'টি স্থুলদেহবিশিষ্ট বস্তু একই স্থানে একসাথে অবস্থান করা সম্ভবপর নয়। তবে সূক্ষ্মদেহধারী কোন কিছু স্থূলদেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে ও মিশ্রিত হতে পারে, এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। একই সময় কোন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করার বিষয়টি অবান্তর। তবে পানি কাঠের মধ্যে ও মেঘখণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে। এছাড়া লোহার মধ্যে আগুন সংযোগ করলে, সেখানে আগুন দেখা যায়। খাদ্যের উপাদান ও দেহের সর্বত্র মিশে যায়। এমনিভাবে জিনের আসর করা লোকের মধ্যেও জিন অনুপ্রবেশ করে। অনুরূপভাবে রূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের দেহের শিরায় শিরায় অতি সহজে মিশে আছে। রূহের জন্য যেমন দেহ, পাখির জন্য তেমনি বাতাসের প্রয়োজন। রূহের বাসস্থান হলো দেহ, আর দেহের উপাদান হলো যার মধ্যে দেহ মিশে আছে। এরূপ অনুপ্রবেশ কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। রূহ যখন দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তার অন্য একটি বাসস্থানের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেহের সাথে রূহের যুক্ত হওয়া বিষয়টি মাটির সাথে পানি মিশ্রিত হওয়া ও দেহের মধ্যে তেল মিশে যাওয়ার ন্যায়।

আল্লাহুম্মা ওয়াফিকনা লিলহাক্কে ওয়াল হাক্কু আইঁউত্তাবায়া। "হে আল্লাহ, আমাদেরকে হক বা সত্যকে জানার ও অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আর যা সত্য তাই অনুসরণীয়।"

বিশতম অধ্যায়

নাফস ও রূহ কি এক, না ভিন্ন

অধিকাংশ জ্ঞানী লোকের মতে নাফস ও রূহ একই। কারো কারো মতে এ দু'টো আলাদা ও পৃথক। নাফস শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। **এক.** জাওহারীর মতে, নাফসের অর্থ হলো রূহ। যেমন– আরবিতে বলা হয়, 'খারাজাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রূহ বের হয়ে গেছে। **দুই.** রক্তকেও নাফস বলা হয়, যেমন- আরবিতে বলা হয়, 'সায়ালাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রক্ত বয়ে গেছে। হাদীস শরীফে আছে, "মালা নাফসুন লাহু সায়েলাতুন লা ইয়ানজুমুল মাউ ইয়া মাতা ফীহে। অর্থাৎ 'যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তা যদি পানিতে মারা যায়, তাহলে পানি নাপাক হবে না।" **তিন.** জিসম বা দেহ। জনৈক আরবদেশীয় কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাকে বলা হয়েছে, বনী তামীম নিজের পুত্রদেরকে মুনযেরের দেহের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।" **চার.** বদ নযর অর্থাৎ নাফসুল আইন। আরবিতে বলা হয় "আসাবাৎ ফলানান আয়-আইন" অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির বদ নযর লেগেছে। কিন্তু এখানে নাফসের অর্থ হবে রূহ। কেননা দৃষ্টির মাধ্যমে রূহ নিজের তাছীর বা প্রতিক্রিয়া কার্যকর করে থাকে। এই জন্য বলা হয়ে থাকে অমুকের নযর লেগেছে। যার অর্থ হলো– বদ রূহের নযর পড়েছে। **পাঁচ.** নাফসের অর্থ কোন মানুষ বা ব্যক্তিকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনে ব্যক্তির অর্থে 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– "স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে। আর কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলূম করা হবে না।" (সূরা আন-নাহল ঃ আয়াত-৩৮)

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ হবে।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ আয়াত-৩৮)

নাফস শব্দটি রূহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত আত্মা!" (সূরা ফজর ঃ আয়াত-২৭)

"এবং আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিলো।" (সূরা নাযিয়াত ঃ আয়াত-৪০)

"নাফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩)

রূহের প্রয়োগ শুধু দেহের জন্য হয় না। আবার রূহ ও দেহের উভয়ের জন্যও হয় না।

পবিত্র কুরআনে রূহের একাধিক অর্থের উল্লেখ রয়েছে। **১.** রূহ শব্দের অর্থ হুকুম বা নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এবং এমনিভাবেই আমি আপনার নিকট আমার নির্দেশে একটি রূহ প্রেরণ করেছি।" (সূরা শূরা ঃ আয়াত-৫২)

"তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা নিজের নির্দেশে ওহী প্রেরণ করেন, যেন সে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।" (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত-১৫)

২. রূহ শব্দের অর্থ ওহী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "তিনি ফেরেশতাদেরকে ওহী সহকারে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি তাঁর ইচ্ছা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-২)

ওহীকে রূহ বলা হয় কেন? ওহীকে এই জন্য রূহ বলা হয়, এর দ্বারা উপকারী জীবন লাভ করা যায়। ওহী ব্যতিরেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে না। পরিণতির দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে পশুর জীবন নিরাপদ।

রূহকে রূহ বলার কারণ কি? রূহকে এই জন্য রূহ বলা হয় যে, এর উপর জীবন নির্ভর করে। আরবি ভাষায় বাতাসকে 'রীহ' বলা হয়। কারণ এর দ্বারা জীবন রক্ষা পায়।

রূহ শব্দের বহুবচন হলো আরওয়াহ। যেমন একটি আরবি কবিতায় উল্লেখ আছে, "ইযা হাব্বাতিল আরওয়াহু মি নাহবে আরদিকুম, ওয়াজাদতু লিমাসরিহা আলাকাবাদি বারাদ।" অর্থাৎ "যখন তোমাদের যমীনের দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন এর দ্বারা আমি নিজের কলিজায় শান্তি অনুভব করি।" তাই আরবি ভাষায় রূহকে রূহ, রায়হান ও ইসতিরাহাত বলা হয়।

নাফসকে রূহ বলার কারণ হলো, এর দ্বারা জীবন রক্ষিত ও অর্জিত হয়। 'নাফস' শব্দটি 'নাফিস' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হলো, "নাফাসাত ও শরাফত" অর্থাৎ পবিত্রতা ও মর্যাদা। নাফসকে নাফস বলার আরেকটি কারণ হলো, আরবি 'তানাফফুস' শব্দের অর্থ শ্বাসগ্রহণ করা ও শ্বাস বের হওয়া। তাই 'তানাফফুস' শব্দ থেকে এটি উৎপত্তি হয়েছে। এছাড়া দেহে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে আসা যাওয়া করার কারণে একে নাফস বলা হয়। এর থেকেই 'নাফাসুন' (শ্বাস বিরতি) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। নিদ্রার সময় মানুষের রূহ সাময়িকভাবে বের হয়ে যায়, জাগ্রত অবস্থায় আবার ফিরে আসে, মৃত্যুর সময় একেবারেই বের হয়ে যায়, কবরে সওয়ালের সময় আবার ফিরে আসে, সওয়াল-জবাবের পর আবার বের হয়ে যায়। হাশরের দিন আবার রূহ দেহে ফিরে আসবে।

নাফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য কি? এদের মধ্যে পার্থক্য হলো গুণগত, সত্তাগত নয়।

রক্তকে নাফস বলার কারণ কি? রক্তকে এই জন্য নাফস বলা হয়, অধিক পরিমাণ রক্ত দেহ থেকে বের হয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় নাফসের দেহ থেকে বের হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং নাফসের ন্যায় জীবনও রক্ত নির্ভর। যেমন বলা হয়– "তাসীলু আলা হাদ্দিযাবাতি নুফুসানা ওয়া লাইসাৎ আলা গায়রি যাবাতি তাসীলু।" অর্থাৎ "তরবারীর ধারের উপর আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয়। "আর তা না হলে রক্ত প্রবাহিত হয় না।" বলা হয়ে থাকে- "ফাদাতনাফসুহ, খারাজাত নাফসুহু, ফারাকাত নাফসুহু" আরবি 'ফয়েয' শব্দের দ্বারা কোন কিছু প্রবাহিত হওয়াকে বুঝায়। আর ইফাদাহ বলতে দ্রুত ও অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে

বুঝায়। ইফাদাহ্ বলতে ইচ্ছাধীন বুঝায় আর ফয়েয শব্দের দ্বারা বাধ্যবাধকতা বুঝায়। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে মানুষের মৃত্যুর সময় রূহ্ বের হয়ে যায়।

মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সুফীদের এ শ্রেণীর অভিমত হলো– রূহ্ ও নাফসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

রূহ্ ও নাফস সম্পর্কে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (র)-এর অভিমত হলো এই যে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন রূহ্ ও নাফসের। নিদ্রার সময় মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন নাফস বের হয়ে যায়। তবে দেহের সঙ্গে নাফসের যোগাযোগ থেকে যায়। একটি লম্বা আলোকরশ্মির মতো কোন কোন সময় নিদ্রিত ব্যক্তি তার নাফসের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে থাকে। তবে জীবনী শক্তি ও রূহ্ তার দেহে বিদ্যমান থাকে যার সাহায্যে নিদ্রিত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। লোকটি জাগ্রত হয়ে গেলে চোখের পলকের চেয়েও অধিক দ্রুতগতিতে তার নাফস দেহে ফিরে আসে। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু দান করতে চান, তখন তার বের হয়ে যাওয়া নাফসকে আটকে দেন। উল্লেখ্য যে, নিদ্রিত অবস্থায় নাফস বের হয়ে উপরের দিকে যায়, আর স্বপ্ন দেখার সময় ফিরে আসে। এভাবে নিদ্রাভঙ্গের পর তার স্বপ্নের সব কথা মনে পড়ে। আর সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিদ্রিত মানুষের রূহকে জানিয়ে দেয়া হয়।

রূহ্ ও নাফস সম্পর্কে ইবনে মান্দা (র)-এর অভিমত হলো। রূহ্ ও নাফস কি- এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, নাফস হলো মাটি ও আগুনে মিশ্রিত, রূহ্ হলো নূর ও রূহানিয়াতের দ্বারা ঘটিত। আরেকটি অভিমত এই যে, রূহ্ হলো ঐশী আর নাফস হলো পার্থিব সত্তা। নাফসের দ্বারা মানুষের ভালো-মন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। হাদীসবেত্তাগণ বলেন যে, রূহ্ ও নাফসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নাফসের জীবন নির্ভর করে রূহের উপর আর নাফস হলো মানুষের একটি সুরত বা আকৃতি। এটা আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, লোভ-লালসার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্য নাফসের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। নাফস শুধু দুনিয়ার মোহমায়ায় আকৃষ্ট। অপরপক্ষে, রূহ্ মানুষকে আখিরাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করে ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। আর শয়তানকে নাফস ও লালসার অধীন করে দেয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের রূহ্ ও জ্ঞানের সাথে মানুষের রূহের সম্পর্ক আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাস বান্দাদের ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন সময় সাহায্য করে থাকেন।

রূহ্ সম্পর্কে আরো কিছু অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। কারো কারো মতে রূহ্ হলো আল্লাহ্ তা'আলার মাখলূক বা সৃষ্টি যার ইলম গোপন রাখা হয়েছে। কেউ বলেন, রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া এক প্রকার নূর ও জীবনী শক্তি। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে, রূহ্ কি দেহের ও নাফসের মৃত্যুর সময় মৃত্যুবরণ করে, নাকি করে না। এক শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে রূহেরও মানুষের ন্যায় হাত, পা, চোখ, কান, নাক ও জিহ্বা ইত্যাদি আছে। অন্য একশ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে

একজন মু'মিনের রূহ হলো তিনটি। আর কাফির ও মুনাফিকের রূহ হলো একটি। অনেকের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সিদ্দীকগণের পাঁচটি করে রূহ আছে। আরেক শ্রেণীর লোকের মতে রূহ একটি ঐশী শক্তি, যা ফেরেশতার জগত বা আলমে মালাকূতে সৃষ্ট। একটি রূহ যখন সকল আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আলমে মালাকূত বা ফেরেশতার জগতে ফিরে যায়।

গ্রন্থকারের মতে যেই রূহকে কবয করা হয়, সেটাই আসল রূহ। সেটাকে নাফসও বলা হয়। আর যে রূহের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস বান্দাদেরকে সাহায্য করেন, সেটা অন্য রূহ, ইনসানী রূহ নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, "এরা হলো ঐসব লোক যাদের দিলে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহের দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন।" (সূরা মুজাদালাহ ঃ আয়াত-২২)

এটাও ঐ ধরনের রূহ যার দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর রূহকে সাহায্য করা হয়েছিলো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বললেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আমার সে নি'আমতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম। আমি পবিত্র রূহ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছি।" (সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-১১০)

ঐ রূহ হলো অন্য রূহ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অর্পণ করেন। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও কোন কোন সময় আরওয়াহ বলা হয়, যেমন– দর্শনের রূহ, ঘ্রাণ গ্রহণের রূহ, শ্রবণের রূহ ইত্যাদি। মূলতঃ এই রূহ হলো দেহে রক্ষিত শক্তি ও সামর্থ্য যা দেহের মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে যায়। এসব আলোচনা থেকে জানা গেলো, এটি বিশেষ অর্থেও রূহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মারেফাত, মুহাব্বত ও তাঁকে পাওয়ার যে আগ্রহ এসবই রূহের মাধ্যমে সম্ভব। রূহ এবং দেহের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন আসল রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন রূহ এ দেহেরই একটি অংশ হিসেবে গণ্য হয়। রূহ হলো কলুষমুক্ত, রূহের দ্বারা তরীকা অনুসরণকারী ও অনুগত বান্দাগণকে সাহায্য করা হয়। তাই বলা হয়, অমুক ব্যক্তির মধ্যে রূহ আছে। আর অমুক ব্যক্তির মধ্যে রূহ নেই। অর্থাৎ লোকটি বুদ্ধিহীন ও একটি বিকল বাদ্যযন্ত্রের ন্যায়।

কাজেই ইলমেরও রূহ আছে। আর তাওয়াক্কুল, সিদক, নির্ভরশীলতা ও সততারও রূহ আছে। উক্ত রূহের অনুপাত লোকদের মধ্যে মর্যাদার ভিত্তিতে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কারো কারো উপর এই রূহ প্রাধান্য বিস্তার করে, আর সে তাঁদেরকে রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। আবার কেউ কেউ এসব শক্তি থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত থাকে। এভাবে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। ওয়াল্লাহুল মুসতাআনু– "আর আল্লাহই একমাত্র সহায়।"

একুশতম অধ্যায়

নাফস কি একটি না তিনটি

অনেকের মতে মানুষের নাফস তিনটি। **এক.** নাফসে মুতমায়িন্নাহ। **দুই.** নাফসে আম্মারাহ। **তিন.** নাফসে লাউয়ামাহ। প্রত্যেক মানুষের উপর কোন না কোন নাফস প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত চিত্ত!" (সূরা ফাজর ঃ আয়াত-২৭)

"আমি নাফসে লাউয়ামাহ্র শপথ করছি।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-২)

"অবশ্য নাফস তো মন্দের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত -৫৩)

প্রকৃতপক্ষে, নাফস মাত্র একটি, কিন্তু তার গুণবাচক নাম তিনটি। তবে নাফসে মুতমায়িন্নাহ এজন্য বলা হয়েছে যে, সে তার রবের ইবাদত, মুহাব্বত, তাওবাহ, ইনাবত বা আনুগত্য, নির্ভরশীলতা ও সন্তুষ্টির দ্বারা স্থির ও প্রশান্ত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত এবং ভয় ও আশা আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন হলো, অন্যের মহাব্বত ও সন্তুষ্টি, ভয় ও আশা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা, যেন মানুষ তার রবের মুহাব্বতে ডুবে অন্যের মুহাব্বত থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকরকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে স্মরণ করে না, আর আল্লাহ্র দীদার লাভের আশায় বিভোর থাকে এবং অন্য কারো সাক্ষাৎ কামনা করে না, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির অন্তরে নেমে আসে প্রশান্তি আর আল্লাহ্ তা'আলার মারফতে সেই ব্যক্তি থাকে সুদৃঢ়। মানুষের এই পলায়নপর মনকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে আনেন যেন তাঁরা আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত আছে। এই মারেফাতের দ্বারাই তারা সবকিছু দেখে ও শুনে। এই প্রশান্তি বান্দার কালব ও নাফসের মধ্যে এবং সারাদেহে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেটা বান্দার রূহকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আকর্ষণ করে, আর তার দেহের প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে নিয়োজিত করে।

রূহের সত্যিকারের প্রশান্তি আল্লাহ্ তা'আলার যিকরের বা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- "ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার যিকরের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিকর সেই জিনিস যার দ্বারা অন্তর শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ ঃ আয়াত-২৮)

ইতমীনানে কালব অন্তরের শান্তিকে বলা হয়, এর দ্বারা মনের অস্থিরতা, দুঃখ-যাতনা দূরীভূত হয়ে যায়। এই নিআমতটি আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হলো ঈমানী ইতমীনান বা বিশ্বাসজনিত প্রশান্তি। অপরটি হলো ইহসানী ইতমীনান। অর্থাৎ

যাবতীয় লোভ-লালসামুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে মনে শান্তি লাভ করা। তাছাড়া নিজের ইচ্ছাকে অথবা কারো অনুসরণকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপর প্রাধান্য না দেয়া। যেসব বিষয়ের সাথে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সঙ্গে সংঘাত বাধে এমন কোন কাজে লিপ্ত ও সম্পৃক্ত না হওয়া। এমন কোন বাসনা পোষণ না করা যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের পরিপন্থি। বরং এ জাতীয় কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে সেটাকে সে শয়তানী প্ররোচনা বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এটা হলো খাঁটি ঈমান।" এরূপ ঈমানের চিহ্ন হলো গুনাহের দরুন বিচলিত হওয়া ও পেরেশানী থেকে দূরে সরে এসে তাওবাহ করে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ করা। এ বিষয়ে চিন্তা করলে এটা বুঝা যায় যে, এই শান্তি ও তৃপ্তি তাওবার কারণেই অর্জিত হয়েছে। যিনি এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন। গুনাহের যে অশান্তি সেটা তাওবার মাধ্যমে দূরীভূত হয়। কোন গুনাহগার ব্যক্তি যদি তার গুনাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তার মধ্যে যে ভয়-ভীতি, চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং পেরেশানী আছে তা সে উপলব্ধি করতে পারে, যদিও লোভ-লালসা, অলসতা, কাম-ক্রোধ তাকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। প্রত্যেক লোভ-লালসার এক প্রকার নেশা আছে, যা মাদকদ্রব্যের নেশার চেয়েও অধিক প্রবল। এমনিভাবে ক্রোধের নেশা শরাবের নেশার চেয়েও মারাত্মক। এজন্য একজন প্রেমিক ও ক্রোধান্বিত মানুষ এমন সব কাজ করে বসে যা একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিও করে না। এমনিভাবে একজন গুনাহগার ব্যক্তি অলসতা, উদাসীনতা এবং অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানের প্রশান্তির দিকে, আল্লাহর যিকরের তৃপ্তির দিকে এবং আল্লাহর মুহাব্বত ও মারেফাতের দিকে এসে যায়। এসব প্রক্রিয়ায় রূহের কখনো শান্তি লাভ হয় না। অন্যথায় রূহ সীমাহীন অস্থিরতা ও দুর্ভোগের শিকার হয়। এভাবে একজন মানুষ বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও অলসতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গকে একটি বিশেষ গুণ প্রদান করেছেন। মানুষের যদি ঐসব গুণ না থাকতো, তাহলে সে সমূহ অশান্তি ও অস্থিরতায় ভুগতো। যেমন– চোখের গুণ হলো দর্শন করা, কানের গুণ হলো শ্রবণ করা আর মুখের গুণ হলো কথা বলা। যখন এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি লোপ পায়, তখন মানুষ গভীর দুঃখ ও বেদনা ভোগ করে। কোন একজন মানুষ যদি আল্লাহর এসব নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার জীবন অসার, অচল ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়া তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে থাকুক না কেন এবং দুনিয়ার সকল বিদ্যায় সে সুপণ্ডিত হোক না কেন। কাজেই যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং তার মা'বুদ হবেন, সে পর্যন্ত সে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবে না। একজন বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী অপরিহার্য।

প্রশান্ত আত্মা কাকে বলে? এ সম্পর্কে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "প্রশান্ত আত্মা হলো সত্য ও মাহবুবিয়াতের স্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী রূহ।" হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, "ঐ মুমিন ব্যক্তি যার দিল আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত।" হযরত হাসান (রা) বলেন, "ঐ রূহ যে আল্লাহ তা'আলার বাণীকে সত্য বলে স্বীকার করে।" হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন, "ঐ রূহ আল্লাহ যে তার রব বা প্রতিপালক সেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সামনে অবনত হয়।" হযরত মানসূর (র) বলেন, "আল্লাহর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন করে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হজয়, সেটাই প্রশান্ত আত্মা।" হযরত ইবনে নাজীহ (র) বলেন, "আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে অবনত এবং তাঁর সাক্ষাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী রূহ হলো প্রশান্ত আত্মা।" তাছাড়া ইবাদত ও আমলের দ্বারা রূহ প্রশান্তি লাভ করে।

নাফসে মুতমায়িন্নাহ সম্পর্কে পূর্বেকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে দু'টি মূলনীতিকে সমর্থন করতেন, সেগুলো হলো ইলম ও ঈমান। একজন মানুষ সন্দেহ থেকে বিশ্বাসের দিকে, মূর্খতা থেকে ইলমের দিকে, আল্লাহর বিস্মৃতি থেকে যিকরের দিকে, গুনাহ থেকে তাওবাহর দিকে, লোক দেখানো ইবাদত থেকে ইখলাসের দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে শৃঙ্খলার দিকে এবং আমলহীনতা থেকে আমলের দিকে অগ্রসর হলে রূহের প্রশান্তি লাভ হয় এসব সতর্ক বাণীর মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে আমরা ঈমান ও আমল ঠিক রেখে জীবনকে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারি। আখিরাতের জীনব সম্পর্কে যার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ সম্পর্কে উদাসীন, সে ব্যক্তির অবস্থা হলো একজন নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, না, এর চেয়েও তার অবস্থা আরো শোচনীয় ও জঘন্য। একজন নেককার জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকেন। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে তার মনের অলসতা ও অনীহা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি লোভ-লালসার তাড়নায় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকে ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা তাকে অতি সহজেই পথভ্রষ্ট করে দেয়। তার অবস্থা একজন নেশাগ্রস্থ লোকের ন্যায়। সৌভাগ্যবশত যদি এই অবস্থায় কোন হাক্কানী আলিমের উপদেশ ও সাবধান বাণী তার মনে রেখাপাত করে আর তার সে অলসতা দূর করে দেয়, তাহলে সে তার অন্তর্নিহিত সৎপ্রবৃত্তির কারণে সম্বিত ফিরে পায় এবং বলে উঠে, হে প্রভু! আমি হাযির। এভাবেই অর্জিত হয় তার সে সাহস ও শক্তি, যার ফলে সে আল্লাহর নাম ও মাহাত্ম্য সমুন্নত করে এবং সুদৃশ্য জান্নাতীমহলসমূহ দেখতে পায়। এরই প্রেক্ষাপটে আরবের জনৈক কবি বলেছেন, "হে প্রশান্ত আত্মা, আমাদেরকে সামনে

এগিয়ে যেতে দাও, কেননা আমাদেরকে অন্ধকার রাতে সফরের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই সুউচ্চ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। এভাবেই আমরা বসন্ত ঋতুর সুশীতল পরিবেশ ভোগ করবো।" এই সুন্দর ও স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা এমন এক ধরনের নূর সৃষ্টি করে যার সাহায্যে ঐসব জিনিস সে দেখতে পায়, যেজন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে। ঐসব জিনিসও সে দেখতে পায় যেগুলো তার মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত প্রয়োজন হবে। দুনিয়া যে এক পলকে শেষ হয়ে যাবে, সেটাও সে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। সেই অবস্থায় দুনিয়ার সকল মন্দ অবস্থা, হানাহানি, কাটাকাটি ইত্যাদি দেখে অনুতপ্ত হৃদয়ে বলে উঠে "আফসোস! আমার ঐসব ত্রুটির জন্য আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ভীষণ লজ্জিত। এরই ফলশ্রুতিতে সে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ লাভ করে এবং সে যতোটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। আল্লাহ না করুন, এমন সময় ও সুযোগ যদি কারো হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে তার পরিতাপ ও অনুশোচনার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। মানুষ তার রবের নি'আমতসমূহে ডুবে আছে। শুক্রকীট থেকে জীবনভর দিন রাত রবের নি'আমতসমূহের মধ্যে সে লালিত পালিত হয়ে থাকে। এ নি'আমতসমূহ যদি কেউ গুণতে চায় তাহলে সেগুলো সে গণনা করতে সমর্থ হবেনা। এসব নি'আমতের মধ্যে রয়েছে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যা দৈনিক চব্বিশ হাজার বার আসে যায়। এছাড়া অন্যান্য নি'আমত গণনা করার তো কোন প্রশ্নই উঠেনা। প্রকৃতপক্ষে, সে কখনো আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমত গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ যদি তার সমস্ত নি'আমতের হিসাব চান, তাহলে কেউ সে হিসাব দিতে পারবে না এবং একটি নি'আমতের হকও আদায় করতে পারবে না। এর দ্বারা এটাও উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও ক্ষমা ছাড়া আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। একজন মানুষ যতোই আমল করুক না কেন এমনকি সে আমল যদি সমস্ত জিন ও ইনসানের নেক আমলের সমানও হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও মহিমার তুলনায় সেটা কিছুই নয়, একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য। অবশ্য যে কোন আমলই আল্লাহর তাওফীক ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন বান্দা ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তার হৃদয়ে যে আলো বা রৌশনি লাভ করে, সেটার সাহায্যে সে তার সকল দোষত্রুটি ও গুনাহের কাজ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। এভাবেই তার সকল মন্দ আমলকে সংশোধন করার শক্তি ও সুযোগ লাভ করে। এভাবেই বান্দা জানতে পারে যে, দয়াময় আল্লাহ তাকে তার আমলের সঠিক বিনিময় প্রদান করেছেন, একটুও কম করেননি। বান্দা আল্লাহর রহমত লাভ করে এভাবেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে এবং তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করে। আর সে বিনয়ী হয় এবং মাথা আল্লাহর মহান দরবারে অবনত হয়ে পড়ে। এই

অবস্থায় সে আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমত প্রত্যক্ষ করে এবং তার সমূহ গুনাহের কাজও সে দেখতে পায়। আর আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা জানায় "হে আমার রব! তোমার নিআমত অফুরন্ত, আমার গুনাহে আমি অনুতপ্ত এবং আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমার কোনই পুণ্য নেই। কল্যাণ ও সৌভাগ্যের আমি উপযুক্ত নই। তবে আমি তোমার রহমতের আশাবাদী ও ক্ষমাপ্রার্থী।" এ ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা বান্দা দু'টি বিরাট উপকার লাভ করে। তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিআমত বৃদ্ধি পায় ও সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে বান্দা আরেকটি আলো দেখতে পায়, যার সাহায্যে তার নিজ সময়ের মূল্য বুঝতে পারে যে এটাই তার সৌভাগ্য লাভের উপায়। এইভাবে যাবতীয় গুনাহ হতে তাওবাহ্ করে একজন লোক যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর পথে আসে, তখন সে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ও সাবধান হয়ে যায়। অর্থাৎ সে সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখে এবং দিনের শেষে এই চিন্তা করে যে তার দিনটি কিভাবে অতিবাহিত হলো? একজন মানুষ এভাবেই গুনাহ্ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

এই অবস্থায় বান্দা তার সকল জাগতিক কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জা বোধ করে যে, সে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহমায়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এই উপলব্ধিই নাফসে মুতমায়িন্নাহর প্রথম স্তর, যেখান থেকে একজন খাঁটি বান্দা আল্লাহর পথে যাত্র শুরু করে।

এখানে নাফসে লাউয়ামাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নাফসে লাউয়ামাহর কসম করেছেন, ইরশাদ হয়েছে, "ওয়া লা উকসিমু বিন্নাফসিল লাউয়ামাহ।" অর্থাৎ "আমি আরও শপথ করছি সেই তিরস্কারকারী মনের।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-২)

নাফসে লাউয়ামাহ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। একশ্রেণীর লোকের মতে নাফসে লাউয়ামাহ এক অবস্থার উপর স্থির থাকেনা। আরবি 'লাউয়ামাহ' শব্দটি 'তালূম' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ হলো তারাদ্দুদ বা ইতস্তত করা। নাফসে লাউয়ামাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিদর্শন এবং তাঁর একটি মাখলূক বা সৃষ্টি, যেটা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। কখনো আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, আবার কখনো অলস হয়ে যায়, কখনো আল্লাহ তা'আলার দিকে অগ্রসর হয়, আবার কখনো পেছনে সরে পড়ে। কখনো হালকা হয় আবার কখনো থেমে যায়। কখনো সৎকাজ পছন্দ করে, আবার কখনো অপছন্দ করে। কখনো সে আনন্দিত হয়, আবার কখনো নিরানন্দে ভোগে। কখনো সন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো অসন্তুষ্ট হয়। কখনো ভালোকাজ করে, আবার কখনো মন্দ কাজ করে। মোটকথা, প্রতি মুহূর্তে নাফসে লাউয়ামাহ তার কর্যক্রম পরিবর্তন করে।

অপর এক শ্রেণীর লোকের মতে আরবি 'লাউম' শব্দ থেকে লাউয়ামাহ্ শব্দটি নেয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে মতবিরোধ আছে যে, নাফসে লাউয়ামাহ কোন ব্যক্তির নাফস? কারো কারো মতে নাফসে লাউয়ামাহ্ একজন মুমিন ব্যক্তির নাফসকে বলা হয়। আর এই নাফসের অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি গুণ হলো, তিরস্কারের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।

নাফসে লাউয়ামাহ্ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র)-এর অভিমত হলো, একজন মুমিন বান্দা সর্বদা নিজের নাফসকে এই মর্মে তিরস্কার করে যে, একটি মন্দ কাজ সে কেন করলো, এই কাজটি না করে সে অন্য একটি নেক কাজ করলো না কেন?

কারো কারো মতে মুমিনের নাফসকে নাফসে লাউয়ামাহ্ বলা হয়, যে নাফস একজন মুমিনকে পাপে লিপ্ত করে, আবার এই জন্য তাকে তিরস্কার করে। অবশ্য এই তিরস্কার করাটা ঈমানের একটি লক্ষণ। কেননা বদবখত বা দুর্ভাগা ব্যক্তির নাফস গুনাহের জন্য তিরস্কার করে না বরং গুনাহ্ না করার জন্য তাকে তিরস্কার করে।

অন্য একশ্রেণীর জ্ঞানী লোকের মতে নাফসে লাউয়ামাহ্ কাফির ও মুমিন উভয়ের নাফসকেই বলা হয়। একজন মুমিন বান্দা কোন গুনাহে জড়িত হওয়ার দরুন ও আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করার কারণে নাফস তাকে তিরস্কার করে। আর একজন বেঈমান ব্যক্তিকে এই নাফস ঈমানদার ও সৎ না হওয়ার জন্য তিরস্কার করে।

অপর একশ্রেণীর আলিমের মতে নাফসে লাউয়ামাহ্র এই তিরস্কার কিয়ামতের দিন কার্যকর করা হবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির নাফস তাকে তিরস্কার করবে। সে ব্যক্তি মন্দ হলে মন্দের জন্য আর সৎ হলে আরো ভালো আমল না করার জন্য তিরস্কার করবে। উপরোক্ত সবগুলো অভিমতই সঠিক। এসবের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাত বা সন্দেহ নেই। কেননা নাফস এসব গুণে গুণান্বিত। এজন্যই এই নাফসকে নাফসে লাউয়ামাহ বলা হয়।

নাফসে লাউয়ামাহ দু'প্রকার। **এক.** লাউয়ামাহ মালূমাহ অর্থাৎ মূর্খ ও অত্যাচারী নাফস, যাকে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতারা ভর্ৎসনা করেন। **দুই.** লাউয়ামাহ গায়র মালূমাহ। এটি হলো ঐ নাফস যেসব সময় নিজ দেহের আমলের ত্রুটির জন্য তাকে তিরস্কার করে। অবশ্য সামর্থ্য অনুযায়ী সে নেককাজ করার চেষ্টা করে থাকে।

সবচেয়ে উত্তম নাফস হলো ঐ নাফস যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ত্রুটির জন্য ও তার অপরাধের জন্য লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তোষজনক কাজের জন্য লোকেরা তাকে মন্দকথা বললে সে সেটা নীরবে সহ্য করে। আর এসব বিষয় সম্পর্কে কোন গুরুত্ব দেয়না। নিশ্চয় এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করে। পক্ষান্তরে, কেউ তাকে অবহেলা করলে সে ব্যক্তির নাফস নিজের আমলের

দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। কেউ তার দোষক্রটি অন্বেষণ করলে তার নাফস তা সহ্য করেনা। অন্য কেউ তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে সে নির্বিকার থাকে না। এরূপ লোক আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।

নাফসে আম্মারাহ্ হলো খারাপ নাফস। সে প্রত্যেক মন্দকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। এটাই হলো তার সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করেন তাকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং সাহায্য করেন, সে নাফসে আম্মাহর চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়। কোন মানুষ তার নাফসের কু-প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া রক্ষা পেতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "আমি নিজের নাফসকে নির্দোষ মনে করি না। নিশ্চয় মানুষের নাফস অপকর্মের দিকে অধিক উৎসাহ্ প্রদান করে। কিন্তু যাকে আমার রব রহ্ম করেন।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো পাক ও পবিত্র হতে পারতো না।" (সূরা নূর ঃ আয়াত-২১)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা ও রাসূল সম্পর্কে বলেছেন, "আমি যদি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম, তাহলে আপনি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়তেন। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত-৭৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা বা ভাষণের প্রাথমিক বাক্যগুলোর অর্থ লক্ষণীয়, "আল্লাহ্ তা'আলার শোকর ও তারীফ। আমরা তাঁর শোকর করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে মাফ চাই এবং আমাদের মনের দৌরাত্ম্য ও কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আশ্রয় চাই। আর আমাদের মন্দকাজ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ গুমরাহ্ করতে পারে না, আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে গুমরাহীতে রাখেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না।

নাফসের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে, তাই নাফস মন্দ আমল করিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন বান্দাকে তার নাফসের কাছে ছেড়ে দেন, তাহলে সেই বান্দা নাফসের দৌরাত্ম্য ও মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দান করেন ও সাহায্য করেন, তাহলে সে রক্ষা পেতে পারে। আসুন, আমরাও মহান মা'বুদের কাছে দুআ করি– "হে আমাদের রব, আমাদেরকে নাফসের দৌরাত্ম্য থেকে ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।"

আল্লাহ তা'আলা নাফসে আম্মারাহ ও লাউয়ামাহ দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। আর নাফসে মুতমায়িন্নাহ দ্বারা সম্মান বর্ধন করেন। আসলে, নাফস একটাই।

তবে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন– আম্মারাহ্, লাউয়ামাহ্ ও মুতমায়িন্নাহ্। প্রকৃতপক্ষে, ইতমীনান বা প্রশান্তি হলো নাফসের চরম পরিপূর্ণতা ও সাবধানতা। আল্লাহ্ তা'আলা নাফসে মুতমায়িন্নাহকে তাঁর সহযোগী শক্তির দ্বারা সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি প্রত্যক নাফসের জন্য একজন ফেরেশতা সঙ্গী করে দিয়েছেন, যিনি সবসময় তার সঙ্গে থাকেন। তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন, তাকে সৎ, সত্য ও ন্যায় পথে চলতে উৎসাহিত করেন। আর নেক আমলের সুন্দর ও মনোরম আকৃতি তাকে দেখান। মন্দ লোককে তার মন্দ আমলের জন্য তিরস্কার করেন, তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন, আর তার খারাপ আমলের খারাপ আকৃতি তাকে দেখান। আর নেক বান্দাকে কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ও নেকআমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন। সবদিক থেকে নেকীর প্রহরা ও আল্লাহর তাওফীক তার নসীব হয়। আর এসব নেককাজ ও ভালো আমলের শোকর আদায়ের জন্য তার সাহস ও শক্তি বাড়তে থাকে। তখন সে দৃঢ়তার সাথে নাফসের মুকাবিলা করতে পারে। একজন বান্দার মূল শক্তি হলো তার ঈমান ও ইয়াকীন। সে নাফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈমানী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। ঈমানের শাখা প্রশাখা হলো- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ওয়ায-নসীহত, লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আর যে সবের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো হলো– ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তাওবাহ্, আত্মসমালোচনা, সবর ইত্যাদি।

এছাড়া নেক বান্দার দিলে আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সীমাহীন ইশক মুহাব্বত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালনের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সুন্দর চরিত্র, সততা ইত্যাদি গুণাবলী একজন নেকবান্দার জন্য অপরিহার্য। একজন খাঁটি ও সত্যবাদী ব্যক্তি এই সরল পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না এবং সতর্কতার সাথে সে সামনে অগ্রসর হয়। কিন্তু শয়তান সততা ও নিষ্ঠাবর্জিত ব্যক্তিকে সরল পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তাই এই ব্যক্তি উদাসীন, ভ্রান্ত ও মাতালের ন্যায় হয়ে যায়, সে কোন সৎ আমল করুক বা না করুক। বরং তার উদাসীনতা তাকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে নেকপথে অগ্রসর হয়, সে নাফসে মুতমায়িন্নাহ অর্জনকারীদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

নাফসে আম্মারার সাথী হলো শয়তান, যে তার কাছে মিথ্যা অঙ্গীকার করে, মিথ্যা আশার বাণী শোনায় এবং তাকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয় আর অসৎ কাজের দিকে প্ররোচিত করে, মন্দ কাজগুলোকে সুন্দর আকৃতিতে উপস্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখায়। মিথ্যা বিষয়গুলোকে অতিসুন্দর আকৃতিতে দেখায় যাতে মানুষ বিনা দ্বিধায় সেটা গ্রহণ করে এবং সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এছাড়া শয়তান ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিতে সচেষ্ট থাকে। সে মানুষের অন্তরে মিথ্যা আশা

জাগিয়ে তোলে, ক্ষতিকর লালসায় লিপ্ত করে। একজন শয়তানরূপী মানুষও জানে কাউকে মন্দকাজে প্ররোচিত করার জন্য লোভ-লালসার কোন বিকল্প নেই। অবশেষে শয়তান তার প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস খুঁজে বের করে, আর সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে ঐগুলোকে অনুসরণ করার জন্য প্রলুব্ধ করে ও তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। তারপর যখন নাফস লোভ-লালসার দরজা খুলে দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে চরম হৈ চৈ ও অশান্তির সৃষ্টি করে, হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। এভাবে শয়তান মানুষের ঈমান, তিলাওয়াতে কুরআন এবং যিকর-আযকার ও নামাযের কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়, মসজিদেকে ধ্বংস করে, গীর্জা ও অগ্নিকুণ্ডকে আবাদ করে। আর মদখোর এবং জুয়াড়ীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এভাবে আল্লার কর্তৃত্বকে বিনষ্ট করতে চায় আর মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে সরিয়ে খোদাদ্রোহী ও মূর্তিপূজারী বানিয়ে ছাড়ে। আর আনুগত্যের ইয্যত থেকে বের করে পাপের স্তূপে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী শ্রবণ করা থেকে অশ্লীল গান-বাজনা শোনার দিকে প্ররোচিত করে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার আশা দূর করে শয়তানের অনুচরদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। পরিণামে যে ব্যক্তি প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখতো, এখন সমূহ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত ছিলো সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আসলে, নাফসে মুতমায়িন্নাহর সাথী হলো ফেরেশতা, আর নাফসে আম্মারাহর সাথী হলো শয়তান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের নিকট ফেরেশতা ও শয়তান উভয়েই আগমন করে।" এভাবেই ভালো-মন্দ খেয়াল মানুষকে প্রভাবিত করে। শয়তানী খেয়াল মানুষকে মন্দকাজের দিকে, আর নেক খেয়াল মানুষকে ভালোকাজে উৎসাহ দান করে। তবে যার দিলে নেকখেয়াল আসে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করা উচিত। আর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাওয়া উচিত। তারপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উপস্থিত সকলকে তিলাওয়াত করে শুনালেন, যার অর্থ হলো, "শয়তান একদিকে তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, আর অন্যদিকে তোমাদেরকে লজ্জাহীনতার উৎসাহ দেয়।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৬৮)

নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহর মধ্যে যে সংঘর্ষ ও সংঘাত দেখা দেয় সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো। ফেরেশতা ও ঈমানের প্রহরীগণ নাফসে মুতমায়িন্নাহর সাহায্যে তাওহীদ, ইহসান, সবর , তাওয়াক্কুল, তাওবাহ, নেকী, তাকওয়া, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহ, একাগ্রতা ইত্যাদির মাধ্যমে

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর শয়তান ও তার বাহিনী নাফসে আম্মারাহর সাহায্যে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। এভাবে প্রত্যেক ভালো জিনিসের দিকে শয়তানকে লেলিয়ে দেয়া হয়। শয়তান নাফসে আম্মারাহকে তার প্রতিনিধি বানাতে চায়, যাতে নাফসে আম্মারাহ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এজন্য শয়তান নাফসে মুতমায়িন্নাহ থেকে নেক আমল ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সর্বদা সক্রিয় থাকে। শয়তান ও নাফসে আম্মারাহ থেকে নেক আমলকে রক্ষা করা বান্দার জন্য একটি কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। বান্দার আমলসমূহ যথারীতি আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছে যায়। একটি নেক আমলও যদি সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছে যায় তাহলে তা হবে ঐ ব্যক্তির নাজাতের কারণ। কিন্তু শয়তান ও নাফসে আম্মারাহ বান্দার একটি নেক আমলও পরিশুদ্ধভাবে যাতে আল্লাহর নিকট পৌছতে না পারে সে বিষয়ে তৎপর ও সক্রিয় থাকে। একজন আরিফ অর্থাৎ আল্লাহ প্রেমিকের বক্তব্যের অর্থ এই যে, "আমি যদি জানতে পারি, আমার একটি নেক আমল যথারীতি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌছে গিয়েছে তাহলে সেটা হবে আমার জন্য ঐ মুসাফিরের থেকেও বেশি আনন্দদায়ক, যে দীর্ঘ সফরের পর নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছে।"

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বক্তব্য হলো, যদি আমি জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে একটি সিজদা গ্রহণ করেছেন, তাহলে সেটা হবে আমার নিকট দীর্ঘ প্রবাসের পর বাড়ি ফিরে আসা মুসাফিরের চেয়েও অধিকতর প্রিয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের মানতই কবূল করে থাকেন।" (সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-২৭)

নাফসে আম্মারাহ নাফসে মুতমায়িন্নাহর সম্মুখে অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নাফসে মুতমায়িন্নাহ যদি কোন ভালোকাজ করে, তখন নাফসে আম্মারাহ তার বিরোধিতা করে আর তাকে মন্দকাজের দিকে উৎসাহিত করে, যেন এতে তার নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। নাফসে মুতমায়িন্নাহ ঈমান, তাওহীদ ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলে নাফসে আম্মারাহ তার পরিবর্তে সন্দেহ, নিফাক, শিরক এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভালোবাসা, গায়রুল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করে। নাফসে মুতমায়িন্নাহ কোন বান্দাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন নাফসে আম্মারাহ খারাপ ও মন্দকাজের প্রতি আল্লাহ-রাসূলের হুকুমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। নেকলোকদেরকে ভ্রান্ত প্ররোচনায় খারাপ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এভাবে জনগণের নেক ধ্যান-ধারণাকে নষ্ট করে। তাই নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আল্লাহ তা'আলা যাঁকে সাহায্য করেন সেই রক্ষা

পায়। ঐ ব্যক্তি যখন পরিশুদ্ধ আমল, আল্লাহর আনুগত্য, তাওবাহ, সত্যবাদিতা ও নাফসের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সৎকর্মে নিয়োজিত হয়, তখন নাফসে আম্মারাহ এসবের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং এক মুহূর্তে তার কাজ সমাধা করতে চায়। এছাড়া নাফসে আম্মারাহ মানুষকে বিশ্বাস করাবার জন্য আল্লাহর শপথ করে বলে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী ছাড়া আর কিছু নই। অথচ এটা একেবারেই নিরেট ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করা। আল্লাহর কসম, এসবই হচ্ছে নাফসে আম্মারাহর প্রতারণা যাতে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে নেককার বান্দা বিরত থাকে ও লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে নাফসে আম্মারাহর দুনিয়াতে ও বরযখে এবং আখিরাতে সংকীর্ণ স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নাফসে আম্মারাহ নেকবান্দাদের সুস্থ মন ও মগজকে পঙ্গু করে দেয়। আর যেসব কাজ উত্তম ও সম্মানজনক এবং উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন সেগুলোকে কুৎসতি আকৃতিতে উপস্থাপন করে। অবুঝ ও দুগ্ধপোষ্য শিশুরাই সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তারা ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। তারা যখন বালিগ হয়, তখন ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারে, আর ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থেকে ভালো বিষয়গুলো গ্রহণ করে, ভালো কাজগুলোকে ত্যাগ করতে পছন্দ করেনা। নাফসে আম্মারাহর প্রকৃতস্বরূপ হলো, খাঁটি তাওহীদকে সে খারাপ ও অপছন্দনীয় আকৃতিতে দেখাতে পছন্দ করে, এর দ্বারা মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এভাবে নেক বান্দাদেরকে তাঁদের উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। আর হীনতা, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আবর্তে ঠেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় বিভ্রান্তিতে নিপতিত নেক বান্দাদের কোন কার্যকর ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশ করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। এই মায়াবী নাফসে আম্মারাহ এ বিষয়গুলোকে মহৎ ব্যক্তিবর্গের কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত প্রদর্শন করে, যে কারণে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে তাঁদেরকে মিসকীনও ফকীর বানিয়ে দেয়া হয়, এটা নেককার বান্দাদের সাথে ঘৃণ্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে চাকচিক্যময় কথার ফাঁদে পড়ে মানুষ খাঁটি তাওহীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে। পবিত্র কুরআন শরীফে তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তারা বলে, "সেকি তার সব মা'বূদকে ত্যাগ করে শুধু একজন মাত্র মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে। এটাতো বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার।" (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৫)

নাফসে আম্মারাহর অনুসারীরা এমনিভাবে খাঁটি ইত্তেবায়ে রাসূলকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। নাফসে আম্মারাহর যারা শিকার সেসব মুশরিক ও বাতিলপন্থীরা যারা খাঁটি ও ঈমানদার ও সৎলোক তাঁদের সম্পর্কে বলে, তারা আলিমদের

মর্যাদাকে হ্রাস করে, ইমামগণের মূল্যবান মতামতকে উপেক্ষা করে, তাঁরা তো কুরআন হাদীসের আলোকে মতামত সাব্যস্ত করে থাকবেন। তাঁরা তো এদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের সাথে বেআদবী করতে কি এদের লজ্জা হয় না? ছোট মুখে বড় কথা কি শোভা পায়? মহৎ বক্তিবর্গের সম্মুখে বড় বড় কথা বলে। আলিমদের শানে কু-ধারণা পোষণ করে। তারা তাদের ভ্রান্ত ভণ্ড নেতাদের বক্তব্যকে সঠিক ও অনুসরণীয় বলে মনে করে, পক্ষান্তরে, পূত-পবিত্র রাসূলের হাদীসগুলোকে আপত্তিকর মনে করে এবং এসব হাদীসকে তাদের মনগড়া বক্তব্য অনুযায়ী অর্থ করার চেষ্টা করে, কোন হাদীস যদি তাদের মতের সাথে খাপ খায়, তাহলে তা গ্রহণ করে, অন্যথায় তা বর্জন করে। কিম্বা অলীক ও অবান্তর অর্থ গ্রহণ করে যে এগুলো আমাদের উপলব্ধি করার আওতার বাইরে। নাফসে আম্মারাহ শপথ করে জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কল্যাণ সাধন ও সকলের সাথে আপোষ করা। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এদের অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। নাফসে আম্মারাহ মানুষের পরিশুদ্ধ ইবাদতকে ঘৃণার উদ্রেককারী রঙে উপস্থাপন করে। কেউ যদি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ইবাদত বন্দেগী করে, তাহলে সাধারণ মানুষ সেটাকে বেশি পছন্দ করেনা এবং তাকে এড়িয়ে চলে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম করে এবং নানা মন্দ ফিকিরের আশ্রয় নেয়, তাহলে তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পছন্দ করে। আসলে, আমাদের উচিত ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা, লোক দেখানোর জন্য নয়। নাফসে আম্মারাহ এভাবেই ধোঁকা দিয়ে থাকে।

যাঁরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, আর যারা আল্লাহর অবাধ্য, নাফসে আম্মারাহ তাদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে। এ সংঘাত বা জিহাদকে নাফসে আম্মারাহ নেককার লোকদেরকে এ বলে বুঝাতে চায় যে, এতে তারা অন্যের বিরূপ সমালোচনার পাত্র হবে। অর্থাৎ তারা যেন এরূপ কোন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। এছাড়া নাফসে আম্মারাহ একজন নেককার বান্দাকে এ ধারণাও দেয় যে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করলে দুঃখ-কষ্ট ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। নাফসে আম্মারাহ জিহাদ সম্পর্কে আরো ধোঁকা দেয় যে, এতে করে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যার ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি ইয়াতীম ও অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের স্ত্রীগণও দুঃখকষ্টে পতিত হয়, তাদের ধনসম্পদও বিনষ্ট হয়ে যায়।

নাফসে আম্মারাহ নেককার বান্দাদেরকে যাকাত ও সাদকাহ সম্পর্কে একইভাবে ধোঁকা দেয়, যাকাত ও সাদকাহ আদায় করলে তারা কপর্দকহীন ও গরীব হয়ে পড়বে এবং অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে।

নাফসে আম্মারাহ আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কেও নেককার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে এই বলে যে, সেসবকে মান্য করা হলে আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য ও সমতুল্য অনিবার্য

হয়ে পড়বে, যদিও এরূপ ধারণা বাতিল ও ভ্রান্ত। নাফসে আম্মারাহ্ এভাবে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলী ও ধর্মদ্রোহিতাকে সুন্দর, মনোরম ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, যেসব গুণ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, নাফসে আম্মারাহ্ সেসব গুণ,স্বভাব ও কার্যাবলীকে এমনভাবে পেশ করে যেন তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। আর সব কিছুতেই তালগোল লাগিয়ে দেয়। ইবলিসের এসব চক্রান্ত থেকে একজন খাঁটি বান্দাই কেবল রক্ষা পেতে পারেন। কেননা যে কোন কর্মকাণ্ড মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, আর তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। এসব কাজ এভাবেই নাফসে আম্মারাহ সম্পন্ন করে। এমন সব কাজ দৃশ্যত এক রকম মনে হলেও অভ্যন্তরীণভাবে অন্যরকম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুদারাত অর্থাৎ সৎপ্রবণতাকে উৎসাহ দান করা, আর 'মুদাহানাত' অর্থাৎ অসৎপ্রবণতাকে উৎসাহ প্রদান করা। প্রথম নাফসে মুতমায়িন্নাহ্ কার্যকর করে আর দ্বিতীয়টি নাফসে আম্মারাহ কার্যকর করে। নাফসে মুতমায়িন্নাহর কাজ হলো– ঈমানের দৃঢ়তা, আত্মসম্মানবোধ, বিনয়ী হওয়া, দীনের জন্য প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানো, দীনের জন্য আত্ম সচেতনতা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধের সঞ্চার ও নাফসে আম্মারাহকে দমনের জন্য সচেষ্ট হওয়া, দীনী কাজে সহায়তা করা, দানশীল হওয়া, আবরুর হিফাযত করা, দূরদর্শিতা অবলম্বন করা, মিতব্যয়ী হওয়া, সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, সুধারণা পোষণ করা, সৎ উপদেশ প্রদান করা, সবর করা, ক্ষমা প্রদর্শন করা, অন্তরকে নিষ্কলুষ রাখা, আল্লাহর শোকর করা ও তাঁর উপর ভরসা রাখা, নেক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, চিত্তের পরিতৃপ্তি লাভ করা, বিনম্র অন্তরের অধিকারী হওয়া।

অপরপক্ষে, নাফসে আম্মারাহর কর্মকাণ্ড হলো মুনাফিকীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা, অহঙ্কারী হওয়া, অত্যাচার করা, ব্যক্তি স্বার্থে লিপ্ত হওয়া, অপচয় করা, অহমিকা পোষণ করা, ভীরুতা অবলম্বন করা, কার্পণ্য করা, অমূলক সন্দেহ পোষণ করা, পরনিন্দা-পরচর্চা করা, উৎকোচ গ্রহণ করা, মায়া-মমতাশূন্য হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, ক্ষমাহীনতা, অলসতা, মূর্খতা, ধোঁকাবাজি, আল্লাহর নিআমতের শোকর না করা, প্রবৃত্তির দাসত্ব করা, অধৈর্য হওয়া, অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা পোষণ করা, অবৈধভাবে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা করা। এসবই হলো শয়তানী বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক ধরনের আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়, আর এক ধরনের আত্মসম্মানবোধ অপছন্দনীয়। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া একটি প্রশংসনীয় কাজ, কারণ ব্যভিচার হলো গর্হিত, অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ। এক ধরনের অহঙ্কারী চাল-চলন আল্লাহ

তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। আর অন্য এক ধরনের অহঙ্কারী চাল-চলন আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। যুদ্ধের ময়দানে অহঙ্কারী চাল-চলন আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। অন্য সময় সেটা অপছন্দনীয়। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, শুধু দুই অবস্থায় ঈর্ষা করা যায়। আল্লাহ তাআলা কাউকে ধনদৌলত দিয়েছেন, আর তিনি দিনরাত তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে থাকেন। আর কাউকে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, আর তিনি এর দ্বারা ধর্মীয় বিষয় ফয়সালা করে থাকেন, আর অন্যদেরকে শিক্ষা দেন। অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা দয়ালু, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন এবং নম্রতার জন্য এতো বেশি দান করেন, যতোটা কঠোরতার জন্য করেন না। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ লাভ করেছে, সে কল্যাণের অংশ পেয়েছে। তাই জানা গেলো যে, নম্রতা একটি উত্তম গুণ, আর অলসতা ও দুর্বলতা হলো একটি মন্দ গুণ। একজন অলস ব্যক্তি সম্ভাব্য উপকারী হওয়া সত্ত্বেও উপকার করতে বিলম্ব করে। আর একজন নম্র স্বভাবের লোক যে কোন সুযোগ সুবিধা অর্জনের নম্রতা অবলম্বন করে। এমনিভাবে মুদারাত বা কাউকে খাতির করা একটি ভালো গুণ এবং মুদাহানাত বা অন্যায়ের সাথে আপোষ করা একটি মন্দ গুণ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুদারাতকারী নিজের হক অর্জনের জন্য অথবা কাউকে সরলপথে আনার জন্য স্নেহ-ভালোবাসার মাধ্যমে অগ্রসর হয়। আর একজন মুদাহানাতকারী কাউকে বাতিলপন্থী বানানোর জন্য অথবা তাকে নিজ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চাটুকারিতা অবলম্বন করে। একজন ঈমানদার ব্যক্তি অন্যকে খাতির ও সমাদর করেন, আর একজন মুনাফিক ব্যক্তি চাটুকারিতা অবলম্বন করে। এর উদাহরণ হলো; একজন লোক ফোঁড়ার দরুন ব্যথায় ছটফট করছে। তার চিকিৎসার জন্য জনৈক কোমল হৃদয়ের অধিকারী চিকিৎসক আসেন, তিনি তাকে দেখে শুনে ফোঁড়াকে নরম করে পাকিয়ে এর ভেতরের দূষিত রক্ত পুঁজ বের করে দিয়ে আবশ্যকীয় ঔষধের ব্যবস্থা করে দেন। লোকটি ঐ রোগীকে বলে থাকে, তোমার কোন ভয় নেই, চিন্তা করো না, পট্টি বেঁধে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর সে এ রোগীর ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর রাখে না। ফলে ফোঁড়ার মধ্যে পুঁজ জমে যায় এবং প্রত্যহ দূষিত বস্তু বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাতে একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঠিক এ ধরনের উপমা নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন একটি ছোলার সমান জখমের এই অবস্থা, তখন ঐ রোগীর কি অবস্থা হবে যা নাফসে আম্মারাহ কর্তৃক সৃষ্ট, যা যাবতীয় লোভ-লালসার খনি, যাবতীয় মন্দ বিষয়ের মূল কারণ এবং তার সাথে শয়তানও চরম প্রতারণা ও অঙ্গীকার করে, তাকে আশান্বিত করে থাকে। তাকে সব ধরনের তন্ত্র-মন্ত্র শেখাতে থাকে, আর ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো দেখতে থাকে। সত্যি

বলতে কি, এটি হলো নাফসে আম্মারাহর সবচেয়ে বড় ধরনের একটি চক্রান্ত। অনেকেই অতি সহজে এ চক্রান্তের শিকার হয়ে যায়। অবিশ্বাসীরা রাসূলগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো যে, তাঁদের উপর জিন ভূত আসর করেছে। অথচ তাঁরা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কিন্তু অভিযোগকারীরা ঘাড় নিচু করে উঁকি মেরে দেখেনি যে, তারা নিজেরা এ মিথ্যাচারে পতিত রয়েছে। আর রাসূলগণের প্রতি তারা এ অভিযোগও উত্থাপন করেছিলো যে, তাঁরা নিরাপত্তা ব্যাহত করে বেড়ান। তাঁরা উন্মাদ, তাঁদের তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগকারীরাই উপরোক্ত মন্দ কাজগুলোতে লিপ্ত ছিলো।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে ইযাম নাফসে আম্মারাহর চক্রান্ত থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাওয়ার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নাফসে আম্মারাহ্ ও শয়তান সকল অন্যায় কাজের মূল হোতা এবং এরা একযোগে কাজ করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যখন কুরআন পাঠ শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চেয়ে নেবে।' (সূরা নাহল ঃ আয়াত-৯৮)

"শয়তান যদি তোমাকে কখনো উসকানী দেয়, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাও, তিনি সব শুনেন, সব জানেন।" (সূরা আরাফ ঃ আয়াত-২০০)

"বলুন, হে রব! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের উপস্থিতি থেকে।" (সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ৯৭-৯৮)

"বলুন, আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টার নিকট সেসব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং গিরায় ফুঁকদানকারী (বা ফুঁকদানকারিণী) এর অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।" (সূরা ফালাক)

"বলুন, আমি পানাহ্ চাই মানুষের রব, মানুষের প্রভু, মানুষের প্রকৃত মা'বূদের নিকট, বারবার ফিরে আসা ওয়াসওয়াসা উদ্রেককারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কু-প্রবৃত্তির উদ্রেক করে সে জিনের মধ্য থেকে হোক, কি মানুষের মধ্য থেকে।" (সূরা নাস)

নাফসে আম্মারাহ্ ও তার সাথী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একজন বান্দাকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া অপরিহার্য। শয়তান হলো নাফসে আম্মারাহর এক নিকৃষ্ট সাথী। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমার সর্বব্যাপী ও কামিল রাবুবিয়াত বা প্রভুত্বের কাছে শয়তান ও নাফসে আম্মারার চক্রান্ত, প্রতারণা

এবং ফাসাদ থেকে তোমরা আশ্রয় চাও। এই দু'টি দুশমনের মধ্যবর্তী স্থান হলো দিল বা অন্তর। এ দু'টির প্ররোচনা অনবরত মানুষের অন্তরের দরজায় আঘাত করে এবং সব সময় আসা যাওয়া করে। এই ভয়ঙ্কর প্ররোচনার মূল উপাদান হলো লোভ-লালসা, হিংসা, যুলুম, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ, আর এসব নাফসে আম্মারাহর মাধ্যমে ঘটে থাকে এবং মানুষের অন্তরকে বিভ্রান্ত করে। তারপর ধূর্ত শয়তান একজন ক্ষতিকর চিকিৎসকের রূপ ধরে রুগ্ন ব্যক্তির কাছে আসে, অর্থাৎ তার রোগের চিকিৎসা করার বাহানায় তাকে বিপথগামী করে এবং তার ফন্দিফিকিরের মারফত তার মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে, এটাই হলো তার রোগমুক্তির অমোঘ পন্থা। অর্থাৎ মানুষ এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে। এভাবে অন্তরের দুর্বলতাজনিত রোগের কারণে নাফসে আম্মারাহর শক্তির সাথে শয়তানের শক্তি মিলিত হয়ে একযোগে প্রতারণা চালিয়ে যায়। একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এভাবেই শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর দ্বারা প্রভাবান্বিত ও প্রতারিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে লোভ-লালসা তাকে মন্দকাজে উৎসাহিত করে। শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর প্ররোচনার ফলে একজন বিপথগামী ব্যক্তি সাময়িক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। তার খারাপ কাজ যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ঈমান ও আমল সে রক্ষা করতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দান করেন, সাহায্য করেন ও রহমতের দ্বারা অনুগৃহীত করেন এবং তার হিফাযত করেন, তার অন্তরচক্ষু খুলে দেন। তখন সে ব্যক্তি নাফসে আম্মারাহ ও শয়তানের চক্রান্তের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারে। এভাবে একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট লোকদের থেকে যতোশীঘ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, একজন লোক সমুদ্রের পানিতে অঙ্গুলি ডুবিয়ে তুললে যে পানিটুকু তার অংগুলিতে লেগে থাকে, চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ঠিক তেমনি সামান্য।

কতিপয় পরিভাষার ব্যাখ্যা

ঈমানের একাগ্রতা ও নিফাকের একাগ্রতার মধ্যে পার্থক্য

ঈমানের একাগ্রতা হলো, আল্লাহ তা'আলার মহিমা, মহান শান শওকতের কাছে লজ্জাবনত হওয়া, ভয়-ভীতি, মুহাব্বত ও শালীনতাসহ আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহ আর নিজ গুনাহের মাত্রা দেখে একজন বান্দার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যখন একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি এভাবে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহর মহান দরবারে অবনমিত হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে, একজন মুনাফিক ব্যক্তির একাগ্রতা হলো, যেটা কৃত্রিম সেটাকে সে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে। আসলে, সেটা তার মনের কথা নয়। জনৈক সাহাবী

নিফাকের একাগ্রতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাইতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, মুনাফিকের একাগ্রতা কি? তিনি বলেছিলেন, "যার দেহ অবনত হয়, কিন্তু দিল অবনত হয় না।" আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে ঐ ব্যক্তির হৃদয় অবনত হয়, যার লোভ-লালসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং এর কু-প্রভাব তার হৃদয় থেকে বের হয়ে গিয়েছে। এভাবেই তার হৃদয় পরিমার্জিত হয়ে তার মধ্যে নূর ও মহত্ত্ব ঝলসে উঠে এবং আল্লাহর ভয়ে সে সদা সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত থাকে। অর্থাৎ তার নাফসের তাড়না লোপ পেয়ে তার হৃদয়ে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য স্থান লাভ করেছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার যিকরের দ্বারা সে ব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করে, তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর শান্তি বর্ষিত হয়, যার দ্বারা সে পরিতৃপ্ত থাকে।

আরবি 'মুখবিত' শব্দের অর্থ হলো– অনুগত ও প্রশান্ত। 'খাবত' ঐ নীচু যমীনকে বলা হয়, যার মধ্যে পানি জমে, 'কালবে মুখবিত' বলতে প্রশান্ত হৃদয়কে বুঝায়। এর চিহ্ন হলো, সে রবের মহা শান ও শওকতের সম্মুখে নিজের হীনতা, নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাঁর সান্নিধ্যে আজীবন সিজদাহরত থাকে। অপরপক্ষে, 'কালবে মুতাকাব্বির' বা অহঙ্কারী হৃদয় নিজ অহঙ্কার হেতু উগ্রভাবসম্পন্ন থাকে, যেমন– উঁচু যমীন যেখানে কোন পানি থাকেনা।

নিফাকের একাগ্রতা মূলত খুশু বা একাগ্রতা নয় বরং খুশুর বাহানামাত্র। সে লোক দেখানোর জন্য কৃত্রিমভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝুঁকিয়ে দেয়, আর তার দিলে কোন প্রকারের খুশু ও খুযূ বিদ্যমান থাকে না বরং তার হৃদয় লোভ-লালসা ও কুচিন্তায় ভরপুর থাকে, সে আসলে অজগর সাপ সদৃশ এবং অরণ্যের সিংহের ন্যায়। এরা সুযোগ পেলেই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আত্মসম্মানবোধ হলো একজন মানুষ নিচতা, মন্দস্বভাব, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকবে এবং নাফসে ঐসব হীন কাজ থেকে সংযত রাখবে।

নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হলো অহঙ্কার। মানুষের আত্মসম্মানবোধ উত্তম স্বভাব থেকে সৃষ্টি হয়। ভালো নাফসের বৈশিষ্ট্য হলো– ইযযত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা আর আল্লাহর সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা, যেন তাঁর বান্দা নীচ ও হীন না হয়। এই ভালো নাফসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সে কোন মন্দ স্বভাবে জড়িত হয়ে না পড়ে। এটা নাফসের প্রক্রিয়া ও আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। যে মানুষের অন্তঃকরণ কর্মশক্তি ও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত, সে যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।

হামিয়ত ও জাফার মধ্যে পার্থক্য

হামিয়ত হলো নাফসের নীচতা অপবিত্রতার উৎস। মানুষ সেদিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়, তাই সেটাকে ত্যাগ করে আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিলম্ব বা গাফলতি করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

পক্ষান্তরে, নাফসের কঠোরতা, অন্তরের অপবিত্রতা ও স্বভাবের অপরিচ্ছন্ন তা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এক প্রকার মন্দ স্বভাবের জন্ম দেয়, সেটাকে জাফা বা যুলুম বলা হয়।

বিনয় ও হীনতার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর পরিচিতি ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান, আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ভালো-মন্দ বুঝ শক্তি এগুলোর মাধ্যমে এক সুন্দর স্বচ্ছ-স্বভাব জন্ম নেয়, এ সবকে বিনয় বলা হয়। একজন বিনয়ী ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহর মুহাব্বতের কারণে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং সে তার স্রষ্টার সাথে একাত্মবোধ করে আর নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম মনে করে না, অন্যের হককে নিজের হকের উপর প্রাধান্য দেয় এবং অন্যের হক আদায় করাকে অপরিহার্য মনে করে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাদেরকে এই অনন্য সুন্দর স্বভাব দান করে থাকেন।

এর বিপরীত হলো– হীনতা, নীচতা, মনের সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা একজন মানুষকে হঠকারিতায় লিপ্ত করে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেমন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা স্বীয় স্বার্থে বিনয় অবলম্বন করে, এরা কর্তার ইচ্ছা পূরণে ব্যবহৃত হয়, এটা সত্যিকার অর্থে বিনয় নয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনয় পছন্দনীয়, আর হীনতা অপছন্দনীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট প্রত্যাদেশ এসেছে যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করো, কেউ কারো সাথে গর্ব করো না, আর অন্যায়ভাবে কারো বিরোধিতা করো না।

বিনয়ের রকমফের

বিনয় দু'প্রকার। **এক.** আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করা ও তিনি যেসব বিষয়কে নিষেধ করেছেন সেগুলোকে পরিহার করে চলাকে বিনয় বলা হয়। নাফস হলো আরাম প্রিয়। সে আল্লাহর নির্দেশ মানার ব্যাপারে গড়িমসি করে। এভাবে সে নাফস আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর বন্দেগী থেকে দূরে থাকে। এছাড়া সকল নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য তৎপর থাকে। একজন নেককার বান্দা যখন আল্লাহর হুকুম পালনে ও তাঁর নিষিদ্ধ আদেশ থেকে বাঁচার জন্য নিজের নাফসকে সংযত করে, তখন আল্লাহর বন্দেগীর জন্য তার বিনয় প্রকাশ পায়।

দুই. মহান রবের মাহাত্ম্য ও মহিমার জন্য তাঁর ইযযতও শানের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হলো বিনয়। নাফস যখন বিদ্রোহ করতে চায়, তখন বান্দা রবের মাহাত্ম্য, একত্ব ও তাঁর ক্রোধকে স্মরণ করে নিজেকে দমন ও সংযত করে বিনয়ী হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের দরুন তার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর সে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, আল্লাহর ক্ষমতা ও আধিপত্যের

কাছে অবনমিত হয়ে যায়। এটাই হলো প্রকৃত বিনয়। এটা প্রথম প্রকারের বিনয়ের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিনয়ের জন্য প্রথম প্রকারের বিনয় অত্যাবশ্যক নয়। প্রকৃত বিনয়ী সে ব্যক্তি যার মধ্যে উভয় প্রকার বিনয় বিদ্যমান।

দীন প্রতিষ্ঠায় প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন ও গর্ব করার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলার দীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করার অর্থ হলো শরীআতের নির্দেশাবলীকে সংরক্ষণ ও সচল রাখা। শরীআতের বিধি-বিধান বলবৎ রেখে সেটা থেকে উপকৃত হওয়া। আর এর সাথে সাথে শরীআতের সুমহান আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখা।

দীনকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে গর্ব বা অহঙ্কার করার অর্থ হলো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে আগ্রহী হওয়া, ব্যক্তিস্বার্থে আইন-কানুন জারি করা, এতে যদি কেউ কোন বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে জোর যবরদস্তি করে তাকে প্রতিহত করা ও ব্যক্তিস্বার্থকে শরীআতের উপর প্রাধান্য দেয়া।

ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও দীনী সহানুভূতির মধ্যে পার্থক্য

দীনী সহানুভূতি হলো শরীআতের বিধি-বিধান অনুযায়ী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আর ব্যক্তিগত সহানুভূতি হলো দীনের পরিবর্তে নাফসের প্ররোচনায় লোক দেখানো প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা। দীনি সহানুভূতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হকে মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়ে থাকে। তবে এই ক্রোধ ব্যক্তি স্বার্থে নয় আর সেই ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের আলো ঝলসে উঠে ও সে আলোয় তার অন্তর পরিপূর্ণতা লাভ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ক্রোধের সঞ্চার হতো তখন তাঁর চেহারা মুবারক লাল রং ধারণ করতো এবং পবিত্র ললাটে ঘাম দেখা দিতো যা তাঁর ক্রোধকে কমিয়ে দিতো। দীনের সহানুভূতির কারণেই তাঁর ক্রোধ দেখা দিতো। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মূসা (আ)-এর ক্রোধ আসতো তখন তাঁর মাথার টুপি পর্যন্ত গরম হয়ে যেতো। আসলে ব্যক্তিগত সহানুভূতির মধ্যে আনন্দ উপভোগের জন্য অথবা হারানো আনন্দের জন্য নাফসের মধ্যে একটি স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। কেননা নাফসের মধ্যে ফিতনা নিহিত আছে আর এই ফিতনাই হলো স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। এছাড়া নাফস লালসার অগ্নি ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কেননা লালসা ও ক্রোধ এমনি এক ধরনের আগুন যেটা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তাপ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলার হকের জন্য এ তাপ নাফসে মুতমায়িন্নাহর পক্ষ থেকে হতে পারে অথবা ব্যক্তিস্বার্থে নাফসে আম্মারাহর পক্ষ থেকে হতে পারে।

বদান্যতা ও অপচয়ের মধ্যে পার্থক্য

একজন দানশীল ব্যক্তি সাধারণত বিচক্ষণ ও যুক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তিনি কোন না কোন কল্যাণের স্বার্থে উপযুক্ত স্থানেই দান করে থাকেন। আর একজন অপব্যয়ী ব্যক্তি প্রায়শ অযথা ও অপাত্রে ব্যয় করে থাকে, আবার কোন কোন সময় যথাস্থানেও ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হিকমতের মাধ্যমে ধনসম্পদে যার যার ন্যায্য পাওনা ঠিক করে দিয়েছেন। সেগুলো দু'প্রকার– নির্ধারিত হক ও অনির্ধারিত হক। **এক.** নির্ধারিত হক হলো যাকাত, সাদকায়ে ফিতর যেগুলো আদায় করা অত্যাবশ্যক। দুই. অনির্ধারিত হক হলো– মেহমানের হক আদায় করা, একজন উপকারীর উপকার শোধ করা আর ঐ খাতে ব্যয় করা যার দ্বারা নিজের ইযযত ও সম্ভ্রম রক্ষা পায়। যে কোন দানকারী এসব ন্যায্য পাওনা আনন্দচিত্তে ও এই আশায় আদায় করে যে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে এর প্রতিদান দেবেন। কাজেই ঐ ব্যক্তি বদান্যতার সাথে ও খোলামনে এবং নাফসে মুতমায়িন্নাহর অনুপ্রেরণায় তার ধনসম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু একজন অপব্যয়ী ব্যক্তির লোভ-লালসার কারণে তার হাত খোলা থাকে এবং অন্ধ ও অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, তার ব্যয়ের কোন পরিকল্পনা বা হিসাব থাকে না, কোন সুযোগ-সুবিধার প্রতিও সে লক্ষ্য করে না। যদি ঘটনাচক্রে কোন ভালো কাজে ব্যয় করার তার কোন সুযোগ-সুবিধা এসে যায়, তাহলে সেটা হবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

আর একজন সখী বা দাতা ব্যক্তির উদাহরণ হলো, যে উর্বর জমিতে বীজ বপন করে এবং ঐ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যাতে সেখানে প্রচুর ফুল ও ফল জন্মে।

একজন অপব্যয়ী ব্যক্তির উদাহরণ হলো শক্ত ও অনুর্বর লোনা জমিতে সে যেন বীজ বপন করলো। ঘটনাক্রমে তার বপন করা বীজ যদি অঙ্কুরিতও হয় এবং ফলও জন্মে, তবে সেই বীজ সাধারণত কোন কাজে লাগে না। একজন দানশীল ব্যক্তির ব্যাপার তার ঠিক উল্টো, তার বীজ ফলে ফুলে সুশোভিত হয় ও উৎকর্ষ লাভ করে। তবে কখনো কখনো বেশি চারা গাছগুলো ভালোভাবে বর্ধিত হয় এবং যমীন সে গাছগুলোকে পুরাপুরি লালন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সত্যিকারের দাতা তো হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। বিশ্ব জাহানের যাবতীয় দান আল্লাহ্ তাআলার দানের তুলনায় এমন যেমন সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পানি, বরং এর চেয়েও কম। ঐ পানির কাৎরা বা বিন্দুও তাঁরই দান। আর আল্লাহ্র যতোটুকু ইচ্ছা ততোটুকু বর্ষণ করেন। আল্লাহ্র যে কোন দান তাঁর হিকমত অনুযায়ীই স্থান কাল পাত্র ভেদে হয়ে থাকে, যদিও মানুষ সেটা অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি এটাও জানেন, কোন স্থান তাঁর অনুগ্রহ পেতে পারে আর কোন স্থান তা পেতে পারে না।

ভয় ও অহঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য

যখন একজন বান্দার হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও মহিমায় ভরে ওঠে তখন তার উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আর একটি নূর তার হৃদয়েও ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সে আল্লাহর ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর তার চেহারা থেকে লাবণ্য ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়। আর তার হৃদয়ের গভীরে আল্লাহ তা'আলার ইশক ও মুহাব্বত জন্ম নেয়। তারপর তার দিকে জনগণের হৃদয় আকৃষ্ট ও আগ্রহান্বিত হতে থাকে এবং তাকে দেখে মানুষ শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করে। এমনকি তার সব বক্তব্য আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে। আর তার আমলও নূরানী হয়ে যায়। সে চুপ থাকলেও তার পরিবেশ অতীব সুন্দর, মোহনীয় ও ভাবগম্ভীর পরিদৃষ্ট হয়। সে যখন কথা বলে, তখন মানুষ সেটা অতি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে।

পক্ষান্তরে, কারো অন্তর যদি মূর্খতা ও যুলুমের দ্বারা ভরে যায়, তাহলে তার থেকে ইবাদত বন্দেগী বিদায় নেয়। অসন্তোষ তাকে ছেয়ে ফেলে, তখন সে লোকজনকে বাঁকা চোখে দেখে, গর্ব করে চলে, নিজেকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর কাউকে অগ্রাধিকারের উপযুক্ত মনে করে না। নিজেকে নিজে বড় মনে করে আমি তাকে ধন্য করেছি। কারো সঙ্গে হাসিমুখে দেখা সাক্ষাৎ করে না বরং ম্লান ও বিমর্ষ মুখে দেখা করে আর মনে করে অন্য সকলের উপর আমার অধিকার আছে, কিন্তু আমার উপর কারো কোন অধিকার নেই। আমি সবার চেয়ে উত্তম কিন্তু আমার চেয়ে কেউ বড় বা উত্তম নয়। এরূপ ব্যক্তি ক্রমশ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দূরে সরে যায়, জনগণের দৃষ্টিতে ধিকৃত ও নিন্দিত হয়ে যায়, সবাই তাকে ঘৃণা করে। প্রকৃতপক্ষে, ভয়-ভীতি হলো মাহাত্ম্যের চিহ্ন। আর অহঙ্কার ও যুলূম হলো মূর্খতার লক্ষণ।

সম্মান রক্ষা করা ও অহঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য

ইযযত ও সম্ভ্রম হিফাযতকারীর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে নতুন, পরিষ্কার ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ পরে শাহী দরবারে গমন করে এবং প্রশাসক ও নেতৃবর্গের সাথে মিলিত হতে চায়। বাহ্যত এ ব্যক্তি নিজের জামা-কাপড় ময়লা, ধূলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে পাকসাফ রাখার প্রবল চেষ্টা করে, যাতে পোশাক-পরিচ্ছদ শাহী দরবারে গমনের উপযুক্ত হয়। আর সে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকে। আর সেই এই জায়গা থেকে সতর্কভাবে বের হয়ে আসে যাতে তার পোশাকে ময়লার কোন চিহ্ন বা দাগ লাগতে না পারে। দুর্ঘটনাবশত ময়লার কোন দাগ যদি লেগে যায় তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে তা ধুয়ে নেয়, যেন ময়লার কোন চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে। একজন দিল ও দীনের হিফাযতকারীর অবস্থা ঠিক এমনি হয়ে থাকে। তবে মানুষের চোখ কাপড়ের ময়লা দাগগুলো দেখতে পায় কিন্তু দিলের দাগ দেখতে পায় না। কেননা তাকে অলসতা ও অজ্ঞতার পর্দা ছেয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা এসব বান্দাদেরকে অপবাদের স্থান থেকে ও জনগণ

থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, যেন তাদের দিলের মিহিন ও সাদা কাপড়ের উপর কোন গুনাহের ছিঁটা না পড়ে। একজন অহঙ্কারী ব্যক্তি এরূপ সতর্কতার ক্ষেত্রে এই পর্যায়ভুক্ত। তবে ঐ অহঙ্কারী ব্যক্তি মানুষের ঘাড়ে চড়তে চায়, তাদেরকে হেয় ও পদদলিত করতে চায়। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রথমোক্ত ব্যক্তির জন্য এক ধরনের আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অন্য ধরনের।

বীরত্ব ও অপরিণামদর্শিতার মধ্যে পার্থক্য

বীরত্বের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। নাজুক ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অটল থাকাকে শাজাআত বা বীরত্ব বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্য ধৈর্য ও সুধারণা থেকে জন্ম নেয়। একজন মানুষ যখন বিজয় লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করে, তখন সে অতিশয় নাজুক পরিস্থিতিতেও অটল ও অবিচল থাকে।

ভুল ধারণা, অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতা থেকে কাপুরুষতা জন্ম নেয়। এ অবস্থায় একজন মানুষ হয় বিজয় সম্পর্কে আশাবাদী, না হয় সবর অবলম্বনকারী। ভীরুতার মূলকারণ হলো, অবিশ্বাস ও ভুল ধারণা। ভীরু ব্যক্তির অন্তর কুমন্ত্রণায় পরিপূর্ণ থাকে, যার উৎসস্থল হলো ফুসফুস। কুধারণা ও কুমন্ত্রণার সময় তার ফুসফুস ফুলে যায়। আর হৃদয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাকে অস্থির ও অশান্ত করে তোলে। এভাবে তার অন্তরে অস্থিরতা ও অশান্তির উদ্ভব হয়। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের ভেতরে মন্দ স্বভাব অন্তর থেকে বের হয়ে আসে, যা কাপুরুষতা, অনুশোচনা ও লোভের সৃষ্টি করে।" কাপুরুষতাকে আরবি ভাষায় 'খালে' বলা হয় কেননা ফুসফুস ফুলে যাওয়ার দরুন দিল তার স্থান থেকে সরে যায়। তাই বদরের যুদ্ধে আবূ জাহল তার সাথী উতবাকে বলেছিলো, তোমার ফুসফুস ফুলে গিয়েছে। অর্থাৎ তুমি কাপুরুষ হয়ে গিয়েছো। যখন কারো দিল বা অন্তঃকরণ স্বস্থান থেকে সরে যায়, তখন তার বুদ্ধির কার্যকারিতাও কমে যায়। অবশেষে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অবসন্নতা দেখা দেয়। অন্ত র তখন সঠিকভাবে কাজ করে না। একজন মানুষের অন্তরের তাপ তার বীরত্বকে দৃঢ়পদে দাঁড় করিয়ে দেয়, সে তখন অটল ও অবিচল থেকে তার কাজ সমাধা করে। তারপর যখন তার অন্তর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় দেখে, তখন সে ঐ ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসে। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো দিলের খাদিম বা সেবক। এ কারণেই দিল যখন পলায়নপর হয়, তখন তার সেবকরাও দ্রুত পালিয়ে যায়।

অপরপক্ষে, জুরয়াত কোন ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতা সহকারে অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়, যার কারণ হলো উগ্রতা ও মনের অস্থিরতা। জুরয়াতে নাফস অর্থাৎ নাফসের অপরিণামদর্শিতা একজন মানুষকে যেখানে পদক্ষেপ করা উচিত নয়, সেখানে পদক্ষেপ করতে অনুপ্রাণিত করে। এর পরিণাম ফল কি লাভজনক না অলাভজনক সেদিকে সে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না।

দৃঢ়তা ও কাপুরুষতার মধ্যে পার্থক্য

দৃঢ় ও দূরদর্শী ঐ ব্যক্তি যে ভেবে চিন্তে সাহসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করে। আর তার ভালো-মন্দ বিবেচনা করে প্রত্যেকটি বিষয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আরবি 'হাযম' শব্দটি শক্তি ও দৃঢ়তাকে বুঝায়। 'হাযমাতুন' লাকড়ীর বোঝাকে বলা হয়। একজন দূরদর্শী ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের সকল দিক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। আর তার ধ্যান-ধারণার আলোকে যেখানে সেখানে অগ্রসর হওয়া অনুচিত বলে মনে করে। এই ভীরুতা তার দুর্বলতার কারণে নয়। অপর পক্ষে, কাপুরুষতা হলো এর ঠিক বিপরীত অবস্থা।

মিতব্যয়িতা ও কৃপণতার মধ্যে পার্থক্য

আরবি 'ইকতিসাদ' শব্দটির অর্থ হলো মিতব্যয়িতা। কোন আয়-ব্যয়কে নীতিগতভাবে সমন্বিত করা, কোন বিষয় সম্পর্কে কিভাবে ব্যয় করা হবে বা না হবে তা চিন্তা করে নির্ধারণ করা। এটাকে মিতব্যয়িতা বলে। তবে কোন খরচ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে মধ্যবর্তী নিয়ম অনুসরণ করাই শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর নিজের হাতকে (কৃপণতাবশত) কাঁধের দিকে সঙ্কুচিত করে রেখো না, আর একেবারে প্রসারিতও করে দিও না, অন্যথায় তিরস্কৃত ও রিক্তহস্ত হয়ে বসে পড়বে।" (সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত-২৯)

"আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করেনা আর কার্পণ্যও করে না, আর তাদের ব্যয় করা এর মধ্যস্থ মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত-৬৭)

"খাও ও পান করো আর অপচয় করো না।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৩১)

আরবি 'শুহহুন' শব্দটির অর্থ হলো কৃপণতা। লোভ-লালসা ও কৃপণতা মন্দ স্বভাব, যা হীনমন্যতা ও নাফসের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানে কুমন্ত্রণা থেকে সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষ অতি লোভী হয়ে যায়। এমনকি কোন সৎকাজে এক কপর্দকও ব্যয় করতে ইতস্তত করে এভাবে যে আবার সে গরীব না হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "মানুষকে অস্থিরচিত্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে হাহুতাশ করতে থাকে। আর যখন সে স্বচ্ছল থাকে, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।" (সূরা মাআরিজ ঃ আয়াত ১৯-২১)

সতর্কতা ও কুধারণার মধ্যে পার্থক্য

একজন সতর্কতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে ঐ লোকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যে বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাল-সামান ও বাহন নিয়ে খুব সাবধানে পথ অতিক্রম করে এবং বিপজ্জনক জায়গা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ

করে। এছাড়া চলার পথে অন্যান্য বিপদাপদের মুকাবিলার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও প্রস্তুত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখে। তার এই সাহস ও সাবধানতা তাকে মনের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে।

কুধারণা অর্থাৎ মানুষের প্রতি অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা এক শ্রেণীর লোকের সহজাত অভ্যাস। তারা কাউকে বিশ্বাস করে না এবং অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লোকের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে চলে। মানুষ এই শ্রেণীর লোককে পছন্দ করেনা। সতর্কতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি লোকজনের সাথে মেলামেশা করে বটে কিন্তু সে তাদেরকে এড়িয়ে চলে। অপরপক্ষে, একজন কুধারণা পোষণকারী ব্যক্তি কারো সঙ্গে মিলামিশাই করে না, সে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও কপটতা পোষণ করে নিজের হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেয়।

মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও ধারণার মধ্যে তফাৎ

যে কোন ধারণা সঠিক হতে পারে, বেঠিকও হতে পারে। স্বচ্ছ অন্তরের আলোর সাথে হতে পারে বা কোন ব্যক্তির অন্তরের অন্ধকারের সাথেও হতে পারে। এমনিভাবে অন্তরের পবিত্রতার সাথে হতে পারে অথবা অন্তরের অপবিত্রতার সাথেও হতে পারে। যে কোন মানুষকে প্রত্যক্ষ করলে তার সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা অধিক সন্দেহজনক ধারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "কোন কোন ধারণা পোষণ করাই গুনাহের কাজ।" ইরশাদ হয়েছে, "নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা হিজর ঃ আয়াত-৭৫)

আরো বলা হয়েছে, "না চাওয়ার কারণে এদেরকে মূর্খ ব্যক্তিরা মালদার মনে করে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে।" (সূরা-আল বারাকাহ ঃ আয়াত-২৭৩)

আরো বলা হয়েছে, "আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। তবে তুমি তাদের চেহারা ও কথন পদ্ধতি দেখে অবশ্যই চিনতে পারবে।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত-৩০)

আসল ফিরাসত বা অন্তর্দৃষ্টি হলো, অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ময়লা আবিলতা থেকে মুক্ত। আর এটা হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঐ নূর দিয়ে দেখে, যা আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুমিনের ফিরাসত বা অন্তর্দৃষ্টি থেকে সাবধান। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার নূর দিয়ে সবকিছু দেখতে পায়।" আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের কারণে একজন মুমিন বান্দার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। কোন মুমিনের অন্তর যখন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলাকে উপলব্ধি করার ও জানার সকল প্রতিবন্ধকতা তার দূর হয়ে যায়। সে অবস্থায় তার

যোগ্যতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে ঐ ধরনের এ রৌশনী সে লাভ করে, যে রৌশনীর দ্বারা সে ঐসব জিনিস দেখতে পায় যা আড়ালে বা অনেক দূরে থাকার কারণে দেখা যায় না। তাই একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আমার নৈকট্য লাভের জন্য ফরয আমলসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর একজন বান্দা তার নফল ইবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এমনকি তার সাথে আমার মুহাব্বত পয়দা হয়ে যায়, তারপর আমি যখন তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শুনতে পায়, চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখতে পায়, হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরতে পারে, আর পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলাফেরা করে। তারপর সে আমারই কথা শুনে, আমারই সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখে, আমারই নির্দেশ অনুযায়ী কোন কিছু ধরে। আর আমার নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।" এই হাদীসের দ্বারা জানা গেলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের দ্বারা তাঁর মুহাব্বত লাভ করা যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলা চান, তখন বান্দার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর হুকুম অনুযায়ী সক্রিয় ও সচল হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় তার দিল একটি পরিষ্কার আয়নার মতো হয়ে যায়। তার মধ্যে যা প্রকৃত সত্য সেটা দৃষ্টিগোচর হয়, সে অন্তরই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে যাঁর অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত, আর সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ। যে অন্তরের উপর আল্লাহ নূরের প্রাধান্য বেড়ে যায়, সে অন্তরের আলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ নূরই অন্তর থেকে চোখে আসে এবং তা সত্য উদঘাটনকারী হয়।

অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানা কিছু ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত সাহাবাদেরকে অন্তরের চোখে অথবা নূরে ফিরাসাতে নামাযের মধ্যে দেখে নিতেন। একদা তিনি মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর একবার মদীনা মুনাওয়ারায় পরিখা খনন করতে গিয়ে সিরিয়ার মহলসমূহ, সানা শহরের ফটক এবং পারস্য সম্রাটের শহর প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একবার মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মূতায় যুদ্ধরত সেনাপতির শহীদ হওয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর একবার আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীকে সেখানে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছিলেন। অথচ তখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায়ই ছিলেন। তারপর তিনি ময়দানে গিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে নাজ্জাশীর জানাযার নামায আদায় করেছিলেন।

হযরত উমর (রা) পারস্যের নেহাওয়ান্দ নামক স্থানে সিপাহসালার ও মুসলিম সেনাবহিনীকে শত্রুর মুকাবিলা করতে দেখতে পেলেন এবং তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, পাহাড় পেছনে রেখে যুদ্ধ করো। অথচ তিনি সে সময়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন। একবার তাঁর নিকট মুযহাজ্জ নামক স্থান থেকে

কয়েকজন লোক আসলেন, তাদের মধ্যে আশতার নাখয়ীও ছিলেন। হযরত উমর (রা) তাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কে? উত্তরে বলা হলো, ইনি হলেন– মালিক ইবনে হারিস। তখন তিনি বললেন, এর উপর আল্লাহ তা'আলার ধ্বংস নেমে আসুক। আমি মুসলমানদের জন্য এর থেকে একটি ভীষণ ক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি। একবার আমর ইবনে উবায়েদ (রা) হযরত হাসান (রা)-এর নিকট এসেছিলেন। তিনি হযরত হাসান (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "ইনি হলেন নওজোয়ানদের সর্দার, যদিও তিনি মুহাদ্দিস নন।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অন্তর্দৃষ্টি

কথিত আছে যে, একবার ইমাম শাফিয়ী (র) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র) মসজিদে হারামে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক সেখানে আসলো। মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র) বললেন, আমার মনে হয় লোকটি কাঠমিস্ত্রী। ইমাম শাফিয়ী (র) বললেন, আমার মনে হয়, লোকটি কর্মকার। লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, সে আগে কর্মকার ছিলো, বর্তমানে সে কাঠমিস্ত্রী।

হযরত আবুল কাশেম মুনাদী (র)-এর অন্তর্দৃষ্টি

একবার অসুস্থ হযরত আবুল কাসেম মুনাদী (র)-এর সেবা শুশ্রূষার জন্য হযরত আবুল হাসান বুশঞ্জী (র) ও হযরত হাদ্দাদ হাসান (র) তাঁর নিকট আসলেন। তাঁরা আসার সময় পথিমধ্যে ধারে কিছু আপেল ক্রয় করেছিলেন। যখন তাঁরা হযরত আবুল কাসেম মুনাদী (র)-এর নিকট আসলেন, তখন ধারে আপেল ক্রয় করার বিষয়টি আবুল কাশেম মুনাদী (র)-এর কাছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিলো এবং তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "এটা কেমন একটি অশুভ ব্যাপার।" তাঁরা মনে করলেন, তাঁরা যে ধারে আপেল ক্রয় করেছিলেন, হয়তো জন্য তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন। তাই তাঁরা ফিরে গিয়ে আপেলের দাম পরিশোধ করে আসলেন। তিনি আবার তাঁদেরকে দেখেই বলে উঠলেন, মানুষের পক্ষে এতো তাড়াতাড়ি অন্ধকার থেকে আলোয় আসা কি করে সম্ভব? এবং তিনি তাদের কাছে ঘটনাটি জানতে চাইলেন। তখন তাঁরা ধারে আপেল ক্রয় করার বিষয়টি বর্ণনা করলেন। সব শুনে তিনি বললেন, যদিও তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব ছিলো না যে তারা যে কেউ একজন আপেলের মূল্য পরিশোধ করে দেবে। দোকানদার দু'জনের মধ্যে কার কাছ থেকে আপেলের মূল্য চেয়ে নেবেন এ বিষয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

হযরত আবূ উসমান হীরী (র)-এর অন্তর্দৃষ্টি

হযরত আবূ যাকারিয়া নখশবী (র)-এর সাথে একজন মহিলার বিবাদ বিসম্বাদ ছিলো। তিনি একদিন হযরত আবূ উসমান হীরী (র)-এর নিকট দাঁড়ানো ছিলেন।

এসময়ে সে বেগানা মহিলার কথা তাঁর মনে পড়লো। হযরত আবূ উসমান (র) মাথা তুলে বললেন, তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি একজন বেগানা মহিলার কথা স্মরণ করছো।

হযরত শাহ্ কিরমানী (র)-এর অন্তর্দৃষ্টি

কথিত আছে যে, হযরত শাহ্ কিরমানী (র) সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। আর তাঁর বেশির ভাগ অন্তর্দৃষ্টি সঠিক হতো। হযরত শাহ কিরমানী (র) বলতেন, যে ব্যক্তি হারাম দৃষ্টি থেকে চক্ষু বন্ধ রাখবে, লোভ-লালসা থেকে নিজের দিলকে রক্ষা করবে, দিলকে সবসময় মুরাকাবায় নিয়োজিত রাখবে, সুন্নাতের পাবন্দ থাকবে, আর হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত থাকবে, এমন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি কখনো ভুল হয় না।

এক নওজোয়ানের অন্তর্দৃষ্টি

জনৈক নওজোয়ান হযরত জুনায়েদ (র)-এর সাথে উঠা বসা করতেন। আর নিজের অন্তরের খেয়ালের ব্যাখ্যা পেশ করতেন। একদিন হযরত জুনায়েদ (র)-এর নিকট তাঁর বিষয় আলোচনা হয়। তিনি নওজোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বিষয়ে মানুষের এমনি সব ধারণা। নওজোয়ান বললেন, আপনি এখন আপনার দিলে কোন বিষয় খেয়াল করুন। হযরত জুনায়েদ (র) বললেন, আমি চিন্তা করেছি। নওজোয়ান তা বলে দিলেন। হযরত জুনায়েদ (র) বললেন, ভুল। নওজোয়ান বললেন, আচ্ছা আবার চিন্তা করুন। তিনি বললেন, চিন্তা করেছি। নওজোয়ান তা বলে দিলেন। তিনি বললেন, ভুল। নওজোয়ান বললেন, আপনি আবার চিন্তা করুন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের বিষয়, আপনি ঠিকই বলেছেন আর আমার অন্তরের কথাও সত্য। হযরত জুনায়েদ (র) তখন বললেন, তুমি তিনবারই ঠিক বলেছো। আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম মাত্র যে, তোমার দিলের অবস্থান কোন পরিবর্তন হয় কি না?

এক ফকীরের অন্তর্দৃষ্টি

হযরত আবূ সায়ীদ খার্রায (র) বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার মসজিদে হারামে গেলাম। এমন সময় একজন ফকীর সেখানে আসলেন। তিনি দু'টি দরবেশী পোশাক পরিহিত ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই ধরনের লোকই মানুষের জন্য বোঝাস্বরূপ। সেই ফকীর তখন আমাকে লক্ষ্য করে এ পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "ভালো করে জেনে নাও, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৩৫)

আমি তাঁর একথা শুনে মনে মনে আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফিরাত কামনা

করলাম। পরক্ষণেই তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "তিনিই তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে তাওবাহ্ কবূল করেন এবং সব রকমের খারাবী ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।" (সূরা শূরা ঃ আয়াত-২৫)

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র)-এর অন্তর্দৃষ্টি

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি এক জামে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একজন সৌম্য ও সুন্দর নওজোয়ান সেখানে আসলেন। তাঁর থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিলো। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, "আমার মনে হয় এ লোকটি ইয়াহুদী।" কিন্তু তারা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো না। আমি সেখান থেকে চলে এলাম, আর সেই নওজোয়ানও চলে গেলো। পরবর্তীতে ঐ নওজোয়ান আমার সাথীদের সাথে দেখা করে জানতে চাইতো, তার সম্পর্কে আমি কি বলেছি, আমার সাথীরা তাকে তা জানাতে লজ্জাবোধ করলেন। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। অগত্যা তাঁরা বললেন যে, তিনি আপনাকে একজন ইয়াহুদী বলে মন্তব্য করেছেন। অতঃপর সে আমার কাছে এসে হাত ধরে যথারীতি মুসলমান হয়ে গেলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন মুসলমান হলে? নওজোয়ান বললো, আমাদের (আসমানী) কিতাবে পড়েছি যে, সিদ্দীক ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ভুল হয় না। তাই ভাবলাম, কেউ যদি সিদ্দীক হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আল্লাহ্ প্রেমিকদের মধ্যে থাকবেন। সুতরাং আমি আপনার নিকট আসলাম, আর আপনি আমাকে দেখেই বুঝতে পারলেন আমি একজন ইয়াহুদী। কাজেই আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, আপনি অবশ্যই একজন সিদ্দীক।

হযরত উসমান (রা)-এর অন্তর্দৃষ্টি

একবার হযরত উসমান (রা)-এর নিকট জনৈক সাহাবী আসলেন। তিনি পথিমধ্যে একজন বেগানা মহিলাকে দেখে এসেছিলেন এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য নিয়ে ভাবছিলেন। তাঁকে দেখে হযরত উসমান (রা) বললেন, "কোন কোন লোক এমন অবস্থায় আমার নিকট আসে যে, ব্যভিচারের চিহ্ন ও প্রতিক্রিয়া তার চেহারায় ফুটে ওঠে।" সে সাহাবী তখন বললেন,,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীকালেও কি ওহী জারী আছে? তিনি বললেন, 'না'। এটা হলো নিরেট ফিরাসত বা অন্তর্দৃষ্টি।

উপদেশ দেয়া ও পরনিন্দার মধ্যে পার্থক্য

উপদেশ দেয়া বা মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে কোন বিদ'আতী, ফিতনাবাজ, প্রতারক বা ক্ষতিকারকের থেকে সাবধান করা। যখন কেউ কোন মুসলমানের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বা লেনদেন করার জন্য বা তার সাথে উঠা বসার লক্ষ্যে কোন উপদেশদাতার পরামর্শ চায়, তখন তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে

তার সঠিক অবস্থা অবহিত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে বলা যায় যে, হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) যখন হযরত মুআবিয়া (রা) অথবা হযরত আবূ জাহাম (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "মুআবিয়া (রা) হলেন একজন গরীব মানুষ, আর আবূ জাহাম (রা) এমন এক ব্যক্তি যে স্ত্রীকে মারধর করে।"

সবর ও অন্তরের কঠোরতার মধ্যে পার্থক্য

সবর হচ্ছে এমন একটি গুণ যা মানুষকে অর্জন করতে হয় এবং মানুষ তার অন্তরকে সকল ভয়-ভীতি ও অশান্তি থেকে মুক্ত রাখে। একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি বিপদ-আপদে পড়লে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে এবং হাহুতাশ করে না। এভাবে একজন নেককার বান্দা সবরের মাধ্যমে তার অন্তরকে শঙ্কামুক্ত রাখেন। তাঁর জিহ্বাকে কোন প্রকার অভিযোগ করা থেকে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসঙ্গত ও অশুভ আচরণ থেকে সংযত রাখেন। আসলে অন্তরকে তাকদীর ও শরীআতের নির্দেশাবলীর উপর সুদৃঢ় ও অবিচল রাখার নামই হলো সবর।

অন্তরে কঠোরতাকে আরবিতে কাসওয়া বলে। অন্তরের কঠোরতার দরুন একজন মানুষের মধ্যে কোন কিছুই কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্য কথায় রুক্ষতা ও কঠোরতার কারণে একজন মানুষ পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়।

মানুষের অন্তর তিন প্রকার। **এক.** কঠিন হৃদয় যেটা পাথরের মতো শক্ত ও অববিত্র। **দুই.** যেটা অতিশয় নরম। কঠিন হৃদয় কোন ভালো গুণ গ্রহণ করে না। আর নরম হৃদয় হয় পানির মতো স্বচ্ছ। **তিন.** কালবে রাকীক, এটাই হচ্ছে আদর্শ হৃদয়। যেটা পাথরের মতো শক্ত নয় আবার পানির মতো স্বচ্ছও নয়। আসলে, এটা হচ্ছে এক ধরনের স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয়। এই হৃদয় তার নির্মলতার কারণে ন্যায় ও অন্যায়, সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। সে অন্তর তার নম্রতার দরুন সত্যকে গ্রহণ করে সংরক্ষণও করে। ন্যায় ও সত্যের খাতিরে নরম দিলও কঠিন হতে পারে। সে অবস্থায় নরম হৃদয় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর যমীনে তাঁর পবিত্র পাত্রস্বরূপ। সে হৃদয়কে কালবে যুজাজী বলা হয়। 'যুজাজ' শব্দের অর্থ হলো কাঁচ। কাঁচের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ বিদ্যমান আছে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্তর হলো কালবে কাসী বা পাথরের মতো কঠিন হৃদয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন– "দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে পরানুখ তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-২২)

“এসব নিদর্শন দেখার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেলো, পাথরের ন্যায় কঠিন কিম্বা এর চেয়েও কঠিনতর।” (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-৭৪)

“এ কারণে যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়।” (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৫৩)

এই আয়াতগুলোতে বক্র হৃদয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি হৃদয় হলো অসুস্থতার কারণে বক্র, অপরটি হলো কঠিন পাথরের মতো শক্ত হওয়ার কারণে বক্র। আর শয়তানের প্ররোচনা, উপরে উল্লেখিত দু'প্রকারের হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য ফিতনা-ফাসাদস্বরূপ। তৃতীয় প্রকারের হৃদয় স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার কারণে শয়তানের প্ররোচনা ও ফেরেশতাদের প্রদত্ত কথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। একটি কোমল হৃদয় আনুগত্য ও নম্রতার কারণে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে ও দৃঢ়তার কারণে মন্দ নাফসের মুকাবিলা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, “এবং এ কারণে যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৫৪)

মার্জনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে পার্থক্য

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উদারতা, বদান্যতা ও পরোপকারার্থে নিজের অধিকার ও ক্ষমতা ছেড়ে দেয়াকে আরবি ভাষায় 'আফু' বলা হয়। একজন মানুষ এইসব অধিকারকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে জনগণকে ইহসান ও সুন্দর স্বভাবের প্রতি অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট করে। পক্ষান্তরে, একজন হীন ও দুর্বল ব্যক্তি অক্ষমতা, ভয়-ভীতি ও দুর্বলতার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এটি একটি মন্দ ও হীন স্বভাব, যদিও তার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে, নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (সূরা শূরা ঃ আয়াত-৪০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। যেমন– আদল বা ন্যায়বিচার ও তার বৈধতা, ফযল বা উৎকৃষ্টতা ও তার মর্যাদা এবং যুলুম ও তার অবৈধতা। যদি একথা বলা হয়, প্রতিশোধ গ্রহণ বা মার্জনা করা একটি অপরটির বিপরীত, তাহলে এ দু'টি কি করে প্রশংসারযোগ্য হতে পারে? এর জবাব হলো, এখানে প্রশংসা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নয় বরং শক্তি ও ক্ষমতার জন্য। কারো

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করার দু'টি উপায় আছে, আর তাহলো, সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা কিম্বা মাফ করে দেয়া। আগেকার দিনের এক শ্রেণীর আলিম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন মানুষকে কারো কাছে লাঞ্ছিত হওয়া একটি অপছন্দনীয় ব্যাপার। কিন্তু যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখতো, তারা ক্ষমা করে দিতো। এটাই হলো সেই বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমতাশালী আর আল্লাহ্ অত্যন্ত মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।"

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা হচ্ছে চারজন। এঁদের মধ্যে দু'জন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ, তুমি মহান ও পবিত্র, হে আমাদের রব! মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তুমি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করো, সে জন্য তুমি যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য। অপর দু'জন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! তুমি মহান ও পবিত্র, হে আমাদের রব! ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তুমি মাফ করো সেজন্য তুমি সকল প্রশংসার অধিকারী। এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন, "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন, তবে আপনিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত-১১৮)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যদি তোমার বান্দার গুনাহ্ মাফ করে দাও, তাহলে সেটা হবে তোমার উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের নিদর্শন। কেননা পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছো। সেটা তোমার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই চিহ্ন। তাদের গুনাহ্ ও আমল সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফহাল, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুমি মাফ করে দিয়েছো। মানুষ সাধারণত প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম হলে দৃশ্যত মাফ করে দেয়। আবার কখনো যালিমের যুলুমের প্রকৃতস্বরূপ সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে তাকেও মাফ করে দেয়। মানুষ যখন কাউকে ক্ষমা করে তখন সে ক্ষমার বাহ্যিক দিক হলো, যুলুম ও লাঞ্ছনা এবং অভ্যন্তরীণ দিক হলো ইয্যত ও দুর্বলতা। আর প্রতিশোধ গ্রহণের বাহ্যিক দিক হলো ইয্যত আর অভ্যন্ত রীণ দিক হলো লাঞ্ছনা। কেউ যদি কাউকে মাফ করে দেন তখন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন ও তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেন। অপরপক্ষে, কেউ যদি নিজের নাফসের তাড়নায় কারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাহলে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে যারা শত্রুতা করতো তাদের বিরুদ্ধে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। এখানে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য। "নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হলে পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" এর দ্বারা বুঝা যায়, যাদের ক্ষমতা আছে তারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এ সকল লোক প্রতিশোধ গ্রহণ

করার ব্যাপারে কারো সাহায্য প্রার্থী হয় না। কারণ এরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কোন অবকাশ নেই। সুবিচার মানুষের একটি মহৎ গুণ। আর প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ ন্যায় অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা করে না। একজন লোক অন্যের প্রতি যতোটুকু অন্যায় আচরণ করে থাকে তার বিরুদ্ধে ততোটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ, তবে সীমা লঙ্ঘন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, আফু বা ক্ষমা প্রদর্শন করা নাফসে মুতমায়িন্নাহর একটি গুণ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা নাফসে আম্মারাহর হীন প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইনতিকাম ও ইনতিসার দু'টি আলাদা বিষয়। ইনতিসারের বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কামনা বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকা। একজন লোক অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সম্মান অর্জন করে, সে সম্মানকে কেউ যদি বিনষ্ট করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হবে। কারণ তার ইয্যত ও মর্যাদাকে কেউ ক্ষুণ্ন করুক বা কেউ তাকে দাবিয়ে রাখুক এটা সে সহ্য করতে পারে না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রশংসার অধিকারী, আল্লাহর কোন বান্দা লাঞ্ছিত বা অত্যাচারিত হলে সে বলে যে আমি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা। আল্লাহর কোন সেবক কখনো লাঞ্ছিত হয় না এবং আল্লাহও তা সহ্য করেন না। নাফসে আম্মারাহ্ তার কর্মকাণ্ডের উপর দৃঢ় থাকে এবং তার আত্মতৃপ্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে বান্দাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করতে চায়। কিন্তু নাফসে মুতমায়িন্নাহ সকল কামনা বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্ত। সে তাওহীদ ও ইনাবত বা আল্লাহর প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে সেটা যখন বিপন্ন হয়, তখন তা রক্ষা করার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট ও সক্রিয় হয় আল্লাহর এই যে সাহায্য ও সহায়তা সেটা তার ঈমানের কারণেই লাভ হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দু'জন ভৃত্য তাদের মুনীবের ক্ষেতে কৃষিকাজ করতো। একদিন একজন অপর জনকে প্রহার করলো। প্রহৃত ভৃত্যটি তার মালিকের শুভকামনায় এবং প্রহারকারীর উপর দয়ার্দ্র চিত্ত হয়ে তাকে মাফ করে দিলো এই ভেবে যে, তা না হলে মুনীব তাকে শাস্তি দেবে। ঘটনাটি মালিকের কর্ণগোচর হলে তিনি ক্ষমাকারী ভৃত্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। ফলে ভৃত্যটি হলো মুনীবের পেশকার। মালিক তাকে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ দান করলেন, যাতে দায়িত্ব পালনের সময় ঐ পোশাক সে পরিধান করে। এই অবস্থায় মুনীবের কোন পশুচালক ঐ পোশাকের উপর ধূলাবালি, ময়লা ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দিলো। সেই অবস্থায় ঐ ভৃত্য যদি কাপড় বিনষ্টকারী লোকটিকে মাফ করে দেয়, তাহলে তার মুনীব খুশি হবে না, তাকে সাজা দিয়েই সন্তুষ্ট হবেন। কেননা ঐ ভৃত্য তার মুনীবের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে ও তাঁর ইয্যতকে ক্ষুণ্ন করেছে। তাই সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, যাতে মালিকের মর্যাদা রক্ষা পায়।

এই অবস্থায় অনুগত ভৃত্য দ্বারা কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে তার মুনীবের সম্মান রক্ষা করা, তার নিজের সম্মান রক্ষা করা নয়।

এই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি কোন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন লোকটি তাঁর কাছে অভিযোগ করলো যে, কোন এক ব্যক্তি আমার পাওনা ফেরত দেয়নি, সে আমার হক নষ্ট করেছে। হযরত আলী (রা) ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর ঐ যালিম ব্যক্তি বিবাদ শুরু করলো এবং পাওনাদারকে এক থাপ্পড় মেরে দিল। এ অবস্থায় পাওনাদার ব্যক্তি আবার হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে গিয়ে যালিম লোকটির বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ করলো। হযরত আলী (রা) ঐ ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তুমি এর প্রতি বাড়াবাড়ি করেছো। তখন পাওনাদার ব্যক্তি বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। কিন্তু হযরত আলী (রা) ঐ যালিম ব্যক্তিটিকে নয়টি চাবুক মারলেন এবং বললেন, তোমাকে মযলূম ব্যক্তি মাফ করে দিয়েছে বটে, তবে এটা হচ্ছে খলীফার হক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, যে জন্য তোমাকে শাস্তি দেয়া হলো।

একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে জনৈক ব্যক্তি এসে একটি সওয়ারী চাইলো আর বললো, আমি আপনার ও আপনার ছেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ঘোড়সওয়ার। তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা উপস্থিত ছিলেন। ঐ লোকটির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে হযরত মুগীরা (রা) তাঁর জামার হাতা গুটিয়ে ঐ ব্যক্তির নাকের উপর ঘুষি মারলেন, যার ফলে তার নাক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। তখন ঐ লোকটির গোত্রের লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট হযরত মুগীরা (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো এবং এর প্রতিকার চাইলো। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি কি আল্লাহর বিধানের বিপরীত প্রতিশোধ নেবো? এটা কিছুতেই হতে পারে না। অর্থাৎ হযরত মুগীরা (রা) যে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তা ছিলো শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে। যে ইয্যত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের খলীফাকে সম্মানিত করেছেন, তিনি যাতে সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে ও আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সেটাই ছিল হযরত মুগীরা (রা)-এর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই তিনি হযরত মুগীরা (রা)-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

হৃদয়ের নির্মলতা, অজ্ঞতা ও গাফলতির মধ্যে পার্থক্য

হৃদয়ের নির্মলতা হলো কোন অন্যায় কাজকে জানার পর সে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু অজ্ঞতা ও গাফলতি হলো এর বিপরীত। কেননা এটা মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা কোন প্রশংসনীয় গুণও নয়। মানুষ সে লোকেরই প্রশংসা করে, যে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কারো সাথে অন্যায়

ও খারাপ ব্যবহার করে না, বরং সদয় ও সুন্দর ব্যবহার করে। একজন মানুষ তার অন্তরের সকল খারাপ গুণ সম্পর্কে অবহিত থেকে অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারলে সেটি হবে তার মহৎ গুণ। হযরত উমর (রা) একবার বলেছিলেন, "আমি নিজে প্রতারক নই আর কেউ আমার সাথে প্রতারণাও করতে পারে না।" বস্তুত হযরত উমর (রা) ছিলেন একজন খোদাভীরু, বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তি। তাই তিনি কাউকে ধোঁকা দিতেন না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যেদিন না ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি; কেবল সেই ব্যক্তিই উপকৃত হবে, যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে।" (সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ৮৮-৮৯)

কালবে সলীম বা নির্মল হৃদয় হচ্ছে সেই হৃদয়, যে হৃদয় সব রকমের কলুষ ও কালিমা থেকে মুক্ত। এরূপ হৃদয়ে সন্দেহপ্রবণতার কোন ব্যাধি থাকে না। এরূপ নির্মল হৃদয়ে কোন লোভ-লালসাও স্থান পায় না। তাই কালবে সলীম রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত। যে হৃদয়ে লোভ-লালসা বিরাজ করে সে হৃদয় রিপুর অনুগামী হয়।

ভরসা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে পার্থক্য

ভরসা হচ্ছে মানুষের এক ধরনের বিশেষ গুণ। বিশ্বাসযোগ্য কর্মকাণ্ড এবং উত্তম আচার আচরণের মাধ্যমে মানুষ তা অর্জন করে। এতে মানুষের অন্তর শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষের বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকেন এবং লোকেরা তার দ্বারা উপকৃত হয়।

'সিকাহ' একটি আরবি শব্দ। এটা 'ওয়াসাক' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো ভরসা ও বিশ্বস্ততা। এই বিরল গুণ মানুষের সাথে ভালোবাসার সুসম্পর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যখন কোন বান্দার হৃদয় সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন সে আল্লাহর বন্দেগীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর কখনো গায়রুল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয় না। এই অবস্থায় আল্লাহ হয়ে যান তাঁর হাতিয়ার ও শক্তির উৎস এবং একমাত্র সম্বল। এরূপ ক্ষেত্রে বান্দা তার যাবতীয় প্রয়োজনের কথা আল্লাহর কাছেই পেশ করে।

গুররাহ বা প্রগলভতা হলো– ঐ প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অবস্থা, যাকে নাফস, শয়তান এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। আর সে এ আশা পোষণ করে যে, তার অনেক গুনাহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন। ধোঁকা মানুষকে এই বলে প্রলোভন দেখায় তুমি তার উপর ভরসা করো যার উপর ভরসা করা যায়না, তুমি তার উপরই আস্থা রাখো, যেখান থেকে উপকার লাভ করা যায় না, তুমি মরীচিকার প্রতারণায় পতিত ব্যক্তির ন্যায় মরীচিকার কাছ থেকে পানি পাওয়ার আশা রাখো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে

ইরশাদ করেছেন, "যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা, পিপাসু ব্যক্তি ওটাকেই পানি মনে করেছিলো, কিন্তু যখন সেখানে পৌঁছলো তখন কিছুই পেলো না। বরং সেখানে আল্লাহকেই পেলো যিনি তার পুরোপুরি হিসাব সম্পন্ন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।" (সূরা নূর ঃ আয়াত-৩৯)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা? তারা হচ্ছে– ঐ সকল লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আর তাদের ধারণা, তারা সবকিছু ঠিক মতো করছে।" (সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ১০৩-১০৪)

যদি গুনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে এর সমপরিমাণ সম্পদও থাকে, তবে অবশ্যই কেয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তা দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনা করতো না।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪৭)

একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কোন গুনাহগার ব্যক্তি তার অনেক গুনাহ থাকা সত্ত্বেও যদি তার প্রতি আল্লাহর নিআমতের ছড়াছড়ি দেখে তবে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেলো, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদের প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়লো, তখন আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো।" (সূরা আন'আম ঃ আয়াত-৪৪)

এটা সবচেয়ে বড় একটি প্রবঞ্চনা যে, একদিকে নি'আমতের ছড়াছড়ি এবং অন্যদিকে গুনাহের বাড়াবাড়ি। এই প্রবঞ্চনার জন্য শয়তানকে মোতায়েন করা হয়েছে এবং নাফসে আম্মারাহ্ শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়েছে। যখন আল্লাহর প্রতি মানুষের বিদ্রোহী মন, গুনাহের প্ররোচনা, ধোঁকাবাজ শয়তান এবং প্রতারিত নাফস একত্রিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এই অবস্থায় আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করে। কোন ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চয়কারী গুনাহ করা সত্ত্বেও শয়তান আল্লাহর ক্ষমা ও মার্জনার লোভ দেখায় এবং শাস্তির জন্য তাওবাহ করার আশ্বাসও দেয়। অর্থাৎ শয়তান বলে, এখন তুমি মনের মতো সব কামনা বাসনা পূর্ণ করে নাও, পরে তাওবাহ করলে চলবে। এভাবে শয়তান মানুষকে তাওবাহর দরজার নিকট পৌঁছতে দেয় না। আর এভাবেই বিভ্রান্ত মানুষ তাওবাহ করা থেকে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত এক সময় আকস্মিকভাবে মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল (আ) এসে তার জান কবয করে নেন।

শয়তান মানুষকে খুবই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছো অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌছেছে। এসবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।" (সূরা হাদীদ ঃ আয়াত-১৪)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে, "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো এবং ভয় করো এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।" (সূরা লোকমান ঃ আয়াত-৩৩)

সে লোক বড়ই ধোঁকার মধ্যে নিপতিত যাকে আল্লাহ্ প্রচুর নি'আমত দান করেছেন, আর সে মনে করে আমিই এর হকদার। সে আরো মনে করে হাশরের দিন তাকে কোন হিসাব দিতে হবে না আর সেদিন কখনো আসবে না। কাজেই যতো খুশি আনন্দ উল্লাস করতে থাকো। তবে যখন সে ধোঁকার গহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে তখন সে বলে উঠে, আমি আমার রবের সান্নিধ্যে পৌছলে বেহেশতেও সম্মান লাভ করতে পারবো। এভাবে শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও আশার প্রলোভনে পড়ে সে ব্যক্তি প্রতারিত হয়। এভাবেই দুনিয়ার নি'আমত ও নাফসে আম্মারাহ শয়তানকে সহায়তা করে। এর ফলশ্রুতিতে সে ব্যক্তি গুনাহের কাজে অটল থাকে। অবশেষে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

রায়জা ও তামান্নার মধ্যে পার্থক্য

কোন বিষয়ে সফলতার উপকরণ সংগ্রহ করার মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করা ও আশা পোষণ করাকে 'রায়জা' বা প্রত্যাশা বলা হয়।

পক্ষান্তরে, কোন উপকরণ ছাড়া কোন কিছু পাওয়ার জন্য আশা পোষণ করাকে 'তামান্না' বা আশান্বিত হওয়া বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যারা ঈমান এনেছে, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশা করার সঙ্গত অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দানে তাদেরকে ধন্য করবেন।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২১৮)

জানা গেলো যে, উপরোক্ত গুণসম্পন্ন লোক ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সব লোকের কাছ থেকে সকল প্রত্যাশা রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ঐ নিআমত থেকে বঞ্চিত তারা বলে থাকে যে, "পাপীগণ ঐসব জিনিস অনুসরণ করে, যেটা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, যদিও তারা আল্লাহর অসীম রহমতের আশা করতে পারে।" এটা কোন নতুন কথা নয়। নাফস ও

শয়তান তাদের অনুগতদেরকে ঐ ধোঁকার মধ্যে ফেলে রাখে। আসলে, ঐ ব্যক্তিই কেবল প্রত্যাশা করতে পারে যে আল্লাহ ও আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর সব প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ রেখে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এবং পরিশুদ্ধ চিত্তে নেককাজ করতে থাকে। সেই ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন লক্ষ্য সামনে রেখে তা অর্জন করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়। খাঁটি প্রত্যাশার চিহ্ন হলো এই যে, প্রত্যাশী ব্যক্তি সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যাতে সে জান্নাত ও তার অফুরন্ত নিআমত থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে।

একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন মহিলার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলো। তারপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহকারে সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য রওয়ানা হলো। এই বরযাত্রী বরসহ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ও ভদ্রজনিতভাবে পাত্রীর বাড়িতে পৌছে, তাহলে বরকে ও বরযাত্রীকে তারা সসম্মানে বরণ করে উত্তম স্থানে বসার ব্যবস্থা করবেন। আর যদি অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও নোংরাভাবে এই বরযাত্রী পাত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হয় তাহলে তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এখানে প্রথম দলটির অবস্থা হলো যথাযথ উপকরণসহ একজন আশাবাদী ব্যক্তির ন্যায়, যে সফলতা অর্জনে সমর্থ। এ সম্পর্কে আরো একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হলো। একজন বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। দু'জন ব্যবসায়ী তাঁর কাছে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বিক্রয় করতো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খুবই সৎ ও ঈমানদার। তিনি তাঁর দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কোন হেরফের করতেন না। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তিনি খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তবে ধনাঢ্য ব্যক্তিটি কাউকে দেখা দিতেন না। তিনি আড়ালে থেকে জিনিসপত্র খরিদ করতেন।

অপর ব্যবসায়ী লোকটি ছিল শঠ ও অসৎ। সে জিনিসপত্রের মধ্যে ভেজাল মিশাতো। একবার ধনাঢ্য ব্যক্তি বললেন, তিনি ব্যবসায়ীদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন ও তাদের থেকে হিসাব-নিকাশ বুঝে নিবেন ও তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবেন।

এখানে যে ব্যক্তি ঈমানদারী ও সততার সাথে ব্যবসা করছিলেন, তাঁর প্রত্যাশা ছিল দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গল লাভ এবং তিনি সেভাবেই তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়েছিলেন। ফলে তিনি নাফসে মুতমায়িন্নাহর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। আর যে ব্যবসায়ী শঠতা ও প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা চালিয়েছিলো তাকে নাফসে আম্মারাহ পরিচালিত ও প্রভাবিত করেছিলো। এরূপ অসৎ ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সব সময় শঙ্কিত থাকে।

'রায়জা' শব্দের আরেক অর্থ হলো কোন মন্দ থেকে পিছিয়ে বা সরে যাওয়া। অর্থাৎ সকল মোহমায়া ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে নিজেকে মনে প্রাণে সমর্পণ করা। আর

নাফসে আম্মারাহ্ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা। এটা হলো নাফসে মুতমায়িন্নাহর বৈশিষ্ট্য। যখন একজন নেক বান্দার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে চলতে থাকে। তাঁর সে যাত্রা হয় ভীতিপ্রদ ও ধীরগতি সম্পন্ন। এভাবে সে দুনিয়ায় লোভ-লালসার জাল ছিন্ন করে ও নাফসে আম্মারাহর প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে নিআমতে পরিপূর্ণ জান্নাতের দিকে পরাক্রমশালী ও রাহমানুর রাহীম আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অগ্রসর হয়। অতএব জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে-ই হয় মুত্তাকী ও খোদাভীরু। এছাড়া একজন আল্লাহর দয়া ও করুণা প্রত্যাশী ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। তাই আরবি 'খায়িফ' শব্দের স্থানে মুত্তাকী আর মুত্তাকী শব্দের স্থানে খায়িফ শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। একজন আল্লাহর করুণা প্রত্যাশী ব্যক্তির হৃদয় সাধারণত একজন ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির অন্তরের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির অন্তর নাফসে আম্মারাহ্ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে এবং আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায়। তার সামনে জান্নাতের পতাকা উড্ডীন থাকে এবং সে সেদিকে অগ্রসর হয়। একজন খোদাভীরু ব্যক্তি এই অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর প্ররোচনা থেকে দূরে থাকে। আর সেজন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে।

একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর সাথে সহাবস্থান করে। শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর থেকে সতর্ক ব্যক্তিই হলো খোদাভীরু। আর যখন সে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা শুনে তখন অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সফলতার আশায় আল্লাহর বন্দিগীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। তাই তাকে একজন আল্লাহর করুণা প্রত্যাশী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে চাও না।" (সূরা নূহ ঃ আয়াত-১৩)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুমিন ব্যক্তি সাধারণত আল্লাহর ওয়াস্তে হিজরতকারী জিহাদকারী হয়ে থাকে। ঈমানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ঈমান হলো একটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট যাহিরী ও বাতিনী আমল। তিনি হিজরত করার প্রসঙ্গে বলেছেন, "পাপকাজ ত্যাগ করা এক ধরনের হিজরত।" জিহাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, "আসল জিহাদ হলো আল্লাহর নির্দেশ পালনে নাফসের সাথে যুদ্ধ করা।"

দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা এক শ্রেণীর গরীব লোকের পুঁজিস্বরূপ, যেটাকে তারা প্রত্যাশার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অথচ এটা শুধু কুহেলিকা মাত্র। এসব এমন প্রত্যাশা যা ঐসব অন্তর থেকে বের হয়ে আসে যেসব অন্তরে নাফসে আম্মারাহর প্ররোচনার ও প্রবণতা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। কুমন্ত্রণার প্রভাবে একজন লোকের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং নাফসে আম্মারাহ একজন বান্দাকে কামনা-বাসনার

পেছনে লাগিয়ে দেয়। নাফসে আম্মারাহ্ একজন বান্দাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ্ কোন বান্দার ঈমান ও আমল বিনষ্ট করেন না। যেমন কোন মহান দয়ালু দাতা কারো কাছ থেকে তাঁর সম্পূর্ণ পাওনা আদায় করে নেন না। সুতরাং আল্লাহর দরবারে কোন গুনাহ্ খাতা করলেও তোমার চিন্তাভাবনার কোন কারণ নেই, যেহেতু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা তোমার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। তাই এই আশাকে প্রত্যাশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ এটা একটি শয়তানী প্ররোচনা, প্রবণতা ও অমূলক আশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। নাফসে আম্মারাহ্ মূর্খদের দিলে যে অমূলক আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় এবং যে সবের দ্বারা তাদের অন্তর আনন্দে ভরে যায় সেসব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, " শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করছে, না আহলে কিতাবের মনস্কামনার উপর। যে পাপ করবে সেই তার প্রতিফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১২৩)

যখন কোন বান্দা আল্লাহর বন্ধুত্ব ও তাঁর সাহায্যকে উপেক্ষা করে, তখন তাকে তার নাফসের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়, আর নাফস ও শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহর সাহায্য ও অভিভাবকত্বের পরিবর্তে নাফস ও শয়তানের অভিভাবকত্ব ও সাহায্য গ্রহণ করে। তখন নেক প্রত্যাশার জন্য তার অন্তরে কোন জায়গা শূন্য থাকে না। এ অবস্থায় নাফস তাকে বলে যে, সে প্রত্যাশার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে, যদিও এটা অমূলক আশা ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন সতর্ক ব্যক্তি সবসময় প্রত্যাশা ও আশার উপর নির্ভর করে নেককাজ করতে থাকে। আর বুদ্ধিহীন ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি নেককাজ ছেড়ে দিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর ভরসা করে বসে থাকে এবং এসবকে প্রত্যাশা হিসেবে মনে করে।

আল্লাহর নি'আমত প্রকাশ ও গর্ব করার মধ্যে পার্থক্য

একজন আল্লাহর নি'আমত প্রাপ্ত ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর নি'আমতের প্রশংসা করে। সে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ স্বীকার করে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর আল্লাহর সমস্ত নি'আমতের কথা প্রচার ও প্রকাশ করে। তার এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলার মহান গুণাবলীকে প্রকাশ করা, তাঁর প্রশংসা করা, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নাফসকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। আর আল্লাহর সাথে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নাফসকে অনুপ্রাণিত করা।

আল্লাহর নি'আমত সম্পর্কে গর্ব করার অর্থ হলো, এসব নি'আমতের কারণে অন্য মানুষের উপর নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা, লোকদেরকে এটা দেখিয়ে দেয়া যে, সে অন্য সকলের চেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। এভাবে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের অন্তরকে অনুগত ও বাধ্য করে এবং তাদেরকে নিজের তা'যীম ও

খিদমতের জন্য আকৃষ্ট করে। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেছেন, শয়তানের অনেক কৌশল এবং ফাঁদ আছে। তার একটি হলো এই যে, সে আল্লাহ তাআলার নি'আমতের মাধ্যমে মানুষকে আবদ্ধ করে যাতে মানুষ সেই নি'আমতের কারণে আল্লাহ তা'আলার অন্য বান্দাদের উপর গর্ব করে ও গায়রুল্লাহর কাছে নিজের মস্তক অবনত করে।

হৃদয়ের আনন্দ ও নাফসের আনন্দের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলার প্রতি কারো ঈমান থাকলে সেটা তার হৃদয়ে মারিফত ও মুহাব্বত সৃষ্টি করে। আর আল্লাহর কালাম পাঠ করলে সেই বান্দা তার অন্তরে পরম তৃপ্তি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে নবী, যাদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এই কিতাব যা আমরা আপনাকে দিয়েছি তা পেয়ে সন্তুষ্ট।" (সূরা রা'দ ঃ আয়াত-৩৬)

যখন কিতাবধারীগণ ওহী দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাদের চেয়ে বেশি আনন্দিত হওয়ার কথা। আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেছেন, "যখন কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বিদ্রূপ ছলে মুসলমানদের নিকট জিজ্ঞেস করে, বলো, তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এতো বৃদ্ধি পেলো? যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই) তাদের ঈমান সত্যিই বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা এর দ্বারা খুবই সন্তুষ্টচিত্ত হয়।" (সূরা তাওবাহ ঃ আয়াত-১২৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে, "হে নবী, বলুন এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা পাঠিয়েছেন। এজন্য তো লোকদের আনন্দ উল্লাস করা উচিত। এটা সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ব করছে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৫৮)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতে ফযল শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও পবিত্র কুরআন। আর আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে কুরআন শরীফকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন।

হযরত হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র)-এর মতে ফযল শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন এবং কুরআন শিখিয়েছেন, সে কুরআন তোমাদের সঞ্চিত সোনা রূপা থেকে অধিক মূল্যবান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও এক শ্রেণীর আলিমের মতে ফযল শব্দের অর্থ হলো– ইসলাম, আর রহমত শব্দের অর্থ হলো– আল কুরআন। এছাড়া ঈমানের দ্বারাও হৃদয়ের আনন্দ লাভ করা যায় এবং সওয়াবও পাওয়া যায়। যখন কোন বান্দাহ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তখনই সে তার হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারে। এই যে ফারাহ বা আনন্দ ও মুহাব্বত এটা একটি বিশেষ অবস্থার

সাথে সম্পর্কিত। এই বিরল আনন্দ কেবল কোন মাহবূবের সাথে মিলনের মাধ্যমে, আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর প্রতি, তাঁর রাসূল ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস রেখে অর্জন করা যায়। বান্দার হৃদয়ে ঐ আনন্দের মাধ্যমে এক দুর্লভ আনুগত্য সৃষ্টি হয়, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কাজেই এই অনাবিল আনন্দ আল্লাহর অন্য সকল নি'আমতের চেয়ে অধিক উত্তম, না, সে আনন্দ সমস্ত নি'আমতের জন্য এক সুগন্ধি বিশেষ। আর এই আনন্দের মধ্যেই রয়েছে আখিরাতের শান্তি ও আনন্দ। তবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আনন্দ, মুহাব্বতের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। মনে সত্যিকার আনন্দের জন্য এটা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বান্দার জন্য আরেক রকমের আনন্দ আছে, আর সেটা হলো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে পুরস্কার লাভ। সেই আনন্দ আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, ভয় ও আশার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া আল্লাহর প্রতি এসব গুণ যখন একজন বান্দার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়ে, তখন সেই আনন্দ বৃদ্ধি পায় ও ব্যাপ্তি লাভ করে। আরেক রকমের আনন্দ আছে, যেটা তাওবাহর মাধ্যমে লাভ করা যায়। তাওবাহর দ্বারা যে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করা যায়, গুনাহের দ্বারা সেটা অর্জন করা যায় না।

যদি কোন গুনাহগার বান্দা জানতে পারতো, তাওবাহর আনন্দ গুনাহের কাজ করার আনন্দের চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশি, তাহলে সে গুনাহের কাজের চেয়ে তাওবাহ করার জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব ধাবিত হতো। একজন গুনাহগার বান্দা তাওবাহ করে যে আনন্দ লাভ করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাবারাক তা'আলা আরো বেশি আনন্দিত হন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যার মধ্যে মানুষের ঐ আনন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন, যার চেয়ে অধিক কোন আনন্দ দুনিয়ায় লাভ করা যায় না। জনৈক ব্যক্তি তার পানাহারের দ্রব্য-সামগ্রীসহ সওয়ারীতে আরোহণ করে সফরে বের হলো। যেতে যেতে একস্থানে বিশ্রামের জন্য থামলো এবং সওয়ারীটি বেঁধে রেখে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখলো তার সওয়ারীটি সেখানে নেই। চারদিকে কেবল ধূ ধূ মরু প্রান্তর এবং তার জীবন যে বিপণ্ন সেটা সে বুঝতে পারলো। এ অবস্থায় লোকটি খুবই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে তার সওয়ারীটি খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সওয়ারীটি কোন পাত্তা পাওয়া গেলো না। অবশেষে নিরাশ হয়ে লোকটি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। পরে আকাশে চাঁদ দেখা দিলো, দূর দূরান্ত পর্যন্ত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লো। এই অবস্থায় সে বিশেষ মনোযোগসহকারে তার সওয়ারীটির আশায় চারদিকে দেখতে লাগলো। হঠাৎ চাঁদের আলোতে সওয়ারীটি তার নযরে পড়লো। সে দেখতে পেলো তার সওয়ারীটি একটি গাছের সাথে আটকে আছে। তখন সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে

গেলো, চরম আত্মভোলা অবস্থায় লোকটির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আর আমি তোমার রব।" বেচারা আনন্দের আতিশয্যে কি বলেছে সেদিকে তার কোন খেয়াল ছিলো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একজন বান্দার তাওবাহ করার দরুন আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও বেশি আনন্দিত হন। কাজেই এটা ধ্রুবসত্য ও অনস্বীকার্য যে, তাওবাহর দ্বারা মানুষ চরম ও পরম তৃপ্তি লাভ করে।

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কঠিন দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্ট এবং বিপদ-আপদ সহ্য করার পর এই ধরনের পরম আনন্দ অর্জিত হয়। মানুষ যদি দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদে পতিত হয়ে সবর করে, তাহলেই তার এরূপ আনন্দ লাভের সৌভাগ্য হয়। একজন গুনাহগার বান্দা যখন গুনাহ থেকে তাওবাহ করে, তখন তার আনন্দ গুনাহের কাজ করার আনন্দের চেয়ে অধিক হয়ে যায় এবং সে অবস্থার স্বাদ সে ব্যক্তি চাটনীর মতো উপভোগ করে।

এমন এক ধরনের আনন্দ আছে যেটা সকল আনন্দ ও সুখের উর্ধ্বে এবং সকল আনন্দের সার নির্যাসস্বরূপ। আর সেটা তখনই অর্জিত হয়, যখন কোন বান্দা দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে অগ্রসর হয়। ঐ শুভ মুহূর্তে তার নিকট ফেরেশতারা এসে আল্লাহ তা'আলার দীদারের শুভ সংবাদ দেন। আর মালাকুল মাউত তার রূহকে বের হয়ে আসার জন্য আহবান জানান এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার রহমত, রিযক ও সন্তুষ্টির শুভ সংবাদ দান করেন। কোন তাওবাহকারীর সামনে যদি তার তাওবাহ করার আনন্দ উপস্থাপন করা হয়, তাহলে সে সেটাকেই সবচেয়ে অধিক প্রাধান্য দেবে। আল্লাহই মহান।

এই অবস্থায় একদিকে এই সম্মানিত রূহকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সুন্দর আকৃতিধারী ফেরেশতারা যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ভিড় করেন, অপরদিকে এই নেক রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। ফেরেশতাগণ ঐ নেক রূহের জন্য দু'আ করতে থাকেন আর এই রূহকে প্রত্যেক আকাশে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা বিদায় অভ্যর্থনা জানান। সুবহানাল্লাহ, এই নেক রূহের কতোই না সৌভাগ্য। এভাবে এ সৌভাগ্যবান রূহ তার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আল্লাহর মহান দরবারে হাযির হওয়ার পর আল্লাহকে সিজদাহ করার অনুমতি লাভ করে। এ ভাগ্যবান রূহ তার রবের বাণী শুনবার সৌভাগ্যও লাভ করে, সে বাণী হলো, "হে ফেরেশতাগণ! আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রেখে দাও।" এরপর তাকে জান্নাতে ভ্রমণ করানো হয়। আল্লাহ তা'আলার সকল নি'আমতও তাকে দেখানো হয় যা তার জন্য সেখানে নির্দিষ্ট করা আছে। বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। এ অবস্থায় সবাই তখন সন্তুষ্ট হন, যেমন– দীর্ঘদিনের বিরহের পর কোন বন্ধু তার প্রিয়জনের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দবোধ করে। এ ব্যক্তি সেখানে সবাইকে ভালো

অবস্থায় দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়, তার এইসব আনন্দ আল্লাহর দীদার লাভের চরম আনন্দের আগেই ঘটে থাকে।

আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য হাশরের দিনের আনন্দ যে কি তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁরা আরশ পাকের শীতল ছায়া লাভ করবে এবং হাউযে কাউসারের পরিপূর্ণ পানপাত্র তাদেরকে পরিবশেন করা হবে। তাদের ডান হাতে থাকবে আমলনামা, তাদের নেকীর পাল্লা হবে ভারী, তাদের চেহারা আনন্দ উচ্ছাসে গোলাপকেও হার মানাবে। একটি অতুলনীয় উজ্জ্বল আলো তাদের সামনে থাকবে। তারা অনায়াসে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের জন্য জান্নাতের ফটক খোলা থাকবে এবং তাদের সম্বর্ধনার স্থান থাকবে অতি নিকটে। সে সময় রিযওয়ান ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে সালাম ও খোশ আমদেদ জানাবেন। আর তারা তাদেরকে হুর-গেলমান ও অন্যান্য বেহেশতী নিআমতের শুভ সংবাদ দান করবেন। আল্লাহর প্রিয় এবং তাঁর খাস বান্দাগণ আল্লাহর দীদার লাভ সম্পর্কে যে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন, তাঁদেরকে তাঁদের মা'বূদ সেজন্য নিজের চেহারা প্রদর্শন করবেন এবং শান্তির বাণী শুনাবেন। তাঁদের সাথে কথাও বলবেন। আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য এটা কতোই না উচ্চ মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয়।

হৃদয়ের নম্রতা ও ভীতির মধ্যে পার্থক্য

নাফসানী দুর্বলতা ও হৃদয়ের ভয়কে আরবিতে জাযা বলা হয়, যেটাকে অতি লোভ-লালসা শক্তিশালী করে তোলে। এ অবস্থা তাকদীর সম্বন্ধে ঈমানের দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়। কেউ যদি অদৃষ্টের লিখনকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, তাহলে সে বিপদ-আপদে পড়লে হায়-হায় করে না, কারণ সে জানে যে, এটা অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয় আর আমরা ওটা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে বা ভাগ্য লিপিতে লিখে রাখিনি। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ। (এসব কেবল এজন্য) যেন যা কিছু তোমাদের ক্ষতি হয় সেজন্য তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ো, আর যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেন, তা পেয়ে তোমরা গৌরবে স্ফীত না হয়ে পড়ো। আল্লাহ উদ্ধত ও অহঙ্কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২২-২৩)

হৃদয়ের নম্রতা শরীআতের পরিপন্থী নয়। কেননা এ নম্রতা আল্লাহর রহমত থেকে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা নরম মেজায ও বিনয়ী বান্দাদের প্রতি রহম করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। তাই বুঝা গেলো নম্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছু নয়। হায় হায় করা মানুষের

এক প্রকার রোগ ও হৃদয়ের দুর্বলতা, এটা হলো দুনিয়ার রুগ্ন হৃদয়ের পরিচায়ক, যাকে নাফসে আম্মারাহ-এর ধোঁয়া কালো করে তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে কলুষিত করে দেয়। আর দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির জন্য আখিরাতের পথ রুদ্ধ করে দেয়। আর নাফস ও লোভ লালসার সংকীর্ণ জালে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই সে সামান্য মুসীবতও সহ্য করতে পারে না এবং তাতে সে ঘাবড়িয়ে যায়। আর যদি তার দিলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর ঈমান ও ইয়াকীনের নূর বিদ্যমান থাকে, আর তার দিল আল্লাহর মহিমা ও ইশক মুহাব্বতের দ্বারা সিক্ত হয়, তাহলে সে অন্তর নম্র হয়ে যায় এবং তার মধ্যে আল্লাহর অনুকম্পা ও শান্তির ঝলক দেখা দেয়। সে ব্যক্তির প্রিয়জন ও সকল মুসলমানের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত ও অনুগ্রহকারী হয়। এমনকি সে মানুষ ছাড়াও গর্তের পিপীলিকার প্রতি এবং নীড়ের পক্ষীকুলের প্রতিও মেহেরবান হয়ে যায়। মানুষের এরূপ অন্তরই আল্লাহ তা'আলার অতি প্রিয়, পছন্দনীয় ও নিকটবর্তী। হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতিও অতিশয় মেহেরবান ছিলেন। যখন আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি রহম করতে চান, তখন তার দিলে রহম ও বিনয়ের উচ্ছাস পয়দা করে দেন। আর যদি তাকে আযাবে ফেলতে চান, তাহলে তার দিল থেকে রহম ও নম্রতার উচ্ছাস বের করে দেন। আর এসবের পরিবর্তে তার দিলকে পাষাণের মতো কঠিন করে দেন। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, "যে ব্যক্তি রহম করে না, তার প্রতিও রহম করা হয় না। দুনিয়াবসীদের উপর রহম করো, তাহলে আকাশবাসী তোমার উপর রহম করবেন।" জান্নাতবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। **এক.** সুবিচারক ও দানশীল বাদশাহ। **দুই.** প্রত্যেক প্রিয়জন ও মুসলমানের প্রতি মেহেরবান ও নরম দিলের অধিকারী ব্যক্তি। **তিন.** অন্যের নিকট সাহায্য কামনায় হাত প্রসারিত করে না এমন ব্যক্তি এবং পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সমস্ত উম্মতের উপর এজন্য অধিক মর্যাদা যে, তাঁর দিলের মধ্যে অপরিসীম দয়া নিহিত ছিলো, যা তাঁর সত্যবাদিতার চেয়েও ছিলো অধিক। এজন্যই প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁর দয়া প্রতিফলিত হতো। এরই ফলশ্রুতিতে বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের প্রস্তাব তাঁর পরামর্শেই গৃহীত হয়েছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তুলনা করেছেন।

অসন্তোষ ও ঈর্ষার মধ্যে পার্থক্য

কেউ কোন কিছু পাওয়ার আশা থেকে বঞ্চিত হলে তার মনের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ঈর্ষা হলো কেউ কারো ভালো দেখলে তার মনে যে কষ্ট হয় এবং অন্যের মধ্যে মন্দ জিনিস দেখলে খুশি হওয়া এবং অন্যের মধ্যে মন্দ পরিলক্ষিত হোক, এই ধারণা পোষণ করা। একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সব সময় কামনা করে যে, ঐসব মন্দ জিনিস সবসময় ঐ লোকটির মধ্যে বিদ্যমান থাকুক।

অসন্তোষের আরেক প্রকার হলো– অন্যের দ্বারা কোনভাবে মনে আঘাত পাওয়া। ঈর্ষার আরেক রূপ হলো, অন্যের অমঙ্গল বা ক্ষতিকর কোন কিছু কামনা করা। তুলনামূলকভাবে অসন্তোষ অল্প সময়ের মধ্যে দূর হয়ে যায়, আর ঈর্ষা মনের মধ্যে দানা বেঁধে থাকে, এটা সহজে দূর হতে চায় না। ঈর্ষা অসৎ দিলের সংকীর্ণতা ও রিপুর তাড়নায় সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে, অসন্তোষ দিলের সচেতনতা ও অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়।

মুনাফাসাত ও হাসাদের মধ্যে পার্থক্য

অন্য লোকদের মধ্যে যে পূর্ণতা ও সাফল্য দেখা যায়, তা অথবা তার চেয়ে অধিক পাওয়ার এক প্রতিযোগিতা ও প্রচেষ্টাকে আরবি ভাষায় মুনাফাসাত বলে। এটি হলো আত্মমর্যাদা, উচ্চাভিলাষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অন্যতম উপায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যেসব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত-২৬)

আরবি 'মুনাফাসাত' শব্দটি 'নাফীস শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উত্তম জিনিস লাভ করার জন্য সকলেরই আগ্রহ থাকে, আর সেটা অর্জন করার জন্য প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয়। যদি কয়েকজন মিলে সেসব জিনিস অর্জন করতে চায়, তাহলে প্রত্যেকেই আগে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ লাভ করে। সাহাবায়ে কেরাম নেককাজে প্রতিযোগিতা করতেন, আর তাতে অংশগ্রহণ করে তাঁরা আনন্দ পেতেন, একে অন্যকে এজন্য উৎসাহও দান করতেন। 'মুনাফাসাত' বা 'মুসাবাকাত' হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "কাজেই তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অগ্রসর হও।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ঃ আয়াত-১৪৮)

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মতো।" (সূরা হাদীদ ঃ আয়াত-২১)

হযরত উমর (রা) নেককাজে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করতেন। কিন্তু কখনো তিনি তাঁর আগে যেতে পারেননি। তারপর যখন হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি আর কখনো আপনার সাথে কোন প্রতিযোগিতায় নামবো না। হযরত উমর (রা) আরো বললেন, আমি যখনই নেককাজে আবূ বকর (রা)-এর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছি, সবসময় হেরে গেছি, প্রত্যেক বারই তিনি জয়ী হয়েছে। দু'জন মুতানাফিস বা প্রতিযোগী এমন দু'জন ভৃত্যের ন্যায় যারা তাদের মুনীবের কোন পছন্দনীয় এবং প্রিয় জিনিসের সম্পর্কে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এরূপ মুনীব উভয় ভৃত্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, আর এরাও একে অপরের প্রতি সৎভাব বজায় রাখে।

হাসাদ বা হিংসা একটি নিন্দনীয় ও নীচ স্বভাব। এর মধ্যে পুণ্য সঞ্চয়ের কোন মনোভাব নিহিত থাকে না। কোন ব্যক্তির নাফস নিজের অলসতা ও অপারগতার দরুন ঐ ব্যক্তির প্রতি হিংসার আগুনে জ্বলে যিনি প্রশংসনীয় নেক কাজে অগ্রগামী হন। আর ঐ ব্যক্তি মন্দ বাসনা পোষণ করে এই বলে যে, হায়, যদি এই ব্যক্তি নেককাজ করা থেকে বিরত থাকতো তাহলে সে তারই সমকক্ষ হতে পারতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তারা তো এটাই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনিভাবে কাফির হয়ে যাও, যেন তোমরা একেবারে তাদের সমান হয়ে যাও।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-৮৯)

এর দ্বারা জানা গেলো, একজন হিংসুক ব্যক্তি যে কোন নিআমত বা ভালো জিনিসের শত্রু। আর অন্যদের থেকে তা চলে যাওয়া সে পছন্দ ও কামনা করে। আমার নিকট যে ভালো জিনিসটি নেই সেটা তার থেকেও ছিন্ন হয়ে যাক। আর একজন মুতানাফিস নি'আমত প্রাপ্তির জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আর সে কামনা করে যে, এ নি'আমত আমার ও আমার সাথীদের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাক। তার এ ইচ্ছা হয় যে, অন্যান্যদের চেয়ে তা বেড়ে যাক অথবা কমপক্ষে তাদের সমান হয়ে যাক। আর একজন হিংসুক ব্যক্তি নিআমতের ধ্বংস কামনা করে। বেশির ভাগ সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি মুনাফাসাতের দ্বারা উপকৃত হন। যদি কোন ব্যক্তি কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে রেখে কোন নেকী বা নি'আমতের দিকে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন, তাহলে তাঁর অনেক উপকার সাধিত হয়; কেননা তাঁর ইচ্ছা হয় যে, আমি তার সমান হই। কোন কোন সময় মুনাফাসাত মাহমূদাহ বা প্রশংসিত আগ্রহকেও হিংসা বলা হয়। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, দু'ব্যক্তির সাথে হিংসা বা মুনাফাসাত বৈধ। প্রথমত সেই ব্যক্তির সাথে যাঁকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, আর তিনি সে অনুযায়ী দিন-রাত আমল করেন। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তির সাথে যাঁকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, আর তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। এটাকে আরবি ভাষায় 'গিবতা' বলা হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের ও নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম ঈমানের একটি অঙ্গ। মাতৃভূমির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা একটি মহৎ গুণ। মানুষ সাধারণত পার্থিব প্রতিপত্তি ও যশের জন্য নেতৃত্ব লাভ করতে চায়। কিন্তু যারা খাঁটি ঈমানদার বান্দা তাঁরা নেতৃত্বকে জনগণের খিদমত করার একটি উপায় হিসেবে মনে করেন। জনগণের সার্বিক ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই তাঁদের নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। তাঁরা এটাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উৎকর্ষ সাধনের একটি উপলক্ষ বা উপায় মনে করেন। খাঁটি দেশপ্রেম ও নিখাদ নেতৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তবে দেশপ্রেম লোক

দেখানো হতে পারে, স্বার্থ সিদ্ধির একটি উপায়ও হতে পারে। ঠিক তেমনি নেতৃত্ব দুনিয়ার মান-সম্মান অর্জনের লক্ষ্যেও হতে পারে।

এছাড়া যিনি দীনের মাহাত্ম্যকে সমুন্নত রাখতে চান, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে চান, যাঁর লক্ষ্য হলো আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসার করা। যিনি শরীআতের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তিনি ইবাদত বন্দেগীতে থাকেন নিষ্ঠাবান। জনগণের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছানোর লক্ষ্যে থাকেন সচেষ্ট ও সচেতন। আর এরূপ ব্যক্তিই কেবল দীনী নেতৃত্ব কামনা করেন। এমনকি এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদেরকে সৎ ও নেককার মানুষের নেতা বানিয়ে দেন। এঁরাই আল্লাহ ও রাসূলের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব লাভ করতে চান। এরকম নেক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে, সৎ ও সফলকাম বান্দা। এঁরাই আল্লাহ তা'আলার দীনকে প্রচার ও প্রসারের উৎসাহী। তাঁরা চান আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। জনগণ তাঁদেরকেই সমর্থন করুক যাতে তাঁরা সকল নেককাজ সহজে সম্পন্ন করতে পারেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস ও প্রিয় বান্দাদের উত্তম আমল ও গুণাবলীর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "যারা দু'আ করতে থাকে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত-৭৪)

অর্থাৎ ঐ নেককার বান্দাদের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁদের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ আল্লাহ তা'আলা অনুগত বান্দা হয়ে যান, তাহলে তাদের চোখ জুড়াবে। আর আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও দাসত্বে নেককার বান্দাগণ তাঁদের অনুসরণ করবে, তাহলে তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভূত হবে। কেননা আনুগত্যের ক্ষেত্রে নেতা ও তাঁর অনুসারীগণ একে অন্যের সহায়ক শক্তি। তাঁরা আল্লাহর কাছে এমন এক জিনিস চান, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে নেককার লোকদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন। এছাড়া তাঁরা নেতৃত্বের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী তাঁদের কাছে পৌছাতে পারেন। নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো সবর, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আল্লাহর পবিত্র বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আর তারা যখন সবর করে এবং আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব অগ্রনেতা পয়দা করলাম, যারা আমাদেরই নির্দেশ মতো হিদায়াত দান করতো।" (সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত-২৪)

তাঁদের নেতৃত্ব প্রাপ্তির যে দু'আ তার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে নেতৃত্ব করার হিদায়াত দান করেন, নেক আমলের তাওফীক দান করেন, উপকারী জ্ঞান

ও নেক আমলের দ্বারা তাঁদের ভেতর ও বাইরের জীবন সুন্দর ও সুসজ্জিত করেন যা ছাড়া নেতৃত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে তাঁর পবিত্র নাম রহমান সংযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে এসব নিআমত শুধু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা তাঁদের নসীব হয়েছে। কাজেই লক্ষণীয় যে, এই অবস্থায় তাঁদের প্রতিদান হবে জান্নাতের আলীশান মহল। কেননা দীন ইসলামের মধ্যে নেতৃত্বের স্থান অনেক উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর প্রতিদানও সেরূপ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব এ জন্য চাওয়া হয় না যাতে প্রশাসক ও নেতৃবৃন্দ জনগণের ঘাড়ে উঠে বসবে আর তাদের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাহলে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে নেতাদের সাহায্যকারী হবে আর ক্ষমতাশীলগণ এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে ও সফলতা অর্জন করবে। তবে এসবের দ্বারা বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়, যেমন– পরস্পর দলাদলি, হিংসা, বিদ্বেষ, অবাধ্যতা, ঈর্ষা, যুলুম, ফিতনা, সন্ত্রাস, পক্ষপাতিত্ব, শরীআতের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অধম ও হীন লোকদেরকে সম্মান প্রদর্শন, আর সম্মানিত দীনদার ব্যক্তিদেরকে অবমাননা করা ইত্যাদি। আসলে, এটাই হলো দুনিয়ার নেতৃত্বের ভিত্তি। দুনিয়ার নেতৃত্ব এসবের মাধ্যমে এমনকি এর চেয়েও অধিক নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় নেতারা এসব বাহ্যিক মন্দ কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। তবে দুনিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন এসব মন্দকার্যকলাপ অবশ্যই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। হাশরের ময়দানে এসব লোকের অবস্থা পিপীলিকার মতো, তাদেরকে মানুষ পদদলিত করে যাবে, যাতে তারা চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। যেহেতু এরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দীনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিলো। আর তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে নগণ্য ও দুর্বল মনে করে তাদের উপর যুলুম করেছিলো।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ও অন্যদের সঙ্গে মুহাব্বতের মধ্যে পার্থক্য

এটা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকেরই এ সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই এই বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুহাব্বত পোষণ করা পরিপূর্ণ ঈমানের অন্যতম শর্ত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা শিরকের সমতুল্য। তবে আল্লাহ প্রেমিকদের সাথে মুহাব্বত রাখা আল্লাহর সাথে মুহাব্বত রাখারই সমতুল্য। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন তাঁদেরকে মানুষ ভালো না বেসে পারে না। যখন কোন বান্দা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে, তখন এই ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর তা'আলার জন্যই হয়ে থাকে। যেমন– একজন মুসলমান আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে ইযাম ও ফেরেশতাদের সাথে মুহাব্বত রাখে, ঠিক

তেমনি আল্লাহর সাথে দুশমনির কারণে তাঁর দুশমনের সাথে দুশমনি রাখে। এ ধরনের মুহাব্বত ও দুশমনির চিহ্ন এই যে, আল্লাহ তা'আলার এরূপ দুশমন একজন বান্দার যতোই উপকার করুক না কেন, তার সেই দুশমনি মুহাব্বতের দ্বারা পরিবর্তিত হবেনা। এভাবে যদি আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার কাছ থেকে কেউ সাময়িকভাবে কোন কষ্ট পায়, তাহলে তাদের সেই সম্পর্ক অটুট থাকবে, সে কষ্ট জেনে শুনে বা ভুলক্রমে অথবা ইজতিহাদের মাধ্যমে দেয়া হোক।

দীন ইসলাম চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– মুহাব্বত, শত্রুতা, নির্দেশ পালন আর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। তাই যার মুহাব্বত, শত্রুতা, নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হয়, তার ঈমান হলো পরিপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি এ চারটি মূলনীতিকে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করলো, তার ঈমান হবে দুর্বল ও অপরিপূর্ণ।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি মুহাব্বত হলো দু'প্রকার– এক প্রকার মুহাব্বত হলো কারো প্রতি এমন কোন মুহাব্বত রাখা যেটা মূল তাওহীদকে আঘাত করে, আর এটা হলো শিরক। আর দ্বিতীয় প্রকারের মুহাব্বত হলো যা পরিপূর্ণ ইখলাসের ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু তাই বলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো ঐ ভালোবাসা যেটা মুশরিকগণ তাদের মূর্তি ও দেবতার প্রতি পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্য মনে করে এবং তাদেরকে ঠিক এরূপ ভালোবাসে যেরূপ ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-১৬৫)

এরা হলো মুশরিক। তারা আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বতের পাশাপাশি মূর্তির সাথেও মুহাব্বত রাখে। এটা হলো তাদের প্রভুত্ব ও দাসত্বের মুহাব্বত। এই কারণে তারা এদের থেকে ভয় ও আশা করে। তাদের কাছে সওয়াল এবং দু'আ করা শুরু করে, তাদের ইবাদতও করে। এরূপ মুহাব্বত হলো নিরেট শিরক। এসব শিরকের কাজ আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাহ্ ছাড়া মাফ করবেননা। মূর্তির প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ ছাড়া ঈমানদার হওয়া যায় না। এ কাজের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণকে যুগে যুগে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন ও আসমানী কিতাব নাযিল করেছিলেন। আর এ ধরনের মুশরিকদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করা হয়েছে। আর যারা মুশরিকদের সাথে আপোষহীন, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে জান্নাত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে মাবূদ জ্ঞান করে, তার ইবাদত করে ও তাকে অভিভাবক মনে করে, তার সাথে একজন তাওহীদবাদী ঈমানদার বান্দা কোনক্রমেই দীনী সম্পর্ক রাখতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের মুহাব্বত হলো, পরিবার-পরিজন, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুসম্পদ, ধনসম্পদ ইত্যাদির সাথে মুহাব্বত রাখা। এটা হলো একটা স্বভাবজাত

ও প্রবৃত্তিজনিত মুহাব্বত, যেমন, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খানা খেলে ও একজন পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পান করলে তৃপ্তি লাভ করে। এই মুহাব্বত আবার তিন প্রকারের। **এক.** যদি এ মুহাব্বতের দ্বারা আল্লাহর মুহাব্বত ও আনুগত্য অর্জিত হয়, আর আল্লাহর রেযামন্দির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এজন্য সওয়াব পাবে, আর এটা হবে একটি নেকীর কাজ। আল্লাহকে ভালোবাসার এটাও একটি উপায়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো এরূপ ভালোবাসা। পরিবার-পরিজনের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। এছাড়া তিনি খুশবুও খুব পছন্দ করতেন। আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা ছিলো তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। **দুই.** কোন ভালোবাসা যদি নির্মোহ হয় ও আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজে কোন বাধার সৃষ্টি না করে, কারো সাথে কোন সংঘাত বাঁধলে শরীআতের বিধি-বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তাহলে সেই ভালোবাসা হবে মুবাহ বা বৈধ। এরূপ ভালোবাসা কোন গুনাহের কাজ নয়। তবে এরূপ ভালোবাসা কোন কোন সময় আল্লাহর সাথে মুহাব্বতের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। **তিন.** আর যদি কেউ কারো ভালোবাসায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও সেটাকে শরীআতের বিধি-বিধানের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি লোভ-লালসার দাস বলে গণ্য হবে। তাই প্রথম প্রকারের ভালোবাসা নেক কাজে অগ্রগামীদের জন্য, দ্বিতীয় প্রকারের ভালোবাসা মধ্যমপন্থী লোকদের জন্য, আর তৃতীয় প্রকারের ভালোবাসা হলো যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। এসব বিষয়ের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আর এই ভালোবাসার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়ও লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এই ভালোবাসা হলো নাফসে আম্মারাহ ও নাফসে মুতমায়িন্নাহর সংঘাতের প্রধান ক্ষেত্র।

তাওয়াক্কুল ও উদাসীনতার মধ্যে পার্থক্য

তাওয়াক্কুল হলো কালবের একটি মহৎগুণ ও অন্তরের ইবাদতস্বরূপ। এর মধ্যে করুণাময় আল্লাহর প্রতি গভীর ভরসা থাকে। একজন নেকবান্দা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে এসে নিজের যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর দরবারে সমর্পণ করে দেয়। আর আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীরেরর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি হলেন উত্তম ব্যবস্থাপক। পাশাপাশি সে লোকটি যাবতীয় বাহ্যিক উপকরণের ব্যবস্থাও করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল ছিলেন। তবে তিনি যুদ্ধে বর্ম পরিধান করতেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। আর হিজরতের সময় তিনি তিনদিন পর্যন্ত সওর পাহাড়ের গুহায় আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে ছিলেন। তাই জানা গেলো যে, রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করতেন। পক্ষান্তরে, বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জামের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা, আর

আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া এবং হঠাৎ করে আল্লাহর কথা মনে পড়লেও সে বিষয় কোন গুরুত্ব না দেয়াকে তাওয়াক্কুলহীনতা বা উদাসীনতা বলা হয়। এরূপ অবস্থায় মন থাকে উপকরণের দিকে, আল্লাহর দিকে নয়। এ পর্যায়ে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারী কোন সাজ-সরঞ্জাম বা উপকরণের ব্যবস্থা করে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অধিকারী। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, বিনা উপকরণের তাওয়াক্কুল অর্জিত হয় না। সুতরাং তাঁরা বাহ্যিক উপকরণ যোগাড় করে উপকরণের যোগদানদাতা আল্লাহর উপর ভরসা করেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হলো, যারা সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ পরিত্যাগ করে। আসলে তাঁরা খাঁটি তাওয়াক্কুলকারী নয়। এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ হলো বিবাহ না করে সন্তান লাভের আশা পোষণ করা, পানাহার না করে ক্ষুধা নিবৃত্তিও ও তৃপ্তি লাভের আশা করা। তাওয়াক্কুল হলো আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

তাওয়াক্কুলের হাকীকত হলো এই যে, ইনসান আল্লাহ তা'আলাকে নিজের অভিভাবক মনে করবে। কোন ব্যক্তির উকীল তাঁর ভালোমন্দ সম্পর্কে যেমন ওয়াকিফহাল থাকেন, তার সম্যক কল্যাণ কামনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার অবস্থা এর চেয়েও অধিক পরিজ্ঞাত। আর বান্দার চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাকে উসীলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, বান্দা চেষ্টা সাধনা করলে আল্লাহ তার প্রয়োজনীয় রিযক দান করবেন। সুতরাং যমীনকে চাষের উপযোগী করে বীজ বপন ও সময় মতো পানি সেচনের নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে তাঁর বান্দার প্রয়োজনীয় রিযকের ব্যবস্থা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্ক গড়ে তুলোনা। আর আল্লাহর উপরই ভরসা রেখো। একমাত্র তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করো। আল্লাহ তা'আলা আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অভিভাবক। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির যে এসব বিষয়কে উপেক্ষা করে অলস হয়ে বসে থাকে, আর বলে আমার অদৃষ্টে যা নির্ধারিত আছে, সেটা এমনি আমার কাছে এসে যাবে। আমি যদি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করি তবুও মৃত্যু আমাকে পাকড়াও করবে। ঠিক তদ্রূপ আমার ভাগ্যে যে রিযক নির্ধারিত আছে সেটা আপনা আপনি আমার কাছে এসে যাবে। যে এরূপ চিন্তাভাবনা পোষণ করে, এটা তাকে বুঝতে হবে যে, শত চেষ্টা তদবীর করলেও তা লাভ করা যাবে না। তার অদৃষ্টে যে রিযক নির্ধারিত আছে সেটা তার জানা নেই, তার চেষ্টার দ্বারা পাওয়া যাবে, না অন্যের উসীলার দ্বারা পাওয়া যাবে, তার রিযক কিভাবে বা কোন পন্থায় আসবে সেটাও তার জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে, এসব বিষয় লুকায়িত আছে। তবে এটা কি করে সে জানতে পারবে যে, কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই তার নির্দিষ্ট রিযক সে লাভ করতে পারবে। এছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে, সেসব অন্যের মাধ্যমে সমাধা

হয়ে থাকে এবং তা অদৃষ্টের সাথে সম্পর্কিত। আর অনেক বিষয় এর বিপরীতও আছে। এটা উক্ত অলস ব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে, তাহলে এটা কি করে জানা যাবে যে, যাবতীয় রিযক অন্যের প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই মূলনীতি প্রত্যেক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদেরকে কি জান্নাত লাভের উপরকরণ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপরকরণ যোগাড় করতে হবে না? কেউ যদি অলস হয়ে বসে থাকে, তাহলে তার অদৃষ্টে যেটা লেখা আছে, সেটা কি সে এমনি পেয়ে যাবে? এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এটা তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থী। তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি উপকরণ যোগাড় করাও অপরিহার্য। অবশ্য আরেক শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারী আছে, যাঁরা কোন কিছু লাভের জন্য কোন উপকরণের তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। (যেমন- আসহাবে সুফফা) এই শ্রেণীর লোক আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমেই সবকিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এঁরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন। সেই অবস্থা অনেক উঁচু স্তরের এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তাঁরা সবসময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এরূপ তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা আল্লাহর খাস বান্দাদের পক্ষেই কেবল সম্ভব। তবে উপকরণের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা সবচেয়ে উত্তম ও আদর্শস্থানীয়। উপকরণের মাধ্যমে যে তাওয়াক্কুল হাসিল করা হয়, সেটাই মহান আম্বিয়া ও সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণ করে গিয়েছেন। হযরত যাকারিয়া (আ) কাঠ মিস্ত্রী ছিলেন। হযরত নূহ (আ)-কে আল্লাহ নৌকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কোন সাহাবী ছিলেন না যিনি তাওয়াক্কুলের অর্থকে বাহ্যিক উপকরণ ছেড়ে দেয়া মনে করতেন, বরং তিনি বাহ্যিক উপকরণ যোগাড় করার জন্য তৎপর থাকতেন। আর এর পাশাপাশি আল্লাহর উপর ভরসাও রাখতেন। মহান সাহাবাগণ ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে যুদ্ধের ময়দানে স্বহস্তে দুশমনের মুকাবিলা করতেন। তবুও তাঁরা তাওয়াক্কুলের হাকীকতের উপর কায়িম ছিলেন। এভাবে তাঁরা সংসার ধর্ম পুরোপুরি পালন করে গিয়েছেন। এছাড়াও তাঁদের কাজ কারবারকে তাঁরা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতেন। তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে তাঁরা সাইয়্যিদুল মুতাওয়াক্কিলীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।*

---

* এছাড়া সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বেকার মুসলিম উম্মাহ সকলেই ব্যবস্থা, পেশা ও শ্রমের বিনিময়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত আলী (রা) বন-জঙ্গল থেকে ঘাস-লতাপাতা উটের পিঠে বহন করে এনে বিক্রয় করতেন। কোন কোন সময় খুরমা খেজুরেরর বিনিময়ে তিনি ইয়াহুদীদেরকে পানীয় সরবরাহ করতেন। হযরত উমর (রা) একজন সার্থক ও সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনাহ (রা) চামড়া রং করার ব্যবসা করতেন এবং আয়ের অধিকাংশ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দান করে দিতেন। হযরত সায়াদ ইবনুল ওক্কাস ও হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) তীর-ধনুক তৈরি করে বিক্রয় করতেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মাংস ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) খাদ্য-দ্রব্যের ব্যবসা করতেন। হযরত উতবা ইবনু আবী ওক্কাস (রা) একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) মদীনার বাজারে উট ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করতেন। তাঁরা কেউই কর্মবিমুখ ছিলেন না এবং শ্রমের মর্যাদাকে হেয় চোখে দেখতেন না। –অনুবাদক

সতর্কতা ও সন্দেহপ্রবণতার মধ্যে পার্থক্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট রাখা, কোন বিষয়ে সীমালঙ্ঘন না করা, এসব নীতিমালাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার নামই হলো সতর্কতা।

ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহপ্রবণতা বলতে ঐ আমলকে বুঝায় যেটা রাসূল (সা)-এর সুন্নাত বা কোন সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়, আর সেটা দীন ইসলামের অংশও নয়। যদি কোন ব্যক্তি ওযূ করার সময় কোন অঙ্গকে তিনবারের অধিক ধৌত করে, ওযূ বা গোসলের নিয়ম বহির্ভূত বাড়াবাড়ি করে, নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করাকে জরুরী মনে করে, যে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে নাপাক হওয়া সম্বন্ধে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, তা সতর্কতার জন্য ধৌত করে, এসবই হলো সন্দেহপ্রবণতা। এভাবে ঐসব মাসয়ালা-মাসায়েল যেসব একজন মানুষের সন্দেহপ্রবণ মন দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেসব সুন্নাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সে সম্পর্কে তাকে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত থাকতে হবে। কারণ একজন মানুষ যদি সতর্কতার পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়বে। সুতরাং কোন বিষয় যাতে সুন্নাতের বরখেলাফ না হয়, সে সম্বন্ধে সকলকে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে, সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

ইলহামে ফেরেশতা ও ইলহামে শয়তানের মধ্যে পার্থক্য

এক. যে ইলহাম ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং আল্লাহর রাসূলের হিদায়াত অনুযায়ী হয়, সেটা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আর যেটা গায়রুল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী হয়, সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। **দুই.** যে ইলহাম আল্লাহর তা'আলার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ, যিকির ও ফিকিরের সৃষ্টি করে, তা হয় ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আর এর উল্টোটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। **তিন.** যে ইলহাম মানুষের দিলে নূর, অনুরাগ ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করে সেটা হলো ফেরেশতার ইলহাম, আর যা এর বিপরীত তা হলো, শয়তানের ইলহাম। **চার.** যে ইলহাম সুখ শান্তি বয়ে আনে তা হলো ফেরেশতার ইলহাম, অন্যথায় সেটা হবে শয়তানের ইলহাম।

ইলহামে ফেরেশতা বলতে কি বুঝায়

একজন নেককার বান্দার পরিচ্ছন্ন দিলে আল্লাহর নূর ঝলমল করতে থাকে। এই ইলহামের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক থাকে, তাই এই ইলহামকে ইলহামে মালাকী বলা হয়। ফেরেশতারা পূত-পবিত্র, কাজেই পূত-পবিত্র দিলের সাথেই তাঁদের সুসম্পর্ক থাকে। এজন্য এরূপ দিলের উপর ফেরেশতার প্রভাব শয়তানের

প্রভাবের থেকে অধিক হয়। কিন্তু যে দিল কলুষিত ও যে দিল লোভ-লালসা ও সন্দেহপ্রবণতায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, ঐসব দিলে শয়তানের প্রভাব প্রবল হয়ে থাকে।

ইকতিসাদ ও তাকসীরের মধ্যে পার্থক্য

ইকতিসাদের অর্থ হলো বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতর মধ্যবর্তী পথ। একটি অপরটির বিপরীত। আবার ইকতিসাদ বলতে কম করা বা সীমালঙ্ঘন করাকেও বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং তাঁদের ব্যয় করার অবস্থা মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত-৬৭)

"আর নিজের হাতকে আপনি কাঁধের দিকে সংকুচিত করে রাখবেন না আর একবারে প্রসারিতও করে দেবেন না। অন্যথায় তিরস্কৃত ও রিক্তহস্ত হয়ে পড়বেন।" (সূরা বনী ইসলাঈল ঃ আয়াত-২৯)

"আর খুব খাও ও পান করো, তবে সীমালঙ্ঘন করো না।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৩১)

গোটা ইসলাম মধ্যবর্তী নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামই মধ্যবর্তী ধর্ম। ইসলামের নামে যেসব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত, সেসবের তুলনায় সুন্নাতই হলো মধ্যবর্তী তরীকা। এছাড়া আল্লাহর দীন হলো বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। আর এটাই হলো মধ্যবর্তী দীন। দীনের সহায়তার লক্ষ্যে যে গবেষণা করা হয়, সেটাকে ইজতিহাদ বলা হয়।

আরবি "গুলূ" শব্দের অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে শয়তান দু'টো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। শয়তান মানুষকে সীমা লঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করে, অথবা উদাসীনতায় জড়িয়ে ফেলে। এসব হলো এক প্রকার ব্যাধির ন্যায়। ঈমান, ইবাদত ও সকল ধরনের দীনী লেনদেনের ক্ষেত্রে শয়তান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিভ্রান্তি থেকে তারাই কেবল রক্ষা পেতে পারে যারা পূত-পবিত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে। সময়ের পরিক্রমায় যেসব নতুন নতুন ভাবধারা কর্মকাণ্ড ও ভ্রান্ত আকীদা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেসব থেকে তাঁরা দূরে থেকে রাসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর এঁরাই আছেন সঠিক পথে। এ দু'টি মারাত্মক ব্যাধি অধিকাংশ আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করে। এজন্য আগেকার দিনের আলিম সমাজ এসব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলমানদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে গিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এদের খপ্পরে পড়লে ধ্বংস অনিবার্য। কোন কোন সময় এ দু'টি ব্যাধি একই ব্যক্তির মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ

তা'আলা মুসলমানদেরকে এসব ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন এবং সরল পথের উপর কায়িম রাখুন।

নিঃস্বার্থ উপদেশদাতা ও স্বার্থপর উপদেশদাতার মধ্যে পার্থক্য

নিঃস্বার্থ উপদেশ দান এক ধরনের মহৎ কাজ। যেটা কারো প্রতি দয়া, করুণা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে প্রকাশ পায়। উপদেশদাতার উপদেশের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও জনগণের সাথে ইহ্সান বা সদয় ব্যবহার করা। তাই একজন উপদেশদাতা উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে গভীর ভালোবাসা ও নম্রতা অবলম্বন করে থাকেন। কেউ যদি উপদেশদাতাকে দুঃখ বা কষ্ট দেয় বা তাঁর সাথে মন্দ ব্যবহার করে তাহলে তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করেন এবং ঐসব লোকদের সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেন, যে রকম ব্যবহার একজন দয়ালু ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক একজন মুমূর্ষ রোগীর সাথে করে থাকেন। ঐ রোগী যদি তার চিকিৎসকের সাথে কোন দুর্ব্যবহার করে, তাহলে তিনি খুশি মনে তা সহ্য করেন ও তার যথাযথ যত্ন নেন। একজন নিঃস্বার্থ উপদেশদাতার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

তবে কিছু কিছু স্বার্থপর উপদেশদাতা আছেন, যাঁরা লোকদেরকে উপদেশের ছলে তিরস্কার করেন, লজ্জা দেন, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করেন। এছাড়া একজন উপদেশ দাতা তাঁর প্রিয়জন বা তাঁর কোন উপকারী ব্যক্তিকে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত দেখলেও তাকে কোন কিছুই বলেন না, বরং আবশ্যক বোধে সেই অবস্থায় মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের পক্ষ নেন এবং বলেন যে এরাও মানুষ, তাদেরও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এছাড়া তার পাপের চেয়ে নেকীর পরিমাণ বেশি, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অপরপক্ষে, কেউ যদি একজন নিঃস্বার্থ উপদেশদাতার উপদেশ না মানেন, তাহলে তিনি মনে দুঃখ পান, তবে সেটা প্রকাশ করেন না। এরূপ উপদেশদাতা আরো বলে থাকেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এর প্রতিদান দেবেন আমার কথা কেউ শুনুক বা না শুনুক। তিনি তাদের জন্য দু'আ করতে থাকেন, আর লোকের দোষ ত্রুটি কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু একজন স্বার্থপর উপদেশদাতার অবস্থা হলো ঠিক এর বিপরীত।

মুবাদারাত ও উজলতের মধ্যে পার্থক্য

মুবাদারাত বা তাড়াহুড়া করা বলতে বুঝায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সুযোগকে মূল্যবান মনে করা ও সেটাকে কাজে লাগানো। সুতরাং একজন তাড়াহুড়াকারী ব্যক্তি সময়ের পূর্বে বা পরে কোন কাজ করে না। বরং সঠিক সময়ের মধ্যেই সে তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে তার কাজ শেষ করার চেষ্টা করে, ঠিক একটি সিংহ যেমন শিকার দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আর উজলত শব্দের অর্থ হলো, সময়ের পূর্বে কোন কাজ শেষ করা। যেমন কেউ

কাঁচা ফল পাকার আগে পেড়ে আনলো। সুতরাং মুবাদারাত বা তাড়াহুড়া হলো দুটি মন্দ অভ্যাসের মধ্যবর্তী সময় বা অবস্থা। একটি হলো উদাসীনতা, অপরটি হলো উজলত, অর্থাৎ সময়ের পূর্বে কোন কাজ শেষ করা। উজলত শয়তানের প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। উজলত বা অসময়ে তাড়াহুড়া করার ফলে অনেক অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়। উজলত আসলে মাত্রাতিরিক্ত অনুশোচনার কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, অলসতা ও উদাসীনতা সময়ের অপচয় ঘটায় ও সুযোগ সুবিধা হাত ছাড়া করে দেয়।

মানুষ পরিস্থিতির শিকার। সুখ দুঃখ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক সাথী। দুঃখ বেদনা ও আনন্দ নিয়ে মানুষের জীবন। তাই সুখ ও আনন্দকে যেমন আমরা সানন্দে গ্রহণ করি, তেমনি দুঃখ ও বেদনাকেও একইভাবে গ্রহণ করতে হবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তাই মানুষকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে। আর এই দুঃখ-বেদনা ও অশান্তিকে কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না। এটাই সবর করার প্রধান শর্ত। যে আল্লাহ্ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলেন, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে, কোন মানুষের কাছে নয়। তাহলেই একজন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। এভাবেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর দেয়া দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সানন্দচিত্তে সহ্য করে আমাদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আহমদ ইবনে কায়স (র) থেকে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। জনৈক ব্যক্তি একবার তাঁর কাছে এসে তার নিজের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, হে আমার প্রিয়, বহু বছর হলো আমি আমার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এখানো আমি সেকথা কাউকে জানাইনি। সুতরাং তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর শির মুবারকে একবার ভীষণ ব্যথা দেখা দিলো। তখন তিনি সেই ব্যথা আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি বললেন, হায়, আমার মাথায় তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কথা শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন এবং গভীর সমবেদনায় বলে উঠলেন, আমার মাথায়ও ভীষণ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, তবুও আমি তা সহ্য করছি। তুমি আমাকে অনুসরণ করো, তোমার মাথার যন্ত্রণার জন্য কোন অনুযোগ না করে সহ্য ও সবর করো। তোমাকে এই ভীষণ মাথা ব্যথার কোন অনুযোগ না করেই সহ্য করতে হবে। এখানে এটা ছিলো সহমর্মিতার এক অতুলনীয় বহিঃপ্রকাশ। একটি আরবি কবিতার পঙ্ক্তির বাংলা অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো। "যে ব্যক্তি তোমার দুঃখ-কষ্টের সময় ব্যথিত হয়েছিলো, তুমি তার দুঃখ-কষ্টের সময় আনন্দিত না হয়ে ব্যথিত হও।"

মানুষের কাছে কেউ কোন অভিযোগ করলে সেটা অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয়, আর এটার উদ্দেশ্য হলো অসন্তোষ প্রকাশ করা। তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন দুঃখ বেদনা জানালে সেটা অভিযোগ হিসেবে বিবেচিত হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত আইয়ূব (রা) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করে তাঁর রবের কাছে আবেদন করেছিলেন, "আমার এই কষ্ট হচ্ছে, আর আপনি সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-৮৩)

হযরত ইয়াকূব (আ) আরয করেছিলেন, "আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আপনার সমীপেই পেশ করেছি।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৮৬)

এমনিভাবে হযরত মূসা (আ)ও আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আর তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি, তুমিই সাহায্যকারী, আর তোমার কাছে সাহায্য চাই আর তোমার কাছে নিবেদন করছি আমার অসুবিধা, তোমার সাহায্য ছাড়া ভালোমন্দ কিছুই করার কোন ক্ষমতা আমার নেই।"

সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মহান দরবারে একবার আবেদন করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার দুর্বলতা ও চেষ্টা তদবীরের ত্রুটি এবং লোকদের কাছে হেয় হওয়ার অভিযোগ করছি। তুমি দুর্বলের রব এবং আমারও রব। হে আল্লাহ! আমাকে কার কাছে সোপর্দ করছো? এমনসব লোকদের কাছে কি যারা আমার সাথে মলিন মুখে দেখা দেয়, অথবা এমন শত্রুর কাছে যাদেরকে তুমি আমার উপর আধিপত্য দান করেছো? যদি আমার উপর তোমার কোন অসন্তোষ না থাকে তাহলে আমার কোন চিন্তাভাবনা নেই। তোমার নিরাপত্তাই আমার সহায়ক। তোমার চেহারার নূরের দ্বারা যে অন্ধকার দূর হয় এবং তোমার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল নির্ভর করে, সেই নূরের উসীলায় আমাকে তোমার গযব ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করো। আমি তোমার সন্তুষ্টি কামনা করতে থাকবো যে পর্যন্ত না তুমি আমার প্রতি রাযী হও। আর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র তোমারই।" এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর দরবারে দুঃখ-বেদনা পেশ করা ধৈর্য ধারণের পরিপন্থী নয়। আল্লাহ তা'আলার হযরত আইয়ূব (আ) সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি।" যদিও তিনি আল্লাহর দরবারে তাঁর দুঃখ-বেদনা "আমি দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত" এই বলে জানিয়েছিলেন। এমনিভাবে ইয়াকূব (আ)-এর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, "সবরে জামীল বা উত্তম ধৈর্যের যে ওয়াদা করেছিলে তার উপর তুমি প্রতিষ্ঠিত আছো।" কোন নবী যখন কোন বিষয়ে ওয়াদা বা অঙ্গীকার করতেন, তখন তা অবশ্যই পূরণ করতেন। আর ইয়াকূব (আ) একথাও উল্লেখ করেছেন যে, "আমি আমার পেরেশানীর অনুযোগ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই উপস্থাপন করছি।" এ অনুযোগের দ্বারা তার ধৈর্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আইয়ূব (আ) তাঁর বিপদাপদের সময় অনুযোগ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্যশীল বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু তাঁকে চরম ধৈর্যশীল বলেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, আইয়ূব (আ) আল্লাহ তা'আলাকে লক্ষ্য করে 'আন্তা রাহমানুর রাহীম' অর্থাৎ তুমি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু, বলেছিলেন। তিনি 'আরহিমনী' অর্থাৎ আমার প্রতি রহম করো, একথা বলেননি। অর্থাৎ তিনি তাঁর দুঃখের কথা উল্লেখ করেছিলেন, আর আল্লাহর গুণাবলীও উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যখন আইয়ূব (আ)-এর জিহ্বা অসুস্থতার কারণে আল্লাহর যিকর করা থেকে অক্ষম হয়ে পড়লো, তখন তিনি এই অনুযোগ করেছিলেন যে, আল্লাহর যিকরের মধ্যে দুর্বলতাজনিত আপদ দেখা দিয়েছে, এটা রোগ যন্ত্রণার কোন অভিযোগ ছিলো না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নিকট এই অভিযোগ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিলো, যেন তিনি দুর্বল উম্মতের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করতে পারে। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা মনে করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন অনুযোগ করা সবর করার পরিপন্থী। অথচ এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বিপদগ্রস্ত করেন এই কারণে যে তারা যেন তাঁর কাছে আশ্রয় চায় ও আহাজারি এবং প্রার্থনা করে। এসব বিপদের সময় বান্দা চুপ থাকুক এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। বরং তাঁর বান্দা আল্লাহর মহান দরবারে সব প্রকারের ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করুক তা তিনি পছন্দ করেন। তাই একজন বান্দাকে এটা স্মরণ রাখা অতি জরুরী যে, একজন মানুষের হাত তার মুখের যতো নিকটবর্তী, তার চেয়ে আল্লাহর তা'আলার রহমত তার হৃদয়ের অধিক নিকটবর্তী, একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ইসলামে অজ্ঞ লোকদের জন্য অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতিতে সমাজে বিভিন্ন দল, উপদল ও সংঘাত দেখা দেয়। যদিও আল্লাহ তা'আলার কিতাব হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে সত্য ও অসত্যের সীমারেখা স্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী একটি বস্তু দান করবেন।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত-২৯)

বদরের যুদ্ধের দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান বলা হয় এজন্য যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু ও মিত্রদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছিলো। এই দিনটিকে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং হিদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারীও বলা হয়। সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে পথভ্রষ্ট বলে, যেমন– মুশরিকরা আল্লাহ

তা'আলার ইবাদত ও মূর্তির উপাসনাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়কে, আর অদৃষ্টের বিষয়কে একিভূত করে ফেলেছিলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ার মতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-২৭৫)

তারা হালাল ব্যবসা ও হারাম সুদকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। তারা এটাও বলে যে, ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য কি? তারা যবাইকৃত পশু ও মৃত পশুকে হালাল হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা এও বলে যে এটা একটি অদ্ভুত ব্যাপার নয়কি, আমরা যে পশু হত্যা করি সে পশুর মাংস হালাল আর আল্লাহর ইচ্ছায় যে পশু মারা যায় সেটার মাংস হারাম। তাদের বক্তব্য হলো সব জানোয়ারই আল্লাহর সৃষ্টি, তবে কিছু সংখ্যক হারাম কেন, আর কিছু সংখ্যক হালাল কেন? মহিলাদের ক্ষেত্রে হালাল হারামের ব্যাপারেও তারা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তাদের মতে সমস্ত নারীদেরকে আল্লাহ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এটা কেমন ব্যাপার যে, নারীদের কিছু সংখ্যক পুরুষদের জন্য হালাল ও কিছু সংখ্যক হারাম করা হয়েছে। এই ভ্রান্ত আকীদার অনুসারীরা আল্লাহর ওলীদেরকে এবং শয়তানের বন্ধুদেরকে এক পর্যায়ভুক্ত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

ইত্তেহাদিয়া ফিরকার কি কি বিষয় শিরকের অন্তর্ভুক্ত

এটা এমন একটি ফিরকা যে ফিরকা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এই ফিরকার অনুসারীরা সমস্ত জগতকে এক মনে করে এবং দাবী করে যে এসবই হলো আল্লাহর সত্তা, এ সত্তা ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আর তারা আরও দাবী করে যে, সমস্ত জিনিস এক সত্তা. পৃথক কোন কিছু নয়। এছাড়া সুনাম, দুর্ণাম, ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম বলতে কোন কিছু নেই। তারা সহজাত প্রবৃত্তি ও ধর্মীয় বিধি-বিধান এসবের উপর বিশেষ নিয়মকানূন প্রবর্তন করেছে। যারা পার্থক্যে ও সাদৃশ্যে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করে তারাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী, তারাই সঠিক পথে আছে। এই যে সাদৃশ্য, মত পার্থক্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়ে থাকে, অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তি এইসব সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছেন। এই অন্ধকার ও অজ্ঞতা থেকে ঐ নূরই তাদেরকে উদ্ধার করতে পারে, যে নূর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার হৃদয়ে দান করেছেন। এই নূরের দ্বারাই তাঁরা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে থাকেন, আর হক ও বাতিল, শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নূর নির্ধারিত করেননি, তার আর কোন নূর নেই।" (সূরা নূর ঃ আয়াত-৪০)

এ ব্যাপারে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এসব আলোচনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার

তাওহীদ বা একত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সে জ্ঞান চক্ষু দান করতেন, তাহলে তারা এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুধাবন করতে পারতো। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওহীদের মধ্যে এবং যারা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে তাদের তাওহীদের মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহর গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন উপমা বা উদাহরণের মধ্যে যে পার্থক্য, খাঁটি তাওহীদে এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানহানির মধ্যে যে পার্থক্য, পূত পবিত্র রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসরণের মধ্যে ও আলিমদের অভিমত ও যুক্তির মধ্যে যে পার্থক্য, আলিমদের অনুসরণের মধ্যে ও তাঁদের ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ও তাঁর দুশমনদের মধ্যে যে পার্থক্য, ঈমানদারী ও রহমানী অবস্থার মধ্যে আর শয়তানী ও নাফসানী অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য, অবশ্য পালনীয় আসমানী কিতাবের ও বিকল্প আদেশের মধ্যে যে পার্থক্য তা নির্ণয় করতে হবে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে পার্থক্য

আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত তাওহীদ আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলীকে বিশদভাবে উপস্থাপন করে। তাওহীদের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহকে মা'বূদ জানা, তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা, তিনি যে এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। এখানে আল্লাহর কোন শরীক বলতে বুঝায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বূদ হিসেবে গণ্য করে তাঁকে ভালোবাসা, ভয় করা, তাঁর নামে শপথ ও মানত করা। তাই আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বের তুলনা করা যাবে না, মনে বা মুখেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এটাই হলো তাওহীদের মর্মবাণী।

বাতিল ফিরকার অনুসারীদের তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা

বাতিল ফিরকার অনুসারীদের নিয়ম-নীতি ও বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তা'আলা যে এসব গুণের অধিকারী নন, সেটাও মনে করে, তারা আল্লাহর সেসব নাম ও গুণাবলী মুখে পর্যন্ত উচ্চারণ করে না, এমনকি কুরআন শরীফের কোন আয়াতও তারা পাঠ করে না যেখানে আল্লাহর নামের উল্লেখ আছে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীসগুলো তারা বর্ণনা করে না। এছাড়া বাতিল ফিরকার অনুসারীরা আল্লাহর নাম ও তাঁর পবিত্র গুণ ও মাহাত্ম্যকে বিকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করে। তারা আল্লাহকে অর্থহীন শব্দের দ্বারা উল্লেখ করে। কেউ এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করলে, তারা পবিত্র কুরআনের বা রাসূলের হাদীসের তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে বিকৃত অর্থ বের করার অপচেষ্টা করে। বাতিলপন্থীরা আল্লাহর গুণাবলীকে অর্থহীন করার এহেন অপচেষ্টাকে তাদের

তাওহীদ হিসেবে নামকরণ করেছে। এটা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা এবং ধর্মদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও বাতিলপন্থীদের আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য

আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলাকে যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর পবিত্র সত্তাকে সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যেসব বিষয় থেকে মুক্ত সেগুলো হলো– তন্দ্রা, নিদ্রা, অলসতা, মৃত্যু, ক্লান্তি, যুলুম করার ইচ্ছা, তাঁর স্ত্রী, সন্তানাদি ও সাহায্যকারী থাকা, তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারা, কোন বান্দাকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা, তাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা করা, আসমান যমীন এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস বিনা প্রয়োজনে পয়দা করা, আযাব ও সওয়াবের ব্যাপারে এসবের কোন সম্পর্ক না থাকা, আর তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসারী না হওয়া, দোস্ত, দুশমন, ভালোমন্দ এবং কাফির মুমিনগণকে একই সমান মনে করা, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহকে কোন বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী হওয়া, কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে কারো শরীক থাকা, আল্লাহর প্রতি অলসতা আরোপ করা, তিনি ভুলভ্রান্তিতে নিপতিত হন মনে করা, আল্লাহ কর্তৃক কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, তাঁর কোন কালাম পরিবর্তন হয় মনে করা, তাঁর প্রতি আপত্তিকর কোন কিছু সম্বোধন করা, সেটা তাঁর নাম, গুণ বা কর্মের সাথে যুক্ত হোক বা না হোক। এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার শান ও সম্মানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণ অতি সুন্দর ও পরিপূর্ণ। আল্লাহর যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত। এভাবেই আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন।

যেসব গুণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র সত্তাকে বিভূষিত ও মহিমান্বিত করেছেন, ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থীরা সেসব গুণকে স্বীকার করে না। বাতিল পন্থীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও কথা বলেন না এবং কাউকে তাঁর সাথে কথা বলারও সুযোগ দেন না। তিনি পবিত্র আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত নন, তাঁর দিকে প্রার্থনার হাত উত্তোলন করা অর্থহীন, তাঁর কাছে কোন পবিত্র বাণী পৌছেনা, তাঁর নিকট থেকে কোন কিছু আসে না, তাঁর নিকট ফেরেশতারা যান না, রূহ উপরে উঠে না, তিনি বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল নন, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর পরাক্রমশালী নন, তিনি এক মুষ্টিতে আসমান ও অন্য মুষ্টিতে যমীন গ্রহণ করবেন না, তিনি প্রথম অঙ্গুলিতে আকাশ, দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে যমীন, তৃতীয় অঙ্গুলিতে পাহাড় এবং চতুর্থ অঙ্গুলির দ্বারা গাছপালা ধারণ করবেন না। তাঁর কোন চেহারা নেই যে, মুমিন বান্দারা জান্নাতে তাঁকে নিজ চোখে দেখতে পাবেন। তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাঁদেরকে সালাম করবেন না, তাঁদের সাথে হাসি মুখে দেখা দেবেন না, তিনি প্রত্যেক রাত্রে প্রথম আকাশে অবতরণ করে এ আহ্বান করেন যে, কেউ

কি মাগফিরাত কামনাকারী আছে, আমি তাকে মাফ করে দেবো, কেউ কি কোন কিছুর প্রত্যাশী আছে, আমি তার আশা পূরণ করে দেবো। তিনি কোন কাজ কোন উদ্দেশ্যে করেন না, বরং তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড উদ্দেশ্যহীন ও যুক্তিহীন। তাঁর ইচ্ছা সর্বব্যাপী নয়। আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয় না, বরং বান্দার ইচ্ছা কার্যকর হয়। তিনি কোন ইচ্ছা করেন না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়াই সবকিছু হয়। বাতিলপন্থীরা একটার নাম রেখেছে ন্যায় বিচার, অপরটির নাম রেখেছে তাওহীদ। এভাবে তারা আরও বলে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ভালবাসেন না, তাঁকেও কেউ ভালোবাসে না। তাঁর মধ্যে কোন দয়া বা অনুরাগ নেই, তাঁর মধ্যে ক্রোধ বা সন্তুষ্টিও নেই। এছাড়া বাতিলপন্থীদের মতে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা নন। তাদের কারো কারো মতে তিনি সর্বজ্ঞাতও নন। এমনকি তাদের কারো কারো মতে আল্লাহর কোন অস্তিত্বই নেই। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ অন্য কাউকে মানতে হবে। এসবই হলো, বাতিলপন্থী ও ভ্রান্ত আকীদার লোকদের বিশ্বাস ও ধারণা যা হলো ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আল্লাহর গুণবাচক নামের হাকীকত, উপমা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও অন্যান্য মহান ইমামগণ আল্লাহর গুণবাচক নামের হাকীকতের পার্থক্য সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর হাত আমার হাতের ন্যায়, তাঁর কান আমার কানের ন্যায়, তাঁর চোখ আমার চোখের ন্যায়, এভাবে আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির তুলনা করা হয়। তবে যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার কান, চোখ, হাত এবং চেহারা আছে, তাঁর স্থিতি আছে, তাহলে এসবের কোনটির সাথে মাখলূকের কোন সাদৃশ্য বুঝায় না। বরং সৃষ্টির গুণের মধ্যে ও স্রষ্টার গুণের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সেই অবস্থায় আল্লাহর উপমা বা সাদৃশ্যের কোন অবকাশ নেই। এসব ধ্যান-ধারণা কেবল ধর্ম বিরোধীদের ভ্রান্তি ও শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিষয়ে সকল নবী ও রাসূলগণের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলগণ যেসব গুণে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে গুণান্বিত ও বিভূষিত করেছেন, ঐসব গুণকে বিনা দ্বিধায় অবিকৃতভাবে মেনে নিতে হবে। এসবকে বিকৃত করার বা বাতিল করার কারো কোন অবকাশ নেই। এসব বিষয়কে মেনে নিতে হবে এবং মাখলূকের সাথে আল্লাহর সকল সাদৃশ্যকে অস্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করে ও আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে, সে কুফুরী কাজ করলো। তবে তাঁরাই সঠিক পথে আছেন, যাঁরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে স্বীকার করেন ও তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। আর আল্লাহর সাথে কোন মাখলূকের সাদৃশ্য আছে, এটাকে স্বীকার করেন না।

আল্লাহর খাঁটি তাওহীদ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর একত্ববাদের সাথে অপর কাউকে সমমর্যাদা জ্ঞান করা

যাঁরা আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী করেন না, আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই এটা তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। একজন খাঁটি তাওহীদবাদী আল্লাহ ছাড়া কারো শপথ করেন না, মানত করেন না, কারো উপর ভরসা করেন না, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য অন্য কারো ইবাদত করেন না, কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমতুল্য মনে করেন না। যারা আল্লাহর ইচ্ছাকেও মানুষের ইচ্ছাকে সমান সমান মনে করে, যারা বলে, আল্লাহও তোমার সাহায্যে সফলকাম হয়েছি, তোমার উপর আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করি, আমাদের জন্য আকাশে আল্লাহ আর যমীনে তুমি, এই সাদকাহ হলো তোমার ও আল্লাহর ওয়াস্তে, তোমার কাছেও আল্লাহর কাছে আমরা তাওবাহ করছি, আমরা তোমার ও আল্লাহর হিফাযতে আছি, মুশরিকদের ন্যায় কাউকে সিজদাহ করা, কারো উদ্দেশ্যে মাথা ন্যাড়া করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা, মানত করা, মৃত্যুর পর কারো কবরে সিজদাহ করা, বিপদের সময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য কামনা করা, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে অন্য কারো সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে আল্লাহর সমান ভালোবাসা রাখা, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত ও প্রয়োজন, সেভাবে অন্য কাউকে ভয় করা, আল্লাহকে যে রকম সম্মান করা উচিত সে রকম সম্মান অন্য কাউকে প্রদর্শন করা। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভালোমন্দ, লাভ-লোকসান, হায়াত-মাউতের মালিক মনে করে, এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোন কিছু যায় আসে না। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে সীমার অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করো না, যেমন– খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-কে সীমাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেছিলো। আমি শুধু একজন আল্লাহর বান্দা, আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূলেই মনে করো। হে লোক সকল! এটা আমার মোটেই পছন্দ নয় যে, তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে অধিক উচ্চস্থান দান করো এবং আমার কবরকে মেলা বা উৎসবের স্থানে পরিণত করো, যেটা মোটেই আমার কাম্য নয়। হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি পূজার স্থান বানাইও না।"

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক গুনাহগার ব্যক্তি বলেছিলো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাওবাহ করছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, "এ ব্যক্তি সত্যের সঠিক পরিচয় লাভ

করেছে।" আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, "এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১২৮)

"আপনি বলুন, সবকিছুই আল্লাহর হাতে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৫৪)

"বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাবোনা।" (সূরা জিন ঃ আয়াত-২১-২২)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আব্বাস (রা) ও সুফিয়া (রা)-কে বলেছিলেন যে, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের কোন কাজে আসবো না।" কিন্তু মুশরিকরা তাদের বরেণ্য ও মহৎ ব্যক্তিদেরকে অন্যায়ভাবে সম্মান প্রদর্শন করে এবং মূর্তিকেও পূজা করে। মুশরিকরা তাদের ধর্মীয় গুরু ও দেবদেবীকে মাবূদ মনে করে পূজা করে। তাদের এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি যারা বিরূপ আচরণ করে, তারা তাদেরকে দুশমন মনে করে। তারা আরো বলে থাকে যে, আসলে তাওহীদবাদীরা মুশরিকদের দেবদেবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও হেয় প্রতিপন্ন করছেন না, তাদের দৃষ্টিতে তাওহীদবাদীরাই সৃষ্টি কর্তার বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যখন সঠিকভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।" (সূরা আয-যুমার ঃ আয়াত-৪৫)

রাসূলের সর্বাত্মক অনুসরণ ও আলিমদের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য

পূত পবিত্র রাসূলের সঠিকভাবে অনুসরণ করার অর্থ হলো– তাঁর হাদীসের উপর অন্য কোন ব্যক্তির কথা বা অভিমতকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য না দেয়া, সে যে কেউ হোক না কেন। তবে সবার আগে ঐ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এবং দুনিয়ার সকলেই এর বিরোধিতা করলেও এসব হাদীসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তবে এটা সম্ভব নয় যে, দুনিয়াবাসী সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হবে। সকল মুসলমানকেই সহীহ হাদীসের নির্দেশ পালন করতে হবে। এ বিষয়ে কোন অবহেলা করা যাবে না, এরই পাশাপাশি হাক্কানী আলিমদের মর্যাদা, ভালোবাসা ও ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁদের ইজতিহাদকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। বলা বাহুল্য, ইজতিহাদ হলো একটি পুণ্যময় কাজ। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের কারণে এক গুণ বা দ্বিগুণ সওয়াব পেয়ে থাকেন। তবে হাক্কানী আলিমদের এহেন ইজতিহাদের দরুন কোন সহীহ হাদীসকে বাদ দেয়া যাবে না। তাঁরা বড় আলিম এই ভেবে তাঁদের অভিমতকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। যাঁরা সহীহ ও সঠিক হাদীসের অনুসারী

তাঁরাও তো বড় আলিম, তাঁদেরকেও সহযোগিতা করা উচিত। যাঁরা হাদীসবিদদের জন্য মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে, আর তাঁদের যেসব অভিমত উক্ত মাপকাঠির অনুযায়ী হয়, সেগুলো গ্রহণীয় আর যেগুলো মাপকাঠির বিপরীত সেগুলো বর্জনীয়। সবাইকে নিদ্বির্ধায় রাসূলের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরাই রাসূলের সত্যিকার অনুসারী যাঁরা রাসূলের শিক্ষা ও উপদেশ অনুযায়ী আমল করে থাকেন। এ আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, আলিমদের অন্ধ অনুকরণ ও তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার মধ্যে পার্থক্য কি।

তাকলীদ ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য

তাকলীদের অর্থ হলো কোন প্রমাণ বা দলীল ছাড়া কারো অভিমত মেনে নেয়া। কিন্তু একজন মুহাক্কিক আলিম তাকলীদের এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ না করে তাঁর সহজাত জ্ঞান ও ইলমের আলোকে সেটা বিশ্লেষণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে সামনে রেখে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করেন। তবে কোন ধর্মীয় বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে দলীলের দ্বারা প্রমাণিত অভিমতকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। পরে উক্ত বিষয়ে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে সেটা গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন লোক নক্ষত্রের সাহায্যে কিবলার দিক ঠিক করলো, পরে যদি তিনি কিবলার সঠিক দিক জানতে পারেন তখন তাঁকে আর নক্ষত্রের সাহায্যে কিবলার দিক ঠিক করতে হবে না। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত হলো, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ -এর কোন সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত হন, তাঁর জন্য কোন অজুহাতেই ঐ সুন্নাত পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না।

আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে এখানে পবিত্র কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। "আলিম লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার কাছ থেকে সুপথপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলাম।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত ১-৫)

"সৎকর্ম শুধু এটা নয় যে, পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে

তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ আয়াত-১৭৭)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। "তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গণীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হলো আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করো যদি ঈমানদার হয়ে থাকো। যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা রাখে। সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত-১-৪)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। "মুমিনগণ সফলাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র, দয়ার অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় না, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে এবং যারা তাদের নামাযের খবর রাখে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারাই শীতল ছায়াযুক্ত উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (সূরা মুমিনূন ঃ আয়াত-১-১১)

"এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করো। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দুআ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান স্থলও বাসস্থান হিসেবে তা কতোই না উত্তম। বলুন, আমার পালনকর্তার কিছুই আসে যায় না, তোমরা যদি তাঁকে না ডাকো। তোমরা মিথ্যা বলেছো। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭৪-৭৭)

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী,

অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারিণী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৩৫)

"মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৬২-৬৩)

"যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য।" (সূরা নূর ঃ আয়াত-৫২)

"তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়িম থাকে এবং যাদের ধন-সম্পদ নির্ধারিত হক আছে যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতদের এবং যারা কিয়ামতের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।" (সূরা মা'আরিজ ঃ আয়াত-২২-২৬)

"তারা তাওবাহকারী, ইবাদত কারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ ও সিজদাহকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা হিফাযতকারী। এই ঈমানদারকে আপনি শুভ সংবাদ দিন। " (সূরা তাওবাহ ঃ আয়াত-১১২)

আল্লাহর ওলীগণ হলেন তাঁদের রবের খাঁটি বান্দা। তাঁরা প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে বিচারক হিসেবে মান্য করেন। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন নির্দেশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হাদীসের পরিপন্থী অন্য কারো নির্দেশ তাঁরা পালন করেন না। কোন অবস্থায়ই তাঁরা কোন বিদ'আতের দিকে কাউকে আহবানও করেন না। এছাড়া তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আল্লাহ প্রেমিকদের দল ছাড়া অন্য কোন দলের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। আর দীন ইসলামকে তাঁরা খেল তামাশার কোন ব্যাপারে মনে করেন না। অশ্লীল গান বাজনাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁরা অসৎ ও খারাপ লোকদের সঙ্গে মিলামিশা করেন না। পবিত্র কুরআনের উর্ধ্বে নিছক আমোদ আহলাদকে তাঁরা কোন স্থান দেন না। যারা শয়তানের বন্ধু তারা লোকদেরকে গানবাজনা আমোদ আহলাদ ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আহবান জানায়। ঐ লোকেরা খুব আনন্দের সাথে তাদের ডাকে সাড়া দেয়। অপরপক্ষে, আল্লাহ প্রেমিকগণ যা আল্লাহ পছন্দ করেন, সেদিকে লোকদেরকে আহবান জানান। যারা নেককাজে বিরোধিতা করে, তাদের মুকাবিলা করেন। যারা শয়তানের বন্ধু তারা শয়তানের ইচ্ছা মতো কাজ করে এবং লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে। আর যিনি নেক

বান্দা তিনি লোকদেরকে শয়তানের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। শয়তানের দলের লোকেরা তাদেরকে শত্রু মনে করে তাঁদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বহু নিরীহ ও অজ্ঞ লোক শয়তানের এহেন চক্রান্তে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়, যদিও তাদের উদ্দেশ্য মন্দ বা খারাপ নয়, এভাবেই শয়তান দীন থেকে অজ্ঞ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে ও তাদের উপর চেপে বসে। ঐসব পথভ্রষ্ট লোক মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দান করে। আর এরাই হলো শয়তানের বন্ধু। সাধারণত একজন মানুষ তিনটি অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়। **এক.** নামাযের সময়। **দুই.** যাঁরা সুন্নাতের পায়রবী করেন ও আহলে সুন্নাতের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। **তিন.** আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এই তিনটি অবস্থায় মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

ঈমানদারদের কারামত ও শয়তানের ভেলকীবাজীর মধ্যে পার্থক্য

একজন ঈমানদার ব্যক্তি রাসূলে পাকের অনুসরণের দ্বারা, খাঁটি নেক আমল এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমে কারামত বা অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। কারামত লাভের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার ও উন্নতি সাধন করা। সুন্নাতের উপর অটল থেকে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নেক আমলের মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত হয়। অপরপক্ষে, শয়তানী ভেলকীবাজী শিরক ও পাপাচারের দ্বারা সৃষ্টি হয়। যারা শয়তানের বন্ধু তারা তাদের খারাপ আমলের মাধ্যমে শয়তানের সাথে এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে, যার ফলশ্রুতিতে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। এছাড়া মূর্তি পূজা, ক্রুশধারী, অগ্নিউপাসক এবং শয়তানের পূজারী ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার অনুসারীদের মধ্য থেকে এরূপ শয়তানী কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়ে থাকে। একজন শয়তানের পূজারী যখন উপাসনার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করে, তখন শয়তান তাকে ইসতিদরাজ বা শয়তানী শক্তি দ্বারা পুরস্কৃত করে। শয়তান সে শক্তির দ্বারা স্বল্পজ্ঞান ও দুর্বল ঈমানের অধিকারীকে বিপথগামী করে ও তার ঈমান নষ্ট করে। অনেক নিরীহ ও সহজ সরল মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী সকল কাজই শয়তানী কাজ বলে গণ্য হয়। এভাবেই অনেক যাদুকর, অগ্নিউপাসক, এমনকি মুসলমান নামধারী ব্যক্তিকে শয়তানের বন্ধু হতে দেখা যায়। একজন খাঁটি মুসলমান অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন সত্য-মিথ্যা, ভালোমন্দ পার্থক্য করতে না পেরে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজের ঈমান নষ্ট করেন। আসলে ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী হলো পবিত্র কুরআন মজীদ, যেটা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী মহা সম্মানিত রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনই সকল ভালোমন্দের মাপকাঠি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন

নেককার বান্দার হৃদয়ে নূর দান করা হয়। সে নূরই কোনটা সঠিক বা কোনটা বেঠিক সে সে ব্যাপারে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি এই পবিত্র নূর থেকে বঞ্চিত, সে অতি সহজে শয়তানের ফাঁদে পড়ে যায়।

আল্লাহর হুকুম পালন ও ইজতিহাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য

আসমানী হুকুম-আহকাম আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ও নির্ধারিত। যেটা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত করেছেন এবং মানুষকে সেটা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার নির্দেশও দিয়েছেন। মহান মুজতাহিদগণ তাঁদের ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে শরীআতের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সেসব যদি কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী ইজতিহাদকে যারা স্বীকার ও মান্য করে না, তাদেরকে ফাসিক ও কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। আর যেসব মাসয়ালা-মাসায়েল কুরআন ও হাদীস মুতাবিক, সেসব অবশ্যই মানতে হবে ও পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইমাম হযরত আবূ হানিফা (র)-এর অভিমত হলো, "কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন বিষয়ে তিনি যে অভিমত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, তার চেয়ে যদি উত্তম অভিমত কেউ পেশ করতে পারেন, তাহলে তিনি সেটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।" তাই তিনি বলেছেন, যদি কোন ইমামের অভিমত হুবহু আল্লাহর হুকুম হতো, তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রমুখ কর্তৃক আমার কোন কোন মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে বিরোধিতা করার সাহস হতো না। একবার ইমাম মালিক (র)-কে খলীফা হারুনুর রশীদ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলে তিনি তাঁর রচিত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের মাসয়ালা -মাসায়েল অনুসরণ করার জন্য জনসাধারণকে নির্দেশ দান করবেন। কিন্তু ইমাম মালিক (র) এ বিষয়ে খলীফাকে বাধা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "ইতিমধ্যে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং প্রত্যেক গোত্রের নিকট বিভিন্নমুখী ইলম পৌছে গিয়েছে।" ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁর শাগরিদদেরকে তাঁর তাকলীদ করতে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং অসিয়ত করে গিয়েছেন, "আমার কোন অভিমত হাদীসের পরিপন্থী হলে তা পরিত্যাগ করবে।" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর সকল অভিমত সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন না। তিনি বলতেন যে, আমার বা অন্য কোন মুজতাহিদদের তাকলীদ করবে না। বরং তাঁরা যেখান থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল সংগ্রহ করেছেন, তোমরা সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করবে। যদি সম্মানিত ইমামগণের বিশ্বাস এরূপ হতো যে তাঁদের অভিমত অবশ্যই অনুসরণীয়, তাহলে তাঁদের অনুসারীগণকে ঐ সবের বিরোধিতা করা অবৈধ বলে জানিয়ে দিতেন। আর তাঁদের অনুসারীরা কোন মাসয়ালা-

মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁদের বিরোধিতা করা জায়েয মনে করতেন না। এছাড়া ইমামগণের অভিমত প্রত্যাহারের সুযোগও থাকতো। এজন্যই একই ইমামের কোন একটি মাসয়ালায় একাধিক অভিমত দৃষ্ট হয়। এতে জানা গেলো যে, ইজতিহাদী মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন আমল করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের নির্দেশের বিরোধিতা করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় এবং এর কোন সুযোগও নেই। পবিত্র কুরআনের কোন আদেশ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসা যাবে না।

পরিশেষে নাফসে মুতমায়িন্নাহ, নাফসে আম্মারাহ এবং নাফসে লাউয়ামাহর কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো। এ তিনটি নাফসের বিভিন্ন রকমের অবস্থাও রয়েছে। একই নাফস কখনো মুতমায়িন্নাহর, কখনো আম্মারাহর আবার কখনো লাউয়ামাহর রূপ ধারণ করে। অধিকাংশ লোকের উপর নাফসে আম্মারাহই আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। নাফসে মুতমায়িন্নাহ ধারণকারী লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এর মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত চিত্ত! সন্তুষ্ট হয়ে তোমার রবের দিকে ফিরে যাও। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমি আমার বান্দাদের মধ্যেও আমার জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।" (সূরা আল-ফাজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

হে আল্লাহ! আমাদের সকল নাফসকে নাফসে মুতমায়িন্নাহ করে দাও, যাতে আমরা তোমার দীনের উপর অটল থাকতে পারি, তোমাকেই ভয় করি আর তোমার প্রতি আগ্রহী, অনুগত ও অবিচল থাকি। আর আমাদেরকে নাফসের সকল অন্যায় ও মন্দ আমল থেকে রক্ষা করো। আমাদের হৃদয় থেকে অলসতা দূর করে দাও আমাদেরকে লোভ-লালসার অনুসারী বানাইও না এবং সীমালঙ্ঘনকারী করো না। কেয়ামতের দিন আমাদের নিঃস্ব ও দেউলিয়া করো না। আমাদের জন্য সত্যকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে দাও। আমরা যেন আত্মপ্রসাদে ও আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হয়ে কেয়ামতের দিন শুন্য ও রিক্ত হয়ে না যাই। হে পরম করুণাময় আল্লাহ! তুমি আমাদের দু'আ কবূল করো ও আমাদেরকে নাজাত দান করো। আমীন। হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসীর।